প্রথম খণ্ড
বেদ-রহস্য

বেদ-রহস্য

The Secret of the Veda

শ্রীঅরবিন্দ
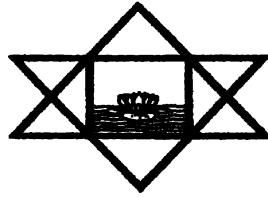
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২
১৯৬৪

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

মূল অনুবাদক : শ্রীশ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রক : অল ইণ্ডিয়া প্রেস
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী—১

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

প্রাক্-কথন

বেদ একটি পবিত্র জ্ঞানগ্রন্থ, অন্তঃস্ফূর্ত কবিতাবলীর সুবিশাল সংগ্রহ, তত্ত্ববিদ্ ঋষিদের কৃতি, এই ছিল প্রাচীনকালে বেদবিষয়ে সমাদর-ভাবনা। ঋষিরা স্বীয় জ্যোতিরুদ্ভাসিত মানসপটে পেয়েছিলেন সার্বভৌম মহৎ, শাশ্বত অপৌরুষেয় এক সত্য যা তাঁরা মননের দ্বারা গঠন করেন নি। এই সত্যকে তাঁরা রূপ দিলেন মন্ত্রে, স্বতঃপ্রকাশিত শক্তিময়ী কবিতায় যার প্রেরণা ও উৎস সাধারণ নয় কিন্তু দিব্য। এই ঋষিরা 'কবি' আখ্যায় অভিহিত হতেন। পরবর্তী যুগে যে কোন কাব্য-রচয়িতাকে কবি বলা হত, সে যুগে কবি-পদটিতে সত্যদ্রষ্টা অর্থ জ্ঞাপিত হত। বেদের মধ্যেই এঁদের 'কবয়ঃ সত্যশ্রুতঃ', সত্যের দ্রষ্টা ও শ্রোতা-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। বেদকে বলা হত 'শ্রুতি' যে পদটি ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মগ্রন্থের অর্থ পেয়েছিল। উপনিষৎ-যুগের ঋষিদের বেদসম্বন্ধে এই ধারণাই দেখা যায়। স্বীয় প্রতি-পাদিত সত্যের প্রামাণ্য হিসাবে তাঁরা বার বার বেদকে সাক্ষী মেনেছেন। কালক্রমে উপনিষদ্গুলিও 'শ্রুতি' বা ভগবদ্-প্রেরিত ধর্মগ্রন্থ-রূপে গণ্য হয়ে পুণ্য শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বেদের যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানপরায়ণ ভাষ্যকারেরা সব কিছুই আখ্যায়িকা ও যজ্ঞক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেছিলেন এবং পণ্ডিতেরা কর্মকাণ্ড-জ্ঞানকাণ্ড-রূপ দুটি শ্রেণীবিভাগ করে প্রথমটিকে সূক্তগুলির সঙ্গে এবং দ্বিতীয়টিকে উপনিষদগুলির সঙ্গে অন্বিত করেছিলেন। এ-সত্ত্বেও বেদ যে সত্যশ্রুত ঋষিদের প্রাপ্তজ্ঞান এ ধারণা-পরম্পরা ব্রাহ্মণগ্রন্থে দৃঢ়মূল ও পরবর্তী যুগেও অক্ষুণ্ণ ছিল। একটি উপনিষদে ও গীতায় কর্মকাণ্ডে জ্ঞান-কাণ্ডের নিমজ্জন নিন্দিত হয়েছে পরুষভাষায় কিন্তু দুটি গ্রন্থেই বেদকে দিব্য জ্ঞানের আকর বলা হয়েছে। এমন কি শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ও উপনিষদ উভয়ই অধ্যাত্মজ্ঞানে চরম ও অভ্রান্ত প্রমাণ বলে পরিগণিত হয়েছিল।

এ-ধারণা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কপোল-কল্পনা, নিরাধার, মূঢ় সংস্কারমাত্র? অথবা এটাই কি সত্য যে পরবর্তী-যুগের কতিপয় বেদসূক্তে যে উচ্চ বিচা-রের স্বল্পমাত্র উপাদান ছিল তাহাই এই ধারণা-পরম্পরার সূত্রপাত সূচিত

করেছিল? উপনিষৎ-রচয়িতারা তাঁদের কল্পনাবহুল ও খেয়ালী ব্যাখ্যার সহায়ে কি এমন অর্থ আরোপ করেছিলেন যা বেদমন্ত্রে নাই? আধুনিক য়ুরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলী সনির্বন্ধে এ-তত্ত্বই পুরঃস্থাপন করেছেন, বহু ভারতীয় আধুনিক পণ্ডিতদের প্রভাবিতও করেছেন। এই তত্ত্বের সমর্থনে রয়েছে এই তথ্য যে বৈদিক-ঋষিরা কেবলমাত্র দ্রষ্টা-ই ছিলেন না, তাঁরা ছিলেন যজ্ঞক্রিয়ানিষ্পাদক পুরোহিত ও গায়ক, সার্বভৌমিক যজ্ঞে গাহিবার জন্য তাঁদের গীত-রচনা, যার বিষয়-বস্তু যজ্ঞবিধির লক্ষীভূত ক্রিয়াকলাপের নির্দেশ ও আপাতদৃষ্টিতে ভোগ্যবস্তু (যথা, ধন, সমৃদ্ধি, শত্রুবিজয় ইত্যাদির) প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা। বেদের মহান ভাষ্যকার সায়ণ ঋক-মন্ত্রগুলির কর্ম-কাণ্ডীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন, প্রয়োজনবোধে কোথাও পৌরাণিকী আখ্যায়িকাত্মক বা ঐতিহাসিক অর্থের আভাস দিয়েছেন যেন পরীক্ষাচ্ছলে। কোনও রূপ উদাত্ত বা ভাবগম্ভীর অর্থের নিরূপণ সায়ণের টীকায় সুদুর্লভ। বহু আয়াসেও যে মন্ত্রগুলির যাজ্ঞিকী বা পৌরাণিকী ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই সেখানে বিকল্প হিসাবে উচ্চাঙ্গ অর্থের ক্ষীণ আভাস দিতে বাধ্য হয়েছেন হতাশ হয়েই যেন। তথাপি আধ্যাত্মিক অর্থে বেদের প্রামাণ্য সায়ণ নিরা-করণ করেন নি, ঋক-মন্ত্রগুলিতে উচ্চতর কোন পরমার্থ-সত্য নিহিত, এ-কথা তিনি অস্বীকার করেন নি। সেই অন্তিমকার্যটির---সেই অস্বী-কৃতির, ভার এই যুগের উপর ন্যস্ত হল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রভাবে তাহা লোকপ্রিয়ও হয়ে উঠল।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা সায়ণের কর্মকাণ্ডীয় সিদ্ধান্তটিই নিলেন, অন্য বিষয়ে তাঁকে দূরেই রাখলেন। শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে স্বকীয় মতের অথবা আনুমানিক ভাবার্থের আরোপ করে তাঁরা বেদমন্ত্রের এমন একটি রূপ দিলেন যা বহুস্থলে স্বৈরচারী ও কল্পনা-প্রসূত। এই পণ্ডিতেরা বেদের মধ্যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, সমাজ-গঠন, সংস্থা, প্রথা, রীতিনীতি ও তাৎকালিক সভ্যতার চিত্র ও নিদর্শন খুঁজলেন। ভাষা-ভেদের সূত্র অনুসরণ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে আর্য-জাতি উত্তর-দেশ থেকে এসে দ্রাবিড়-ভারতকে আক্রমণ ও জয় করে। এরূপ ঘটনার স্মৃতি কিন্তু ভারতে পরম্পরাগত প্রবাদের মধ্যে পাওয়া যায় না, এরূপ ঘটনার উল্লেখও নাই ভারতের কোনও মহাকাব্যে বা অভিজাত-সাহিত্যে। এই মতানুসারে বৈদিক ধর্ম প্রকৃতি-দেবতার পূজা, সৌর-আখ্যায়িকাপূর্ণ, যজ্ঞ ও যজ্ঞানুষ্ঠানিক গাথার দ্বারা উৎসর্গীকৃত যেগুলির ভাব বা বিষয়-বস্তু আদিমসভ্যতা-সুলভ;

এবং এই বর্বরোচিত প্রার্থনাগুলি-ই হল বেদ যার সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম দর্প, (মহিমা-মণ্ডিত করে যাতে আমরা দিব্যত্ব আরোপ করি।)

এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে আদিম যুগে দেব-দেবীরূপে পূজা পেতেন ভৌতিক জগতের শক্তি-সমূহ যথা সূর্য, চন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, বায়ু, বর্ষা, বাত্যা, পবিত্র সরিৎ ইত্যাদি এবং প্রকৃতি-ব্যাপারের অধিষ্ঠাতা অন্য বহু দেবতারা। রোমে গ্রীসে, ভারতবর্ষে এবং অন্য বহু পুরাতন জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে পূজার এই ছিল সামান্য-স্বরূপ। কালক্রমে সকল দেশেই এই দেবতারা ক্রমশঃ উচ্চতর ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্যালাস এথিনী (Pallas Athene) আদিতে সম্ভবতঃ আকাশ-দেবতা (বেদকীর্ত্তিত দ্যৌঃ) জিয়াস (Zeus)-এর শীর্ষ থেকে অগ্নিশিখায় উদ্ভূত উষাদেবীরূপে; প্রাচীন 'অভিজাত' গ্রীস-দেশে তিনি উচ্চতর বৃত্তির বিধাত্রী, তিনিই আবার অ-ভিন্না বলে গণ্য হয়ে উঠেছিলেন বিদ্যা-জ্ঞান ইত্যাদি উচ্চাঙ্গভাবের অধিষ্ঠাত্রী মিনার্ভা দেবীর সঙ্গে। তেমনি ভারতবর্ষে নদী-দেবী সরস্বতী কালক্রমে জ্ঞান-বিদ্যা-কলাশিল্পের অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর পদ-স্থান পেয়েছিলেন। এইরূপ পরিবর্তন গ্রীসের সকল দেবতাতেই লক্ষিত হয়—যথা সূর্য-দেবতা অ্যাপোলো (Apollo) হয়ে উঠেছিলেন কাব্য-কলা ও ভবিষ্যৎ-বাণীর দেবতা, অগ্নি-দেব হিফাস্টস্ (Hephaestus) পরিণত হয়েছিলেন দিব্য-শিল্পী ও শ্রম-দেবতা বিশ্বকর্মারূপে। এই পরিবর্তন-ক্রিয়া ভারতবর্ষে মধ্য-মার্গেই নিরুদ্ধ। আধ্যাত্মিক ক্রিয়া ও ভাবের পূর্ণতর বিকাশ সক্রিয় রেখেও বৈদিক দেবতারা তাঁদের বাহ্য-স্বরূপ সুদৃঢ়ভাবেই ধরে রেখেছিলেন। উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে নূতন পৌরাণিক এক দেব-গোষ্ঠী স্থান পেয়েছিল। উচ্চতর বিশ্বাত্মক ব্যাপারে ক্রিয়াবান বিবেচিত হওয়ায় এই পৌরাণিক দেবতারাই প্রাধান্য পেলেন যদিও তাঁদের উদ্ভব পূর্বের বৈদিক দেবতা-পরম্পরা থেকেই,—যেমন বৈদিক বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণ-স্পতি থেকে এসেছিলেন পৌরাণিক রুদ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, ও দুর্গা। এই পরিবর্তন-ক্রম ভারতবর্ষে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, পূর্ব-দেবতারা পৌরাণিক গোষ্ঠীতে ক্ষুদ্র পর্যায়ে গণিত। এরূপ হওয়ার মুখ্য কারণ, প্রারম্ভ থেকেই ঋগ্বেদের দেবতাদের উপর বাহ্যিক ও মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াশীলতার যুগপৎ সামর্থ্য প্রবলভাবেই আরোপিত হয়েছিল। দেবতাদের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখার কোন প্রাচীন সাহিত্যিক নিদর্শন গ্রীস বা রোমে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন জাতিসমূহে এই পরিবর্তনের কারণ জাতির কৃষ্টিগত ও সাংস্কৃ-

তিক বিকাশ। সভ্যতার ক্রম-পরিণতিতে যথা যথা মানুষ উত্তরোত্তর মনঃ-প্রধান হয়ে ওঠে ও দেহ-প্রধান জীবন-ব্যাপারের প্রতি আসক্তি ন্যূনতর হতে থাকে তথা তথা কর্মবিধান ও দেবস্বরূপ কল্পনাতে সুচারুতর ও সূক্ষ্মতর এমন কোন তত্ত্ব-অনুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হয় যা তাৎকালীন উচ্চতর মনোধর্মী বিচার ও রুচির অবলম্বন হতে পারে। প্রয়োজন হয় এমন এক সত্তার বা দেব-বিগ্রহের যা এই সকল উচ্চ ভাবধারার ধারক ও অনুমন্তা হতে পারে। চিন্তার অগ্রগতিতে অন্তর্মুখী প্রবৃত্তির প্রভাব যে উত্ত-রোত্তর বর্ধিত ও দৃঢ়মূল হয়েছে সে কৃতিত্বের ভূয়িষ্ঠ অংশ সকল দেশেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বানুসন্ধানী রহস্যবিদ্‌দের প্রাপ্য। আদিম সভ্যতাগুলিতে তাঁদের প্রভাব সুমহান। প্রায় সর্বত্র কদাচিৎ এমন একটি রহস্য-যুগ এসেছিল যখন গভীরতর ধী-সম্পন্ন আত্মজ্ঞানীরা স্বকীয় সাধনানুরূপ কৃত্য-কর্ম ও বিধিবিধানসমূহ এবং প্রতীকাত্মক গূঢ়-বিদ্যা সন্নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠাপিত করেছিলেন আদিমতর বাহ্যধর্মের অনুষ্ঠেয় বিধিনিয়মের অভ্যন্তরে বা পরিধিতে। এই ব্যাপারটি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছিল। গ্রীসে ছিলেন অর্ফিক (Orphic) এবং ইলিউসীয় (Eleusinian) রহস্য-বাদীরা; মিশর ও ক্যালডিয়া দেশে, গুহ্য ও যাদু-বিদ্যানিরত পুরোহিতরা, পারস্যদেশে মাগি-রা এবং ভারতবর্ষে ঋষিবৃন্দ। রহস্যবাদী ভাবকরা (Mystics) আত্মজ্ঞান ও গভীরতর বিশ্ব-জ্ঞানের চর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে উপর-ভাসা দেহগত মানুষের পিছনে এক গভীরতর আত্মা ও অন্তঃসত্ত্বা বিদ্যমান যার অন্বেষণ ও অবগতি মানবের সর্বোত্তম কর্ম। 'আত্মানং বিদ্ধি' ছিল তাঁদের মহতী শিক্ষাবাণী। ভারতবর্ষে আত্ম-জ্ঞান ও আত্মোপলব্ধি হয়ে উঠেছিল মানব-সাধারণের মহৎ আধ্যাত্মিক প্রয়োজন ও উচ্চতম কাম্যবস্তু। তাঁরা সন্ধান পেয়েছিলেন আরও একটি সত্যের—বিশ্বের বাহ্যরূপের পিছনে এক পরমার্থতত্ত্বের—যার গবেষণ, অনুসরণ ও সাক্ষাৎকার হয়েছিল তাঁদের মহৎ অভীপ্সার লক্ষ্য। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন প্রকৃতির সেই সব শক্তি ও রহস্য যা ভৌতিক জগতের পরিধিভুক্ত না হয়েও ভৌতিক জগৎ ও ভৌতিক বস্তুর উপর গুহ্য প্রভুত্ব এনে দিতে পারে। এই গুহ্যবিদ্যা ও গুহ্য-শক্তির একটা সুব্যবস্থিত প্রয়োগ-বিধান রচনা-ও ছিল তাঁদের মহৎ কৃত্য-কর্মের অন্যতম। এ-কর্মটি তাঁরা নিরাপদে সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন কঠিন ও সযত্ন প্রশিক্ষণ, নিয়মানু-বর্তিতা ও প্রকৃতি-শোধনের দ্বারা; সাধারণ মানুষের পক্ষে এটি অসাধ্য।

কঠোর পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যতীত এ-সব ব্যাপারের মধ্যে মানুষের প্রবেশ সঙ্কটাবহ, নিজের পক্ষে, অপরের পক্ষেও। এই বিদ্যা ও শক্তিসমূহের অপব্যাখ্যা ও দুরুপযোগ সম্ভব—-সত্যকে মিথ্যার দিকে, শিবকে অ-শিবের দিকে নিয়ে যাওয়া। অতএব গোপনতার কঠিন পরিবেশ ব্যবস্থিত হয়েছিল যার অন্তরালে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গুপ্তবিদ্যাটি হস্তান্তরিত হত। প্রতীকের আবরণে রচিত যবনিকার পিছনে রহস্য-ব্যাপারগুলি রেখে এমন সব সংলাপ ও নির্বহণ-সূত্র প্রণীত হয়েছিল যার অর্থ দীক্ষিত শিষ্যদিগেরই বোধগম্য। অপরের কাছে সেগুলি ছিল অবোধ্য বা বোধ্য হত কেবলমাত্র বাহ্যার্থে যা প্রকৃত রহস্যার্থকে গোপায়িত রাখত। সর্বত্র রহস্যবাদের এই-টেই সার কথা।

ভারতবর্ষে আদিমতম কাল থেকে এই পরম্পরাগত প্রবাদ প্রচলিত রয়েছে যে বেদের ঋষিরা ক্রান্তদর্শী কবি ছিলেন ও সাধারণ মানবের অগোচর মহৎ আধ্যাত্মিক ও লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সেই জ্ঞান ও শক্তিনিচয় তাঁরা স্ববংশজ বা মনোনীত বরিষ্ঠশিষ্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করতেন গুপ্তদীক্ষার সহায়ে। এই প্রবাদটি সর্বথা নির্মূল বা আলম্বনহীন, শূন্যে সহসা-উদ্ভূত বা ক্রমশঃ-রচিত একটা অন্ধবিশ্বাসমাত্র, এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। যত স্বল্পই হউক, বহুশতাব্দীসঞ্চিত প্রক্ষিপ্ত বাক্য এবং গল্পকথায় যতই পরিবর্ধিত হউক, প্রবাদটির একটি অধিষ্ঠান-ভূমি বা ভিত্তি নিশ্চয়ই ছিল। তা যদি সত্য হয়, তা হলে দ্রষ্টাকবিদের গুহ্যজ্ঞান ও রহস্য-বিদ্যার সামান্য কিয়দংশ নিশ্চয়ই বর্ণিত হয়ে থাকবে তাঁদের রচনায় এবং বেদমন্ত্রে এরূপ কিছু উপাদান বিদ্যমান থাকবেই গুহ্যভাষার অন্তরালে ও প্রতীকের আবরণে সুগোপায়িত থাকা সত্ত্বেও। আর যদি বিদ্যমান থাকে অন্ততঃ কিছু অংশের রহস্যভেদও সম্ভব হবে। একথা সত্য যে ভাষার সুপ্রাচীনত্ব, অপ্রচলিত শব্দ-সমষ্টির প্রয়োগ (যাস্কের গণনায় চতুঃ-শতেরও অধিক শব্দের অর্থ অবিদিত) এবং বহুস্থলে কঠিন ও পুরাতন রচনাশৈলী বেদমন্ত্রের অর্থ অস্পষ্ট রাখাতেই সহায়ক হয়েছিল। বৈদিক প্রতীকগুলির অর্থ-সঙ্কেতের যে কোষ ঋষিদের নিকট ছিল তাহা লুপ্ত হওয়ায় পরবর্তীযুগীয়দের নিকট বেদ দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছিল; এমন কি গুহ্যবিদ্যায় প্রবেশের নিমিত্ত উপনিষদ-যুগের আত্মজিজ্ঞাসুদের-ও দীক্ষা ও ধ্যানের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। আরও পরবর্তী যুগের বিদ্যোৎসাহীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কখনও বা নিছক অনুমানের শরণাপন্ন হয়েছিলেন

কখনও বা বৌদ্ধিক ব্যাখ্যায় অভিনিবেশের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কখনও বা পৌরাণিকী আখ্যায়িকা বা ব্রাহ্মণগ্রন্থের কথানকের শরণ নিয়েছিলেন যদিও বহুস্থলে সেগুলিও অস্পষ্ট ও প্রতীকাত্মক। তথাপি সেই বিলুপ্ত রহস্যের উদ্ধার-ই বেদের প্রকৃত অর্থাববোধে ও মূল্যায়নে একমাত্র সাধন। বেদে কি আছে এই প্রশ্নের উত্তরে যাস্কমুনির সঙ্কেতটির উপর গুরুত্ব অর্পণীয়। তাঁর মতে বেদ হ'ল ক্রান্তদর্শী কবিদের প্রজ্ঞায় উদ্ভূত স্বতঃস্ফূর্ত বাক্। প্রাচীন পরম জ্ঞানের অন্বেষণে এই সূত্রই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। অন্যথা বেদ চিরকালের নিমিত্ত আমাদের কাছে সীলমোহরে আবদ্ধ গ্রন্থই থেকে যাবে; ব্যাকরণবিশারদদের বা ব্যুৎপত্তিবিদ্-দের বা পণ্ডিতদের অনুমান-বহুল তর্ক-বিতর্কের সহায়ে এই নিহিত জ্ঞানকক্ষের দ্বার উন্মুক্ত হবে না।

সনাতন বেদের মন্ত্রগুলিতে গুহ্য-অর্থ বা রহস্য-জ্ঞান নিহিত আছে এ-ধারণা চলে আসছে অতি প্রাচীন কাল হতে---বেদ যত প্রাচীন এ-ধারণা পরম্পরাও তত প্রাচীন। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বাস করতেন যে মন্ত্রগুলি তাঁদের চেতনার কোন উচ্চতর ও গুপ্ততর স্তর থেকে স্ফূর্ত্ত এবং সেই গুপ্তজ্ঞান-গর্ভিত। বেদ-বাক্যের প্রকৃত অর্থ তিনিই জানতে পারেন যিনি স্বয়ং দ্রষ্টা-কবি বা রহস্যবেত্তা। অন্যের নিকট বেদমন্ত্রগুলি গূঢ়ার্থ প্রকাশ করবে না। চতুর্থ মণ্ডলের একটি সূক্তে (ঋক ৪: ৩: ১৬) ঋষি বামদেব নিজেকে এই ভাবে বর্ণিত করেছেন---"অন্তঃপ্রকাশযুক্ত (বিপ্রঃ) হয়ে আমি স্ব-গত বিচার-ভাবনা (মতিভিঃ) ও অন্তঃস্ফূর্ত্ত শব্দসমূহে (উক্‌থৈঃ) মার্গদর্শক (নীথানি) গুহ্য বচনগুলি (নিণ্যা বাচাংসি) ব্যঞ্জিত করছি"---আবার বলছেন "ঋষিপ্রজ্ঞালব্ধ বাক্য, যার অন্তরর্থ দ্রষ্টা বা কবিকেই শোনাবার জন্য"---"কাব্যানি কবয়ে নিবচনা"। বেদমন্ত্র সম্বন্ধে ঋষি দীর্ঘতামস বলছেন "ঋক্‌গুলি সেই পরমাকালে প্রতিষ্ঠিত যা অ-ক্ষর, যা অ-পরিবর্তনীয়, যে আধারে সকল দেবতারা অধিষ্ঠিত রয়েছেন" আরও বলছেন "যিনি এই আধারকে জানেন না, বেদমন্ত্র তার কোন কাজে লাগবে ?" (ঋ: ১: ১৬৪: ৩৯) । এর পর বাক্-এর চারিটি স্তর নির্দেশ করে ঋষি বলছেন---তিনটি স্তর গুহায় নিহিত, চতুর্থটি মানবীয় যেখান থেকে মানবভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ শব্দগুলি জন্ম নিয়েছে। বেদের শব্দসমূহ ও বিচারধারা কিন্তু উচ্চতর স্তর তিনটিতে সংবদ্ধ (ঋ: ১: ১৬৪: ৪৫)। অন্যত্র বলা হয়েছে বেদবাণী পরমা (প্রথমম্), সর্বোচ্চশিখরভূতা (বাচো অগ্রম্), শ্রেষ্ঠা ও নিত্যাল্পনির্দোষা

(অরিপ্রম্) (ঋঃ ১০: ৭১:)। বেদবাণী গুহায় নিহিত, সেইখান থেকে এর উদ্ভব এবং প্রকাশ। সত্যদ্রষ্টার অন্তরেই এর প্রবেশ,---ঋষিদের অন্তরে---এবং তাঁদের বাক্পদ্ধতি অনুসরণেই, উপলভ্য; কিন্তু সাধারণের পক্ষে এর নিগূঢ়ার্থে প্রবেশ অসম্ভব। যাঁরা এ-বাণীর অন্তরাশয় জানেন না, তাঁরা দেখেও দেখতে পান না, শুনেও শুনতে পান না। বিরল সে জন যাকে কামনা করে' দিব্য-বাণী আপনাকে নিরাবরণ করেন, শোভনবস্ত্রাবৃতা সুসজ্জিতা জায়া নিজতনু নিরাবরণ করেন পতির কাছে যেমন। অপরে যাঁরা অবিরাম বেদ-ধেনুর দুগ্ধ-পানে অসমর্থ, তাঁরা বন্ধ্যা গাভী নিয়ে বিচরণ করেন, তাঁদের কাছে বেদ-বৃক্ষ ফলপুষ্পহীন শুষ্কবল্লরী মাত্র। দ্বিধাহীন নিঃসঙ্কোচ উক্তি; নিঃসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্তে পৌছান যেতে পারে যে রচনাকালেই ঋক্গুলিতে নিহিত করা হয়েছিল এমন গূঢ়ার্থ যা সর্ব সুলভ নয়। পবিত্র বেদমন্ত্রগুলিতে ছিল গুহ্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-তত্ত্ব এবং কেবলমাত্র এই জ্ঞানের অর্জনেই দিব্য-সত্যের অবগতি ও উচ্চতর অবস্থান-ভূমিতে আরোহন সম্ভব। এই বিশ্বাস কোন অর্বাচীন পরম্পরাগত নয়; সম্ভবতঃ বৈদিক যুগের সকল ঋষিরা, অন্ততঃ বামদেব ও দীর্ঘতামস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ঋষিরা এই বিশ্বাস পোষণ করতেন।

এই ধারণা-পরম্পরা বৈদিককালেই প্রথিত, উত্তরকালেও অবিচ্ছেদে প্রচলিত। বেদ-ব্যাখ্যার একাধিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ যাস্ক-মুনি করেছেন। একটি হল যাজ্ঞিকী বা কর্মকাণ্ডীয় ব্যাখ্যা, একটি ঐতিহাসিকী যেটিকে পৌরাণিকী রূপকথা বলাই বোধ হয় অধিকতর সঙ্গত। তৃতীয়টি বৈয়াকরণিক শব্দ-ব্যুৎপত্তি-কোবিদদের কৃত ব্যাখ্যা অর্থাৎ আধ্যাত্মিক। যাস্ক-মুনি স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে জ্ঞানের ত্রৈবিধ্য-হেতু বেদসূক্তগুলির তিনটি ভিন্ন অর্থ সম্ভব---একটি অধিযজ্ঞীয় বা কর্মকাণ্ডীয়; দ্বিতীয়টি আধিদৈবিক অর্থাৎ দেবতা-স্বরূপাত্মক। অন্তিমটি আধ্যাত্মিক যেটিতেই নিহিত বেদের প্রকৃত তাৎপর্য এবং যা অধিগত হলে অন্য অর্থ সব শীর্ণ বা খণ্ডিত হয়ে যাবে। আধ্যাত্মিক অর্থটিই ত্রাণ-সমর্থ, অন্য অর্থগুলি বাহ্য এবং গৌণ। আরও একটু অগ্রে যাস্ক বলছেন---বস্তুর সত্য-স্বরূপ ও সত্য-ধর্ম ঋষিরা অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। পরে যখন বেদনিহিত জ্ঞান ও অন্তরার্থ প্রায় বিলুপ্ত, তখন যে ঋষিদের সে জ্ঞান লুপ্ত হয় নি তাঁদের কর্তব্য হল সেটিকে রক্ষা করা দীক্ষিত শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে। আরও পরবর্ত্তী যুগে বেদের অর্থবোধে নিরুক্ত ও বেদাঙ্গাদি বুদ্ধিনির্ভর বহিরুপকরণের উপযোগ

অপরিহার্য হল। এ পরিস্থিতিতে-ও যাস্ক বলছেন "বেদের সত্য-অর্থের সাক্ষাৎকার হয় ধ্যানযোগ বা তপস্যার দ্বারা"; এর প্রয়োগে যাঁরা সমর্থ তাঁদের অন্য কোন বাহ্য সহায়ের প্রয়োজন হয় না। যাস্কের এই উক্তি অতি সুস্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধ।

বেদে নিহিত রহস্য-তত্ত্বই যে ভারতীয় দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মের মূল উৎস এ ধারণা-পরম্পরা ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বারা অধিকতর সমর্থিত, ইউরোপীয় মতবাদের অপেক্ষা, যে মতবাদে ভারতীয় ধারণা তুচ্ছ ও নগণ্য বলে কল্পিত। জড়বাদী বাস্তবতার যুগে লিখিত উনবিংশ শতকের বিদ্যাবত্তার বিচারে জাতির আদিম-রূপ বর্বরতা বা অর্ধ-বর্বরতা যখন সমাজ-ধর্ম ও সমাজ-জীবন অপরিপক্ব ও কুসংস্কার-বহুল; প্রগতির ধারায় বুদ্ধি, তর্কশক্তি, কলা, দর্শন, ও ভৌতিকবিজ্ঞানের উৎকর্ষে ও স্পষ্ট-তর, নির্দোষতর ব্যবহারিক-বুদ্ধির উদ্ভবে গড়ে ওঠে সভ্য আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও অনুষ্ঠান-সমূহ। এ-আলেখ্যে বেদসম্বন্ধে পুরাতন উচ্চাঙ্গের ধারণার কোন স্থান ছিল না; বরং বেদগ্রন্থ ভ্রান্তি ও কুসংস্কারের পর্যায়েই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আজ আমরা ভারতে জাতি-প্রগতির যথার্থতর ধারণায় পৌঁছাতে সক্ষম। প্রাচীন সভ্যতাগুলির আদিম পর্বে উত্তরযুগের প্রগতির উপাদান অন্তর্নিহিত থাকলেও, আদিম যুগের প্রাজ্ঞেরা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, বা উচ্চতর্কবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন রহস্যবাদী, রহস্য-মানবও তাঁদের বলা চলতে পারে---অতীন্দ্রিয়-শক্তির অনুসন্ধিৎসু ও ধর্ম-জিজ্ঞাসু। সন্ধানী তাঁরা ছিলেন না বস্তুর বহির্জ্ঞানের ; অন্তরালে যে সত্য প্রচ্ছন্ন তারই অন্বিষ্মু ছিলেন তাঁরা। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যুগ এসেছিল পরে; পাইথাগোরাস ও প্লেটোর মত মনীষীরা কতক অংশে রহস্যবাদী ভাবক (Mystic) ছিলেন অথবা ভাবকদেরই ভাবধারা থেকে স্বীয় চিন্তার বহু উপাদান আহরণ করেছিলেন। ভারতে, দর্শনবিদ্যা রহস্যবাদীদের জিজ্ঞাসা থেকে বর্ধিত হয়ে তাঁদেরই আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করেছে; পরবর্তী যুগের অধ্যাত্মসাধনায় ও যোগমার্গে তাঁদেরই পদ্ধতিসমূহের কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। বেদে অন্তর্গূঢ় রহস্য নিহিত আছে এই জনশ্রুতি ঐতিহাসিক তথ্যের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং ভারতীয় কৃষ্টির ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। বেদ-ই ভারতীয় কৃষ্টির ধ্রুব প্রতিষ্ঠান-ভূমি, কুসংস্কারবদ্ধ যাজ্ঞিক পূজা-বিধি, বর্বর বলিপূজার মন্ত্রমাত্র নয়, এ-ধারণা জনশ্রুতি-পর্য্যায় অতিক্রম করে ঐতিহাসিক বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত।

যদিও বা সূক্তগুলিতে উচ্চাঙ্গের অধ্যাত্মজ্ঞান ও উচ্চবিচারশীল ভাবরাশি সন্নিবিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, এরূপ ধারণা করাই কি সঙ্গত হবে না যে এগুলি বেদের স্বল্পভাগমাত্র, অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশের বিষয়বস্তু যাজ্ঞিক পূজাবিধি, দেবতার স্তুতি ও বরপ্রার্থনা। যজমানের প্রার্থনার বিষয়——প্রভূত গো ও অশ্ব, যোদ্ধৃবীরবৃন্দ, পুত্ররত্ন, সর্ববিধ ঐশ্বর্য, বিপদে রক্ষা, সংগ্রামে বিজয়, আকাশ হইতে বারিপতন, মেঘ ও রাত্রির পাশ হইতে সূর্যদেবের মুক্তি, সপ্তনদীর নির্বাধ প্রবাহ, দস্যু (দ্রাবিড়)-হস্ত হইতে অপহৃত গবাদি পশুর মোচন এবং এইরূপ বহু বরপ্রার্থনা যেগুলিকে স্থূল-দৃষ্টিতে কর্মকাণ্ডীয় পূজার লক্ষ্যবস্তু বলা যায়। এ ধারণার উপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে যৎকিঞ্চিৎ আধ্যাত্মিক ও গোপন-জ্ঞানের অধিকারী হলেও ঋষিরা ছিলেন মোটের উপর তাৎকালিক প্রাকৃত-সুলভ বিচার বিচারণায় প্রভাবিত মানুষ। অতএব, তাঁদের স্তুতিপাঠে এই দুই মনোভাবের ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ অনিবার্য। পরম্পরাগত বেদভাষ্যে যে দুর্বোধ্যতা যে অদ্ভুত ও স্থানে স্থানে আবোল-তাবোল প্রলাপ-উক্তি দৃষ্ট হয় তার হেতু এই দ্বৈধ-ধারার মিশ্রণ। কিন্তু বেদের বহুল অংশে যদি পাই উচ্চ চিন্তা ও বিচারণার বৃহৎ সমুদায়, যদি দেখি বহু মন্ত্রের, এমনকি সম্পূর্ণ বহু সূক্তগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব একমাত্র অতীন্দ্রিয় (Mystic)-ভাব ও অভিপ্রায়ের অনুর্থে, এবং অবশেষে যদি দেখি কর্মকাণ্ডীয় ও বহিরাঙ্গের প্রক্রিয়ার বর্ণনা এরূপ সব প্রতীকের রূপ নিয়েছে যা রহস্যবিদেরা সর্বদা ব্যবহার করতেন, যদি আরও দেখি সূক্তগুলির অভ্যন্তরে প্রতীকার্থ প্রয়োগের সুস্পষ্ট সঙ্কেত, এমন কি সুব্যক্ত নির্দেশ, তা হলে পূর্বোপনীত স্থূল সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিবর্তনীয়। বুঝতে হবে আমরা গোপন রহস্যদর্শীদের একটি মহান শাস্ত্রগ্রন্থের সম্মুখীন, যেটি দ্ব্যর্থাত্মক। একটি অর্থ বাহ্য, অপরটি গুহ্য। প্রতীকগুলির-ই এমন নিজ নিজ বিশিষ্টার্থ আছে যা সেগুলিকে তাৎপর্যে গূঢ় বিদ্যার অঙ্গীভূত করে এবং সেই বিদ্যার তত্ত্বজ্ঞানে ও গোপন শিক্ষণে উপাদানভূত করে। অল্পসংখ্যক কয়েকটি সূত্র-ব্যতিরেকে সমগ্র বেদ অন্তর্গূঢ় অর্থে এইরূপই একটি ধর্মগ্রন্থ। অথচ, বাহ্যার্থ কেবল অন্তরার্থের ছদ্ম-বহিরাবরণ (মুখোস) মাত্র, এ ভাবনা অনিবার্য নয়। বেদ-রচয়িতারা হয়ত ঋক্-সূক্তগুলিকে শক্তিময়ী বাক্ মনে করতেন——শক্তিময়ী শুধু আন্তর-সাধনে নয় বহির্বস্তু সম্বন্ধেও। বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে কেবল অধ্যাত্ম অর্থ ও তাৎপর্যের অবকাশ, প্রাক্তন ঋষিরা কিন্তু ছিলেন এমন মানুষ যাঁদের

গোপন রহস্যবিদ্ বলা চলে, এমন মানুষ যাঁরা বিশ্বাস করতেন আন্তর উপায়, বহিঃ ও আন্তর দুইরূপ পরিণাম সাধনেই সমর্থ---বাক্ এবং মননের এমন প্রয়োগ সম্ভব যাতে উভয়প্রকার সিদ্ধিই বেদের ভাষায় 'দিব্য ও মানুষী'---লভ্য হতে পারে।

গূঢ় বাক্ ও অর্থের এ-সমষ্টি ও সমবায় বেদে কোথায়? সে সন্ধান পাওয়া যাবে যদি ঋষি-প্রযুক্ত পদ ও সূত্রগুলির প্রাথমিক সহজ ও সরল অর্থে, এবং সর্বদা সেই একই অর্থে আমরা গ্রহণ করি, বিশেষ করে সেই কুঞ্জীভূত পদসমূহের যেগুলিকে রহস্যবাদের সৌধ-নির্মাণে সন্ধি-শিলা বলা চলতে পারে। এইরকম পদের মধ্যে একটি মহান পদ সত্য-পর্যায়ী "ঋত"; সত্যের সন্ধানই ছিল রহস্যবাদী ভাবক ঋষিদের গবেষণার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য---আধ্যাত্মিক-সত্য বা আন্তর-সত্যের সত্যস্বরূপ, আমাদের সত্তার সত্যস্বরূপ, বস্তু-নিচয়ের সত্যস্বরূপ, ও দেবতার সত্যস্বরূপ এবং আমাদের ও বিশ্ব-বস্তুর অন্তরালে যা বিদ্যমান তার সত্যস্বরূপ। কর্মকাণ্ডীয় ব্যাখ্যায় কিন্তু বৈদিক-ভাবনার এই মুখ্য 'ঋত' পদটির নানা অর্থ করা হয়েছে ভাষ্য-কারের সুবিধা বা খেয়ালখুশীর অনুযায়ী---যথা সত্য, যজ্ঞ, জল, বিগত ব্যক্তি, এমন কি অন্ন এবং এইরূপ ভিন্নার্থজ্ঞাপক বহুবিধ শব্দ যার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ স্বৈরাচারের অনুবর্তনে বেদ-গবেষণায় কোনও নিশ্চিত ফলপ্রাপ্তি অসম্ভব। কিন্তু যদি আমরা সর্বদা এবং সর্বস্থলে ঋত-পদটির প্রধান ও মুখ্য 'সত্য' অর্থই গ্রহণ করি তা হলে বিস্ময়কর এবং সুস্পষ্ট এক পরিণাম লক্ষিত হয়। বেদে ব্যবহৃত অনুরূপ স্থায়িপদগুলিরও অর্থ বিবেচনায় এই ব্যবস্থাই যদি অক্ষুণ্ণ রাখি, যদি পদগুলির সহজ ও মুখ্য অর্থ স্বীকার করি, চপলতা পরিহার করে সর্বদা সেই ধ্রুব অর্থই গ্রহণ করি, সঙ্কীর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডীয় অর্থের পক্ষপাত সংবরণ করি, 'শ্রবম্', 'ক্রতু' ইত্যাদি কতিপয় মুখ্য পদগুলির সমুচিত অর্থগৌরব দিই মনো-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে---যে অর্থ-দ্যোতনা পদগুলির মধ্যে নিহিত এবং কোনও কোনও স্থলে প্রকাশ পেয়েছে যেমন বেদে অগ্নির বর্ণনায় 'ক্রতুর্হৃদি' বিশেষণে ---তা হলে বেদ-গবেষণার লক্ষ্যের নির্দেশ হবে স্পষ্টতর, ব্যাপকতর ও সুদূরপ্রসারী। এ ছাড়া যদি বেদের মধ্যেই প্রতীকাত্মক পদগুলির আন্তর অর্থ সম্বন্ধে ঋষি-প্রদর্শিত বহু সঙ্কেত ও কৃচিৎ-লব্ধ স্পষ্টোক্তির নির্দেশগুলি আমরা অনুসরণ করি এবং রহস্যগর্ভ কাহিনীগুলির সেই অর্থানুযায়ী ব্যাখ্যা করি---যে সব কাহিনী পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত যথা; বৃত্র ও বৃত্রশক্তির সংগ্রাম,

বৃত্র-বিজয়, পণি বা অন্যান্য দস্যু-হস্ত থেকে সূর্য, অপ ও গাভীদিগের মুক্তি—তাহলে সমগ্র ঋগ্বেদকে আমরা পাই একটি নিগূঢ়, গুপ্ত, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র ও সাধনসূত্রের সমষ্টিরূপে যার উদ্ভব অন্য যে কোন প্রাচীন দেশে মরমী ভাবকদের দ্বারা সম্ভব হতে পারত এবং যা ভারতবর্ষে আজও টিকে রয়েছে বেদের মধ্যেই। স্বেচ্ছাকৃত যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বটে কিন্তু প্রথমদৃষ্টিতে পর্দাটিকে যতটা স্থূল মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তত নয়। সম্যক্‌ দৃষ্টি উন্মীলনে যবনিকা অন্তর্হিত হয় ও বাক্‌রূপী সত্য মূর্ত হয়ে ওঠে।

বেদে বহু মন্ত্র-পাদে এমন কি সমগ্র সূক্তে রাহস্যিক অন্তরার্থ প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট। সহজেই প্রতীতি জন্মায় বাক-শৈলী রহস্যগর্ভা ও গূঢ়ার্থা। অগ্নির বর্ণনায় ঋষি যখন বলেন "নিজধামে বিরাজমান দেদীপ্যমান সত্যের সংরক্ষক", মিত্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতারা 'সত্য-স্পর্শী', 'সত্য-সংবর্ধক' অথবা 'সত্য-জাত' তখন এই সব বিশেষণপদগুলি এমন কোন রহস্যবাদী কবির উক্তি বুঝতে হবে যিনি নিখিল বস্তুর অন্তরালে বস্তু-স্বরূপের মূলস্থিত, প্রাক্তন ঋষিদের অনুসংহিত, সত্যের চিন্তায় মগ্ন। সাধারণ অগ্নি বা যজ্ঞীয় অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী জড়-প্রকৃতির শক্তি ও সামর্থ্য ঋষির চিন্তার বিষয় নয়। সরস্বতীর বর্ণনায় কবি বলছেন—ইনি সত্যবাক্‌-এর প্রচোদয়িত্রী, যথার্থ বিচারের বিবোধয়িত্রী, বিচারসমৃদ্ধশালিনী যিনি প্রবুদ্ধ হয়ে আমাদের চেতনাকে মহার্ণবের অভিমুখে প্রবুদ্ধ করেন, আমাদের সমগ্র বিচারবুদ্ধিকে (বিবেকবুদ্ধি) উদ্ভাসিত করেন। কোনও এক নদী-দেবতার উদ্দেশে এ-স্তুতি নয়। ইহা অন্তঃপ্রেরণা-শক্তির স্তুতি—প্রেরণা-নদীও বলা চলতে পারে—সত্যবাক্‌-এর সেই আলোকধারা যা আমাদের বিবেকবুদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে' সত্যকে অন্তর্জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বস্থলেই দেবতারা অন্তর্ভাবের মূর্ত বিগ্রহ ; বহির্যজ্ঞ, আন্তরকর্মের প্রতীকমাত্র, দেব ও মানবের মধ্যে অন্যোন্য অন্তর্ভাব-বিনিময়ের প্রতীক। মানুষ অর্পণ করে তার সম্বল, প্রতিদানে দেবতারা দেন শক্তি-অশ্ব, আলোক-ধেনু, 'বল'রূপী বীর অসুর-বৃন্দ, বৃত্র-পণি-দস্যুরূপী অন্ধকারের সহিত শক্তিসংগ্রামে বিজয়। ঋষি যখন বলেন—'আমরা সচেতন হব যুদ্ধ-অশ্বের দ্বারা অথবা মানবোত্তর শক্তি-অধ্যুষিত বাণীর দ্বারা তখন বুঝতে হবে এ-উক্তির রহস্যময় কোনও তাৎপর্য আছে নচেৎ কোনও সঙ্গত অর্থই নাই। এই পুস্তকে অনূদিত অংশে বহু মন্ত্র ও সমগ্র সূক্ত পাওয়া যাবে যেগুলি রহস্যপুটিত হওয়া সত্ত্বেও

বেদের প্রকৃত অর্থের আচ্ছাদক বাহ্য যজ্ঞীয়কর্মাত্মক রূপকের আবরণ বিদীর্ণ করে। ঋষি বললেন—"বৃহদ্দ্যুলোকে অ-মর্তদের মধ্যে ধী-শক্তিই মানবগ্রাহ্য বস্তুর পোষণ ও পুষ্টিসাধন করে—এই ধী নানারূপ ঐশ্বর্যের স্বয়ং-দোগ্ধ্রী ধেনু—"। অতঃপর যজমানের প্রার্থিত বিবিধ ঐশ্বর্যদ্রব্যের উল্লেখ রয়েছে যথা গো, অশ্ব এবং অবশিষ্ট যা কিছু। স্পষ্ট বুঝা যায় যে অভিপ্রেত বক্তব্য-বিষয় ভৌতিক ঐশ্বর্য নয়, সেটি এমন কিছু যা কেবল-মাত্র ধী,—মন্ত্র-গর্ভিত ধী-ই,—দিতে পারে, বিদ্যুৎ-দ্যুলোকে অমর্ত্যদের মধ্যে মানবোপযোগী বস্তুর পোষয়িত্রী সেই 'ধী'। এখানে যজ্ঞের অন্তঃ-ক্রিয়ায় দেবতাদের নিকট থেকে বিপুল ও ভাস্বর ঐশ্বর্যের অবতারণ ও দিব্য-রূপান্তরের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অবশ্য গূঢ় বাক্-শৈলীর মাধ্যমে; তবুও নিগূঢ় বচনের (নিণ্যা বাচাংসি) মর্মজ্ঞদের কাছে স্পষ্ট ও অর্থগম্য (কবয়ে নিবচনা)। আর একটি ঋক-মন্ত্রে পাই—নিশা ও উষা সনাতন দুই ভগিনী প্রফুল্ল দুই তন্তুবায়-রমণীরূপে যজ্ঞরূপী বস্ত্র-বয়নে তন্তু যোগা-চ্ছেন, সম্যক্-সিদ্ধ কর্মের দ্বারা। গূঢ়ার্থগর্ভা রহস্যবাণী। কর্মকাণ্ডীয় যজ্ঞ আন্তর-অর্থে গ্রহণীয়, 'গো', 'ঐশ্বর্য', 'মহানিধির' প্রাচুর্য ইত্যাদি প্রার্থিত বস্তুগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রতীকাত্মক, এ-সম্বন্ধে এর চেয়ে স্পষ্টতর নির্দেশ আর কি হতে পারে?

রহস্যবিদ্যা গোপন রাখতেই হবে, অতএব প্রতীক ও প্রতীকাত্মক শব্দের সহায়তা অনিবার্য। অর্থ-গুপ্তির নিমিত্ত ছদ্মাবরণের (মুখোস) প্রয়োজনে ঋষিরা দ্ব্যর্থ-বোধক শব্দের আশ্রয় নিলেন। এ-কৌশলটি অতিশয় সুগম সংস্কৃত ভাষায় কারণ একই পদের নানা ভিন্নার্থ-সম্ভাব্যতা এই ভাষার বৈশিষ্ট্য,—যে কারণে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ অত্যন্ত দুরূহ এবং স্থানে স্থানে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলা চলে। যেমন, পশু-সংজ্ঞক 'গো'-শব্দের আর এক অর্থ 'আলোক' বা 'আলোক-রশ্মি', 'প্রকাশ-রশ্মি'। এই অর্থে পদ-টির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় কতিপয় ঋষির নামকরণে, যথা 'গোতম' অর্থাৎ উজ্জ্বলতম, 'গবিষ্ঠির' অর্থাৎ আলোক-আকাশে স্থির জ্যোতি। বৈদিক 'গো-বৃন্দ' শব্দটি গ্রীসদেশের পৌরাণিক গাথার পরিচিত সত্য-জ্যোতি-জ্ঞান-সূর্যের রশ্মি অর্থে প্রযুক্ত, 'গো-যূথ' শব্দের সম-পর্যায়ী। কতকগুলি সূক্ত থেকে সঙ্কলিত এই অর্থ সর্বত্র ব্যবহৃত হলে কোথাও অর্থবোধে অসঙ্গতি পাওয়া যায় না। প্রচলিত অর্থে, 'ঘৃত'-শব্দটিতে বুঝায় পরিশোধিত নবনীত-জাত আজ্য-পদার্থ, যজ্ঞীয় কর্মে মুখ্য বিশেষাঙ্গ উপাদানগুলির অন্যতম।

কিন্তু "ঘৃ"-ধাতুর ব্যুৎপত্তিগত দীপ্ত-হওয়া অর্থ গ্রহণ করলে 'ঘৃত' পদের 'দীপ্তি'ও হতে পারে। বহু সূত্রে পদটি এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে;—যেমন, দিবস্পতি ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের বর্ণনায় বিশেষণ 'ঘৃতস্নু' পদটি। ধাবমান অশ্বের গা-বেয়ে ঘি পড়ছে এ-অর্থ অবশ্যই অভিপ্রেত নয় এখানে, যদিও 'আজ্য-ঘৃত' অর্থই সঙ্গত হবে অগ্রে একটি বিশেষ স্থলে, যখন যজ্ঞে উপস্থিতির পর অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞভাগের অংশরূপে 'ঘৃত'-মিশ্রিত অন্ন বিতরণ করা হচ্ছে। দ্ব্যর্থবোধের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। যজ্ঞীয় উপকরণের আজ্য-পদার্থ ঘৃত, দীপ্তিময় আলোকের প্রতীক, ভিন্ন অর্থে। চিন্তা বা বিচারবিমর্শ-বাচক পদকে উপমিত করা হয়েছে 'ঘৃত'-পদটির সঙ্গে, যেমন 'ধিয়াং ঘৃতাচীং' অর্থাৎ 'ভাস্বর ধী' বা প্রকাশোজ্জ্বল বিচার বা বোধ। এই গ্রন্থে অনূদিত একটি বিচিত্র ঋক্ পাওয়া যাবে যাতে অগ্নিদেব আহূত যজ্ঞীয় পুরোহিত-রূপে, এবং প্রার্থিত ঘৃতস্রাবী মানসদ্বারা (ঘৃতপ্রুষা মনসা) যজ্ঞীয় বেদী ও হব্য প্লাবনের জন্য, যার ফলে হবে দিব্যধাম-ত্রিতথের অভিব্যঞ্জন ও দেবতাদের আবির্ভাব। 'ঘৃতস্রাবী মন'—এ কি অদ্ভুত বস্তু যার সিঞ্চন দ্বারা পুরোহিত দেবতাদের ও দিব্য ভুবনত্রয়ের প্রকাশে সক্ষম হবেন। ঘৃত-সংজ্ঞাটির রাহস্যিক ও আভ্যন্তরিক অর্থ স্বীকৃত হলে সুসঙ্গত অর্থ-ই পাওয়া যাবে। ঋষির অভিপ্রেত অর্থ হল—'আলোক-স্রাবী মন', জ্ঞানদীপ্ত উদ্ভাসিত মনের স্বচ্ছ প্রকাশ। যজ্ঞীয় অগ্নি বা মানব-পুরোহিত বিবক্ষিত নয় এখানে, কথা বলা হচ্ছে দিব্যসঙ্কল্প দ্রষ্টা, কবি-ক্রতু অন্তর-অগ্নির, যা অবশ্যই সত্তার বিবিধ স্তর ও দেবতাদের প্রকাশ করতে সমর্থ। স্মরণে রাখতে হবে যে ঋষিরা তত্ত্ববিদ্ জ্ঞানীমাত্রই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন, ধ্যানদশায় যাঁদের মানসপটে সব কিছুই মূর্ত ও আকারিত হয়ে উঠত। প্রাক্-উপলব্ধ বা সহ-উপলব্ধ অন্তরানুভূতির সঙ্গে যুগনদ্ধ হয়ে আসত অন্তর্দৃষ্ট মূর্তিগুলি, প্রতীকের বা সঙ্কেতের ব্যঞ্জনা নিয়ে, প্রকাশ পেত কখনও বা ভবিষ্যদ্বাণীরূপে কখনও বা গূঢ়রহস্যের আকৃতি নিয়ে। অন্তরের অনুভূতির ও তজ্জনিত প্রতীকমূর্তিটির যুগপৎ আবির্ভাব সম্ভব হত—আত্ম-তর্পণের ফলে প্রকাশজ্যোতিঃ ক্ষরণের চিত্রের সঙ্গে ঘৃত-সিঞ্চনকারী পুরোহিতের চিত্রটিও ফুটে উঠত। পাশ্চাত্য-মানসের পক্ষে ব্যাপারটা অদ্ভুত বা বিসদৃশ বোধ হতে পারে কিন্তু ভারতীয় পরম্পরায় অভ্যস্ত, ধ্যান-গুহ্য অন্তর্দর্শন-সমর্থ ভারতীয় মানসে এটি সম্পূর্ণ বোধগম্য। মরমী ভাবকরা (Mystics) স্বভাবত প্রতীকমনা। ভৌতিক বস্তু বা ক্রিয়া-

সমূহকে এমন কি স্বকীয় বাহ্যস্বরূপ, জীবনের ঘটনাবলী ও পরিস্থিতিকেও অন্তরের সত্যদৃষ্টি ও পরমার্থ তত্ত্বদৃষ্টিতে দেখতে সমর্থ তাঁরা। অতএব তাঁদের মানসে বস্তুর ভাবনা ও তার প্রতীকাত্মক সঙ্কেতের মধ্যে তাদাত্ম্য-দর্শন বা সহ-চরণ সহজ ও স্বভাবানুগত।

বেদের অন্য মুখ্য স্থায়িপদগুলির প্রতীকাত্মক ব্যাখ্যায় এই পদ্ধতিই অনুসরণযোগ্য। বৈদিক 'গো' শব্দটি যেমন প্রকাশরশ্মির প্রতীক; 'অশ্ব'-শব্দটি শক্তি, অধ্যাত্মবীর্য ও তপোবলের প্রতীক। ঋষি যখন অগ্নিদেবের নিকট 'অশ্ব-রূপা গো-অগ্রা বর'-এর প্রার্থনা জানাচ্ছেন, সত্যসত্যই অগ্রগামী গাভী-সহ অশ্ব-যূথের যাচ্ঞা তাঁর অভিপ্রেত নয়, তাঁর কাম্য জ্যোতিরুদ্ভাসিত মহৎ অধ্যাত্মশক্তিপুঞ্জ, ভাষান্তরে, 'জ্যোতিরগ্রা আলোক-ধেনু' বলা চলতে পারে। একটি ঋকে যেমন বর্ণিত হয়েছে পণি-দস্যুদের কবল হতে মুক্তি দীপ্যমান গো-যূথের অর্থাৎ আলোকরশ্মিজালের, তেমন অপর একটি ঋকে প্রার্থনার সামগ্রী অশ্ববল অর্থাৎ শক্তিপুঞ্জের প্রাচুর্য। কোথাও বা ঋষির প্রার্থনা, বীরবৃন্দ বা যোদ্ধৃ-অনুচরবৃন্দ ইত্যাদি বিশিষ্ট নাম-পদের মাধ্যমে, কোথাও বা প্রতীকের আবরণ সম্পূর্ণ পরিহার করে কেবলমাত্র ভাববাচক বিশেষ্যপদের মাধ্যমে, যেমন 'সুবীরম্' অর্থাৎ পূর্ণ-বীরত্ব। কখনও বা প্রযুক্ত পদটি যুগপৎ নাম-সংজ্ঞক ও ভাব-বাচক; যেমন, দেবতার নিকট যাচ্ঞার বস্তুদের মধ্যে অন্যতম, পুত্র বা পুত্রবৃন্দ (অপত্যম্) —এখানে এই পদটির সহজ অর্থের অতিক্রমণে গূঢ়ার্থও সম্ভব, কারণ বহু সন্দর্ভে নবজাত পুত্র পদটি স্পষ্টই প্রযুক্ত হয়েছে আভ্যন্তর নব-জন্মের রূপক-অর্থে। স্বয়ং অগ্নিদেব আমাদের পুত্র, আমাদেরই কর্ম-প্রসূত এমন পুত্র যিনি বৈশ্বানর-অগ্নিরূপে স্ব-পিতারও পিতা; উত্তম সন্ততিবান হয়ে 'সু-অপত্য'যুক্ত বস্তুর আশ্রয়ে সোপান রচনা করেই আমরা উচ্চতর সত্য-লোকের মার্গ আবিষ্কার করি বা প্রাপ্ত হই। বেদে 'অপ' শব্দটিও প্রতীকার্থে ব্যবহৃত। নিশ্চেতন সমুদ্রের-'অপ্রবেত সলিলম্'—উল্লেখ রয়েছে যার অভ্যন্তর থেকে নিগূঢ় প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বর স্বীয় মহিমায় জন্মগ্রহণ করেন, সেই মহার্ণবের 'মহো অর্ণঃ'—কথাও বলা হয়েছে যার ঊর্ধ্বস্থিত বারি-রাশিকে দেবী সরস্বতী চিন্ময় করেছেন আমাদেরই বোধসৌকর্যার্থে বা আমাদের চেতনাকে প্রবুদ্ধ ও প্রবর্তিত করেছেন অন্তর্জ্ঞান বা বোধি-রশ্মির সহায়ে—'প্রচেতযতি কেতুনা'। সপ্ত নদীর উল্লেখে প্রত্যয় জন্মাতে পারে উত্তরভারতের নদীগুলির কথাই হয়ত বলা হচ্ছে কিন্তু বেদে বর্ণিত হয়েছে

দ্যুলোকের সাতটি মহতী নদীর কথা যাঁরা স্বর্গধাম থেকে অবতরণ করেছেন ভূলোকে; সত্য-বিদ্ সত্য-দ্রষ্ট্রী তাঁরা (ঋতজ্ঞা), তাঁরা মুক্ত করে দিয়েছেন জ্ঞান-বারিধারা যা আমাদের বৃহৎ-দ্যুলোকের বর্ত্ম উন্মুক্ত করে দেবে। এই বাক্-রীতিই অনুসরণ করে ঋষি পরাশর বর্ণনা করছেন 'অপ'-এর সদনে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও বৈশ্বানর প্রাণের কথা; বলছেন ইন্দ্রদেবের কথা যিনি বৃত্রসংহারের অবসানে রুদ্ধ-পর্জন্য বারিরাশি মুক্ত করে স্বর্গীয় বৃষ্টি-ধারায় ভূতলের নদীগুলিকে প্রবাহিত করছেন। বেদে বহু স্থলে কীর্তিত 'অপ'-মুক্তির কাহিনীর প্রতীকাত্মক রূপ ও অর্থ স্পষ্ট হল। এই সঙ্গে পাই আর একটি প্রতীকাত্মক কাহিনী—দেবগণ ও অঙ্গিরস ঋষিবৃন্দ কর্তৃক গহনান্ধকার গিরিগুহাগর্ভে সূর্যদেব ও তদীয় গো-যূথের বা 'স্বর'-অভিধেয় সূর্যলোকের অন্বেষণ ও বন্ধনমুক্তি। ঊর্ধ্বতর সত্য ও জ্যোতির প্রতীকরূপে সূর্যদেবকে সতত সম্বদ্ধ দেখি বেদে। অবরকোটিতে বা নিম্নকোটিতে প্রচ্ছন্ন সত্যলোকে বিমুক্ত করা হচ্ছে সূর্যদেবের হয়যূথকে; স্বীয় ঊর্ধ্বতম জ্যোতিতে বিরাজমান সূর্যদেব (সবিতা) আহূত হচ্ছেন গায়ত্রী-মহামন্ত্রে আমাদের ধীশক্তিকে প্রচোদিত করবার জন্য। এইরকম দ্ব্যর্থবোধক পদের দ্বারাই বেদে শত্রুদের অভিহিত করা হয়েছে পশু-অপহারক, দস্যু, লুণ্ঠক বা বৃত্র নামে। প্রচলিত সরল শব্দার্থ অনুসরণে বোঝায় মানবীয় বহিঃশত্রু। কিন্তু আলোকের আবরক বা জল-নিরোধক অসুরবিশেষ হল বৃত্র, তার কর্মের সহয়করা বৃত্র-বৃন্দ। দস্যু, লুণ্ঠক বা বিনাশক নামে যারা অভিহিত হল তারা প্রকৃতপক্ষে সত্য-আলোক, সত্য-জ্যোতির বিরোধী অন্ধ তামসের শক্তি-সমূহ। বাহ্য স্থূলার্থের গভীরে অন্তর্গূঢ় রহস্যময় অর্থ-নিধানের নির্দেশ বেদের বহুস্থলেই পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের পঞ্চমমণ্ডলে একটি বিশিষ্ট ও অতিশয় অর্থগর্ভ মন্ত্র উল্লেখ-নীয় যাতে 'সূর্য'-দেবের স্বরূপ-নির্দেশ প্রতীকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। মন্ত্রটির বিচারে শুধু যে বৈদিক কবিদের গভীর রহস্যপূর্ণ প্রতীকাত্মক শব্দের প্রয়োগ-শৈলীর নিদর্শন পাই তা নয়, পরবর্তী উপনিষদ-প্রণেতাদের দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয়ও পাই যে তাঁদের পূর্বগামী ঋষিরা ছিলেন অন্তর্জ্ঞান-সম্পন্ন ও বুঝতে পারি ঋগ্বেদকে তাঁরা কোন দৃষ্টিতে দেখতেন। বেদ-মন্ত্রটির আর্থিক অনুবাদ এইরকম হতে পারে—"সত্যের দ্বারা আবৃত এক সত্য রয়েছে যেখানে সূর্যদেবের অশ্বগুলিকে তাঁরা বিমুক্ত করে দিয়েছেন; একত্র দাঁড়িয়ে ছিল তারা, সংখ্যায় দশ শত। সেই এক-ও ছিলেন, দেখে-

ছিলাম তাঁকে দেবশরীরধারীদের মধ্যে যিনি মহত্তম (শ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক মহিমশালী)।" এইবার দেখা যাক এই চিন্তনা বা রহস্যময় অনুভূতিটিকে পরবর্তী উপনিষদ-যুগের কবিরা তাঁদের স্বকীয় শৈলীতে কি ভাবে মন্ত্রার্থের গোপনীয়তা পরিহার করেছেন কেন্দ্রীয় সূর্যাত্মক প্রতীকটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে। উপনিষদের বর্ণনাটি এইরকম—"আচ্ছন্ন রয়েছে সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্র দিয়ে অপাবৃত কর তাকে, সত্যধর্মকে নিয়ে এস দৃষ্টির গোচরে। হে পূষা (পোষক), হে ঋষিশ্রেষ্ঠ, হে যম, হে সূর্য, হে প্রজাপতি-পুত্র! সংহৃত ও সুসজ্জিত কর তোমার কিরণজাল, দেখি তোমার মনোহরতম ও কল্যাণতম জ্যোতিঃরূপটি। তিনি যিনি সেই এক পুরুষ, তিনিই আমি।" বেদমন্ত্রে 'ঋতেন' পদটিতে অভিপ্রেত যে আবরক অবর-সত্যের ভাব সেটি রূপ পেল উপনিষদে 'হিরন্ময় পাত্র' পদ-দুটির দ্বারা, 'দেবশরীরধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ (দেবানাং শ্রেষ্ঠং বপুষাম্)' ভাবটির প্রকাশ হল উপনিষদে 'সূর্যদেবের কল্যাণ-তম রূপ' বাক্যাংশের দ্বারা। এটি হল সেই পরম জ্যোতিঃ যা অপর সকল বাহ্য জ্যোতিঃ থেকে ভিন্ন ও বৃহত্তম। বেদমন্ত্রের 'সেই এক পুরুষ (তদেকং)' ভাবটি ব্যাহৃত হল উপনিষদের 'আমিই সেই' সোঽহম্-মহামন্ত্রে। 'দশ শতের একত্রে সম্মিলিত হওয়া' (সায়ণও বলেন সূর্যের কিরণ-জালই এখানে অভিপ্রেত) ভাবটি ব্যক্ত হল সূর্যদেবকে 'রশ্মিসমূহ সংহৃত ও ব্যূহিত করা'র প্রার্থনাতে যাতে তাঁর পরম জ্যোতীরূপটি দৃষ্টিগোচর হয়। দুটি সন্দর্ভেই বলা হয়েছে সূর্যদেব পরম সত্য ও পরম জ্ঞানের অধিদেবতা ও তাঁর কিরণজাল সত্য ও জ্ঞান-রশ্মির বিচ্ছুরণ। বেদে সর্বস্থলে এবং উপনিষদে বহুস্থলেই সূর্যদেবের এই প্রতীকার্থই করা হয়েছে। এই দৃষ্টান্তটি থেকে—এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে—স্পষ্ট বোঝা যায় যে সুপ্রাচীন বেদের সম্যক অর্থবোধে মধ্যকালীন কর্মকাণ্ডীয় ব্যাখ্যাকার প্রকাণ্ডপণ্ডিতদের অপেক্ষা বা আধুনিকযুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন-মননধর্মী পাশ্চাত্ত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর অপেক্ষা যথার্থতর ঈক্ষণা ও ধারণা ঔপনিষদ কবিদের ছিল।

বেদে অন্তর্গূঢ় বা রহস্যার্থের প্রকৃত ও সত্য অনুসন্ধানী যদি হই তাহলে বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ কতিপয় অধ্যাত্ম বা মনস্তত্ত্ববাচক পদগুলির সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করতে হবে এবং অ-ব্যভিচারে সকল স্থলেই সেই নির্দিষ্ট অর্থ প্রযুক্ত হয়েছে বুঝতে হবে। সত্যবাচক 'ঋত' এইরকম একটি পদ। আর একটি হল, মন্ত্রগুলিতে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত চিন্তা বা বিচার-শক্তির সমানার্থক 'ধী'-শব্দটি। এটির স্বাভাবিক সরল অর্থ হল বিচার বা বোধ-

শক্তি, উত্তরকালে 'বুদ্ধি'-শব্দটি যে অর্থে প্রচলিত। বহুবচনে 'ধী'-শব্দটি হয় 'ধিয়ঃ' অর্থাৎ চিন্তাসমূহ। বিভিন্ন স্থলে ব্যাখ্যায় এই 'ধী'-পদটির, 'চিন্তা' বা 'বিচার' ছাড়া, নানা ভিন্ন-অর্থ করা হয়েছে—যথা, 'জল', 'কর্ম', 'যজ্ঞ', 'অন্ন' ইত্যাদি। আমাদের গবেষণায় কিন্তু পদটিকে সর্বত্র স্বাভাবিক ও প্রাথমিক সরল অর্থে গ্রহণ করতে হবে এবং দেখতে হবে পরিণামে কি দাঁড়ায়। 'কেতু'-শব্দটির অতি প্রচলিত অর্থ, 'রশ্মি', কিন্তু মননশীলতা বা বিচারবুদ্ধি বা বৌদ্ধিক উপলব্ধি অর্থেও শব্দটির প্রয়োগ পাওয়া যায়। যে মন্ত্রগুলিতে পদটি ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির বিচার ও বিমর্শে নিষ্কর্ষ পাই যে শব্দটি বোধিবাচক বা অন্তর্জ্ঞানরশ্মিবাচক। যেমন দেখা যায় সেই মন্ত্রাংশে যেখানে বলা হচ্ছে 'কেতুনা' অর্থাৎ অন্তস্ফুরিত জ্ঞানরশ্মিদ্বারা সরস্বতী দেবী মহাসমুদ্রের (মহার্ণবের) সংবিৎ আমাদের চিত্তে এনে দেন; 'উর্ধ্বস্থিত পরম মূল থেকে অধোমুখে প্রেরিত রশ্মিসমূহ', এই উক্তির অভিপ্রেত অর্থ, বোধি বা অন্তর্জ্ঞান-রশ্মি। সত্য ও জ্যোতিঃ-সূর্যের কিরণ-জাল বর্ণনাতে এই বোধি-রশ্মিই বুঝতে হবে। 'ক্রতু' শব্দটির প্রাথমিক ও প্রচলিত অর্থ, কর্ম বা যজ্ঞ, কিন্তু অন্য অর্থেও প্রযুক্ত দেখা যায়, যেমন প্রজ্ঞা বা বল, বিশেষতঃ সেই প্রজ্ঞাবল যা নির্ধারিত করে করণীয় কর্ম কোনটি, অর্থাৎ সংকল্প-শক্তি। বেদার্থের রহস্যভেদে এই অন্তিম অর্থটিই আমাদের গ্রহণযোগ্য। অগ্নি হলেন 'কবি-ক্রতু' অর্থাৎ দ্রষ্টা-সংকল্পশক্তি, তিনি হলেন 'ক্রতু-হৃদি' অর্থাৎ হৃদয়স্থ সংকল্পশক্তি। পরিশেষে উল্লেখ্য বেদে বহু-প্রযুক্ত 'শ্রবস্' পদটি। বহুস্থলে অর্থ করা হয়েছে 'কীর্তি'। ভাষ্য-কারেরা 'অন্ন' অর্থেও পদটির ব্যাখ্যা করেছেন যদিও সর্বস্থলে এ-দুটি অর্থ সঙ্গত হয় না এবং বহুস্থলে দুটি অর্থই নিষ্প্রভ ও দুর্বল। ব্যুৎপত্তি-দৃষ্টিতে শব্দটির উদ্ভব শ্রবণার্থক 'শ্রু'-ধাতু থেকে। প্রয়োগ দেখা যায় শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থে, কখনও বা স্তুতি বা স্তব অর্থেও যা ভাষ্যকার সায়ণের দ্বারাও স্বীকৃত। অতএব অনুমান করা যেতে পারে শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'শ্রুত-বিষয়' অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়-জাত জ্ঞান বা 'শ্রুত-জ্ঞান'। ঋষিরা নিজেদের অভিহিত করেছেন, 'সত্য-শ্রুতঃ', তাঁদের শ্রবণলব্ধ জ্ঞানকে বলেছেন 'শ্রুতি'। এই দৃষ্টিতে 'শ্রবস্' শব্দের অর্থ পাই অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তঃপ্রেরিত জ্ঞান। বেদের রহস্যভেদে এই অর্থই গ্রহণযোগ্য এবং গৃহীত হলে মন্ত্রার্থ হবে সুসঙ্গত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।—ঋষি বলছেন, শ্রবাংসি (শ্রবঃসমূহ) উর্ধ্বভূমিতে নীত ও অধোভূমিতে আনীত হয়েছে। এখানে 'শ্রবস্' পদটির ব্যাখ্যায়

'অন্ন' বা 'কীর্তি' এ-দুটি অর্থই অসঙ্গত কিন্তু 'অন্তঃপ্রেরণা' অর্থে ব্যাখ্যাটি হয় সুষ্ঠু ও সুসঙ্গত—সত্য-সন্ধানী অন্তঃপ্রেরণার উর্ধ্বায়ন ও লব্ধসত্য হয়ে নিম্নভূমিতে অবতরণের সঙ্কেত বহন করছে ঋষির এই উক্তিটি। বেদার্থ-গবেষণায় সর্বত্র এই পদ্ধতিই অবলম্বনযোগ্য। বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই মুখপত্রের স্বল্প-পরিসরে। গূঢ়-উক্তির রহস্যভেদে পাঠককে প্রাথমিক অন্তর্দৃষ্টিদানের উদ্দেশে এ-কথাটি ইঙ্গিত-ই পর্যাপ্ত।

বৈদিক সূক্তের মর্মোদ্ঘাটনে এই ব্যাখ্যারীতির অনুসরণে কোন গুপ্তার্থ বা রহস্য-ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়? রহস্যবিদ্ মরমীয়াদের ভাবাদর্শের যা স্বরূপ সর্বত্র দেখা যায় তারি অনুকূল হবে এই ভাবনা। অনুকূল হবে ভারতীয় কৃষ্টির সেই বিবর্তন-সরণির যার প্রথম পর্বে পাই আধ্যাত্মিক-সত্যের প্রারম্ভিক রূপ ও পরবর্তী উপনিষদ-যুগে তার পরাকাষ্ঠা। বেদান্ত-মহাবৃক্ষের বীজের সন্ধান পাই বেদে নিহিত গুহ্য-জ্ঞানের অভ্যন্তরে। পরমার্থ-সতের সাক্ষাৎকার, পরমজ্যোতির স্পর্শ ও অমৃতত্বের আকূতিকে কেন্দ্রীভূত করে আবর্তিত হচ্ছে সকল ভাবনা ও চিন্তনা। বহিশ্চর অবর-সত্যের অপেক্ষা রয়েছে এক উচ্চতর ও গভীরতর সত্য, মানবীয় মানসলোকের অন্তরালে রয়েছে এক বৃহত্তর ও উর্ধ্বতর বোধি-জাত অন্তঃপ্রেরণা ও প্রকাশ-জ্যোতি, রয়েছে এক অমৃতত্বের সন্ধান যার অভিমুখে হবে চিদাত্মার উর্ধ্বায়ন। এই সত্যলোকের পথ খুঁজে বার করতে হবে আমাদের, সংশ্লিষ্ট হতে হবে সেই পরম সত্য ও অমৃতত্বের সঙ্গে—'সপন্ত ঋতম্ অমৃতম্'—এই সত্যের গর্ভাশয়ে জন্ম নিতে হবে, বর্ধিত হতে হবে এবং পরিণামে পরমলোকে আরূঢ় হয়ে সেই সত্যধামে বাস করতে হবে। যাত্রাশেষে মিলবে পরমেশ্বরের সাযুজ্যলাভ, সার্থক হবে মর্ত্য হতে অমর্ত্যের অভিযান। বৈদিক রহস্যবাদীদের মূল ও কেন্দ্রশায়ী প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা হল এইটি। প্রাচীন যুগের রহস্যবিদ্‌গণের সূত্রানুসরণে প্লেটোশিষ্যেরা উপনীত হয়েছিলেন এই সিদ্ধান্তে যে মানব-জীবন দুটি জগতের সহিত সম্বদ্ধ। একটিকে অভিহিত করা যেতে পারে অধ্যাত্ম-জগৎ যেখানে উর্ধ্বতর সত্য সদা প্রতিষ্ঠিত, অপরটিকে বলা চলতে পারে দেহধারী জীবাত্মার জগৎ, প্রকৃত পক্ষে যেটি উর্ধ্বতর জগৎ থেকে উদ্ভূত হয়ে অব-ভ্রষ্ট হয়েছে নিম্নের অবর-সত্য ও অবর-চেতনার ভূমিতে। বৈদিক রহস্যবাদীদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ কিন্তু তাঁরা এই তত্ত্বটির অধিকতর বাস্তব ও ব্যবহারিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন কারণ দুটি জগতের সঙ্গেই

তাঁদের যোগ ছিল অনুভূতি ও উপলব্ধি সিদ্ধ। অনৃত ও প্রমাদের বাহুল্যে ব্যামিশ্র অবর সত্যলোককে ঋষিরা অভিহিত করেছেন 'অনৃতস্য ভূরেঃ'; আছে এক পরম সত্য-ধাম---'ঋতস্য সদনম্'---সত্য, ঋত ও বৃহতের ভুবন যেখানে সব কিছু সত্য-চিন্ময়, 'ঋত-চিৎ'। এই দুই লোকের অন্তরীক্ষে দ্যুলোকপর্যন্ত সমাবিষ্ট রয়েছে স্ব স্ব জ্যোতির্বৈশিষ্ট্যে বর্ণাঢ্য ভুবনের পর ভুবন, শীর্ষে পরমজ্যোতির্লোক---সত্য-সূর্যের ধাম, স্বর্লোক বা বৃহৎ দ্যৌ। সেই দিব্য-ধামের মার্গ, 'ঋতস্য পন্থা', আমাদের অনুসন্ধেয়, এইটিই দেব-যান। বৈদিক ঋষিদের এইটি হল দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত। তৃতীয় সিদ্ধান্ত---মানবজীবন হল সুরাসুরের যুদ্ধক্ষেত্র যেখানে সত্য ও জ্যোতির শক্তিসমূহ---অমর দেবতারা---অন্ধকারের শক্তিসমূহের সহিত সংগ্রামে নিরত। অন্ধকারের শক্তিরা বিবিধ নামে অভিহিত হয়েছে যথা---বৃত্র ও বৃত্রবৃন্দ, বল ও পণি, দস্যুগণ ও তাদের অধিপতিগণ। অন্ধকারের শক্তিরা পরম-সত্যের প্রকাশ ও আলোকের কখনও বা আবরক, কখনও বা অপহারক, দিব্য-ধারার (ঋতস্য ধারার) স্বর্মুখী প্রবাহের বাধক, সকল প্রকারে চিদাত্মার ঊর্ধ্বগতির রোধক। এই বিরোধের উচ্ছেদকল্পে অন্ধকারের শক্তিপুঞ্জকে পরাভূত করতে হবে দেবতাদের সহায়ে, তাঁদের আবাহন করতে হবে অন্তর্যজ্ঞের আহুতি দিয়ে, দিব্য বাণীর সাধনে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে হবে স্বীয় অন্তরে---মন্ত্রের বিশিষ্ট শক্তি হল এই---যজ্ঞের হবি অর্পণ করতে হবে তাঁদের উদ্দেশ্যে, বিনিময়ে সেই অভয়-বরপ্রাপ্তির জন্য যা লক্ষ্যস্থল স্বর্লোকের বর্ত্ম নির্মাণে সফলতা আনবে। বাহ্য যজ্ঞের উপাদান ও সাধন-সমূহ বেদে নির্দিষ্ট হয়েছে যে পদ ও শব্দ-গুলির দ্বারা সেগুলি প্রযুক্ত হয় অন্তর্যজ্ঞ ও আত্মসমর্পণের-ই প্রতীকরূপে। আমরা স্বরূপে যা, এবং যা আমাদের স্বকীয়, সব কিছুই সমর্পণ করে দিতে হবে পরম সত্যের গর্ভাশয়ে আমাদের অন্তর্জন্মের আধানরূপে যাতে দিব্য-সত্যের ঐশ্বর্য ও দিব্য-জ্যোতিরালোকের অবতরণ সম্ভব হয় আমাদের জীবনে। বিকশিত হবে আমাদের চিত্তে সম্যক বিচার, সম্যক বোধ ও সম্যক ক্রিয়াশীলতা। এ-সব নেমে আসবে ঊর্ধ্বতর সত্যের প্রেরণা ও সংবেগ বহন করে ('ঋতস্য প্রেষা', 'ঋতস্য ধীতি') যাতে সেই পরম সত্যের পরিমণ্ডলে আমরা নিজেদের গড়ে তুলতে পারি। যজ্ঞের যজন হল একটি যাত্রা---তীর্থযাত্রাও বটে, সংগ্রামাভিযানও বটে। তীর্থযাত্রা দেবাভিমুখী, অগ্নিদেব (অন্তর্জ্বালা বা অন্তরভীপ্সা) রয়েছেন সেই অভিযানের পুরোধায়, মার্গদর্শক ও নেতারূপে। যজ্ঞোদ্দিষ্ট মানবীয় দ্রব্য-

হুতি অলৌকিক রহস্যময় অগ্নিদেবের দ্বারা স্বর্লোকে উন্নীত হয়ে রূপান্তরিত হয় তাদের অমৃত-স্বরূপে, উর্ধ্ব থেকে নেমে আসে দিব্য দ্রব্য-সম্ভার প্রতি-ষ্ঠিত হতে আমাদের অন্তঃসত্ত্বার গভীরে। বেদান্তের শিক্ষা ও মতবাদের বীজ যেমন পাওয়া যায় ঋগ্বেদের সিদ্ধান্তের মধ্যে, তেমনি পরবর্তী যুগের যোগ-ক্রিয়া ও যোগ-সাধনার বীজও পাওয়া যায় ঋগ্বেদের আন্তর-ক্রিয়া ও আন্তর-সাধনার অভ্যন্তরে। পরিশেষে উল্লেখ্য রহস্যবাদী বৈদিক ঋষি-দের চরম ও চূড়ান্ত রহস্য-বাণী—নিখিল বস্তুসত্ত্বার অদ্বয় সৎস্বরূপ 'তদ্ একম্', 'তদ্ সৎ', তিনি এক তিনি সেই। এই মহাবাক্যই হল উপনিষদ-যুগের মর্মবাণী। দেবতারা হলেন সেই 'এক'-এর নাম, রূপ ও শক্তি-বিশেষ, প্রতি দেবতাটি সর্বদেবময়, অপর সকল দেবতারা তাঁর অন্তর্গত। আছে একটিই সত্য 'তৎ সত্যম্', আছে একটি-ই পরম আনন্দ-ধাম যেখানে আমাদের আরূঢ় হতে হবে। এই ব্যাহৃতিটি বেদের মর্মকথা, অধিকাংশ স্থলে এটিকে কিন্তু পাওয়া যায় যেন যবনিকার অন্তরালে। এটি ছাড়া বেদে বক্তব্য আরও অনেক কিছু আছে কিন্তু এইটি বেদের হৃৎ-স্থিত কেন্দ্রীয় বাণী।

যে ব্যাখ্যা-পদ্ধতি এখানে উপস্থাপিত করা হল সেটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে, 'আর্য'-নামিকা দার্শনিক মাসিক পত্রিকাতে, 'বেদে রহস্যবাদ' শীর্ষক ধারাবদ্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে। তত্ত্বানুসন্ধানের নূতন মার্গে সিদ্ধান্তটির সম্পূর্ণ রূপ তখন দেওয়া সম্ভব ছিল না। সুচিন্তিত প্রাক-সিদ্ধ কোন পরিকল্পনা বা পটভূমির অভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়াতে সাধারণ পাঠকের নিকট সিদ্ধান্তটি দুর্লভ ও অজ্ঞাত থেকে গেছে। প্রবন্ধ-টিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের ইংরাজী অনুবাদ যেগুলিকে অনুবাদ-সংজ্ঞা না দিয়ে ব্যাখ্যা বলাই সঙ্গত; 'রহস্যবাদীদের সিদ্ধান্ত' শীর্ষক একটি ব্যাখ্যাত্মিকা ভূমিকাও সংলগ্ন ছিল। ঋগ্বেদের দশটি মণ্ডলের অগ্নিসূক্তগুলির নিরবশেষ ও যথাসম্ভব মূলানুযায়ী অনুবাদের ভবিষ্যৎ প্রকাশন সংকল্পিত হয়েছিল। এই অনুবাদ-গ্রন্থে দ্বিতীয়, ও ষষ্ঠ ও প্রথম মণ্ডলের কতিপয় অগ্নি-সূক্তের অনুবাদ পূর্বে আর কোথাও প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্তগুলির রহস্যভেদে যে ব্যাখ্যা-রীতি ও যে সিদ্ধান্ত এই ভূমিকাটিতে নির্দিষ্ট হল, বিদগ্ধজন সমক্ষে সেটির সমুচিত যুক্তি ও বিচার-সহ সমর্থনের জন্য প্রয়োজন, সমগ্র বা অধিকাংশ ঋগ্বেদের একটি নূতন সংস্করণ। সে সংস্করণে থাকবে প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী

অর্থ সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে মূলের মুখ্য-বিষয়গুলির উপর প্রয়োজনীয় টিপ্পনী ও মন্তব্য, প্রামাণ্য যুক্তি ও বিচার সহযোগে শব্দার্থ ও ভাবার্থের সমর্থন এবং একটি বিস্তৃত ও বিশদ পরিশিষ্ট যাতে তালিকাভুক্ত হবে ঋত-শ্রবস্-ক্রতু-কেতু প্রভৃতি কুঞ্চিকাভূত প্রতীকাত্মক বৈদিক পদগুলির শব্দার্থ। রহস্য-উক্তির অর্থভেদে এরূপ একটি তালিকার সবিশেষ প্রয়োজন। অনুরূপ একটি পরিকল্প আয়োজিত হয়েছিল কিন্তু সার্বকালিক ও গুরুতর কার্যান্তরের প্রয়োজনে বিপুল শ্রমসাপেক্ষ এই কর্মে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। পাঠকদের সুবিধার জন্য এই ভূমিকাটি লিখিত হল ও এতাবৎ অ-প্রকাশিত "মরমীয়াদের রহস্যবাদ" শীর্ষক নিবন্ধ থেকে কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত করা হল কারণ তদ্ব্যতিরেকে অনুবাদ-গ্রন্থটি বোঝা দুরূহ হতে পারে। সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকদের জন্য সূক্তগুলি সংস্কৃত লিপিতে দেওয়া হয়েছে। কোন বিশিষ্ট মতবাদ বা অভ্যুপগমের (hypothesis) প্রমাণসহ সমর্থনের উদ্দেশ্যে লিখিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ নিবন্ধ এটি নয়। বেদে স্থূলপূজাবিধির অতি-রিক্ত কিছুর যাঁরা দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও এই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে নিহিত অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বিষয়ে যারা স্পৃহাশীল তাঁদের অবগতির জন্য এবং স্বীয় শিষ্যগণের সম্মুখে বিষয়বস্তুটির একটি স্থায়ী রূপদানের অভিপ্রায়ে প্রবন্ধটি প্রকা-শিত হল।

এটি সাহিত্যিক অনুবাদ নিছক শাব্দিক বা আক্ষরিক অনুবাদ নয়। তবে মূলের অর্থ, অভিপ্রায় ও বিচারের কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। প্রারম্ভিক পদক্ষেপে মূলের অতিনিষ্ঠ ও অনলংকৃত ভাষান্তরকে নেওয়া হয়েছে ভাবার্থ-গ্রহণের আধার ও আশ্রয়রূপে এবং তারি সহিত সঙ্গতি রেখে অনুবাদকার্যটি নিষ্পন্ন হয়েছে। একমাত্র এই রীতিতেই প্রাচীন রহস্য-বাদীদের মর্মকথা বিদিত হতে পারে। নিখুঁত ও অনুপম ভাষাশৈলীতে রচিত ঋগ্বেদের সূক্তগুলি বর্ণাঢ্য রূপক-অলঙ্কারে সমৃদ্ধ, উদাত্ত-তাল-লয়-সমন্বিত। সূক্তাত্মক এরূপ মহাকাব্যের অনুবাদ নিতান্তই শুষ্ক পণ্ডিতি-কৃতিতে পর্যবসিত হবে যদি না ভাষান্তরে সাহিত্যিক রস ও কবিত্ব-শক্তির ঈষৎ আভাসও না পাওয়া যায়। গদ্যানুবাদে তদতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করা অনুচিত, সম্পূর্ণ ভিন্ন-গোষ্ঠীয় ভাষার রূপান্তরে। বৈদিক ও ইংরাজী ভাষার বাক্-সরণি ও পদ-বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত দু-টি ভিন্নমুখী কোটিতে, লিখিত-ভাষার নিজস্ব রূপ ও সাহিত্য-শৈলীর যৎসামান্য নিদর্শন রাখতে হলে বৈদিক-ভাষার অতি-সংহত বাক্যাবলীর রূপান্তরে ইংরাজী-ভাষার

বৈশিষ্ট্যগত অপেক্ষাকৃত শিথিল ও তরল বাগ্‌ভঙ্গীর প্রয়োজন। অনুবাদের পক্ষে দ্বিতীয় বাধা—বৈদিক পদগুলির দ্ব্যর্থ-প্রয়োগ ও অতিব্যাপ্তি যার সহায়ে একই পদে প্রতীক ও তৎসঙ্কেতিত পদার্থের অভিপ্রায় ব্যঞ্জিত, যেমন "গো"-শব্দটি "পশু" ও "রশ্মি" দুটি অর্থ-অনুযায়ী 'ঘৃত'-শব্দটিতে আজ্যপদার্থ ছাড়া 'মনের নির্মল প্রকাশ'-অর্থেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তেমনি "অশ্ব"-পদটিতে 'আধ্যাত্মিক বল'-এর সঙ্কেত। অনুবাদককে নূতন নূতন বাক্-সমষ্টির বিন্যাস খুঁজতে হয়, যথা 'আলোক-ধেনু' বা 'দেদীপ্যমান গো-যূথ'। অপর একটি কৌশল হতে পারে, প্রতীকার্থে ব্যবহৃত পশু বা পদার্থ-বাচক শব্দে আদ্যক্ষর স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত করা। কোনও স্থলে প্রতীকপদের সম্পূর্ণ পরিহার, কোথাও বা সেটিকে অক্ষুণ্ণ রেখে গূঢ়ার্থটিকে অনুমান-লভ্য রাখা অনিবার্য হয়েছে। একই ভাব-প্রকাশে সর্বত্র এক রীতির বাক-সমষ্টি প্রযুক্ত হয় নি। মূলের বাগ্‌ভঙ্গীর অনুরোধে বৈচিত্র্য নিয়ে আসতে হয়েছে অবশ্য অর্থ ও অভিপ্রায় অবিকৃত রেখে। বহু স্থলে মূল পদের ব্যঞ্জনা ও বর্ণ-সমৃদ্ধির সমপর্যায় ইংরাজী প্রতিশব্দের অভাবে একাধিক পদ বা বাক্যাংশের ব্যবহার বা অন্য কোন কৌশলের সহায়তা নিতে হয়েছে অর্থের সমগ্র প্রকাশের প্রয়োজনে। এ-ছাড়া বহু স্থলে এমন সব অতি-প্রাচীন শব্দ ও পদ-বিন্যাস আছে যার অর্থ অবিদিত, অতএব অনুমানসিদ্ধ; বিভিন্ন অথচ তুল্যবল অর্থে অনুবাদ সম্ভব! এরূপ স্থলে অনুবাদে অস্থায়ী প্রাথমিকরূপমাত্র দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলি সূক্তের অনুবাদ প্রকাশনের জন্য সজ্জিত হওয়ার পর প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হতে পারে। সে দিন এখনও আসে নি।

শ্রীঅরবিন্দ

প্রথম অধ্যায়

বেদের সমস্যা ও তার সমাধান

বেদের কি আদৌ বা এখনও কোন রহস্য আছে?

প্রচলিত ধারণা এই যে সেই পুরাতন রহস্যের মর্ম উদ্ঘাটিত করা হয়েছে ও সকলের দৃষ্টির সামনে প্রকাশ করা হয়েছে, বরঞ্চ কোন রহস্য ছিলই না। বেদের সূক্তগুলি একটি আদিমকালীন ও তখনও বর্বরজাতির যাজ্ঞিক রচনা-পর্বাদির ও সন্তোষ-বিধায়ক অনুষ্ঠানের একটি ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে, ও প্রকৃতির শক্তিসমূহকে জীবিত ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে তাদের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং অর্ধগঠিত উপকথা ও অমার্জিত, অসমাপ্ত জ্যোতি-বিদ্যার রূপকের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ স্তূপে পূর্ণ। শুধু পরবর্তী সূক্তগুলিতেই আমরা গভীরতর তাত্ত্বিক ও নৈতিক চিন্তার আবির্ভাব দেখতে পাই—কেউ কেউ মনে করেন সেগুলি ঐসব মন্ত্রগুলিতেই স্বচ্ছন্দে অভিশপ্ত "দস্যু" ও "বেদ-বিদ্বেষী" প্রতিকূল দ্রাবিড়দের কাছ থেকে গৃহীত, ও যেভাবেই পাওয়া যাক্, পরবর্তী বৈদান্তিক চিন্তার আদি বীজ। এই আধুনিক মতটি কিছু আগেও যারা অসভ্য ছিল তাদের দ্রুত মানবীয় ক্রমবিকাশের মতবাদ অনুযায়ী; এই মতটি জমকালো সমালোচনাত্মক গবেষণার দ্বারা সমর্থিত ও কয়েকটি বিজ্ঞানের ও তুলনামূলক ধর্ম্মবিজ্ঞান ও তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। দুঃখের বিষয় সেগুলি এখনও শৈশব অবস্থায় ও তাদের পদ্ধতি প্রধানতঃ জল্পনা-প্রবণ, তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনশীল।

এই অধ্যায়গুলিতে ঐ পুরাতন সমস্যাটির সম্বন্ধে একটি নতুন মত উপস্থিত করা আমার উদ্দেশ্য। প্রচলিত সমাধানগুলির বিরুদ্ধে আমি কোন নেতিবাচক ও বিধ্বংসী প্রণালী অবলম্বন করার প্রস্তাব করছি না; আমি শুধু উপস্থিত করব ব্যাপকতর ভিত্তির উপরে রচিত একটি নির্দিষ্ট, গঠন-মূলক ও এক হিসাবে পরিপূরক প্রকল্প যা অধিকন্তু ও প্রসঙ্গত প্রাচীন চিন্তাধারা ও ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসের দুএকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উপরে কিছু আলোকপাত করবে। সেগুলির সমাধান সাধারণ ব্যাখ্যার দ্বারা সম্পূর্ণ হয়নি।

ঋগ্বেদে, যা য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে একমাত্র প্রকৃত বেদ, আমরা

পাই একটি অতি প্রাচীন ভাষায় লিখিত যাজ্ঞিক মন্ত্রের একটি সমষ্টি,—সে ভাষার বহু সমস্যা আছে যার সমাধান প্রায় অসম্ভব। বেদের ভাষা অনেক অতি-পুরাতন রূপে ও শব্দে পূর্ণ যেগুলি পরবর্তী ভাষায় পাওয়া যায় না। যুক্তিসহ অনুমানের দ্বারা তাদের অনিশ্চিত অর্থ নির্ধারণ করতে হয়। তাতে অনেক শব্দ আছে যা ক্ল্যাসিক্যাল অভিজাত সংস্কৃতেও পাওয়া যায়, কিন্তু যাদের অর্থ ভিন্ন বলে মনে হয়, অন্ততঃ অন্য অর্থ হতে পারে। তাদের মধ্যে বহু শব্দ আছে, বিশেষতঃ সর্বাপেক্ষা প্রচলিত ও অর্থ-নির্দেশের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, যেগুলির পরস্পর সম্বন্ধবিহীন এতগুলি অর্থ আছে যে আশ্চর্য লাগে; এগুলি আমাদের পছন্দ অনুযায়ী যেভাবে চয়ন করব, সেই অনুসারে বেদের অনেক অংশ, অনেক মন্ত্র, এমনকি সমস্ত চিন্তাধারাই সম্পূর্ণ অন্য রঙে রঞ্জিত হতে পারে। বহু সহস্র বৎসরে এই সুপ্রাচীন স্তোত্রগুলির অর্থ নির্ধারণ করার জন্য অন্ততঃ তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হয়েছে, সেগুলির প্রত্যেকটির প্রণালী ও সিদ্ধান্ত অন্যগুলির থেকে ভিন্ন। এদের একটি হলো প্রাগৈতিহাসিক ও ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলিতে অংশতঃ পাওয়া যায়; কিন্তু ভারতীয় পণ্ডিত সায়ণের সম্পূর্ণ ঐতিহ্য-অনুযায়ী সমকালীন ব্যাখ্যা ও আমাদের সময়েই য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের বহু আয়াস-সাধ্য, তুলনা ও অনুমানের ওপরে গঠিত ব্যাখ্যাও আছে। এই দুটি ব্যাখ্যা-রই একটি সামান্য বৈশিষ্ট্য আছে—তা হলো এদের সিদ্ধান্তসমূহ ঐ সুপ্রাচীন মন্ত্রগুলির ওপরে একটা অসামান্য অসঙ্গতি ও অর্থদারিদ্র্যের ছাপ ফেলেছে। মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির স্বাভাবিক ভাবে হোক্ বা আন্দাজেই হোক একটি ভাল বা সুসঙ্গত অর্থ দেওয়া যায়; ফলে যে-রচনাশৈলী পাওয়া যায়, তার ভঙ্গি চটকদার হলেও, আবশ্যক ও শোভাপ্রদ বিশেষণে পূর্ণ হলেও এবং তা চাকচিক্যময় অলঙ্কার ও শব্দবাহুল্যের আশ্চর্যকর স্তূপের মধ্যে স্বল্প অর্থ বিকাশ করলেও, তা দিয়ে অন্ততঃ বোধগম্য বাক্য-সমূহ গঠন করা যায়। কিন্তু মন্ত্রগুলি সমগ্রভাবে পড়লে মনে হয় যে আমরা যেন এমন লেখকদের সামনে উপস্থিত হয়েছি যাঁরা অন্যান্য জাতি-দের প্রাচীন লেখকদের মত সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক ভাষা ব্যবহার করতে বা সুসংলগ্ন চিন্তা করতে সমর্থ ছিলেন না। সংক্ষিপ্ততর ও সরলতর ঋক্-গুলিতে ছাড়া ভাষার প্রবণতা দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট হওয়ার দিকে; চিন্তাগুলি অসম্বদ্ধ, ব্যাখ্যাকারকে তাদের জোর করে মিলিয়ে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে হয়। যে-অংশ নিয়ে পণ্ডিত কাজ করছেন তাঁর ব্যাখ্যার বদলে তাঁকে

প্রায় মিথ্যা উদ্ভাবনের এক প্রণালী স্থাপন করতে হয়। আমাদের মনে হয় তিনি অর্থপ্রকাশ করছেন না কিন্তু বিদ্রোহী উপাদানকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে কোন রকমে তার একটা রূপ ও সঙ্গতি দেবার প্রচেষ্টা করছেন।

এ সত্ত্বেও সমগ্র সাহিত্যের ইতিহাসে এই দুর্বোধ্য ও বর্বর রচনাগুলিই সবচেয়ে গৌরবময় সৌভাগ্য লাভ করেছে। এগুলি জগতের সমৃদ্ধতম ও গভীরতম ধর্মের মধ্যে কয়েকটিরই শুধু নয়, পরন্তু সূক্ষ্মতম পরমতাত্ত্বিক দর্শনসমূহের কয়েকটিরও মূল বলে খ্যাত হয়েছে। সহস্র সহস্র বছরের স্থিরীকৃত ঐতিহ্যে, ব্রাহ্মণে ও উপনিষদে, তন্ত্রে ও পুরাণে, মহৎ দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মতবাদসমূহে ও বিখ্যাত সন্ত ও মুনিদের শিক্ষায় যা কিছু প্রামাণিক ও সত্য, এগুলি তাদের উৎস ও মানদণ্ড বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হয়েছে। এগুলির যে নাম বহন করত তা হলো বেদ, জ্ঞান,---মানুষের মন যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান গ্রহণ করতে সক্ষম, তারই প্রাপ্ত নাম, কিন্তু যদি আমরা সায়ণের বা আধুনিক মত অনুযায়ী প্রচলিত ব্যাখ্যাগুলি স্বীকার করি তাহলে এই মহত্ত্বপূর্ণ ও পবিত্র যশের সবটাই একটি অতিকায় উপন্যাস। পক্ষান্তরে, অত্যন্ত বাহ্যিক লাভ ও ভোগ-পরায়ণ ও প্রায় একেবারে প্রাথমিক নৈতিক ধারণা বা ধার্মিক আস্পৃহা ব্যতীত আর কিছু সম্বন্ধে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও জড়বাদীদের কুসংস্কারপূর্ণ কল্পনার চেয়ে মন্ত্রগুলি অধিক কিছু নয়। ঐগুলির সাধারণ ভাবের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন কয়েকটি অংশ এই সামগ্রিক ধারণার অবলোপ করে না। পরবর্তী ধর্ম ও দর্শনসমূহের প্রকৃত ভিত্তি বা উৎস হ'ল উপনিষদগুলি; সে-গুলিকে তাহলে বেদের অনুষ্ঠানমূলক জড়বাদের বিরুদ্ধে দার্শনিক ও চিন্তাশীল মানসের বিদ্রোহ বলে মনে করতে হয়।

কিন্তু এই ধারণার দ্বারা, যা কতকগুলি একই রকম য়ুরোপীয় ব্যাপারের দ্বারা সমর্থিত, কিছুরই ব্যাখ্যা হয় না। উপনিষদগুলির সার-বস্তুতে যেরকম গভীর ও চরম চিন্তা, যেরকম বিস্তারিত মনস্তত্ত্ব---ব্যবস্থা পাওয়া যায়, তা পূর্বতন শূন্য থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। নিজের অভিযানের পথে মানুষের মন জ্ঞান থেকে জ্ঞানেই এগিয়ে চলে; অথবা যে-জ্ঞান অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে ও যার ওপর অজ্ঞানের প্রলেপ পড়েছে, তা পুনরুজ্জীবিত করে ও ব্যাপকতর করে বা পুরাতন ইঙ্গিত অবলম্বন ক'রে নতুন আবিষ্কার করে। উপনিষদের চিন্তা প্রাচীনতর মূলের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু সাধারণ মতবাদগুলিতে তার কোন স্থান নেই। ঐ ফাঁক ভরাবার জন্যে যে-প্রকল্প

করা হয়েছে—বাইরে থেকে আগন্তুক বর্বর আর্যেরা সুসভ্য দ্রাবিড়দের কাছ থেকে ঐসব চিন্তা ধার করেছিলেন—তা জল্পনার দ্বারা সমর্থিত একটি জল্পনা মাত্র। পঞ্জাবের মধ্যে দিয়ে আর্যদের আগমনের সমগ্র কাহিনীটাই শব্দতাত্ত্বিকদের একটা কল্পনা কিনা সেবিষয়ে এখন সন্দেহ হচ্ছে। প্রাচীন য়ুরোপে বুদ্ধিমূলক দর্শনগুলির আগে ছিল মরমীদের রহস্যবাদ; অরফিউ-সীয় ও ঈলিউসীয় রহস্যবাদ প্রস্তুত করেছিল সেই অতি-উর্বর মানসভূমি যার থেকে পাইথাগোরাস ও প্লেটোর উদ্ভব হয়েছিল। ভারতেও যে পরবর্তী চিন্তার অগ্রগতির ঐরকমই একটি প্রারম্ভ হয়েছিল, তা অন্ততঃ খুবই সম্ভব। উপনিষদগুলিতে আমরা চিন্তার যে-রূপ ও প্রতীক দেখি, তার ও ব্রাহ্মণ-গুলির সারের অনেকাংশ ভারতেও একটি যুগের সূচনা দেয় যখন গ্রীকদের রহস্যবাদের মতই চিন্তার একটি গুহ্য উপদেশের আকার বা আবরণ ছিল।

প্রচলিত মতগুলি আর একটা ফাঁক রেখে গেছে, তা হলো বেদে প্রচলিত বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তির জড়াত্মিকা উপাসনার ও গ্রীকদের বিকশিত ধর্মের মধ্যে, এবং উপনিষদে ও পুরাণে দেবতাদের সঙ্গে যে-সব মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ধারণা জড়িত আছে, তাদের মধ্যে প্রভেদ। আপাততঃ আমরা এই মত মেনে নিতে পারি যে মানুষের ধর্মের আদিমতম সম্পূর্ণ সচেতন রূপ অবশ্যই ছিল—কারণ পার্থিব মানুষ বাইরে থেকে আরম্ভ করে ভিতরের দিকে চলে—বহিঃপ্রকৃতির শক্তিসমূহের উপাসনা যার উপর মানুষ নিজের সত্তার চৈতন্য ও ব্যক্তিত্ব আরোপ করে।

বেদে অগ্নি হল বহ্নি, সূর্য রবি, পর্জন্য জলভরা মেঘ, উষা প্রভাত; এ ত স্বীকার করাই হয়; আর যদি কয়েকটি দেবতার জড়মূলক বা প্রাকৃতিক উদ্ভব ও ক্রিয়া তত স্পষ্ট না হয়, তবে শব্দতত্ত্ব অনুসারে অনু-মান করে ও চতুর কল্পনা করে অস্পষ্টকে নির্দ্দিষ্ট রূপ দেওয়া সহজ। কিন্তু যখন আমরা বিচার করি গ্রীক উপাসনার—যা এখনকার কাল-নিরূপণের ধারণা অনুসারে বেদের খুব বেশী পরবর্তী নয়—তখন একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রভেদ দেখি। দেবতাদের স্থূল গুণাবলী অপসৃত হয়ে গেছে ও সেগুলি মানসিক ধারণার অধীন হয়েছে। প্রচণ্ড আবেগময় অগ্নিদেব শ্রমের দেবতায় পরিণত হয়েছেন, সূর্য বা এ্যাপোলো কাব্যের ও ঐশ্বরিক বাণীময় প্রেরণার অধিষ্ঠাতা, এ্যাথিনী, যাঁকে আপাতদৃষ্টিতে সঙ্গতভাবে উষাদেবীর সঙ্গে এক বলে মনে করা যায়, তাঁর সব স্থূল ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বিস্মৃত হয়েছেন, তিনি জ্ঞানের শক্তিময়ী ও শুদ্ধ প্রজ্ঞাময়ী দেবী;

আর রয়েছেন অন্যেরা, যেমন যুদ্ধের, প্রেমের, সৌন্দর্য্যের দেবতারা, যাঁদের যদি কোন সময়ে কোন স্থূল কর্ম থেকেও থাকে, তা সব তিরোহিত হয়েছে। মানুষের সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন অনিবার্য, একথা বলাই যথেষ্ট নয়; যে-প্রক্রিয়ার ফলে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, তারও অনুসন্ধান করা ও বিশদ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। পুরাণে অন্য দৈব নাম ও রূপের প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই একই বিপ্লব অংশতঃ সাধিত হয়েছে দেখতে পাই, কিন্তু গ্রীক আখ্যায়িকাতে ক্রমবিকাশের যে-অস্পষ্ট প্রক্রিয়া লক্ষ্য করি, তার দ্বারাও তা কিছুটা সম্ভব হয়েছে। সরস্বতী নদী হয়েছে কাব্য, শিল্প ও জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; বৈদিক বিষ্ণু বা রুদ্র তখন শ্রেষ্ঠ দেবতা, এক দিব্য ত্রয়ীর দুটি অঙ্গ ও যথাক্রমে বিশ্বের স্থিতি ও ধ্বংসপ্রক্রিয়ার ব্যঞ্জক। ঈশা উপনিষদে আমরা দেখতে পাই আগমিক জ্ঞানের দেবতারূপে আবেদন করা হয়েছে সূর্যের কাছে, যাঁর ক্রিয়ার দ্বারা আমরা সর্বোচ্চ সত্যে উপনীত হতে পারি। বহু সহস্র বৎসর প্রত্যেক ব্রাহ্মণ দৈনিক উপাসনাতে যে-গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতেন, সেই পবিত্র বৈদিক মন্ত্রেও সূর্যের ঐ একই কর্ম, ও এও লক্ষ্যণীয় এই মন্ত্রটি ঋগ্বেদের একটি চরণ, ঋষি বিশ্বামিত্রের একটি সূক্ত থেকে নেওয়া। ঐ উপনিষদেই অগ্নিকে আবাহন করা হয়েছে শুধু নৈতিক কর্মের জন্য, পাপ থেকে শুদ্ধিকর্তারূপে ও শুভপথে দিব্য আনন্দের দিকে মানবাত্মার পরিচালকরূপে এবং মনে হয় তিনি ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে অভিন্ন ও মানুষের কর্মের জন্য দায়ী। অন্যান্য উপনিষদ-গুলিতে দেবতারা স্পষ্টই ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার প্রতীক। যে-লতাটি বৈদিক যজ্ঞের জন্য 'মিস্টিক' মদ প্রদান করত, সেই সোম শুধু চন্দ্রের দেবতা হয়েছে তাই নয়, তা আবার মন বলে নিজেকে অভিব্যক্ত করে। এইসব বিকাশ প্রাচীন ভূত-উপাসনার ও বেদে আরোপিত অপেক্ষাকৃত উন্নততর বিশ্বব্যাপী সর্বপ্রাণবাদের পরে ও পৌরাণিক আখ্যায়িকার—যাতে দেবতাদের গভীরতর মানসিক কর্ম প্রদত্ত হয়েছে—আগে হয়েছিল, সেই সময় ছিল খুব সম্ভব রহস্যবাদের যুগ। বস্তুস্থিতি থেকে মনে হয় একটা ব্যবধান থেকে গেছে বা আমরা যে বৈদিক ঋষিদের উপাসনায় কেবল বাহ্যপ্রাকৃতিক অঙ্গটিকে নিয়ে তন্ময় হ'য়ে আছি তা তার দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে।

আমি বলছি এই ব্যবধানটি আমাদেরই সৃষ্টি ও বাস্তবিক প্রাচীন পবিত্র রচনাগুলিতে নেই। আমি এই প্রকল্প প্রস্তাব করছি যে ঋগ্বেদই একমাত্র সাহিত্য যা গণনার যোগ্য ও মানুষের চিন্তার প্রথম যুগ থেকেই

এখনও আমাদের যুগে বর্তমান, ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইলিউসীয় ও অফিক রহস্যবাদ যে-সময়ের ক্ষীয়মান অংশ ও যখন, কি কারণে তা এখন নির্দিষ্ট করা শক্ত, জাতির আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক জ্ঞান গুপ্ত রাখা হ'ত বাস্তব ও ভূতাত্মক প্রতীকের আবরণে যেগুলি তাদের অর্থ সাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখত ও দীক্ষিতদের কাছে প্রকাশ করত। আত্ম-জ্ঞানের ও দৈবতজ্ঞানের পবিত্র স্বরূপ ও গোপনরূপ রহস্যবাদীদের একটি প্রধান তত্ত্ব ছিল। তাঁরা মনে করতেন যে ঐ জ্ঞান সাধারণ মানুষের গ্রহণ-যোগ্য নয়, এমনকি তার পক্ষে হয়ত বিপজ্জনকও; আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ অশুদ্ধচিত্ত প্রাকৃতজনের কাছে প্রকট হলে তা বিকৃত, অপপ্রযুক্ত ও গুণরহিত হবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যেই তাঁরা পছন্দ করতেন প্রাকৃত জনের পক্ষে ফলপ্রসূ কিন্তু অসম্পূর্ণ বাহ্যিক পূজাপদ্ধতি ও দীক্ষিত-দের জন্য আন্তর পদ্ধতি; তাঁরা তাঁদের ভাষাকে আবরণ পরিয়েছিলেন এমন শব্দ ও চিত্রের যেগুলির অর্থ বিশেষভাবে বৃতদের কাছে ছিল আধ্যা-ত্মিক ও সাধারণ উপাসকমণ্ডলীর কাছে ছিল বাহ্যিক বাস্তব। বৈদিক সূক্তগুলি এই নীতি অনুসারেই চিন্তিত ও রচিত হয়েছিল। ঐ সূক্তগুলির সূত্র ও অনুষ্ঠানগুলি হল প্রকাশ্যতঃ, তখনকার সাধারণ ধর্মের দেবত্ব আরোপিত প্রকৃতি—উপাসনার জন্য পরিকল্পিত বাহ্যিক আচারের বিশদ ব্যবস্থা, আর গুপ্তভাবে আধ্যাত্মিক অনুভব ও জ্ঞানের ও আত্মবিকাশের একটি মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির—যা ছিল তদানীন্তন মনুষ্যজাতির শ্রেষ্ঠ কীর্তি—পবিত্র মন্ত্র ও ফলপ্রসূ প্রতীক। সায়ণের দ্বারা অভিজ্ঞাত যাজ্ঞিক তন্ত্রের বাহ্যিক দিকগুলি থাকতে পারে; য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার সাধারণ ধারণাগুলি স্বীকার করা যায়, কিন্তু এগুলির পিছনে রয়েছে বেদের প্রকৃত ও এখনও গুপ্ত রহস্য—সেই সব গুহ্য বচন, নিণ্যা বচাংসি, যা শুদ্ধ-আত্মা বিপশ্চিৎদের জন্য গীত হয়েছিল। বৈদিক শব্দগুলির তাৎপর্য, বৈদিক প্রতীকগুলির অর্থ ও দেবতাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়াবলী নির্দিষ্ট ক'রে বেদের এই অপেক্ষাকৃত কম স্পষ্ট কিন্তু গুরুত্ব-পূর্ণ অর্থটিকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন কিন্তু অবশ্যকর্তব্য কর্ম; এই অধ্যায়গুলি ও এদের সঙ্গে যে অনুবাদগুলি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি তার প্রস্তুতি।

এই প্রকল্পটি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণিত হলে তিনটি সুবিধা হবে। উপ-নিষদের যে-সব অংশ এখনও অবোধ্য বা ভালভাবে বোঝা যায়নি, সেগুলি ও পুরাণগুলির উদ্ভবের অনেক কিছু সরল ও সফলভাবে ব্যাখ্যাত হবে।

এর দ্বারা সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য যুক্তিযুক্তভাবে ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হবে; দেখা যাবে যে বাস্তবিক বৈদিক উৎস থেকেই বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি ও মহৎ ভারতীয় উপাসনা-প্রণালীগুলির উদ্ভব। বৈদিক মূলে আমরা দেখতে পাই পরবর্তী ভারতীয় চিন্তার ভিত্তি-গত ধারণাগুলির মূল বীজ বা তাদের প্রাথমিক, এমনকি তাদের আদিম-রূপ। অতএব ভারতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্মের আরও সারবান্ তুলনামূলক গবেষণার স্বাভাবিক উৎস পাওয়া যাবে। অদৃঢ় জল্পনার মধ্যে বিচরণের বা অসম্ভব রূপান্তর ও অব্যাখ্যাত সংক্রমণের পরিবর্তে আমরা পাব যুক্তির সন্তোষজনক স্বাভাবিক ও ক্রমিক বিকাশের সূত্র। প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য প্রাচীন জাতির প্রথম দিকের অনুষ্ঠানও 'মিথে'র পুরাণের ওপরেও কিছু আলোক-পাত হতে পারে। শেষে, বৈদিক রচনাগুলির সব অসঙ্গতি ব্যাখ্যাত ও তিরোহিত হবে। এগুলি শুধু আপাতদৃষ্টিতেই আছে, কারণ প্রকৃত অর্থের সূত্র একটি আভ্যন্তরীণ তাৎপর্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সেই সূত্রটি একবার পাওয়া গেলে বোঝা যায় যে সূক্তগুলি ন্যায়সঙ্গত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ও তাদের ভাষা আমাদের আধুনিক চিন্তাপ্রণালীর ও প্রকাশভঙ্গীর মত না হলেও, তাদের নিজস্ব শৈলী অনুসারে যথাযথ ও নির্দ্দিষ্ট ও তার দোষ শব্দের সংযমে, বাহুল্যে নয়, ব্যঞ্জনার আতিশয্যে, অর্থের দৈন্যে নয়। বেদ তখন আর বর্বরতার একটি চিত্তাকর্ষক অবশেষ থাকে না, কিন্তু জগতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রগুলির প্রধানতমদের মধ্যে স্থান পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বেদ সম্বন্ধে পূর্বতন মতবাদ নিরীক্ষা

বেদ তাহলে আমাদের বুদ্ধিনির্ভর দর্শনগুলির এক পূর্বতন যুগের সৃষ্টি। সেই আদিযুগের চিন্তা অগ্রসর হ'ত আমাদের নৈয়ায়িক যুক্তি-প্রণালী থেকে ভিন্ন পন্থায় এবং ভাষা আমাদের প্রথায় অস্বীকার্য, প্রকাশ-ভঙ্গী স্বীকার করত। জ্ঞানীশ্রেষ্ঠরা তখন যত জ্ঞান মানুষের সাধারণ প্রত্যক্ষ ও নিত্য কার্যাবলীর ঊর্দ্ধে বিস্তৃত, তা পাবার জন্য আন্তর অনুভূতি ও সম্বোধির সংকেতের উপর নির্ভর করতেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞার আলো, যুক্তিসঙ্গত প্রত্যয় নয়; তাঁদের আদর্শ ছিল দিব্য প্রেরণাময় ঋষি, যথাযথ তার্কিক নয়। ভারতীয় ঐতিহ্য বেদের উৎপত্তির এই বর্ণনা নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে। ঋষি ব্যক্তিরূপে মন্ত্রের রচয়িতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি সনাতন সত্য ও এক অপৌরুষের জ্ঞানের দ্রষ্টা; বেদের ভাষাও শ্রুতি, তা হল এক ছন্দ যা বুদ্ধির দ্বারা রচিত নয় কিন্তু শ্রুত, এক দিব্যবাক্ যা অসীমের স্পন্দিত হয়ে নেমে এসেছিল সেই মানুষের আভ্যন্তর শ্রবণে যিনি নিজেকে অপৌরুষেয় জ্ঞান পাবার যোগ্য করেছিলেন। দৃষ্টি ও শ্রুতি শব্দ দুটি বৈদিক; মন্ত্রগুলির গুহ্য পরিভাষায় ওই দুইটি ও অন্যান্য সম্পর্কিত শব্দ আগমিক জ্ঞান ও দিব্য প্রেরণার অন্তর্গত বস্তু সূচিত করে।

আগমিক জ্ঞানের বৈদিক ধারণায় অলৌকিক বা অতি-প্রাকৃতের কোন ব্যঞ্জনা নেই। এই শক্তিগুলির প্রয়োগকারী ঋষি প্রগতিশীল আত্ম-অনুশীলনের দ্বারা ওইগুলি পেতেন। জ্ঞান ছিল চারণ ও লক্ষ্যে পৌঁছানো, অথবা আবিষ্কার ও জয় করে নেওয়া; অপৌরুষেয় জ্ঞান প্রকাশ হ'ত একেবারে শেষে, প্রজ্ঞার আলো ছিল অন্তিম-বিজয়ের পুরস্কার। বেদে অবিচ্ছিন্নভাবে রয়েছে এই যাত্রার, সত্যের পথে আত্মার অগ্রগতির ছবি। ওই পথে আত্মা যেমন অগ্রসর হয়, তেমন ওপরেও ওঠে; তার আস্পৃহার সামনে শক্তির ও আলোর নূতন নূতন ক্ষেত্র খুলে যায়; বীর্যময়ী সাধনার দ্বারা আত্মা তার বৃহত্তর আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য জয় করে নেয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঋগ্বেদ মনুষ্য জাতির সামূহিক প্রগতির

একটি বিশেষ যুগে বিশিষ্ট উপায়ের দ্বারা লব্ধ মানুষের মহান অগ্রগতির বিবরণ বলে গণ্য হতে পারে। ঋগ্বেদের গূঢ় ও প্রকাশ্য তাৎপর্য হল এই যে তা হচ্ছে কর্মকাণ্ড, আন্তর ও বাহ্যিক যজ্ঞের শাস্ত্র; আত্মা যখন প্রাকৃত ও পশুতুল্য মানুষের অনধিগম্য চিন্তা ও অনুভূতির স্তর সব আবিষ্কার করে ও তাতে উত্তরণ করে, বেদ হল তার সংগ্রামের ও বিজয়ের গাথা, মর্ত্যের ভিতর ক্রিয়াশীল দিব্য জ্যোতি, শক্তি ও করুণার মানবীয় স্তুতি। অতএব ঋগ্বেদ আদৌ বুদ্ধিগত বা কাল্পনিক জল্পনার নিষ্কর্ষ লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা নয় বা তাতে আদিম বর্বর ধর্মের যুক্তি-অসহ কোন মতবাদ নেই। শুধু অনুভূতির সমতা ও প্রাপ্ত জ্ঞানের অপৌরুষেয়তা থেকে অবিরত পুনরাবৃত্ত কয়েকটি ধারণার থেকে একটি নির্দিষ্ট রাশির ও একটি নিশ্চিত প্রতীকময় ভাষার উদ্ভব হয়; মানুষের গোড়ার দিকের ভাষায় বাস্তবতা ও গূঢ় ব্যঞ্জনা-শক্তির সংযোগের দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে অপ্রকাশ্যকে প্রকাশ করতে সমর্থ ব'লে শুধু তাই সম্ভবতঃ ছিল ওই ধারণাগুলির অনিবার্য রূপ। অন্তত আমরা দেখতে পাই সূক্ত থেকে সূক্তান্তরে একই নির্দিষ্ট পদে ও অলংকারে ও প্রায়ই একই বাক্যাংশসমূহে একই ভাব-রাশির পুনরাবৃত্তি; আর দেখি কবিত্বের মৌলিকত্বের সন্ধানের প্রতি এবং চিন্তার নূতনত্ব ও ভাষার নবীনতার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা। চারুকলার লাবণ্য, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যের কোন এষণাই এই মরমী কবিদের সেই বিশিষ্ট ও পবিত্র রূপকে বদলাতে প্ররোচিত করতে পারে নি; তাঁদের পক্ষে সেই রূপ অবিচ্ছিন্ন দীক্ষিত-পরম্পরার কাছে জ্ঞানের চিরন্তন সূত্রদায়ক একটি দিব্য বীজগণিতের মত হয়ে উঠেছিল।

বস্তুতঃ মন্ত্রগুলির ছান্দসিক রূপ নির্দোষ। তাদের আঙ্গিকে আছে একটি অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা এবং শৈলীর ও কবিদের ব্যক্তিত্বের বিপুল বৈচিত্র্য; এগুলি অমার্জিত বর্বর ও আদিম কারিগরদের কীর্তি নয়; বরং সেগুলি একটি স্বয়ং-পর্যবেক্ষক প্রেরণার প্রবল, যদিও সু-নিয়ন্ত্রিত গতিতে নিজের রূপের সৃষ্টিকারী এক উত্তম ও সচেতন শিল্প-কলার প্রাণবন্ত স্পন্দন; তবুও একটি অপরিবর্তনশীল কাঠামোর মধ্যে ও একই উপাদান নিয়ে এই সব মহৎ ক্ষমতা ইচ্ছাবশে অনুশীলিত হ'য়েছে। ঋষিদের কাছে ভাব প্রকাশের শিল্প ছিল উপায় মাত্র, লক্ষ্য নয়; তাঁদের প্রধান প্রয়োজন ছিল কঠোরভাবে ব্যবহারিক, উপযোগিতার সর্বোত্তম অর্থে উপযোগিতামূলক। মন্ত্রলেখক ঋষির পক্ষে মন্ত্র ছিল তাঁর ও অন্যদের

আধ্যাত্মিক প্রগতির উপায়। মন্ত্র তাঁর আত্মা থেকে উৎসারিত হত, তাঁর মনের একটি শক্তি হ'য়ে উত্থিত হত, তা ছিল তাঁর আন্তর জীবনের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি সঙ্কট মুহূর্তে, আত্মপ্রকাশের বাহন। তাঁর অন্তঃস্থিত দেবতাকে প্রকট করতে, খাদক ও অশুভের প্রকাশককে বিনাশ করতে মন্ত্র তাঁকে সাহায্য করত; সংসিদ্ধি-সাধক আর্যের হাতে তা হয়ে উঠেছিল একটি অস্ত্র; তালুর উপরে আবরকের বিরুদ্ধে, পথে বৃকের বিরুদ্ধে, স্রোতস্বিনীর তীরে দস্যুর বিরুদ্ধে ইন্দ্রের বজ্রের তা ঝক্‌মক্ করে উঠত।

বৈদিক চিন্তাধারার গভীরতা, ঐশ্বর্য ও সূক্ষ্মতার সংযোগে, তার পরিবর্তনহীন নির্দিষ্টতা থেকে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক জল্পনার উদ্ভব হয়। কেননা ন্যায়সঙ্গতভাবে আমরা এই রকম বিচার করতে পারি যে চিন্তার ও মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার প্রারম্ভে, এমনকি সেগুলির প্রাথমিক প্রগতি ও বিকাশের কালেও এইপ্রকার নির্দিষ্ট রূপ ও সারবস্তু সহজে সম্ভব হয় না। আমরা তাহলে অনুমান করতে পারি যে আমাদের সংহিতা একটি যুগের শেষ দিকের প্রতিভূ, তার আরম্ভের এমনকি তার অনুগামী অবস্থারও প্রতিনিধি নয়। এমনকি এও সম্ভব যে এই সংহিতার প্রাচীনতম সূক্তগুলিও এক প্রাচীনতর মানবীয় ভাষার মুক্ততর, নমনীয়তর শব্দে প্রকাশিত একটি পূর্বতন কাব্যময় ভগবদ্বাক্যের অপেক্ষাকৃত আধুনিক বিকাশ বা অনুবাদ[১]। কিংবা সংহিতাটির উপাসনা গাথার সমগ্র বিশাল সংগ্রহই আর্যদের অধিকতর সোচ্চার অতীত থেকে বেদব্যাসের নির্বাচিত একটি অংশ মাত্র। সাধারণ বিশ্বাস এই যে আমাদের ঐতিহ্যের মহান্ মুনি, বিরাট সংগ্রহকর্তা (ব্যাস) এই চয়ন করেছিলেন; তাঁর দৃষ্টি ছিল কলিযুগের প্রারম্ভের দিকে, বর্দ্ধমান ক্ষীণ-আলোকময় শতাব্দীসমূহের ও অন্তিম তমসার দিকে। এই সংগ্রহ সম্ভবতঃ সম্বোধির যুগগুলির পূর্বপিতৃগণের প্রোজ্জ্বল উষাগুলির শেষ অবদান তাঁদের বংশধরদের কাছে, মানবজাতির কাছে, যা তখনই চেতনার নিম্নতর স্তরের দিকে ও জড়জীবন, মনীষা ও তার্কিক বুদ্ধির সহজতর ও নিরাপদ—বোধহয় শুধু বাহ্যিক রূপেই নিরা-

১: বেদ নিজেই অবিরত "প্রাচীন" ও "আধুনিক" ঋষিদের কথা বলেছেন (পূর্বঃ... নূতনঃ); প্রথমদল এতই প্রাচীন যে তাঁদের একরকম উপদেবতা, জ্ঞানের আদি প্রতিষ্ঠাতা বলে গণ্য করা যায়।

পদলাভের দিকে ফিরতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু এসবই হ'ল জল্পনা ও অনুমান মাত্র। একথা নিশ্চিত যে মনুষ্য সভ্যতার আবর্তনের নিয়ম অনুসারে বেদ ক্রমে দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে ও তার অর্থ লুপ্ত হয়ে গেছে, এই প্রাচীন বিশ্বাস পরবর্তী ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এই দুর্বোধ্যতার আরম্ভ হয়েছিল ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার পরবর্তী মহান বৈদান্তিক যুগ শুরু হবার অনেক আগেই; সেই যুগে প্রাচীন জ্ঞান রক্ষা করার বা অন্ততঃ পুনরুদ্ধার করার জন্য তীব্র প্রচেষ্টা হয়েছিল; অন্যরকম হওয়া প্রায় সম্ভব ছিল না। কারণ বৈদিক রহস্যবিদদের অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্লভ অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপরে গঠিত হয়েছিল ও তার কাজ চলত কতকগুলি শক্তির সাহায্যে যা আমাদের অধিকাংশের ভিতরেই আদিম এবং অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত এবং যখন আদৌ সক্রিয় তখনও মিশ্র ও তাদের ক্রিয়া অনিয়মিত। একবার সত্য অনুসন্ধানের প্রাথমিক তীব্রতা কেটে যাবার পরে, ক্লান্তি ও শিথিলতার যুগ আসতে বাধ্য, তখন প্রাচীন সত্যগুলি অংশতঃ নষ্ট হয়ে যাবে। একবার নষ্ট হয়ে গেলে, প্রাচীন মন্ত্রগুলির অর্থ নিরীক্ষা করে সহজে তা উদ্ধার করা যাবে না; কারণ ঐসব সূক্তগুলিকে ইচ্ছা করেই দ্ব্যর্থক ভাষায় রূপায়িত করা হয়েছিল। একবার একটা সূত্র পেলে একটা অবোধ্য ভাষা সঠিকভাবে বোঝা যায়; যে শব্দ চয়ন ইচ্ছাবলেই দ্ব্যর্থক তা আরো নাছোড়বান্দাভাবে ও সফলভাবে নিজের রহস্য রক্ষা করতে পারে, কারণ তা অনেক প্রলোভন ও ভ্রান্তিকর সূচনায় পূর্ণ। সুতরাং ভারতীয় মানস যখন আবার বেদের অর্থ নিরীক্ষার দিকে দৃষ্টি ফেরালো, তখন সে কাজটি হল কঠিন ও সফলতা হল আংশিক। তখনও আলোর একটি উৎস ছিল,—— তা হল যাঁরা বেদ মুখস্থ করতেন ও ব্যাখ্যা করতেন তাঁদের মধ্যে পরম্পরায় পাওয়া ঐতিহ্যিক জ্ঞান; মূলে ঐ দুটি কাজ এক ছিল, কারণ পুরোহিত ছিলেন আচার্য ও ঋষি দুই। কিন্তু ঐ আলোর স্বচ্ছতা আগেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খ্যাতিমান পুরোহিতরাও যেসব উৎসর্গীকৃত বাক্য আবৃত্তি করতেন, তাঁরাও সেগুলির শক্তির ও অর্থের খুব অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়েই যজ্ঞাদি করতেন। কারণ বৈদিক উপাসনার বাইরের রূপগুলি ভিতরের জ্ঞানের উপরে একটা কঠিন আবরণের মত হয়ে উঠেছিল ও একদা যা তারা রক্ষা করত, তাই তারা অবরোধ করছিল। তখনি বেদ কতকগুলি কাল্পনিক কাহিনী ও অনুষ্ঠানের রাশি হয়ে উঠেছিল। প্রতীকী

অনুষ্ঠানের শক্তি তিরোহিত হয়েছিল; মরমী কাহিনী থেকে আলো হয়েছিল অস্তমিত। রেখে গিয়েছিল শুধু একটা বাহ্যিক আপাতপ্রতীয়মান কিম্ভূত-কিমাকার সরল বাহ্যরূপ।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি এক শক্তিশালী পুনরুজ্জীবনের বিবরণ; সেই আন্দোলন বেদের উৎসর্গীকৃত ঋক্ ও অনুষ্ঠানগুলিকে এক নতুন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উৎস বলে গ্রহণ করেছিল। ঐ আন্দোলনটির দুটি পারস্পরিক পরিপূরক দিক ছিল; একটি আকারের লক্ষণ, অন্যটি বেদের মর্মের প্রকাশ,—ব্রাহ্মণগুলি[১] প্রথমটির প্রতিনিধি, উপনিষদগুলি দ্বিতীয়টির। ব্রাহ্মণগুলির প্রচেষ্টা হল বৈদিক অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটি, তাদের বাস্তব ফলপ্রসূতার সর্তাবলী, তাদের বিভিন্ন অংশের, গতি ও করণসমূহের প্রতীকাত্মক অর্থ ও উদ্দেশ্য, অনুষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় মন্ত্রের তাৎপর্য, দুর্বোধ্য উল্লিখিত বিষয়ের অর্থ, প্রাচীন কাহিনী ও ঐতিহ্যের স্মৃতি, এসব নির্দিষ্ট করা ও রক্ষা করা। ব্রাহ্মণগুলির অনেক কাহিনী অস্পষ্টতঃ মন্ত্রগুলির পরে রচিত যেসব অংশ আর বোঝা যেত না, তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্ভাবিত, আর কয়েকটি হয়ত প্রাচীন প্রতীককারদের প্রযুক্ত রূপক কাহিনীর অংশ, অথবা মন্ত্রগুলির রচনার বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মৃতি। মৌখিক ঐতিহ্যের আলো সবসময় বিষয়কে অস্পষ্ট করে তোলে; যখন একটি নূতন প্রতীক ব্যবস্থা কোন পুরানো প্রতীক ব্যবস্থার ওপর প্রযুক্ত হয়, তখন তা তাকে প্রকাশ করে না ঢেকে ফেলে; সুতরাং ব্রাহ্মণগুলি নানা চিত্তাকর্ষক ইঙ্গিতে পূর্ণ হলেও আমাদের গবেষণায় অতি অল্প সাহায্য করে; যখন তারা বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের যথাযথ শাব্দিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে তখনও তারা সেগুলির অর্থের নিরাপদ দিশারী নয়।

উপনিষদের ঋষিরা অন্য একটি প্রণালী অনুসরণ করলেন। তাঁরা ধ্যান ও আধ্যাত্মিক অনুভবের দ্বারা লুপ্ত বা অস্তমান জ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন, প্রাচীন মন্ত্রগুলিকে তাঁরা সহায় বা নিজেদের সম্বোধির ও দর্শনসমূহের প্রমাণরূপে ব্যবহার করতেন; অথবা বৈদিক বাক্ ছিল চিন্তার ও সাক্ষাৎদৃষ্টির বীজ যা দিয়ে তাঁরা পুরাতন সত্যকে নূতন আকারে উদ্ধার

১: অবশ্য এই অধ্যায়ে এইটি ও অন্যান্য মূল্যায়ন কয়েকটি মূল প্রবণতার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মত। উদাহরণস্বরূপ, ব্রাহ্মণদের মধ্যে দার্শনিক অংশ আছে।

করেছিলেন। যা তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা তা প্রকাশ করেছিলেন অন্যতর ভাষায় যা যে যুগে তাঁরা বাস করতেন তখন আরো বোধগম্য ছিল। এক হিসাবে তাঁদের বেদচর্চা একেবারে স্বার্থহীন ছিল না; তা পণ্ডিতের শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বাক্যের বাস্তবিক বিন্যাস অনুসারে তার যথাযথ চিন্তা অবধারণ করার ইচ্ছা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হত না। তাঁরা শুধু ভাষাগত সত্যের চেয়ে এক উচ্চতর সত্যের অনুসন্ধানী ছিলেন এবং যে জ্ঞান পেতে তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, তার ব্যঞ্জনারূপেই শব্দাবলী ব্যবহার করতেন। ব্যুৎ-পত্তিগত অর্থ তাঁরা জানতেন না বা অবহেলা করতেন ও প্রায়ই এক প্রতীকী ব্যাখ্যার প্রণালী প্রয়োগ করতেন যাতে তাদের অনুসরণ করা খুব কঠিন। এইজন্যে যদিও উপনিষদগুলি প্রাচীন ঋষিদের প্রধান প্রধান চিন্তার ও তত্ত্ব-ব্যবস্থার উপর যে আলোকপাত করে তার জন্য অমূল্য, তবুও যে-সব শ্রুতি তারা উদ্ধৃত করে সেগুলির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে তারা ব্রাহ্মণ-গুলির মত অল্প সাহায্য করে। বেদের ব্যাখ্যার চেয়ে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল উপনিষদগুলির আসল কাজ। কেননা এই বিরাট আন্দোলনের ফল হয়েছিল চিন্তার ও আধ্যাত্মিকতার একটি নূতন ও দীর্ঘস্থায়ী, প্রভাব-শালী বিবরণ; বেদ বেদান্তে পরিণত হল। আর এর মধ্যে দুটি প্রবণতা ছিল যা পুরানো বৈদিক চিন্তা ও সংস্কৃতি বহুধা বিভক্ত হয়ে যাবার কারণ হয়েছিল। প্রথমতঃ, ঐ আন্দোলনের মধ্যে একটি ঝোঁক ছিল বাহ্যিক অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও যজ্ঞের উপযোগিতাকে একটি শুদ্ধতর আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অধীন করা। বাইরের ও ভেতরের, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে প্রাচীন মরমীদের দ্বারা রক্ষিত ভারসাম্য ও সমন্বয় স্থানচ্যুত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিল; একটা নূতন সামঞ্জস্য ও সমন্বয় স্থাপিত হয়েছিল; শেষ পর্যন্ত তা ঝুঁকে পড়েছিল কঠোর তপোশ্চর্যা ও সন্ন্যাসের দিকে, ও বৌদ্ধধর্ম, তার নিজের প্রবণতাগুলির অতিচারের দ্বারা স্থানচ্যুত ও বিশৃঙ্খল হওয়া পর্যন্ত, তা রক্ষিত হয়েছিল। যজ্ঞ ও প্রতীকময় অনুষ্ঠান ক্রমেই নিষ্প্রয়োজন উদ্বর্তন বোঝা হয়ে উঠল, তবুও, যেমন প্রায় হয়ে থাকে, যান্ত্রিক ও সফলপ্রসূ হয়ে গেল বলেই, জাতি ও মানুষের যে অংশটি তাদের আঁকড়ে রইলো, তা তাদের যা সবচেয়ে বাহ্যিক, তার প্রয়োজনীয়তা অতিরঞ্জিত করল ও তাদের খুঁটিনাটি অযৌক্তিকভাবে সবলে চাপিয়ে দিতে লাগল। বেদ ও বেদান্তের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ ব্যবহারিক ভেদের উৎপত্তি হল যা তত্ত্বে সম্পূর্ণ স্বীকৃত না হলেও কার্যকরী হয়েছিল ও যাকে এইভাবে

প্রকাশ করা যায়---পুরোহিতদের জন্য বেদ, জ্ঞানীদের জন্য বেদান্ত।

বৈদান্তিক আন্দোলনের দ্বিতীয় ঝোঁক হল মরমীরা যে প্রতীকী ভাষায়, যে বাস্তব রূপক কাহিনীতে ও কবিত্বময় অলংকারে নিজেদের চিন্তাকে আবৃত করে রেখেছিলেন, তার বোঝা থেকে নিজেকে ক্রমশঃ মুক্ত করা ও তার জায়গায় একটা স্পষ্টতর বিবরণ ও আরো দার্শনিক ভাষা স্থাপিত করা। এই প্রবণতার সম্পূর্ণ বিকাশ শুধু বৈদিক যজ্ঞের উপযোগিতাকে নয় কিন্তু বৈদিক মন্ত্রগুলিকেও নিষ্প্রয়োজন করে দিল। উপনিষদগুলি, যাদের ভাষা ক্রমেই স্পষ্টতর ও সহজতর হয়ে উঠছিল উচ্চতম ভারতীয় চিন্তার উৎস হল ও বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের[১] দিব্য প্রেরণাময় কবিতার স্থান গ্রহণ করল। বেদগুলি ধীরে ধীরে শিক্ষার অনিবার্য ভিত্তি না থাকাতে আর সমান উদ্যমে ও সমান মনীষার সঙ্গে পঠিত হল না; তাদের প্রতীক-ময় ভাষা অব্যবহৃত হওয়াতে নূতন বংশীয়দের কাছে---যাঁদের চিন্তাপ্রণালী বৈদিক পিতৃদের ধারা থেকে ভিন্ন ছিল তার আভ্যন্তরীণ অর্থের অবশেষও লুপ্ত হয়ে গেল। সম্বোধির যুগগুলি বুদ্ধির যুগের ঊষার মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

বৌদ্ধধর্ম এই বিপ্লবটিকে সম্পূর্ণ করল ও প্রাচীন জগতের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি মাত্র শ্রদ্ধেয় আড়ম্বর ও যান্ত্রিক ব্যবহার অবশিষ্ট রাখল। উহা বৈদিক যজ্ঞের লোপ করবার ও মার্জিত সাহিত্যিক ভাষার স্থানে জনসাধারণের লোকভাষার ব্যবহার প্রচলিত করার চেষ্টা করল। যদিও বৌদ্ধধর্মের এই কাজের পরিসমাপ্তি পৌরাণিক ধর্মগুলিকে হিন্দু-ধর্মের পুনরুজ্জীবনের দ্বারা কয়েক শতাব্দীর জন্য স্থগিত হয়েছিল, বেদ এই বিরতি থেকে লাভবান হয়নি। নূতন ধর্মটির জনপ্রিয়তাকে প্রতিরোধ করার জন্য শ্রদ্ধার যোগ্য কিন্তু অবোধ্য পাঠ্যের স্থানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃতের সুবোধ রূপে লিখিত শাস্ত্র উপস্থিত করা প্রয়োজন হল। দেশের জনসাধারণের মধ্যে পুরাণগুলি বেদকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিল ও নূতন ধর্ম-ব্যবস্থাগুলির আচার প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির স্থান নিল। বেদ যেমন জ্ঞানীদের থেকে পুরোহিতদের হাতে চলে গিয়েছিল, তেমনি এখন পুরো-

১: এও মূল প্রবণতাই বর্ণনা করছে এরও কিছুটা বদল হতে পারে। বেদগুলিও প্রামাণ্যরূপে উদ্ধৃত হয়, কিন্তু মোটের ওপর উপনিষদগুলিই জ্ঞানকাণ্ড হয়ে উঠেছে। বেদ হয়েছে বরং কর্মকাণ্ড।

হিতদের কাছ থেকে পণ্ডিতদের হাতে গিয়ে পড়তে আরম্ভ করল। সেই আশ্রয়ে তার অর্থের শেষ অঙ্গহানি হল ও তা তার প্রকৃত মর্যাদা ও পবিত্রতার হ্রাস ভোগ করল।

অবশ্য প্রাক্-খ্রীষ্টীয় যুগের প্রথম থেকে ভারতীয় পণ্ডিতরা সূক্তগুলির ওপর যে কাজ করেছেন তা যে সম্পূর্ণই একটি বিফলতার কাহিনী তা নয়। বরঞ্চ, বেদের প্রকৃত রহস্য লুপ্ত হয়ে যাবার পরেও সূক্তগুলি জীবন্ত শাস্ত্রের মর্যাদা হারিয়ে ফেলার পরে, পণ্ডিতদের নিয়মানুবর্তী অধ্যবসায় ও রক্ষণশীল ঐতিহ্যের জন্যই বেদ আদৌ রক্ষা পেয়েছে—তাঁদের কাছে আমরা এর জন্যে ঋণী। আর বেদের লুপ্ত রহস্য পুনরুদ্ধার করার জন্যেও দুহাজার বছর ধরে পণ্ডিতদের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধার ফলে আমরা কয়েকটি অমূল্য সহায়ক বস্তু পেয়েছি বেদের একটি পাঠ যার উচ্চারণের খুঁটিনাটি পর্যন্ত বিধিবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট। যাস্কের গুরুত্বপূর্ণ নিরুক্ত ও সায়ণের মহান্ ভাষ্য যা তার বহু ও প্রায়ই আশ্চর্যকর ত্রুটি সত্ত্বেও এখনও পণ্ডিতদের পক্ষে সারবান বৈদিক বিদ্যাবত্তার পথে প্রথম ও অনিবার্য পদক্ষেপ।

(২)

পণ্ডিতবর্গ

বেদের সূক্তগুলি আমরা যেমন পেয়েছি তা দুহাজার বছরেরও বেশী অবিকৃত রয়েছে। আমরা যতদূর জানি, এদের কাল হল ভারতীয় মনীষার সেই মহান্ যুগ—গ্রীক্ প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে সমসাময়িক কিন্তু যার আরম্ভ আরও আগে—যার ভিত্তিতে দেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যে বর্ণিত সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের সময় আরো কত আগে নিয়ে যাওয়া যায় তা আমরা জানি না। কিন্তু যদি আমরা এই গ্রন্থ অত্যধিক প্রাচীন বলে মনে করি, কতগুলি বিচারের দ্বারা তা সমর্থিত হয়। অভ্রান্ত পাঠ—প্রত্যেক পদ্যাংশে নির্ভুল, উচ্চারণের প্রতিটি ঝোঁকে নির্ভুল—বৈদিক যাজ্ঞিকদের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। কারণ যথাযথ ভ্রান্তিহীনতার উপরে যজ্ঞের ফলবত্তা নির্ভর করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রাহ্মণে আমরা ত্বষ্টৃর কাহিনী পাই যিনি ইন্দ্র কর্তৃক নিহত তাঁর পুত্রের একজন প্রতিশোধ-গ্রহীতার জন্ম দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞ করার সময়ে উচ্চারণের ঝোঁকের একটি ভুল হওয়াতে ইন্দ্র-নিধনকারীর পরিবর্তে ইন্দ্র-বধ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয়দের স্মৃতিশক্তির বিস্ময়কর অভ্রান্ততাও বিখ্যাত। যেরকম প্রক্ষিপ্ত অংশ, পরিবর্তন ও আধুনিক রূপদায়ক সংশোধন কুরুদের প্রাচীন মহাকাব্যের স্থানে মহাভারতের বর্তমান রূপ স্থাপিত করেছে, বেদের পবিত্রতা সে সব নিবারণ করেছে। সুতরাং এ মোটেই অসম্ভব নয় যে ব্যাসের সংহিতা ঐ মহান্ মনীষী ও সংকলয়িতা যেভাবে সাজিয়েছিলেন, আমরা তার সার সেই ভাবেই পেয়েছি।

সারবস্তুই তিনি এভাবে সাজিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান লিখিতরূপে নয়। বৈদিক পদ্যের বাগবিধি ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের কাব্যের বাগবিধির থেকে নানাভাবেই ভিন্ন এবং তা বিশেষ করে যে-সন্ধি সাহিত্যিক সংস্কৃতের বিশিষ্ট অঙ্গ, অনেক স্বাধীনভাবে তার ব্যবহার করত। একটা জীবন্ত ভাষায় যা স্বাভাবিক, বৈদিক ঋষিরা বাঁধাধরা নিয়মের চেয়ে তাঁদের শ্রুতি-কেই বেশী অনুসরণ করতেন; কখনও কখনও তাঁরা বিভিন্ন শব্দের সন্ধি করতেন, কখনো তাদের অযুক্ত রেখে দিতেন। কিন্তু বেদ যখন লেখা হল,

সন্ধির নিয়ম তখন ভাষার ওপরে অনেক বেশী কঠোর প্রভাব বিস্তার করেছিল ও যতটা সম্ভব সূক্তগুলি তার নিয়মাবলী অনুসারে বৈয়াকরণদের দ্বারা লিখিত হয়েছিল। তাঁরা কিন্তু লিখিত সূক্তগুলির সঙ্গে পদপাঠ নামে আরেকটি পাঠ দিতে ভুলে যাননি, তাতে সব সন্ধিগুলিকে তাদের মূল ও বিভিন্ন শব্দে ভেঙ্গে দেখা হয়েছিল; সমাসের বিভিন্ন পদগুলিও উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ব্যবস্থার ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারত তার বদলে দেখি যে রচনাগুলিকে বৈদিক রাগবিধির মূল সুষমাগুলিতে সহজেই পরিণত করা যায়,—প্রাচীন স্মৃতিধরদের বিশ্বস্ততার প্রতি এ হল একটি উল্লেখ-যোগ্য গৌরবের বিষয়। পদপাঠের সঠিকতা বা তার সারবান সিদ্ধান্তে সন্দেহের স্বল্প।

আমাদের ভিত্তিরূপে তাহলে আমরা একটি রচনা-সংগ্রহ পেয়েছি যা আমরা আস্থার সঙ্গে স্বীকার করতে পারি ও যাতে কোন কোন ইউরোপীয় গ্রন্থের মত বিশৃঙ্খল আয়াসসাধ্য সংশোধনের প্রয়োজন হয় না, যদিও বা আমরা মনে করি যে কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঠ সন্দিগ্ধ ও দোষযুক্ত। এ হল একটি অমূল্য সুবিধা যার জন্য প্রাচীন ভারতীয় পাণ্ডিত্যের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই।

অন্য কোন কোন বিশেষ দিকে সবসময়ে পণ্ডিতদের ধারা নিঃসন্দেহে অনুসরণ করা নিরাপদ নাও হতে পারে,—যেমন যে-সব ক্ষেত্রে প্রাচীনতর ঐতিহ্য দৃঢ় ও নিশ্চিন্ত ছিল না, সেই সব ক্ষেত্রে বৈদিক সূক্তগুলিকে তাঁদের আপন আপন ঋষিদের নামে আরোপ করা। এসব খুঁটিনাটির গুরুত্ব বেশী নয়। আর আমার মতে মন্ত্রগুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের স্তবকগুলির যথাযথ ক্রমে ও সঠিক সম্পূর্ণতায় সাজানো হয়েছে, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই। যদি কোন ব্যতিক্রম থাকে সেগুলি সংখ্যায় ও গুরুত্বে উপেক্ষণীয়। সূক্তগুলি আমাদের কাছে অসংলগ্ন মনে হয় কারণ ঐগুলি আমরা বুঝি না। সূত্রটি একবার পাওয়া গেলে আমরা দেখতে পাই যে ঐগুলি হল নিখুঁতভাবে অখণ্ড ও সামঞ্জস্যপূর্ণ—চিন্তার গঠনের জন্য, যেমন ভাষা ও ছন্দের জন্য তেমনই প্রশংসনীয়।

যখন আমরা বেদ ব্যাখ্যার ব্যাপারে প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা যে কাজ করে গেছেন তার কাছ থেকে সাহায্য চাই, তখন আমরা অনেক বিষ-য়েই সবচেয়ে বেশী তুষ্ণীভাব গ্রহণ করতে বাধ্য বোধ করি। কারণ

পাণ্ডিত্যের প্রথম যুগেই বেদের যাজ্ঞিক ব্যাখ্যাই প্রাধান্য ছিল তখনই শব্দের মৌলিক অর্থ সূক্তের চরণ, পরোক্ষ উল্লেখ চিন্তার গঠনের সূত্র, এসব বহুকাল আগে থেকেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছিল; পণ্ডিতদের মধ্যেও সেই সম্বোধি বা আধ্যাত্মিক অনুভব ছিল না যা লুপ্ত রহস্যের কিছুটাও উদ্ধার করতে পারত। এইরকম ক্ষেত্রে বিদ্যাবত্তা হল, বিশেষতঃ যখন তার সঙ্গে একটি চতুর পণ্ডিতি মানস থাকে, দিসারী যত ফাঁদও তত।

আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সহায় যাস্কের নিরুক্ত, তার অতি বিভিন্ন মূল্যের দুটি উপাদানের মধ্যে আমাদের ভেদ করতে হয়। যাস্ক যখন একজন অভিধান করে হিসাবে প্রাচীন বৈদিক পদগুলির বিভিন্ন অর্থ দেন, তখন তাঁর প্রামাণিকতা মহান্ ও তিনি আমাদের যে সাহায্য দেন তার গুরুত্ব প্রথম শ্রেণীর। এ মনে হয় না যে তিনি সব প্রাচীন অর্থ জানতেন, কারণ কাল ও পরিবর্তনের দ্বারা বহু অর্থ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল ও একটি বিজ্ঞানসম্মত ভাষাতত্ত্বের অভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু ঐতিহ্য অনেক অর্থ রক্ষা করেছিল। যেখানে যেখানে যাস্ক বৈয়াকরণের চাতুর্য্যের উপযোগ না করে সেই ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন সেখানেই শব্দের যে অর্থ তিনি আরোপ করেছিলেন, তা যে পাঠের অর্থ বলে তিনি বলেছেন সর্বদা তাতে প্রযুক্ত না হলেও ভাষাতত্ত্বের দ্বারা তা সম্ভাব্য অর্থ হিসাবে স্বীকৃত হতে পারে। কিন্তু শব্দতাত্ত্বিক যাস্ক কোষাগার যাস্কের সমশ্রেণীতে নয়। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারাই নির্মিত হয়, কিন্তু সারবান ভাষাতত্ত্বের জন্য আমরা আধুনিক গবেষণার কাছে দায়ী। ইউ-রোপে বা ভারতে, উনিশ শতক পর্যন্ত পূর্বতন শব্দতাত্ত্বিকরা যে নিছক চাতুরীময় রীতি ব্যবহার করতেন আর কিছুই তার চেয়ে কল্পনাময় ও নিয়মবিহীন হতে পারে না। আর যাস্ক যখন ঐ পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করেন তখন আমরা তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নিতে বাধ্য হই। আর বিশেষ বিশেষ সূক্তের ব্যাখ্যায় পরবর্তীকালের সায়ণের বিদ্যাবত্তার চেয়ে তিনি অধিক বিশ্বাসজনক নন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক গ্রন্থের মধ্যে যাস্কের নিরুক্ত বেদবিষয়ক মৌলিক ও প্রাণবন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় সে যুগে আরম্ভ করেছিল বলে বলা যায়, সায়ণের ভাষ্যতার সমাপ্তি করে। অভিধানটা সংকলিত হয় ভারতীয় মানসের পূর্বতর উৎসাহ ও শক্তিতে যখন তা তার প্রাগ্-ঐতি-

হাসিক সম্পদগুলিকে মৌলিকতার একটি নূতন বিকাশের উপকরণ হিসাবে সংগ্রহ করেছিল ; মুসলমান বিজয়ের আঘাতে প্রাচীন সংস্কৃতি স্থানচ্যুত ও আঞ্চলিক অংশে বিভক্ত হয়ে যাবার আগে তার শেষ আশ্রয় ও কেন্দ্র দক্ষিণ ভারতে ক্ল্যাসিক্যাল ধারায় আমরা এইরকম যেসব গ্রন্থ পেয়েছি এই ভাষ্যটি তাদের মধ্যে প্রায় শেষ মহান্ গ্রন্থ। সেই সময় থেকে বলশালী ও মৌলিক কিন্তু সঙ্কীর্ণ প্রচেষ্টা, নবজন্মের ও নূতন সমন্বয়ের অনেক বিচ্ছিন্ন প্রযত্ন হয়েছে, কিন্তু এইরকম সাধারণ বিশাল ও প্রধান কর্ম প্রায় সম্ভব হয়নি।

অতীত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই মহান্ বস্তুটার আকর্ষক গুণাবলী সুস্পষ্ট। তাঁর সময়ে সবচেয়ে বিদ্বান পণ্ডিতদের সহায়তায় সায়ণের দ্বারা রচিত এই গ্রন্থ সেই সময়ে একজন মনীষী যতটা পরিশ্রম করতে পারতেন সম্ভবতঃ তার চেয়ে অধিক বিদ্যাবত্তার প্রযত্নের প্রতিনিধি, তবুও এর ওপরে একটি সমন্বয়কারী মনের ছাপ আছে। খুঁটিনাটিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হলেও গ্রন্থটি মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ, বিরাটভাবে কল্পিত কিন্তু যে ভঙ্গীতে রচিত তা প্রাঞ্জল, সংক্ষিপ্ত ও জোরালো ও এমন সাহিত্যিক সুষমাময় যা ভারতীয় ভাষ্যের চিরাচরিত রূপের মধ্যে প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কোথাও পণ্ডিতিপনা দেখান নেই, রচনার কঠিনতার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম-কৌশলে অবগুণ্ঠিত, এবং একটি আবেশ আছে স্বচ্ছ তীক্ষ্ণতার ও নিশ্চিত অথচ নম্র প্রামাণিকতার যা বিরুদ্ধ মতবাদীর ওপরেও। ইউরোপে প্রথম বৈদিক পণ্ডিতরা সায়ণের ব্যাখ্যার বিশেষ করে যৌক্তিকতারই সুখ্যাতি করেছিলেন।

তবুও বেদের বাহ্যিক অর্থের ক্ষেত্রেও অতিশয় তুষ্ণীভাব বিনা সায়ণের পদ্ধতি বা তার ফল অনুসরণ করা সম্ভব নয়, তিনি তাঁর পদ্ধতিতে ভাষার ও গঠনের অপ্রয়োজনীয় ও সময়ে সময়ে অবিশ্বাস্য উচ্ছৃঙ্খলতা স্বীকার করেছেন অথবা তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌছান, প্রায় সাধারণ বৈদিক শব্দের ও স্থিরীকৃত বৈদিক সংকেতের ব্যাখ্যায় আশ্চর্যজনক অসঙ্গতির দ্বারা শুধু তাই নয়। এসব খুঁটিনাটি দোষ যে উপকরণ নিয়ে তিনি কাজ করেছিলেন তাদের যে অবস্থায় তিনি পেয়েছিলেন তাতে বোধহয় অনিবার্য্য। কিন্তু সাধারণের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় দোষ এই যে তিনি সর্বদাই যজ্ঞীয় সংকেতের দ্বারা অবশিষ্ট ও ঐ সঙ্কীর্ণ ছাঁচে জোর করে বেদের অর্থকে ফেলে দেন। এইভাবে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের বাহ্যিক অর্থের জন্যও বহু মহান্ সামঞ্জস্যময়

ও প্রয়োজনীয় সূত্র হারিয়ে ফেলেন। বাহ্য অর্থের সমস্যাটিই আন্তর অর্থের মতই চিত্তাকর্ষক। ফল হয়েছে ঋষিদের তাঁদের চিন্তা সংস্কৃতি ও অবস্থার এত সঙ্কীর্ণ ও দারিদ্র্য নিপীড়িত এক ছবি যা স্বীকৃত হলে বেদের প্রতি প্রাচীন শ্রদ্ধা, তার পবিত্র প্রামাণিকতার দিব্য যথা বুদ্ধির কাছে অবোধ্য হয়ে পড়ে ও স্থূল এক ভ্রান্ত থেকে আবদ্ধ একটি অন্ধ ও নিঃসন্দেহ শ্রদ্ধার ঐতিহ্য হিসাবেই শুধু ব্যাখ্যাত হতে পারে।

অবশ্য ভাষ্যটিতে অন্য দিক ও উপাদান আছে, কিন্তু সেগুলি প্রধান ভাবের অধীন বা অঙ্গ। সারণ তাঁর সহায়কদের অতীতের অবশেষ ও প্রায় পরস্পরবিরোধী জল্পনা ও ঐতিহ্যের এক বিশাল রাশি নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল। তার কয়েকটি বস্তুকে তাঁদের স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল, অন্য কয়েকটিকে তাঁরা নগণ্য দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ সম্ভব যে তাঁর গ্রন্থের মহান্ ও বহুকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রামাণিকতার কারণ তাঁর পূর্বতন অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলা থেকে একটি দৃঢ় আকার ও সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা গড়ে তোলার কুশলতা।

প্রথম সে উপকরণ নিয়ে সায়ণকে কাজ করতে হয়েছিল। তার যা আমাদের কাছে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক তা হল শ্রুতির প্রাচীন আধ্যাত্মিক, দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসমূহের,—তার পাঠ ও তার ভিত্তির অবশেষ। এগুলি যতটা পর্যন্ত প্রচলিত বা গোঁড়া[১] মতবাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, সায়ণ ততটা তাদের স্বীকার করেছেন; কিন্তু এগুলি তাঁর গ্রন্থে ব্যতিক্রম তাদের পরিমাণ ও উপযোগিতার নগণ্য। কখনও কখনও তিনি কম প্রচলিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উল্লেখ মাত্র করেছেন বা কিছুটা স্বীকার করে-ছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু স্বীকার করেননি। যে মানুষের কাছ থেকে তাঁর কামনার ফল ও তার আস্পৃহাকে বিষয়কে আটকে রাখে, তার একটি প্রাচীনতর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু স্বীকার করবার জন্যে নয়। সায়ণের কাছে বৃত্র হল শত্রু বা জড় মেঘ দৈত্য যে বারিরাশি আটকে রাখে ও বৃষ্টিদাতাকে যাকে বিদ্ধ করতে হয়।

১: আমি শব্দটি ঢিলেভাবে ব্যবহার করছি। ইউরোপীয় বা সাম্প্রদায়িক অর্থে গোঁড়া বা গোঁড়ামির বিরোধী এই শব্দগুলির ভারতবর্ষে কোন প্রয়োগ নেই। ভারতে চিন্তা ও মতবাদ সব সময়ে মুক্ত।

দ্বিতীয় উপাদান হল রূপক কাহিনী বা যাকে প্রায় পৌরাণিক বলা যায়---যে গূঢ়তর অর্থ ও প্রতীকী ঘটন সমস্ত পুরাণের ন্যায্যতার প্রতিপাদক---তাকে বাদ দিয়ে দেবতাদের শুধু বাহ্যিক আকারে রূপায়িত করে এমন কাহিনী[১]।

তৃতীয় উপাদান হল রূপকথামূলক ও ঐতিহাসিক, প্রাচীন স্থপতি ও ঋষিদের কাহিনী, যা বেদের অপ্রসিদ্ধ উল্লেখগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য ব্রাহ্মণ বা পরবর্তী ঐতিহ্যের দ্বারা রচিত হয়েছিল। বেদের অপ্রসিদ্ধ উল্লেখগুলি ব্যাখ্যা করার জন্য সায়ণ এই উপাদানটি দ্বিধার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। প্রায়শঃই তিনি এগুলিকে মন্ত্রগুলির প্রকৃত ব্যাখ্যা বলে স্বীকার করেছেন, কখনও কখনও তিনি আর একটি অর্থ দিয়েছেন যেটির সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিগত বেশী সহানুভূতি ছিল কিন্তু তিনি এদুটির মধ্যে দোদুল্যমান।

আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ হ'ল নৈসর্গিক ব্যাখ্যা। শুধু যে স্পষ্ট প্রতীয়মান বা চিরাচরিত সনাক্তকরণ আছে তাই নয়। ইন্দ্র, মরুৎ, ত্রিবৃৎ অগ্নি, সূর্য্য, ঊষা---কিন্তু আমরা দেখি মিত্রকে দিনের সঙ্গে, বরুণকে রাত্রির সঙ্গে, আর্যমান ও ভগকে সূর্যের সঙ্গে, বিভুদের রবির কিরণের সঙ্গে একতা স্থাপন করা হয়েছে। আমরা এখানে দেখতে পাই বেদের জড় ও বাহ্য প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার বীজ যাকে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য কত অধিক বিস্তারিত করে। প্রাচীন পণ্ডিতরা তাদের তুলনায় একই রকম স্বাধীনতার বা তাঁদের জল্পনায় একই প্রকার সুসঙ্গত খুঁটিনাটির উপযোগ করেননি, তথাপি সায়ণের ব্যাখ্যার এই দিকটিই বাস্তবিক ইউরোপীয় তুলনামূলক মাইথলজির জন্মদাতা। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধারণাটিই ব্যাপক; ঐটাই মূল সুর যার মধ্যে আর সব সুর হারিয়ে যায়। দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মতে সূক্তগুলি জ্ঞানের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য হয়েও প্রধানতঃ ও মূলতঃ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বদ্ধতনার ক্রিয়া বলতে প্রধানতঃ বৈদিক যজ্ঞের আনুষ্ঠানিক সম্পাদনই বোঝাত। সায়ণ সর্বদাই এই প্রত্যয়ের আলোতেই কাজ করেছেন। এই ছাঁচে ফেলে তিনি বৈদিক ভাষার রূপ দিয়েছেন---পুরোহিত, দাতা, ঐশ্বর্য, স্তুতি, উপাসনা, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ এইরকম বিশিষ্ট শব্দগুলিকে যাজ্ঞিক

১ঃ একথা মনে করার কারণ আছে যে পুরাণ ও মহাকাব্যগুলির বর্তমান রূপ বিকশিত হবার আগে পুরাণ (কাহিনী) ও ইতিহাস (বাস্তবিক ইতিকথার ঐতিহ্য) বৈদিক সর্বোকৃতির অংশ ছিল।

উদ্দেশ্যে পরিণত করে। ঐশ্বর্য ও অন্ন---কারণ যজ্ঞের লক্ষ্য হিসাবে সর্বাপেক্ষা স্বার্থযুক্ত ও জড়ীয় বস্তুসমূহ উল্লিখিত হয়েছে বীর্যশক্তি, সন্তান, সেবক, স্বর্ণ, অশ্ব, গো, বিজয়, শত্রুগণের হত্যা ও লুণ্ঠন প্রতিদ্বন্দ্বী ও অমঙ্গল প্রার্থী সমালোচকের বিনাশ। এইরূপে ব্যাখ্যাত সূক্তের পর সূক্ত পড়লে বোঝা যায় গীতার মধ্যে আপাত প্রতীয়মান অসঙ্গতিটি---গীতা সর্বদাই বেদকে দিব্যজ্ঞান বলে গণ্য করেও নিছক বেদবাদের সমর্থকদের তীব্র নিন্দা করেছে---তাদের পুষ্পিত বাক্য শুধুই ইহলৌকিক ঐশ্বর্য, শক্তি ও ভোগশ্লিষ্ট ছিল। বেদের সকল সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে এই নিম্নতম ব্যাখ্যার প্রতি বেদের এই চরম ও প্রামাণিক বন্ধনই সায়ণের ভাষ্যের ফল। যজ্ঞীয় ব্যাখ্যার এই প্রাধান্য ভারতবর্ষকে তার সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের জীবন্ত উপযোগ থেকে ও উপনিষদের সম্পূর্ণ অর্থের সূত্র থেকে বঞ্চিত করেছে। সায়ণের ভাষ্যটি প্রাচীন ভুল বোঝার ওপরে শেষ সিদ্ধান্তের মোহর দিয়েছিল যা বহু শতাব্দীতেও ভাঙ্গা সম্ভব হয়নি। ও যখন অন্য একটি সংস্কৃতি বেদপাঠে নিযুক্ত হল তখন ঐ ভাষ্যের ব্যঞ্জনাগুলি ইউ-রোপীয় মনে নূতন ভ্রান্তি সৃষ্টি করল। যদিও সায়ণের ভাষ্য বেদের আভ্য-ন্তর তাৎপর্যের ওপর দুটি তালা দিয়ে চাবি লাগিয়ে দিয়েছে, তবুও বৈদিক বিদ্যাবত্তার পাশের প্রকোষ্ঠগুলি উন্মুক্ত করার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। ইউরোপীয় পাণ্ডিত্যের বিপুল শ্রম তার উপযোগিতাকে স্থানচ্যুত করতে পারেনি। প্রত্যেক পদে এর মত অস্বীকার করতে আমরা বাধ্য হই. কিন্তু প্রত্যেক পদে এটা ব্যবহার করতে আমরা বাধ্য হই। এ হল একটি আবশ্যকীয় ঝাঁপ-পৈঠা অথবা একটি সিঁড়ি যা আমাদের ব্যবহার করতেই হয় বেদের মধ্যে প্রবেশ করার জন্য, যদিও এটাকে পিছনে ফেলে যেতেই হবে তবুও আমরা গভীর প্রদেশের মধ্যে এগিয়ে যেতে চাই।

তৃতীয় অধ্যায়

আধুনিক মতবাদ

সায়ণ যজ্ঞমূলক ব্যাখ্যার ওপরে চরম প্রামাণিকতার যে-মুদ্রা অঙ্কিত করেছিলেন, একটি বিদেশী সংস্কৃতির কৌতূহল বহু শতাব্দী পরে সেটি ভেঙ্গে ফেললো। এমন এক পাণ্ডিত্যের কাছে প্রাচীন শাস্ত্রটি ধরে দেওয়া হল যা জল্পনায় দুঃসাহসিক, কাল্পনিক উদ্ভাবনে দক্ষ, নিজের বোধ অনুসারে বিবেকবান, কিন্তু প্রাচীন মরমী কবিদের প্রণালী বুঝতে অপটু, কারণ ঐ পাণ্ডিত্য প্রাচীন মেজাজের প্রতি সহানুভূতিহীন, আপন মানসিক বা আধ্যাত্মিক পরিবেশে বৈদিক আলেখ্য ও রূপক কাহিনীতে যে-চিন্তারাজি লুকিয়ে আছে তাদের ব্যাখ্যার সূত্রবিহীন। এর ফল হয়েছে দু'রকম—একদিকে বৈদিক ব্যাখ্যার সমস্যাগুলির এক অধিকতর পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সতর্ক এবং স্বাধীনতর আলোচনার প্রারম্ভ; অন্যদিকে এদের আপাতঃ প্রতীয়মান ভৌতিক অর্থের চরম অতিরঞ্জন ও তার প্রকৃত ও আভ্যন্তর রহস্যের অস্পষ্টতাসাধন।

জল্পনার বলিষ্ঠতা ও আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের স্বাধীনতা সত্ত্বেও ইউরোপের বেদবিষয়ক পাণ্ডিত্য বরাবরই সায়ণের ভাষ্যে সুরক্ষিত ঐতিহ্যিক উপকরণের ওপরেই নিজেকে গড়ে তুলেছে ও সমস্যাটির কোন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিচার করার প্রচেষ্টা করেনি। সায়ণে ও ব্রাহ্মণগুলিতে যা খুঁজে পেয়েছেন তাই আধুনিক মতের ও জ্ঞানের আলোকে আরো বিকশিত করেছে; ভাষাবিজ্ঞান, মাইথলজি ও ইতিহাসে প্রযুক্ত তুলনামূলক পদ্ধতির থেকে উদ্ভাবনাত্মক অনুমানের দ্বারা, উন্মেষশালিনী জল্পনার সাহায্যে বিদ্যমান উপকরণের বিশাল বিস্তৃতি ক'রে ও বিক্ষিপ্ত কিন্তু প্রাপ্তব্য সংকেতসমূহকে একসঙ্গে মিলিয়ে ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য বৈদিক মাইথলজি, বৈদিক ইতিহাস ও বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ মতবাদ গড়ে তুলেছে যা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের দ্বারা মুগ্ধ করে ও তার আপাতঃপ্রতীয়মান নিশ্চয়তার এই প্রভাবজনক প্রাসাদটি যে প্রধানতঃ জল্পনার বালুর ওপরে নির্মিত, সেই তথ্যটি লুকিয়ে রাখে। আধুনিক মতবাদটি বেদের সম্বন্ধে এই প্রত্যয় থেকে—যার জন্য সায়ণ দায়ী—আরম্ভ হয় যে তা হল একটা

প্রাচীন আদিম ও বহুলাংশে বর্বর সমাজে উপাসনা গাথা, সেই সমাজের নৈতিক ও ধার্মিক চিন্তার ও অসংস্কৃত, সামাজিক গঠন ও অমার্জিত ও তার পারিপার্শ্বিক বিশ্ব সম্বন্ধে তার দৃষ্টিকোণ শিশুসুলভ। যে অনুষ্ঠান-ব্যবস্থাকে সায়ণ এক দিব্যজ্ঞানের অংশরূপে ও রহস্যময়ভাবে ফলপ্রসূরূপে স্বীকার করেছিলেন, ইউরোপীয় বিদ্বত্তা গ্রহণ করল কাল্পনিক অতিমানবীয় ব্যক্তিদের প্রতি নিবেদিত তুষ্টিজনক যজ্ঞের তন্ত্ররূপে। সেই দেবতারা তাঁদের উপাসনা করলে বা অবহেলা করলে কল্যাণকারী বা অমঙ্গলকারী হতে পারতেন। ঐ বর্বর জাতিগুলির আদিম ইতিবৃত্ত, আচার ও প্রতিষ্ঠান-সমূহের সূত্রের অনুসন্ধানের ক্রমে বিকশিত, সূক্তে বর্তমান অস্পষ্ট উল্লেখিত বিষয়ের নতুন পাঠ ও নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা সায়ণ-স্বীকৃত অঙ্গটি অচিরেই গৃহীত ও বিস্তারিত হল। প্রাকৃতিক উপকরণটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করল। বৈদিক দেবতাদের বাহ্যিক দিকে কয়েকটি বিশেষ প্রাকৃত শক্তির সঙ্গে স্পষ্টভাবে ঐক্যসাধন আর্য মাইথলজিগুলির তুলনা-মূলক আলোচনার উৎসরূপে ব্যবহৃত হল। কয়েকটি কর্মপ্রধান দেবতা-দের সূর্যের শক্তিরূপে সসঙ্কোচ সনাক্তকরণ আদিম 'মিথ'-রচনার রীতির সূত্ররূপে গৃহীত হ'ল এবং তুলনামূলক মাইথলজির বিরাট সূর্য-মিথ ও তারকা-মিথ প্রতিষ্ঠিত হল। এই নূতন আলোতে বৈদিক স্তোত্রগুলি প্রকৃতির অর্দ্ধ-কুসংস্কারময়, অর্দ্ধ-কবিত্বময় রূপক ব'লে, যার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাখ্যাত হয়েছে। অবশিষ্ট অংশ হ'ল কিছুটা সমসাময়িক ইতিহাস, কিছুটা যাজ্ঞিক অনুষ্ঠানের সূত্র ও আচার, রহস্যময় নয়; কিন্তু শুধুই আদিম ও কুসংস্কারপূর্ণ।

আদিম মানুষের সংস্কৃতির ও সম্প্রতি-অসভ্য অবস্থা থেকে উদ্ভবের অবৈজ্ঞানিক মতবাদগুলি সমস্ত ঊনিশ শতকে জনপ্রিয় ছিল ও এখনও প্রভাবসম্পন্ন, তাদের সঙ্গে এই ব্যাখ্যাটির সম্পূর্ণ সঙ্গতি আছে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের প্রসার এই প্রথম ও ক্ষিপ্র, ব্যাপক সিদ্ধান্তকে লক্ষ্যণীয় ভাবে নাড়া দিয়েছে। আমরা এখন জানি যে অনেক হাজার বছর আগে চীন, মিশর, কলডীয়া, এসিরিয়াতে আশ্চর্য সব সভ্যতা ছিল। গ্রীস ও ভারত, এশিয়া মেডিটেরেনিয়ান এলাকার জাতিগুলির সাধারণ উন্নত সংস্কৃতির ব্যতিক্রম ছিল না, তাও এখন সকলের দ্বারা স্বীকৃত হতে আরম্ভ করেছে। বৈদিক ভারতীয়রা যদি এই সংশোধিত জ্ঞানের ফলে কোন উপকার না পায়, তার কারণ হ'ল ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য যে মতবাদ থেকে

আরম্ভ হয়েছিল, তার উদ্বর্তন,—তা হল এই যে বৈদিক ভারতীয়রা ছিলেন তথাকথিত আর্যজাতির অন্তর্গত ও হোমরীয় কাব্যে, প্রাচীন নর-ওয়ের গদ্য কাহিনীতে, গল ও টিউটনের রোমক বিবরণে বর্ণিত আর্য গ্রীক, কেল্ট ও জার্মানদের সংস্কৃতির সমান স্তরে পৌছেছিলেন। এর থেকেই এই মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল যে এই আর্য জাতিরা ছিলেন উত্তরের বর্বর ও তাঁরা তাদের হিমতর দেশ থেকে মেডিটেরেনিয়ন অঞ্চলের ইউরোপে ও দ্রাবিড় ভারতের প্রাচীন সমৃদ্ধ সভ্যতাগুলির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন।

এদের মধ্যে যেসব ইঙ্গিতের ওপর ভিত্তি ক'রে আর্যদের সাম্প্রতিক আগমনের মতবাদটি গড়ে উঠেছিল, তাদের পরিমাণ খুব অল্প ও মর্মার্থ অনিশ্চিত। ঐরূপ আগমনের বাস্তবিক কোন উল্লেখ নেই। আর্য ও অনার্যের যে ভেদের ওপর কতকিছু গড়ে তোলা হয়েছে, সাক্ষ্যরাশির থেকে তা জাতিগত নয় বরং সাংস্কৃতিক[১] বলে মনে হয়। বেদের ভাষা এক নির্দিষ্ট উপাসনা বা আধ্যাত্মিক সাধনাকে আর্যের বিশিষ্ট লক্ষণরূপে নির্দেশিত করে, জ্যোতির শক্তিবর্গের উপাসনার ও "সত্যের" সাধনার ভিত্তিতে আত্মসংযম ও অমরত্বের, ঋতম্ ও অমৃতম, আস্পৃহা, এর উপরেই তা আশ্রিত ছিল। জাতিগত ভেদের কোন নির্ভরযোগ্য সূচনা নেই। বর্ত্তমানে ভারতবাসী জাতিদের অধিকাংশই আরো উত্তর অক্ষ থেকে এমনকি শ্রীযুক্ত তিলক যেমন বিচার করেছেন, উত্তর মেরু থেকে আগত এক নূতন জাতির বংশধর, তা সর্বদাই সম্ভব হতে পারে; কিন্তু বেদে এমন কিছু নেই, যেমন নেই এদেশের বর্তমান জাতিগত আকৃতিতে,[২] যা প্রমাণ করে এই অবতরণ বৈদিক সূক্তগুলির কাছাকাছি সময়ে ঘটেছিল বা তা ছিল সভ্য দ্রাবিড় উপত্যকায় একটি গৌরবর্ণ মুষ্টিমেয় বর্বরদের ধীর প্রকাশ।

১: বলা হয় যে শ্বেতাঙ্গ ও উন্নতনাসা আর্যদের তুলনায় দস্যুরা কৃষ্ণবর্ণ ও নাসিকা-হীনরূপে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু প্রথম পার্থক্যটি নিশ্চয়ই যথাক্রমে আলো ও তমসা অর্থে আর্য দেবতা ও দাসশক্তিদের প্রতি প্রযুক্ত, আর অনাস শব্দটির মানে নাসিকাবিহীন নয়। যদিও তা হ'ত, তবুও দ্রাবিড় জাতিগুলির প্রতি তা একেবারেই প্রযুক্ত হতে পারে না; কারণ দাক্ষিণাত্যের নাসিকা উত্তরাখণ্ডের হস্তিশুণ্ড সম যে কোন "আর্য" নাসার মতই উৎকৃষ্ট।

২: ভারতে আমরা পুরাণো শব্দতত্ত্বের ভিত্তির ওপরে গড়া ভেদের সঙ্গে ও ঐসব প্রাচীনতর সাধারণ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জল্পনার সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু এক উন্নততর জাতিবিজ্ঞান জাতিগত সমস্ত নিরীক্ষাই অস্বীকার করে ও সমগ্র ভারত উপদ্বীপে একটি সমপ্রকৃতি জাতি বাস করে এই ধারণার দিকেই তার ঝোঁক।

যে উপাদান আমাদের আছে তার থেকে এ স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না যে আদি সংস্কৃতিগুলি,—যদি ধরে নেওয়া হয় যে কেল্ট, টিউটন, গ্রীক্ ও ভারতীয়, এগুলি একটি সাধারণ মূল সংস্কৃতির প্রতিনিধি,—বাস্তবিকই অবিকশিত ও বর্বর ছিল। তাদের বাহ্যিক জীবনে ও তার ব্যবস্থায় একটি সবিশেষ শুদ্ধ ও মহৎ সরলতা, তাদের পূজিত দেবতাদের বিষয়ে ধারণা ও তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধে একটা বিশেষ বাস্তবিকতা, ও স্বচ্ছ মানবিক নৈকট্য আর্য্য সংস্কৃতিগুলিকে আরও আড়ম্বরপূর্ণ ও জড়বাদী মিশরীয়, কলডীয় সভ্যতা থেকে ও তার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ও গুহ্য ধর্ম থেকে ভিন্ন করে। কিন্তু ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি মহৎ আন্তর সংস্কৃতির বিরোধী নয়। বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রেই এগুলিতে একটি মহান্ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় যা সাধারণ মতবাদকে খণ্ডন করে। প্রাচীন কেল্ট জাতিরা কয়েকটি উচ্চতম দার্শনিক প্রত্যয়ের অধিকারী ছিল। আজও তারা একটি মরমী ও সম্বোধির বিকাশের ফলে তার চিহ্ন বহন করছে—তা যখন এত স্থায়ী ফল উৎপন্ন করেছে তখন নিশ্চয়ই বহুকালব্যাপী ও অতিশয় বিকশিত ছিল। এ খুবই সম্ভব যে গ্রীসে হেলেনীয় নমুনাটি অর্ফিয় ও ইলিউসীয় প্রভাবের দ্বারা একইভাবে গঠিত হয়েছিল ও গ্রীক্ রূপক-কাহিনী আমাদের কাছে যেভাবে এসেছে—সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় ভরা,—তা অর্ফিয় শিক্ষার দান। যদি প্রমাণিত হয় যে বৈদিক পূর্বপুরুষরা আমাদের মধ্যে যেসব প্রবণতা ও ধারণা বপন করেছিলেন, ভারতীয় সভ্যতা সে সকলেরই বিস্তৃতি, তাহলে তা সাধারণ ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এইসব প্রাচীন সংস্কৃতির, যা এখনও আমাদের পক্ষে আধুনিক মানুষের প্রমুখ শ্রেণী, তার মানসের, প্রধান উপাদান, তার চিন্তা, শিল্প ও ধর্মের প্রধান প্রবণতা নির্দিষ্ট করে,—অসাধারণ প্রাণবত্তা কোন মতেই কোন আদিম বর্বরতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে না। ঐগুলি একটি গভীর ও শক্তিশালী প্রাগৈতিহাসিক বিকাশের ফল।

তুলনামূলক রূপককাহিনী-বিজ্ঞান মানুষের অগ্রগতির এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থাটিকে অবহেলা ক'রে তার ঐতিহ্যের তাৎপর্য বিকৃত করেছে। তা তার ব্যাখ্যার ভিত্তি করেছে সেই মতবাদকে যা আদিম বর্বর ও প্লেটো বা উপনিষদের মধ্যে আর কিছুই লক্ষ্য করেনি। ঐ মতটি ধরে নিয়েছে যে উষা, রাত্রি ও সূর্যের মত আশ্চর্যজনক ব্যাপার সম্বন্ধে সহসা সচেতন ও স্থূল বর্বর ও কাল্পনিক উপায়ে তাদের ব্যাখ্যা করতে সচেষ্ট অসভ্যদের

আশ্চর্যবোধের ভিত্তির উপরেই প্রাচীন ধর্মগুলি গঠিত। আর শিশুসুলভ আশ্চর্য-বোধ থেকে আমরা এক লাফেই গ্রীক্ দার্শনিকদের ও বৈদান্তিক মুনিদের গভীর মতবাদসমূহে পৌছে যাই। তুলনামূলক রূপককাহিনী-বিজ্ঞান হল অ-হেলেনীয় উপাদানকে গ্রীকমানসের ও ভুল বোঝার ভিত্তির ওপর গঠিত দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যারত হেলেনীয় সংস্কৃতি-গবেষকদের সৃষ্টি। ধৈর্যপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার চেয়ে কবির কল্পনার উদ্ভাবনী লীলা হল এর পদ্ধতি। আমরা যদি এই পদ্ধতির ফল নিরীক্ষা করি তাহলে দেখতে পাই আলেখ্যের ও তাদের ব্যাখ্যায় এক অসাধারণ বিশৃঙ্খলা যাতে কোনই সঙ্গতি বা পারম্পর্য নেই। তাতে আছে একরাশ খুঁটিনাটি, যেগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটির সঙ্গে মিশ্রিত, বিশৃঙ্খলভাবে একে অন্যের পথে বাধক, পরস্পরবিরোধী অথচ বিজড়িত, ও তাদের প্রামাণ্যের জন্যে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায় হিসাবে কাল্পনিক জল্পনার উপর নির্ভরশীল। ঐ অসঙ্গতি সত্যের মানদণ্ডের পদে উন্নীত করা হয়েছে; কেননা খ্যাতনামা পণ্ডিতরা এই বিচার করেছেন যে আরও যুক্তিসঙ্গত ও সুশৃঙ্খল সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে এইরকম একটি পদ্ধতি তার সঙ্গতি বশতঃই অপ্রমাণিত ও অশ্রদ্ধেয় বলে গণ্য হবে, কারণ ধরেই নিতে হবে যে বিশৃঙ্খলাই প্রাথমিক রূপককাহিনী রচনার শক্তি'র সারমর্ম। কিন্তু তাহলে তুলনাত্মক রূপক-কাহিনী-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে অবশ্য স্বীকার্য্য কিছু থাকে না এবং যে কোন একটি মতবাদ আর একটির মতনই উপাদেয় হবে; কারণ অসঙ্গতির একটি বিশেষ সমষ্টি ভিন্নভাবে গঠিত আর একটি অসঙ্গতির চেয়ে বেশী সত্য, এর কোনই যুক্তি নেই।

তুলনামূলক রূপককাহিনী-বিজ্ঞানের জল্পনায় অনেক কিছুরই উপযোগিতা আছে; কিন্তু যাতে তার অধিকাংশ সিদ্ধান্তই সারবান ও গ্রহণযোগ্য হয় তার জন্যে তাকে আরও ধৈর্যশালী ও সঙ্গতিপূর্ণ প্রণালী ব্যবহার করতে হবে ও তাকে একটি সুদৃঢ়ভিত্তিক ধর্মবিজ্ঞানের অংশ রূপে গঠন করা প্রয়োজন। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে প্রাচীন ধর্মগুলি ও যেসকল ধারণার ওপর আমাদের আধুনিক বিশ্বাসমূলক মতবাদের ব্যবস্থাগুলি গঠিত, প্রাচীন ধর্মগুলি অন্ততঃ সেইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ প্রতীতির ভিত্তির ওপর রচিত ছিল। এও স্বীকার করতে হবে পূর্বতর ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক মতবাদগুলির ব্যবস্থা থেকে উত্তরকালীন ধর্মবিশ্বাস ও দার্শনিক মতবাদের ব্যবস্থার দিকে একটি সম্পূর্ণ বোধগম্য প্রগতিশীল ক্রমবিকাশ হয়েছে।

আমাদের উপাদানগুলির ব্যাপক ও গভীর আলোচনা করে ও মানুষের চিন্তা ও প্রতীতির বাস্তবিক ক্রমবিকাশ আবিষ্কার ক'রে আমরা প্রকৃত জ্ঞান পাব। শুধু গ্রীক ও সংস্কৃত নামের এককীকরণের দ্বারা, হেরক্ল-এর চিতা অস্তগামী সূর্যের রূপক, বা প্যারিস ও হেলেন বৈদিক সরমা ও পণিদের বিকৃতি, এই চাতুর্যপূর্ণ আবিষ্কার কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে মনোরম চিত্তবিনোদন হতে পারে, কিন্তু ঠিক ব'লে প্রমাণিত হলেও শুধু সেগুলিই কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে না। তাদের যাথার্থ্য ও সন্দেহাতীত নয়, কারণ যে-আংশিক ও কাল্পনিক পদ্ধতি দ্বারা সূর্য্য ও নক্ষত্র সম্বন্ধীয় রূপক গঠিত হয়, তার দোষ হ'ল এই যে তা একইরকম ও প্রত্যয়জনক ভাবে যে-কোনও মানবীয় ঐতিহ্য, বিশ্বাস, এমনকি বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। এই প্রণালী অনুসরণ ক'রে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরা কোথাও কোন সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছি বা আমরা উদ্ভাবনী দক্ষতার কথাই শুনছি।

তুলনামূলক শব্দতত্ত্বের থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ঐ বিজ্ঞানের বর্তমান অবস্থায় কোন সিদ্ধান্ত হবার আশা কম। ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে যা ছিল, এখন আধুনিক শব্দতত্ত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী অগ্রসর। নিছক উদ্ভট কল্পনার স্থানে তা একটা শৃঙ্খলার ভাব ও পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে, আমাদের দিয়েছে ভাষার অঙ্গ-সংস্থান সম্বন্ধে ও শব্দ-প্রকরণে কি সম্ভব বা কি সম্ভব নয়, তার সম্বন্ধে আরও যথার্থ ধারণা। ভাষার ক্ষয়ের নিয়ামক কয়েকটি নীতি স্থাপিত করেছে; সেই নিয়মগুলি ভিন্ন কিন্তু সদৃশ ভাষাসমূহের পরিবর্তনে প্রতীয়মান একই শব্দের বা পরস্পর-সম্পর্কিত শব্দরাশির একীকরণে সাহায্য করে। এখানেই কিন্তু এর সব কৃতিত্ব শেষ। এর জন্মের সময়ে যেসব উচ্চ আশা পোষণ করা হয়েছিল, এর পরিণত অবস্থায়ও সেগুলি পূর্ণ হয়নি। তুলনামূলক শব্দতত্ত্ব কোন ভাষাবিজ্ঞান স্থাপিত করতে পারেনি এবং একজন শব্দতাত্ত্বিক কয়েক দশক ধরে আন্তরিক শ্রমের পরে ঐ বিজ্ঞানের যে সকুণ্ঠ বর্ণনা দিয়েছিলেন, যেন তিনি ক্ষমা চাইছেন। আমরাও তা প্রয়োগ করতে বাধ্য—তিনি তাঁর প্রিয় গবেষণাগুলি "আমাদের জল্পনামূলক নগণ্য বিজ্ঞান" বলতে বাধ্য বোধ করেছিলেন। কিন্তু জল্পনামূলক বিজ্ঞান বিজ্ঞানই নয়। সুতরাং আরও নিশ্চিত ও যথাযথ বিদ্যা অনুসরণকারীরা তুলনামূলক শব্দতত্ত্বকে আদৌ ঐ নাম দিতে অস্বীকার করেন ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্ভাবনাই নাকচ

করেন।

বস্তুতঃ শব্দতত্ত্বের প্রাপ্ত সিদ্ধান্তসমূহের এখনও কোন প্রকৃত নিশ্চয়তা নেই; কারণ যে দু'একটি নীতির সীমিত প্রয়োগ হয়েছে, সেগুলি ছাড়া তার আর কোনও নির্ভরযোগ্য ভিত্তি নেই। ইতিপূর্বে আমাদের সকলেরই এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিল যে বরুণ ও গ্রীক্‌দের স্বর্গ উরানস একই; এখন এই একীকরণ একটি শব্দতাত্ত্বিক ভ্রান্তি বলে নিন্দিত; আগামীকাল আবার তা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। 'পরমে ব্যোমন্‌' হ'ল একটি বৈদিক বাক্যাংশ আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই যার অনুবাদ করবেন "উচ্চতম স্বর্গে"; কিন্তু শ্রী টি. পরমশিব আইয়ার তাঁর বুদ্ধি-উজ্জ্বল ও আশ্চর্য্যজনক বই "ঋক্‌-সমূহ"তে বলেছেন যে ঐ বাক্যাংশের মানে হ'ল 'নিম্নতম গহ্বরে', কারণ "ব্যোমন্‌" মানে বিভাগ, ফাটল, আক্ষরিক অর্থে রক্ষার অভাব ("উমা"); এবং তিনি যে যুক্তির প্রয়োগ করেছেন তা আধুনিক পণ্ডিতদের রীতির এতই সম্পূর্ণ অনুগামী যে "রক্ষার অভাব"-এর মানে যে ফাটল হতে পারে না ও মানুষের ভাষা ঐসব নীতির ভিত্তির ওপরে গড়ে ওঠেনি। শব্দতাত্ত্বিক এই উত্তর দেওয়া থেকে নিবারিত হন। কেননা যেসব নীতির ওপর ভাষা গড়া হয়েছিল বা সুসঙ্গতভাবে বিকশিত হয়েছিল। শব্দবিজ্ঞান সেগুলি করতে পারেনি, এবং অন্যদিকে তা নিছক উদ্ভট কল্পনা ও শক্তির পুরানো ভাব এখনও রক্ষা করেছে ও বাস্তবিকই ঐ একই প্রকার বিপজ্জনক অনুমানের দীপ্তিতে পূর্ণ। কিন্তু তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে বেদে 'পরমে ব্যোমন্‌' উচ্চতম স্বর্গ না নিম্নতম গহ্বর সূচিত করে, তা নির্ণয় করতে কিছুই আমাদের সাহায্য করে না। একথা স্পষ্ট যে এতটা দোষপূর্ণ শব্দবিজ্ঞান বুদ্ধি-উজ্জ্বল সহায় হতে পারে কিন্তু কখনই বেদের অর্থের দিশারী হতে পারে না।

আমাদের এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে বস্তুতঃ ইউরোপীয় পণ্ডিতরা বেদের সম্বন্ধে যে গবেষণা করেছেন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক থাকায় সাধারণ লোকের মনে তা অতিরিক্ত মর্য্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু সত্য হল এই যে সতর্ক, যথাযথ ও নিশ্চিত প্রাকৃত বিজ্ঞান-গুলির ও পাণ্ডিত্যের এইসব অন্যতর উজ্জ্বল কিন্তু অর্বাচীন শাখাগুলির মধ্যে বিরাট প্রভেদ আছে। প্রাকৃত বিজ্ঞানগুলি তাদের ভিত্তি সম্বন্ধে সজাগ। তাদের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি ধৈর্যের সঙ্গে গঠিত, ও তাদের উপসংহার সারবান; অন্যগুলি অতি অল্প উপকরণের ভিত্তিতে বিশাল ও ব্যাপক

মতবাদ ও জল্পনা ও প্রকল্পের আতিশয্যের দ্বারা নিশ্চিত ইঙ্গিতের দীনতা পূরণ করতে বাধ্য হয়। এগুলির প্রারম্ভ খুব চমৎকার কিন্তু কোন নিরাপদ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে না। এরা হ'ল বিজ্ঞানের পক্ষে প্রাথমিক অমার্জিত ভারা ; কিন্তু বাস্তবিক এখনও বিজ্ঞান হয়ে ওঠেনি।

এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে বেদের ব্যাখ্যার সমস্ত সমস্যাটাই এখনও এক উন্মুক্ত ক্ষেত্র রয়ে গেছে যাতে সমস্যাটির ওপরে আলোকপাত করতে পারে এমন যে কোন অবদানই গ্রহণযোগ্য হবে। ভারতীয় পণ্ডিত-দের ঐরকম তিনটি অবদান পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে দুইটি ইউ-রোপীয় গবেষণার বিদ্যাবত্তার পণ্ডিতদের ধারা বা পদ্ধতি অনুসরণ করেছে ও অনেক নতুন মতবাদের দ্বার খুলে দিয়েছে, যেগুলি প্রমা-ণিত হলে বেদের বাহ্যিক অর্থ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেক বদলাতে হবে। শ্রীযুক্ত তিলক তাঁহার 'দি আর্টিক হোমস্' গ্রন্থে ইউরোপীয় গবেষক-দের সাধারণ সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করেছেন। কিন্তু বৈদিক উষা ও বৈদিক গো-এর আলেখ্য ও সূক্তে বর্তমান জ্যোতির্বিদ্যার উপাদান নতুন ক'রে নিরীক্ষা ক'রে অন্ততঃ এই দৃঢ় সম্ভাবনাটি স্থাপিত করেছেন যে আর্যজাতিগুলি তুষার যুগে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকে নেমে এসেছিল। শ্রী টি, পরমশিব আয়ার চিন্তার এক সাহসিক অভিযানের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে সমগ্র বেদই হ'ল বিশ্ববিবর্তনের ঐ একই যুগে আমাদের গ্রহের দীর্ঘ-কালব্যাপী তুষার-মৃত্যুর পরে তার নবজন্মের অন্তর্ভুক্ত ভূতলের গঠনের একটি বিশেষ ব্যাপারের রূপক আলেখ্য। শ্রীযুক্ত আইয়ারের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি সমগ্রভাবে স্বীকার করা কঠিন। কিন্তু তিনি অন্ততঃ বেদের অহি বৃত্রের ও সপ্তসিন্ধুর মুক্তির রূপক কাহিনীর ওপর নূতন আলোকপাত করেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদের চেয়ে, যা সূক্তগুলির ভাষার দ্বারা সিদ্ধ হয় না, অনেক বেশী সঙ্গতিপূর্ণও সম্ভব। শ্রীযুক্ত তিলকের গ্রন্থের সঙ্গে নিলে এই পুস্তকটি প্রাচীন শাস্ত্রের একটি নূতন বাহ্যিক ব্যাখ্যার সূত্রপাত করতে পারে; যা এখনও ব্যাখ্যা করা যায় না এমন অনেক কিছুর ব্যাখ্যা করতে পারে ও আমাদের জন্যে আর্যদের পুরাণো জগতের বাস্তবিক পার্থিব পরিবেশ না হ'লেও, তাঁদের পার্থিব উদ্ভব নূতন করে রূপায়িত করবে।

তৃতীয়টি ভারতীয় ব্যাখ্যার প্রাচীনতর কিন্তু আমার বর্তমান লক্ষ্যের নিকটতর। এটি বেদকে একটি প্রাণবন্ত শাস্ত্ররূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার

জন্য আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দের চেষ্টা। দয়ানন্দ নিরুক্তে যে-শব্দতত্ত্ব পেয়েছিলেন তার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে তাঁর ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন একজন বিরাট সংস্কৃত পণ্ডিত ও তাঁর উপকরণগুলি আশ্চর্য দক্ষতা ও স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার সেই বিশিষ্ট ধর্ম, যা "ধাতুর বহু-অর্থ" সায়ণের এই বাক্যাংশের দ্বারা সবচেয়ে ভাল বর্ণিত হয়, তিনি তার যে উপযোগ করেছেন তা বিশেষভাবে সৃজনশীল। আমরা দেখব যে এই ইঙ্গিতের যথাযথ অনুসরণ ক'রে বৈদিক ঋষিদের বিশিষ্ট পদ্ধতি বোঝার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। সূক্তসমূহের দয়ানন্দের ব্যাখ্যা এই ধারণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে বেদ হল আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের এক সর্বাঙ্গীন প্রকাশ। বেদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হ'ল একেশ্বরবাদ ও বৈদিক দেবতারা হলেন এক দেবের বিভিন্ন বর্ণনাত্মক নাম, তাঁরা যুগপৎ সেই দেবের শক্তি-সমূহ প্রকৃতিতে যেভাবে ক্রিয়াশীল দেখি, তাদের সূচক, এবং বেদের অর্থের প্রকৃত বোধের দ্বারা আমরা আধুনিক গবেষণার দ্বারা আবিষ্কৃত সব বৈজ্ঞা-নিক তত্ত্বে উপনীত হতে পারি।

এইরকম একটি মতবাদ স্থাপন করা স্পষ্টতঃ কঠিন। সত্য বটে ঋগ্বেদ নিজেই বলেছেন যে দেবতারা হলেন বিভিন্ন নাম ও প্রকাশ, এক বিশ্বাত্মক সৎ-এর যিনি আপনার স্বরূপে বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে বর্তমান; কিন্তু সূক্তগুলির ভাষা থেকে আমরা এই উপলব্ধি করতে বাধ্য যে শুধু বিভিন্ন নামই নয়, কিন্তু দেবতারা এক দেবের বিভিন্ন রূপ, শক্তি ও ব্যষ্টি-প্রকাশ। বেদের একেশ্বরবাদে অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ ও বহুদেবতাবাদও অন্তর্ভুক্ত এবং তা মোটেই আধুনিক সরল ও সুতীক্ষ্ণ ঈশ্বরবাদ নয়। যদি আমরা বেদের স্তোত্রগুলির সঙ্গে প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি করি, তাহলেই শুধু তার ওপর আমরা একটি কম জটিল মতবাদ জোর করে চাপাতে পারি।

এখন যতটা স্বীকার করা হয়, প্রাচীন জাতিসমূহ যে তার চেয়ে বিজ্ঞানে আরও অগ্রসর হয়েছিল, তা স্বীকার করা যায়। আমরা এখন জানি যে মিশরীয় ও কলডীয়রা অনেককিছু আবিষ্কার করেছিল যার অনেককিছু সে যুগের পরে আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা পুনরাবিষ্কৃত হয়েছে, আর অনেক-কিছু এখনও তা হয়নি। প্রাচীন ভারতীয়রা, অন্ততঃ, নগণ্য জ্যোতির্বিদ ছিলেন না ও সর্বদাই দক্ষ চিকিৎসক ছিলেন, হিন্দু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, মূলে বিদেশী ছিল মনে হয় না। এ সম্ভব যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অন্যান্য

শাখাতেও তারা প্রাচীনকালে উন্নত ছিল। কিন্তু স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক ঘোষিত বেদে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রকাশ বহু প্রমাণের অপেক্ষা করে। যে প্রকল্পের ভিত্তির ওপরে আমি আমার গবেষণা পরিচালনা করব তা হ'ল এই যে বেদের দু'টি দিক আছে। ঐ দুইটি দিক খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ হলেও তাদের ভিন্ন রাখতে হবেই। ঋষিরা তাঁদের জ্ঞানের সারকে একটি সমান্তরাল রেখার ব্যবস্থায় সাজিয়েছিলেন যাতে একই দেবতারা বিশ্বপ্রকৃতির বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শক্তি ছিলেন ও তাঁরা একটি দ্বিবিধ অর্থের ব্যবস্থায় তার প্রকাশ সাধন করেছিলেন যার দ্বারা একই ভাষা দুই রূপেই দেবতাদের উপাসনায় ব্যবহৃত হত। কিন্তু মানসিক বা তাত্ত্বিক অর্থ জাগতিক অর্থের চেয়ে প্রধান। আরও ব্যাপক, ঘনসম্বদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ও আত্ম-উৎকর্ষণের জন্যেই বেদের উপযোগিতা। সুতরাং এই অর্থটি প্রথমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

এই কাজে প্রাচীন ও আধুনিক প্রত্যেকটি ব্যাখ্যাই অনিবার্যভাবে সহায়তা করে। সায়ণ ও যাস্ক দিয়েছেন বাহ্যিক প্রতীকগুলির আনুষ্ঠানিক কাঠামোও তাদের চিরাচরিত অর্থের ও ব্যাখ্যার বিরাট ভাণ্ডার। উপনিষদ্‌গুলি পূর্বতন ঋষিদের মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক চিন্তার সূত্রগুলি নিজেরা যেমন পেয়েছে তা দিয়েছে ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও সম্বোধি লাভের স্বকীয় পদ্ধতি আমাদের দিয়ে গিয়েছে। ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য তুলনামূলক গবেষণার একটি যুক্তি-নির্ভর প্রণালী দিয়েছে, যেটাকে এখনও সিদ্ধ করতে হবে ও কিন্তু যা বর্তমান উপকরণ বৃদ্ধি করতে ও শেষপর্যন্ত অধুনা অবর্তমান একটি বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা ও দৃঢ় যুক্তিনির্ভর ভিত্তি দিতে সমর্থ। দয়ানন্দ বৈদিক ঋষিদের ভাষাগত রহস্যের সূত্র দিয়েছেন এবং বৈদিক ধর্মের একটি কেন্দ্রগত প্রত্যয়ের ওপর আবার জোর দিয়েছেন—তা হ'ল এক সৎ ও দেবতাগণ তাঁর বহুদিক-সম্পন্ন ঐক্যের প্রকাশক নাম ও রূপ, এই চিন্তাটি।

অন্তর্বর্তী অতীতের থেকে এত সাহায্য পেয়ে আমরা এই দূরবর্তী অতীতকে এখনও হয়ত পুনর্গঠন করতে পারব ও বৈদিক জ্ঞানের তোরণের মধ্যে দিয়ে একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রজ্ঞার চিন্তা ও তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রবেশ করতে পারব।

চতুর্থ অধ্যায়

মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ভিত্তি

বেদের অর্থের সম্বন্ধে যে কোন প্রকল্পকে, যদি তা নিশ্চিত ও সারবান্ হতে হয়, সর্বদাই এমন একটা ভিত্তির থেকে অগ্রসর হতে হবে বেদের ভাষা থেকেই স্পষ্টভাবে যার উদ্ভব। যদি বা তার বিষয়বস্তুর অধিকাংশ প্রতীকের ও আলেখ্যের একটি ব্যবস্থা হয়, যাদের অর্থ আবিষ্কার করা দরকার, তথাপি সূক্তগুলির বিশদ ভাষায় এমন স্পষ্ট সূচনা থাকা চাই যা আমাদের সেই অর্থে পৌঁছে দেবে। তা না হ'লে, প্রতীকগুলি দ্ব্যর্থক বলে, এই বিপদের সম্ভাবনা থাকবে যে ঋষিদের মনোনীত আলেখ্যগুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য আবিষ্কার না ক'রে আমাদের কল্পনা ও পক্ষপাত থেকে একটা ব্যবস্থা নির্মাণ করব, তাহ'লে আমাদের মত তা যতই উদ্ভাবনশীল ও সম্পূর্ণ হোক্, বাতাসে প্রাসাদ গড়ার মত হবে, উজ্জ্বল কিন্তু বাস্তবতা বা দৃঢ়তা শূন্য।

অতএব আলেখ্য ও প্রতীক ছেড়ে দিলে বেদের বর্বর ও আদিম অর্থের চেয়ে উচ্চতর কোন তাৎপর্য্য যদি আমরা গ্রহণ করি, আমাদের সমর্থন করতে পারে, সূক্তগুলির স্পষ্ট ভাষায় সেরকম কোন মনস্তাত্ত্বিক ধারণার যথেষ্ট শাঁস আছে কিনা, তা নির্ধারণ করা হ'ল আমাদের প্রথম কর্তব্য। তারপরে সূক্তগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য থেকে যতটা সম্ভব প্রত্যেকটি প্রতীকের ও আলেখ্যের ব্যাখ্যা ও প্রত্যেকটি দেবতার প্রকৃত তাত্ত্বিক ক্রিয়া আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। বেদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট শব্দের-ও দৃঢ় ও অপরিবর্তনশীল অর্থ আমাদের আবিষ্কার করতে হবে--তা প্রতিষ্ঠিত উত্তম শব্দতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপর ও যেখানে যেখানে শব্দগুলি পাওয়া যাবে সেই সেই অংশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে তা খাপ খাওয়া চাই। কারণ, আগেই যেমন বলা হয়েছে সূক্তের ভাষা নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নয়; তা হ'ল সযত্নে রক্ষিত ও যথোচিত বিবেকবত্তার সঙ্গে সম্মানিত যা সর্বদা একটি বিধিবদ্ধ ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান বা ঐতিহ্যিক সিদ্ধান্ত ও অবিরত অনুভূতিকে প্রকাশ করে। বৈদিক ঋষিদের ভাষা যদি স্বচ্ছন্দ ও পরিবর্তনশীল হ'ত, তাঁদের চিন্তাসমূহ যদি স্পষ্টতঃ পরিবর্তনশীল, অবস্থায় থাকত,

অস্থির ও অনিশ্চিত হ'ত, তাহ'লে তাঁদের পারিভাষিক শব্দের অর্থে আমরা যে সুবিধাজনক উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসঙ্গতি আরোপ করি ও তাঁদের প্রত্যয়-গুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখতে পাই তা সমর্থন করা যেত বা সহ্য করা যেত। কিন্তু সূক্তগুলি স্পষ্টতঃ এর বিপরীত সাক্ষ্য বহন করে। যে বস্তু তিনি ব্যাখ্যা করছেন, তার মধ্যে যেমন আনুগত্য ও যথোচিত নিষ্ঠা আছে, ব্যাখ্যাকারের মধ্যেও তা দাবী করবার অধিকার আমাদের আছে। এত সুস্পষ্ট যে বৈদিক ধর্মের বিভিন্ন প্রত্যয়গুলির ও সযত্নে রক্ষিত আদৃত শব্দ-গুলির মধ্যে একটা সুদৃঢ় সম্বন্ধ আছে ; ব্যাখ্যার অসঙ্গতি ও অনিশ্চয়তা প্রমাণ করবে যে বেদের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বিপথচালক তা নয়, কিন্তু শুধু এই যে ব্যাখ্যাতা প্রকৃত সম্বন্ধগুলি আবিষ্কার করতে পারেনি।

যথাযথভাবে ও সযত্নে এই প্রচেষ্টা করার পরে যদি সূক্তগুলির অনু-বাদ করে দেখান যায় যে আমরা যেসব ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট করেছিলাম সেগুলি স্বাভাবিকভাবে সহজে ব্যাখ্যাত স্থানে খাপ খেয়ে যায়, যদি সেগুলি যা স্পষ্ট মনে হয়েছিল তার ওপর আলোকপাত করে ও যেখানে শুধু বিশৃঙ্খলা ছিল সেখানে বোধগম্যতা ও সঙ্গতির সৃষ্টি করে। সূক্তগুলি যদি সামগ্রীকভাবে সূক্তগুলি থেকে এইভাবে একটি স্পষ্ট ও সম্বন্ধ অর্থ প্রদান করে ও অনু-গামী স্তবকগুলি সম্পর্কিত বিস্তারগুলির ন্যায় সঙ্গত পারম্পর্য্য দেখাতে পারে, আর এসবের ফল যদি একটি গভীর, সুশৃঙ্খল প্রাচীন সিদ্ধান্তের ব্যবস্থাসমূহ হয় তাহলে আমাদের প্রকল্প অন্য প্রকল্পের সঙ্গে দাঁড়াবার যেখানে সেগুলি এটির প্রতিরোধ করে সেখানে সেগুলিকে প্রতিবাদ বা যেখানে আমাদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সেগুলির মিল আছে সেখানে তাদের পূর্ণ করার অধিকার হবে। আমাদের প্রকল্পের সম্ভাব্যতাও কমে যাবে না, এবং তার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে এভাবে যদি দেখা যায় বেদে প্রকাশিত চিন্তার ও মতের ব্যবস্থা পরবর্তী ভারতীয় চিন্তার ও ধার্মিক অনুভবের প্রাচীন রূপ, বেদান্ত ও পুরাণের স্বাভাবিক জন্মদাতা।

এতটা বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রচেষ্টা এই ক্ষুদ্রাকার ও সংক্ষিপ্ত অধ্যায়-গুলির উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। এদের উদ্দেশ্য হ'ল যে সূত্র আমি নিজে পেয়েছি, ব্যাখ্যার পথ ও তার প্রধান প্রধান মোড়গুলি যে সব সিদ্ধান্তে আমি উপনীত হয়েছি ও বেদ যে সব ইঙ্গিত দিয়ে আমাদের সেগুলিতে পৌঁছুতে সাহায্য করে, এসব তাদের নির্দেশ করে দেওয়া, যাঁরা তা অনুসরণ করতে যত্নবান হতে পারেন, তাঁদের জন্যে। প্রথমতঃ, আমার বোধ হয় যে আমার মনে

এই মতবাদের সূত্রপাত ব্যাখ্যা করে দেওয়া যুক্তিযুক্ত, যাতে যে-পথ নিয়েছি পাঠক তা আরও ভাল বুঝতে পারেন, বা যদি তিনি ইচ্ছা করেন, নিরীক্ষা করতে পারেন কোন সংস্কার বা ব্যক্তিগত পছন্দ যা এই দুরূহ সমস্যায় যুক্তির প্রয়োগ প্রভাবিত বা সীমিত করে থাকতে পারে। বেদ পড়বার আগে আমিও অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয়ের মতই প্রাচীন সূক্তগুলির ধার্মিক, ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক অর্থ সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত-সমূহ স্বীকার করে নিয়েছিলাম। ফলে, আধুনিকীভূত হিন্দু মতানুসারে আমি উপনিষদগুলিকেই হিন্দু দর্শন ও ধর্মের সবচেয়ে প্রাচীন উৎস, প্রকৃত বেদ, জ্ঞানশাস্ত্র বলে মনে করতাম। ঋগ্বেদ সম্বন্ধে আমি যা কিছু জানতাম তা এই গভীর শাস্ত্রটির আধুনিক অনুবাদগুলি থেকে, আর তা আমার পক্ষে ছিল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল, কিন্তু চিন্তার ইতিহাসের পক্ষে বা একটি জীবন্ত আধ্যাত্মিক অনুভবের পক্ষে তার মূল্য ও গুরুত্ব অল্পই বলে মনে হত।

ভারতীয় যোগের পন্থা অনুসারে আত্মোন্নতির কয়েকটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করার সময়ে বৈদিক চিন্তার সঙ্গে আমার প্রথম পরোক্ষ সংযোগ হয়; সেগুলি আমার অজ্ঞাতে ও স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে, বর্তমানে অব্যবহৃত কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা অনুসৃত প্রাচীন পন্থার দিকে কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছিল। এই সময়ে নিয়মিত হয়ে আসছে এই রকম কয়েকটি আন্তর অনুভূতির সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি প্রতীকী নামের একটি ব্যবস্থা আমার মনে উঠতে আরম্ভ করে ও তাদের মধ্যে এল সম্বোধিময় বুদ্ধির চারটি শক্তির তিনটির—দৃষ্টি, শ্রুতি ও অপরোক্ষ জ্ঞান—প্রতিনিধি, ইলা, সরস্বতী ও সরমা এই তিনটি নারীশক্তির বিগ্রহ। এগুলির মধ্যে দুটি বৈদিক দেবীদের নাম বলে আমার কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল না। বরং প্রচলিত হিন্দু ধর্ম বা প্রাচীন পৌরাণিক ধর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল—বিদ্যার দেবী সরস্বতী ও চন্দ্রবংশের জননী ইলা। কিন্তু সরমা যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। কিন্তু আমার মনে যে মূর্তিটি উঠত তার সঙ্গে বৈদিক স্বর্গ-শূনির কোন সম্পর্ক স্থাপন করতে সমর্থ হইনি; সেই মূর্তিটি আমার স্মৃতিতে জড়িত ছিল আরগাইভ হেলেনের সঙ্গে ও আলোর লুপ্ত রশ্মিগুলিকে অন্বেষণ করতে তমসার শক্তিসমূহের গুহায় প্রবেশকারিণী প্রাকৃতিক উষার ছবি উপস্থিত করত। একবার সূত্রটী খুঁজে পেলে—প্রাকৃতিক আলো যে আন্তর জ্যোতির প্রতীক—এ দেখা সহজ হয় যে স্বর্গশূনি হতে পারে সম্বোধি যা অবচেতন

মনের অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে সেখানে বন্দী জ্ঞানের উজ্জ্বল দীপ্তির ঝলক মুক্তি সম্ভব করার জন্য। কিন্তু সূত্রটি ছিল না ও আমি প্রতীকের ঐক্য বিনা শুধু নামের ঐক্য ধরে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমার দক্ষিণ ভারতে বাসই বেদের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। দুটি জিনিস, যা আমার মন লক্ষ্য করতে বাধ্য হ'ল, উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড়দের জাতিগত বিভাগের সম্বন্ধে আমার অন্যের কাছে প্রাপ্ত বিশ্বাসে কঠোর আঘাত করল। এই পার্থক্য আমার পক্ষে সর্বদাই আর্য্য ও দ্রাবিড়দের শারীরিক নমুনার অনুমিত ভেদের ও উত্তরের সংস্কৃতেয় ও দক্ষিণের অ-সংস্কৃতেয় ভাষাগুলির মধ্যে একটি আরও নির্দিষ্ট গরমিলের ভিত্তির ওপরে আশ্রিত ছিল। আমি অবশ্য উত্তরকালীন মত-গুলিও জানতাম যেগুলি ধরে নেয় যে একটি সবর্ণ জাতি—দ্রাবিড় ও ভার-তীয়-আফগান—ভারতীয় উপত্যকায় বাস করে, কিন্তু তখন পর্যন্ত আমি এইসব জল্পনার গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বেশীদিন বাস করার আগেই তামিল জাতির মধ্যে উত্তরের বা আর্য্য নমুনার ব্যাপক পুনরাবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারিনি। যেদিকেই ফিরতাম, আমার মনে হত যে শুধু ব্রাহ্মণদের মধ্যেই নয়, কিন্তু সব বর্ণ ও শ্রেণীর মধ্যেই আমি আমার মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হিন্দুস্থানের বন্ধুদের পুরানো পরিচিত মুখ, অঙ্গ ও চেহারা চিনতে পারতাম যদিও এই সাদৃশ্য আমার নিজের স্বদেশ বাঙ্গলার ক্ষেত্রে অতটা ব্যাপক ছিল না। আমার এরকম মনে হয়েছিল যে যেন উত্তরের সমস্ত উপজাতিদের এক বিরাট দল দক্ষিণ ভারতে নেমে এসেছিল ও কোন পূর্ববর্তী বাসিন্দাদের আধকার করেছিল। একটি দক্ষিণী নমুনার সাধারণ একটি ধারণা থেকে গিয়েছিল কিন্তু ব্যক্তিদের অঙ্গগঠন লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হওয়া বড় অসম্ভব ছিল। শেষ পর্য্যন্ত আমি এ লক্ষ্য না করে পারিনি যে যা কিছু মিশ্রণ হয়ে থাক্, যা কিছু প্রদেশগত পার্থক্য বিবর্তিত হয়ে থাক্, সমগ্র ভারতবর্ষে সমস্ত বিভিন্নতার পিছনে এখনও একটি শারীরিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের নমুনা আছে। নৃতাত্ত্বিক গবেষণারও প্রবণতা এই দিকে।

তাহলে শব্দতাত্ত্বিকদের সৃষ্ট আর্য ও দ্রাবিড় জাতিদের মধ্যে তীব্র ভেদের বিষয়ে কি হবে? তা অন্তর্হিত হয়ে যায়। যদি আদৌ এক আর্য আক্রমণের কথা স্বীকার করতেই হয়, তাহলে আমাদের ধরে নিতে হয় যে ঐ আক্রমণ সমস্ত ভারত প্লাবিত করেছিল, যা কিছু পরিবর্তন হয়ে

থাক্ ও সমগ্র জাতির শারীরিক গঠন নির্ণীত করেছিল, অথবা তা ছিল এক আরও কম সভ্যজাতির ছোট ছোট দলের অন্তঃপ্রবেশ, যারা আদি অধিবাসীদের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়েছিল। তাহ'লে আমাদের এই কল্পনা করতে হয় যে তারা বড় নগরসমূহের নির্মাতা, দূরদেশে বাণিজ্য-কারী, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিবিহীন নয় এমন একটি সভ্যজাতির দ্বারা অধিকৃত একটি উপত্যকায় প্রবেশ করে নিজেদের ভাষা, ধর্ম, চিন্তা ও রীতি পুরানো অধিবাসীদের ওপর চাপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল। আক্র-মণকারীদের এক অতি সুসংগঠিত ভাষা, সৃষ্টিশীল মনের অধিকতর বলবত্তা ও একটি অধিকতর ক্রিয়াশীল ধামিক রূপ ও উদ্দীপনা থাকলে এইরূপ অঘটন সম্ভব হতে পারত।

আর দুই জাতির সংমিশ্রণ হয়েছিল এই মতবাদের সর্বদাই আর একটি সহায় ছিল ভাষার প্রভেদ। কিন্তু এক্ষেত্রে ও আমার আগে থেকে গঠিত ধারণাগুলি বিশৃঙ্খল ও বিহ্বল হয়ে গেল। কারণ তামিল ভাষার অনেক শব্দ, যা আপাতঃদৃষ্টিতে সংস্কৃতের রূপ ও স্বভাব থেকে খুব বেশী ভিন্ন মনে হয়, পরীক্ষা করে তবুও দেখলাম যে সংস্কৃত ও তার দূর-সম্পকিত ভগিনী লাতিন্, ও কখনও কখনও গ্রীক ও সংস্কৃতের মধ্যে, নূতন সম্বন্ধ স্থাপন করতে গিয়ে, অবিরত শুদ্ধ তামিল মনে করা হয় এমন অনেক শব্দ বা শব্দগোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। কোন কোন সময়ে তামিল শব্দটি শুধু সম্বন্ধটির সূচনাই দিত না, কিন্তু একটি সম্পকিত শব্দগোষ্ঠীর মধ্যে লুপ্ত যোগসূত্রটিও প্রমাণ করে দিত। আর এই তামিল ভাষার মধ্যে দিয়ে আমার কাছে এখন যা আর্য ভাষাগুলির প্রকৃত নীতি, উৎস, ও যাকে বলা যায় ভ্রূণ অবস্থার তত্ত্ব ব'লে প্রতিভাত হয়, তা দেখতে পেলাম। আমি এই পরীক্ষা এত দূর পর্যন্ত করতে সমর্থ হইনি যাতে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, কিন্তু আমার নিশ্চিত মনে হয় যে দ্রাবিড় ও আর্য ভাষাদের আদি সম্বন্ধ, যতটা মনে করা হয় তার চেয়ে অনেক নিকটতর ও ব্যাপকতর ছিল এবং এই সম্ভাবনারও ইঙ্গিত সূচিত হয় যে ঐ দুটি একটি লুপ্ত আদিম ভাষার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন পরিবার হতে পারে। যদি তা হয়, বেদে ব্যাপ্ত ইঙ্গিতগুলিই দ্রাবিড়ভারতে আর্য প্রবেশের একমাত্র সাক্ষ্য হবে।

সুতরাং দ্বিবিধ আগ্রহের সঙ্গে আমি প্রথমবার মূলবেদ আরম্ভ করলাম যদিও পুঙ্খানুপুঙ্খ বা গভীর অধ্যয়ন আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আর্য ও

দস্যুদের মধ্যে জাতিগত ভেদের ও দস্যুদের সঙ্গে এই দেশে জাত ভারতীয়রা এক, এই মতের বৈদিক ইঙ্গিতগুলি যে আমি যতটা মনে করেছিলাম তার চেয়ে অনেক দুর্বল, তা বুঝতে আমার বেশী সময় লাগল না। কিন্তু এই প্রাচীন সূক্তগুলিতে উপেক্ষিত অবস্থায় বর্তমান গভীর মনস্তাত্ত্বিক চিন্তার ও অনুভূতির আবিষ্কার আমার কাছে অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক ছিল। আর এই বস্তুটির গুরুত্ব আমার দৃষ্টিতে অনেক বৃদ্ধি পেল যখন আমি দুটি জিনিস আবিষ্কার করলাম, প্রথমতঃ, বৈদিক মন্ত্রগুলি আমার নিজের অনেক আন্তর অনুভূতিকে স্পষ্ট ও নিশ্চিত আলোকে উদ্ভাসিত করল, যার ব্যাখ্যা ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব, বা যোগের ও বেদান্তের শিক্ষার সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় ছিল, তাতে পাইনি; এবং দ্বিতীয়তঃ, ঐ মন্ত্রগুলি উপনিষদের অনেক অস্পষ্ট অংশ ও ধারণার ওপর আলোকপাত করল যেগুলিতে আমি পূর্বে কোন নির্দিষ্ট অর্থ আরোপ করতে পারিনি, ও যুগপৎ তারা পুরাণের মধ্যেও অনেক কিছুরই নূতন সার্থকতা দান করল।

সৌভাগ্যক্রমে সায়ণের ভাষ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকাতে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেতে আমার সাহায্য হ'ল। কারণ বেদের অনেক সাধারণ ও প্রচলিত শব্দের স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আরোপ করতে, যেমন 'ধীর' অর্থ চিন্তা বা বুদ্ধি 'মনস', মন, 'মতি', চিন্তা, আবেগ বা মানসিক অবস্থা, 'মনীষা'-বুদ্ধি, 'ঋতম্'-সত্য; 'কবি'-দ্রষ্টা, 'মনীষী'-চিন্তাশীল, 'বিপ্র' বা 'বিপশ্চিৎ' মনে প্রবুদ্ধ, ও আরও অনেক সদৃশ শব্দের অর্থে নির্দিষ্ট ভাবটি দিতে; ও 'দক্ষ' ও 'শ্রবস'-এর মত শব্দের-সায়ণ যথাক্রমে যাদের বলবত্তা ও ঐশ্বর্য, অন্ন বা যশ অর্থ করেছেন দুঃসাহস করে ব্যাপকতর গবেষণার দ্বারা সমর্থিত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে আমি মুক্ত ছিলাম।

আমাদের এইসব শব্দের স্বাভাবিক অর্থ দিতে পারার অধিকারের ওপরে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সায়ণ ধী, ঋতম্ ইত্যাদি শব্দের অত্যন্ত বিভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। ঋত শব্দটির, যা যে-কোন তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ, তিনি কখনও "সত্য", "যজ্ঞ" ও মাঝে মাঝে "জল" এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সর্বদাই শব্দটির সত্য এই অর্থ দেয়। সায়ণ কৃত "ধীর" অনুবাদ বিভিন্ন--"বুদ্ধি", "প্রার্থনা", "কর্ম", "অন্ন" ইত্যাদি। এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়তভাবে বুদ্ধি বা বোধ। বেদের অন্য শব্দগুলির সম্বন্ধেও একই কথা। তারও, সায়ণের প্রবণতা হ'ল শব্দাবলীর মধ্যে সব সূক্ষ্ম ভাব ও ভেদ লুপ্ত করা ও সেগুলির

সবচেয়ে অনিশ্চিত সাধারণ অর্থ দেওয়া। মানসিক ক্রিয়াবাচক সব ধারণার আখ্যারই অর্থ তাঁর কাছে শুধু 'বুদ্ধিমান্', শক্তির নানাবিধ ধারণার ব্যঞ্জনাকারক সব শব্দই—আর বেদ তাদের দ্বারা প্লাবিত—'বল'-এর সাধারণ ধারণায় পর্যবসিত। পক্ষান্তরে আমি বিভিন্ন শব্দের, ব্যাপক অর্থে তারা পরস্পরের যতই নিকট হোক, অর্থের প্রকৃত ভাব ও যথার্থ অনুষঙ্গ নির্দিষ্ট করার ও রক্ষা করার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখে খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলাম, বেদের ঋষিরা কাব্যরীতির অন্যান্য বিশারদদের মত শব্দসমূহের যথার্থ অনুষঙ্গ অনুভব না ক'রেও বাচনিক মিশ্রণে তাদের যথার্থ ও নির্দিষ্ট শক্তি প্রদান না করে, বিশৃঙ্খলভাবে বা বিচার না করে তাদের প্রয়োগ করতেন, একথা ধরে নেবার আমি বাস্তবিক কোন কারণ দেখি না।

এই নীতি অনুসরণ করে দেখলাম যে শব্দের ও খণ্ডবাক্যের সরল, স্বাভাবিক ও সোজা অর্থ ত্যাগ না ক'রেও, শুধু ভিন্ন ভিন্ন স্তবকেরই নয়, পরন্তু বহু সম্পূর্ণ অংশের অসামান্য রকম অধিক রাশি দৃষ্টিগোচর হ'ল যেগুলি বেদের সমগ্র প্রকৃতিই বদলে দিল। তখন এই মহান্ শাস্ত্র এইভাবে প্রতিভাত হল যে এর সমস্তটার মধ্যেই সমৃদ্ধতম চিন্তার ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির সুবর্ণধারা প্রবহমান, যা অধিকাংশ সূক্তেই কখনও ক্ষুদ্র ধারায়, কখনও বৃহত্তর স্রোতে বর্তমান। আরও যেসব শব্দের সরল ও সাধারণ অর্থ তাদের আপন প্রসঙ্গকে তাত্ত্বিক তাৎপর্যের ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে, সেগুলি ছাড়াও, বেদ এই রকম পদে পূর্ণ, যেগুলি আমাদের বেদের সাধারণ মর্মের ধারণা অনুসারে, বাহ্যিক ও ভৌতিক বা আন্তর ও তাত্ত্বিক অর্থ দেওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'রায়ে', 'রয়ি', 'রাধস', 'রত্ন' এইরকম অনেক শব্দ হয় শুধু পার্থিব সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বা আন্তর আনন্দ ও প্রাচুর্য বোঝাতে পারে ও সমানভাবে আন্তর বা বাহ্যিক জগতে প্রযুক্ত হতে পারে; 'ধন', 'বাজ', 'পোষ'—এইসব শব্দের অর্থ হয় বৈষয়িক ঐশ্বর্য, প্রাচুর্য ও বৃদ্ধি অথবা আন্তরিক বা বাহ্যিক সম্পদ, তাদের প্রাচুর্য ও ব্যক্তির জীবনে তাদের বৃদ্ধি হতে পারে। উপনিষদে ঋগ্বেদ থেকে একটি উদ্ধৃতিতে আধ্যাত্মিক আনন্দ বোঝাবার জন্য 'রায়ে' ব্যবহৃত হয়েছে; মূলে তাহলে কেন তা ঐ একই অর্থ বহন করতে পারে না? 'বাজ' একটি প্রসঙ্গে এ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে যেখানে প্রত্যেকটি শব্দের তাত্ত্বিক অর্থ আছে পার্থিব প্রাচুর্যের উল্লেখ সমজাতীয় ভাবের সমগ্রতায় এক ভীষণ অসঙ্গতি নিয়ে আসে। সুতরাং

সাধারণ বুদ্ধির দাবী এই যে বেদে এই সব শব্দের আন্তর ব্যঞ্জনার সঙ্গে প্রয়োগ, স্বীকৃত হোক্।

কিন্তু যদি অবিরত এরকম করা হয় তাহলে শুধু সম্পূর্ণ ঋকই ও সূক্তাংশই নয়, পরন্তু সমগ্র সূক্তই এক মনস্তাত্ত্বিক আকার গ্রহণ করে। এক সর্তে পূর্ণ হলে এই রূপান্তর প্রায়ই সম্পূর্ণতা লাভ করে, কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টি অপরিবর্তিত থাকে না—সেই সর্ত হল এই যে আমরা বৈদিকযজ্ঞের প্রতীকময় স্বরূপ স্বীকার করে নেব। গীতায় আমরা দেখি যজ্ঞ শব্দটি দেবতাদের বা পরমের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বাহ্যিক বা আন্তর সকল কর্মের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এইরূপ প্রতীকমূলক ব্যবহার কি এক পরবর্তী দার্শনিক বিচার-প্রবণতা জাত অথবা তা যজ্ঞের বৈদিক ভাবনাতেই অন্তর্নিহিত ছিল? আমি দেখলাম যে বেদের অনেক সূক্ত রয়েছে যাতে যজ্ঞের বা যজ্ঞের বলির ধারণা খোলাখুলিভাবে প্রতীকময়, অন্য অনেক মন্ত্রে রূপকের আবরণ বেশ স্বচ্ছ। তখন এই প্রশ্ন উঠল, এগুলি কি পুরাতন কুসংস্কারময় আচার থেকে প্রারম্ভিক প্রতীকবাদের বিকাশপরায়ণ পরবর্তী রচনা অথবা এগুলি অধিকাংশ সূক্তেই রূপকের দ্বারা কমবেশী গুপ্ত একটি ভাবের নৈমিত্তিক, স্পষ্টতর বিবরণ? বেদে যদি আভ্যন্তরভাবে পূর্ণ সূক্তাংশের সতত পুনরাবৃত্তি না থাকত তাহলে অবশ্যই প্রথম ব্যাখ্যাই মেনে নিতে হ'ত। কিন্তু পক্ষান্তরে অনেক সমগ্র মন্ত্রেই শ্লোক থেকে শ্লোকান্তরে সুসিদ্ধ ও জ্যোতির্ময় সুসঙ্গতির থেকে উৎসারিত তাত্ত্বিক অর্থ স্বাভাবিকভাবেই দেওয়া যেত, সেগুলিতে একমাত্র অস্বচ্ছ বস্তু ছিল যজ্ঞের বা অর্ঘের বা কখনও কখনও অনুষ্ঠাতা পুরোহিতের উল্লেখ যিনি মানুষ বা দেবতা হতে পারতেন। আমি সর্বদাই দেখতাম যে এই পদগুলি প্রতীকমূলকভাবে ব্যাখ্যাত হলে চিন্তার গতি আরও সুসিদ্ধ, আরও ভাস্বর, আরও সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠত ও সমগ্র মন্ত্রের অর্থ সম্পূর্ণ হ'ত। সুতরাং আমার প্রকল্পকে অনুসরণ করাতে ও তার ভিতর বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতীকমূলক অর্থ অন্তর্ভুক্ত করাতে আমি নিজেকে সমালোচনার প্রত্যেক সারবান্ নীতির দ্বারা সমর্থিত বলে মনে করলাম।

তা সত্ত্বেও এই স্থলেই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রথম প্রকৃত প্রতিবন্ধক এসে উপস্থিত হয়। আমি এপর্যন্ত পদসমূহের ও বাক্যসমূহের বাহ্যিক অর্থের ওপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ সরল ও স্বাভাবিক পদ্ধতির পথে অগ্রসর হচ্ছিলাম। এখন আমি একটি বস্তু পেলাম যাতে একহিসাবে বাহ্যিক

অর্থ অগ্রাহ্য করতে হ'ল; এবং এই হ'ল এক প্রক্রিয়া যাতে প্রত্যেক সতর্ক ও বিবেকবান মন নিজেকে অবিরত দ্বিধার দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখছে। আর যথাসম্ভব সতর্ক হয়েও কেউই সর্বদা নিশ্চিত হতে পারেন না যে তিনি প্রকৃত সূত্র ও যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। সাময়িকভাবে দেবতা ও মন্ত্র বাদ দিলে,—বৈদিক যজ্ঞের তিনটি অঙ্গ—যজমান, অর্ঘ, যজ্ঞের ফল। যজ্ঞ যদি দেবতাদের প্রতি উৎসর্গীকৃত কর্ম হয়, তাহলে যজ্ঞের নিবেদক যজমানকে কর্মের কর্তা ছাড়া আর কোন ভাবে নিতে পারতাম না। যজ্ঞ হল বাহ্য বা আন্তর কর্ম, যজমান তাহলে নিশ্চয়ই হবে কর্মের কর্তা আত্মা বা ব্যক্তি। কিন্তু অনুষ্ঠাতারাও ছিলেন—হোতা, ঋত্বিক, পুরোহিত, ব্রহ্মা, অধ্বর্যু ইত্যাদি। বেদের প্রতীক-ব্যবস্থায় তাঁদের অংশ কি ছিল? আমরা যদি একবার যজ্ঞের প্রতীকময় অর্থ ধরে নিই, তাহলে আমাদের ঐ অনুষ্ঠানের প্রত্যেক অঙ্গেরও প্রতীকমূলক মূল্য ধরে নিতে হবে। আমি দেখলাম যে দেবতাদের বারংবার যজ্ঞের পুরোহিত আখ্যা দেওয়া হয়েছে ও অনেক সূক্তাংশে একটা অমানুষিক শক্তিই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষ। আমি এও লক্ষ্য করলাম যে আমাদের ব্যক্তিত্বের অঙ্গগুলিতেই অবিরত ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়েছে। আমাকে শুধু এই নীতি বিপরীতভাবে প্রয়োগ করতে হ'ল ও মনে করতে হ'ল যে ব্যক্তিরূপে পুরোহিত বাহ্যিক মূর্তিতে প্রতিনিধি ও আন্তর ক্রিয়াবলীতে আলেখ্য, এক অমানুষিক শক্তিকে বা বলের বা আমাদের ব্যক্তিত্বের কোন একটি দিকের। তখন বাকী থাকল বিভিন্ন পুরোহিতদের কর্মের তাত্ত্বিক অর্থ নির্দিষ্ট করা। এখানে আমি দেখলাম যে বেদ নিজেই শব্দতাত্ত্বিক ইঙ্গিত ও ঝোঁকের দ্বারা একটি ইঙ্গিত দিয়েছে, যেমন 'পুরোহিত' শব্দটির, 'পুরো হিত' এই বিভক্ত আকারে, যে প্রতিনিধি, সম্মুখে স্থাপিত, এই অর্থে প্রয়োগ ও মানুষের মধ্যে যে দিব্য সঙ্কল্প বা শক্তি কর্মসমূহের সমগ্র উৎসর্গে ক্রিয়া সঞ্চালন করে তাঁর প্রতীক অগ্নির বারংবার উল্লেখ।

যজ্ঞের প্রদত্ত বস্তুগুলি কি তা বোঝা আরও কঠিন। যদি বা সোম-আসব, যেখানে যেখানে তার উল্লেখ আছে তার ব্যবহার ও ফল, তার একার্থবাচক শব্দাবলীর শব্দতাত্ত্বিক ইঙ্গিত দ্বারা তার নিজের ব্যাখ্যা সূচিত করে। 'ঘৃত' যজ্ঞে পরিষ্কৃত মাখনের দ্বারা কি বস্তুকে বুঝায়? তবুও ঐ শব্দটি বেদে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে অনবরত তার প্রতীকমূলক তাৎপর্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্বর্গ থেকে ঝরে

পড়ছে বা ইন্দ্রের অশ্বদের থেকে অথবা মন থেকে চুঁইয়ে পড়ছে——এরকম 'ঘৃতে'র মানে কি হতে পারে? যদি পরিষ্কৃত মাখনরূপে ঘৃতের মানে অত্যন্ত অনির্দিষ্টভাবে ব্যবহৃত প্রতীকের বেশী কিছু হয়, যার ফলে প্রায়ই তার বাহ্যিক অর্থ ঋষির মনে সম্পূর্ণ বা অংশতঃ অপসৃত হয়ে যায় তাহলে স্পষ্টতঃই এ হ'ল অদ্ভূত নিরর্থক কিছু। অবশ্য শব্দগুলির অর্থ সুবিধামত বদলে নেওয়া সম্ভব, যেমন ঘৃত মানে কখনও মাখন ও কখনও জল, এবং 'মনস' মানে কখনও মন, কখনও অন্ন বা পিষ্টক হিসাবে নেওয়া যায়। কিন্তু আমি দেখলাম ঘৃত অবিরতই চিন্তা বা মনের সম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়েছে ঃ বেদে স্বর্গ মনের প্রতীক, ইন্দ্র জ্যোতির্ময় মানসের ও তাঁর অশ্ব দুটি সেই মানসের যুগলশক্তির প্রতিনিধি, এমনকি বেদ কোন কোন সময়ে স্পষ্টভাবে দেবতাদের প্রতি শুদ্ধীকৃত ঘৃতরূপে ধীষণার বা বুদ্ধির আহুতির কথা বলেছেন। ঘৃতম্ পূতম্ ধীষণাম্ (৩।২।১), ঘৃত শব্দটির শব্দতাত্ত্বিক অর্থের মধ্যে সমৃদ্ধ বা উষ্ণ উজ্জ্বলতার ভাবটিও গণ্য। ইঙ্গিতসমূহের এই একত্র ফলেই আমি পরিষ্কৃত মাখনের আলেখ্যের একটি মনস্তাত্ত্বিক অর্থ নির্দিষ্ট করাতে নিজেকে সক্ষম ব'লে বোধ করলাম। আমি আরও দেখলাম যে ঐ একই নীতি ও পদ্ধতি যজ্ঞের অন্যান্য অঙ্গের প্রতিও প্রযোজ্য।

যজ্ঞের ফল সবই আপাতঃদৃষ্টিতে ছিল পার্থিব——গো, অশ্ব, স্বর্ণ, সন্তান, মনুষ্য, দৈহিক বল, যুদ্ধে বিজয়। কিন্তু আমি আগেই আবিষ্কার করেছিলাম যে বৈদিক গো এক অতি রহস্যময় পশু এবং কোন পার্থিব পশুপাল থেকে তা আসেনি। গো শব্দটি গাভী ও জ্যোতি দুই-ই বোঝায় ও অনেক সূক্তাংশে তার অর্থ স্পষ্টই আলো, এমনকি যেখানে গাভীর চিত্র দেওয়া হয়েছে, এ কথা যথেষ্ট স্পষ্ট যখন সূর্যের গাভী——হোমরীয় হেলিয়স বা দিনকরের গাভী, ও উষার গাভী নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হয় মনস্তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে পার্থিব আলো জ্ঞানের, বিশেষতঃ দিব্যজ্ঞানের প্রতীকরূপে বেশ ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এই নিছক সম্ভাবনা কি করে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত করা যেতে পারে? আমি অনেক মন্ত্রাংশ পেলাম যেগুলির প্রসঙ্গগুলি তত্ত্বমূলক, ও শুধু গাভীর চিত্রই তার ভৌতিক ব্যঞ্জনার দ্বারা ঐ ব্যাখ্যার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে। অনবদ্য রূপের স্রষ্টা হিসাবে ইন্দ্র আহূত হয়েছেন সোম-আসব পান করবার জন্যে, পান করে তিনি আনন্দে পূর্ণ হন ও "গাভী দাতা" হন; তখন আমরা

তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ অথবা তাঁর চরম সত্য ভাবনাসমূহ লাভ করি, তখন আমরা তাঁকে প্রশ্ন করি এবং তাঁর স্বচ্ছ বিবেক আমাদের পরম কল্যাণ সাধন করে, একথা স্পষ্ট যে এইরূপ একটি অংশে গাভীরা পার্থিব পশুপাল হতে পারে না। জাগতিক আলো প্রদান করার-ও এই প্রসঙ্গে কোন অর্থ হয় না। অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে বৈদিক 'গো'-এর তাত্ত্বিক প্রতীকতা আমার মনে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমি তারপরে প্রতীকতা অন্যান্য যেসব অংশে শব্দটি ছিল তাতে প্রয়োগ করলাম এবং সর্বদাই আমি দেখলাম যে তার ফলে ঐসব অংশে উৎকৃষ্ট ও ঐসব স্থলে শ্রেষ্ঠ সুসঙ্গতি পাওয়া গেল।

'গো' ও 'অশ্ব' অনবরত পরস্পর সম্পর্কিত। 'উষা', 'গোমতী' ও 'অশ্ববতী'রূপে বর্ণিত; উষা যজমানকে অশ্ব ও গাভী প্রদান করেন। প্রাকৃতিক উষার প্রতি প্রযুক্ত হ'লে, গোমতী অর্থ হ'ল আলোর রশ্মির সঙ্গে সংযুক্ত অথবা তাদের নিয়ে আসা, এ হল মানুষের মনে জ্ঞানের উদয়ের চিত্র। সুতরাং অশ্ববতী শুধু ভৌতিক অশ্বকে বোঝাতে পারে না; এরও নিশ্চয়ই এক তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য আছে। বৈদিক অশ্বের সম্বন্ধে গবেষণা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে 'গো' ও 'অশ্ব', জ্যোতি ও শক্তি, চৈতন্য ও শক্তি এই দুইটি সহচর ভাবনা প্রকাশ করে যা বৈদিক ও বৈদান্তিক মানসের কাছে সত্তার সকল ক্রিয়ার যুগল বা যুগ্ম দিক ছিল। সুতরাং এ স্পষ্ট হ'ল যে বৈদিক যজ্ঞের দুই প্রধান ফল, গাভীর সম্পদ ও অশ্বের সম্পদ, মানস জ্ঞানের ঐশ্বর্য্য ও প্রাণিক শক্তির প্রাচুর্য্যের প্রতীক ছিল। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল যে বৈদিক কর্মের ঐ দুটি প্রধান ফলের সঙ্গে নিরন্তর সম্বদ্ধ অন্যান্য ফলগুলিরও নিশ্চয়ই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে পারে। তাদের নিশ্চিত অর্থ নির্দিষ্ট করাই বাকী রইল।

বৈদিক প্রতীক-ব্যবস্থার আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল লোকসমূহের ব্যবস্থান ও দেবতাদের ক্রিয়াবলী। লোকসমূহের প্রতীকের সূত্র আমি পেলাম ব্যাহৃতিগুলির বৈদিক ভাবনায়, 'ওম্' এই মন্ত্রের তিনটি প্রতীকময় শব্দে ও চতুর্থ ব্যাহৃতি 'মহস্'-এর ও তাত্ত্বিক শব্দ 'ঋতম্'-এর পারস্পরিক সম্পর্কে। ঋষিরা বিশ্বের তিনটি বিভাগের কথা বলেন, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ বা মধ্যবর্তী লোক ও স্বর্গ বা দ্যৌ; কিন্তু একটি মহত্তর স্বর্গ বা বৃহৎ দ্যৌও আছে যাকে বিপুল লোক, 'বৃহৎ' বলা হয়, যাকে কখনও কখনও 'মহো অর্ণ', বিরাট সলিল বলা হয়। এই বৃহৎ-কে আবার ঋতম্

বৃহৎ বা একটি ত্রিক আখ্যায়, সত্যম্ ঋতম্ বৃহৎ, বর্ণিত করা হয়। এ ভুবন তিনটি যখন ব্যাহৃতি তিনটির অনুরূপ তত্ত্ব, তখন বৃহৎ ও সত্যের চতুর্থ লোকটি উপনিষদে উল্লিখিত চতুর্থ ব্যাহৃতি মহস্-এর অনুরূপ বলেই মনে হয়। পৌরাণিক ব্যবস্থায় এই চারটি আর তিনটির দ্বারা সম্পূর্ণ হয়—-জন, তপ ও সত্য—-হিন্দু বিশ্ববিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তিনটি লোক। বেদেও আমরা তিনটি সর্বোচ্চ লোকের কথা পাই যাদের নাম কিন্তু দেওয়া হয়নি। কিন্তু বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ব্যবস্থায় ঐ সাতটি ভুবন হল সাতটি আভ্যন্তর তত্ত্ব বা সত্তার সাতটি স্তরের অনুরূপ,—-সৎ, চিৎ, আনন্দ, বিজ্ঞান, মন, প্রাণ, অন্ন। মধ্যবর্তী বিজ্ঞান বা মহস্-এর তত্ত্ব বা বিরাট ভুবনটি হল সকল সত্তার সত্য, তা হ'ল বৃহতের তত্ত্ব, বৈদিক 'ঋতম্'-এর সঙ্গে অভিন্ন, পৌরাণিক ব্যবস্থায় যেমন আরোহক্রমে মহস্-এর পরে জনলোক বা দিব্য আনন্দলোক আসে, বেদেও তেমনি ঋতম্, সত্য, তার ওপরে ময়স বা আনন্দ-এ নিয়ে যায়। আমরা তাহলে বেশ নিশ্চিত হতে পারি যে এই দুটি চিন্তাধারা অভিন্ন ও উভয়েই নির্ভর করে আভ্যন্তর চৈতন্যের সাতটি তত্ত্বের একই ভাবনার ওপরে, যেগুলি বাহ্যিক সাতটি ভুবনে নিজেদের রূপায়িত করে। এই নীতি অবলম্বন ক'রে আমি বৈদিক ভুবনগুলির সঙ্গে তাদের অনুরূপ চৈতন্যের তাত্ত্বিক স্তরের অভিন্নতা নির্ণয় করতে সমর্থ হলাম ও সমগ্র বৈদিক ব্যবস্থাটি আমার মনে পরিষ্কার হয়ে গেল।

এইসব সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়াতে বাকীটুকু স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্যভাবে লাভ করা গেল। আমি আগেই বুঝেছিলাম যে মিথ্যার বদলে সত্যকে, ও বিভক্ত ও সীমিত সত্তার পরিবর্তে ও অসীম সত্তাকে বরণ ক'রে মানব-আত্মার মর্ত্য অবস্থা থেকে অমৃতত্বে গতি হ'ল বৈদিক ঋষিদের মূল চিন্তা। মৃত্যু হল জড়ের মর্ত্য অবস্থা যাতে প্রাণ ও মন অন্তর্নিহিত রয়েছে। অমৃতত্ব হ'ল অসীম সত্তা, চৈতন্যের ও আনন্দের অবস্থা। মানুষ দ্যৌ ও পৃথিবী, মন ও দেহ এই দুই স্তর বা 'রোদসী' অতিক্রম ক'রে সত্যের মহস্-এর আনন্ত্যে ও দিব্য আনন্দে উত্তীর্ণ হয়। এই হ'ল পূর্বপিতাদের, প্রাচীন ঋষি-দের আবিষ্কৃত মহান্ পন্থা।

আমি দেখেছিলাম যে দেবতারা জ্যোতির সন্তান, অদিতির ও অসীম-তার পুত্র বলে বর্ণিত হয়েছেন। আর কোন ব্যতিক্রম বিনা সকল দেবতা-রাই মানুষকে সমৃদ্ধ করেন, তার কাছে জ্যোতি বহন করে আনেন, তার ওপর সলিলের পূর্ণত্ব, স্বর্গের প্রাচুর্য্য বর্ষণ করেন, তার মধ্যে সত্যের বৃদ্ধি

ও দিব্যলোকসমূহ গঠন করেন ও সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও তাকে মহান্ লক্ষ্যে, সমগ্র সুখে, সুসংসিদ্ধ আনন্দে উপনীত করে দেন এইভাবে বর্ণিত হয়েছেন তাঁদের বিভিন্ন ক্রিয়াবলী, তাঁদের আখ্যা, তাঁদের সঙ্গে সম্বন্ধ রূপককাহিনী, উপনিষদ ও পুরাণসমূহে বর্তমান ইঙ্গিত ও গ্রীক রূপক কাহিনীর নৈমিত্তিক পরোক্ষ ও আংশিক আলোর থেকে তাঁদের বিভিন্ন কর্মসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে যে দৈত্যেরা দেবতাদের বিরুদ্ধতা করেছিল, তারা সকলেই হ'ল ভেদের ও সীমার শক্তি, তাদের নামই সূচিত করে তারা হল আবরক, বিদ্বারক, ছিন্নকারী, গ্রাসকারী, অবরোধক, দ্বৈতস্রষ্টা, বাধক শক্তিসব যারা সত্তার স্বতন্ত্র ও একীভূত অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কাজ করে। বৃত্র, পণি, অত্রি, রাক্ষস, সম্বর, বল, নমুচি—এরা দ্রাবিড় রাজা ও দেবতা, অত্যধিক ঐতিহাসিক বোধযুক্ত আধুনিক মন তাদের যা বলে বিশ্বাস করতে চায়, নয়; এগুলি আমাদের পূর্বপুরুষদের ধার্মিক ও নৈতিক কর্মের উপযোগী প্রাচীনতর ভাবনার প্রতীক। তারা হ'ল উচ্চতর শ্রেয় ও অবর বাসনার শক্তিসমূহের মধ্যে সংগ্রামের প্রতীক। ঋগ্বেদের এই ভাবনাটি ও আমাদের প্রাচীন প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি, জরথুষ্ট্রের অনুগামী-দের শাস্ত্রগুলিতে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরও সাক্ষাৎভাবে কিন্তু অপেক্ষা-কৃত কম তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার সঙ্গে ও অন্যভাবে বিবৃত শুভ ও অশুভের মধ্যে বিরুদ্ধতার এই একই কল্পনা খুব সম্ভব আর্য সংস্কৃতির এক অভিন্ন ও সাধারণ শাসন থেকে উদ্ভূত হয়েছিল।

শেষে আমি দেখলাম যে বেদের বিধিবদ্ধ প্রতীকতা দেবতাদের সম্বন্ধে রূপক কাহিনী ও প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে তাঁদের আদানপ্রদানের প্রতিও প্রসা-রিত হয়েছিল। এইসব কাহিনীর সবগুলির না হলেও কতকগুলির খুব সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক ও জ্যোতিষিক মূল ছিল; কিন্তু যদি তা হয়েও থাকে, তাদের মূল ভাব এক তাত্ত্বিক প্রতীকতা দিয়ে সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। বেদের প্রতীকের অর্থ একবার জানা গেলে, এই সব রূপক কাহিনীর আধ্যাত্মিক অর্থ স্পষ্ট ও অনিবার্য হয়ে ওঠে। বেদের প্রতি অঙ্গ অন্য অঙ্গগুলির সঙ্গে অভিন্নভাবে সংযুক্ত ও একবার ব্যাখ্যার এক বিশেষ নীতি গ্রহণ করার পরে, এই রচনাগুলির স্বরূপই সেই ব্যাখ্যাকে তার যুক্তিসঙ্গত সীমানায় নিয়ে যেতে আমাদের বাধ্য করে। এগুলিতে যেসব উপকরণ আছে তা শক্তিশালী হস্তের দ্বারা দক্ষতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ও আমরা যেভাবে তাদের ব্যবহার করি, তাতে কোন অসঙ্গতি থাকলে তাদের অর্থের

ও যথাযথ চিন্তার সমস্ত কাঠামোই বিচূর্ণ হয়ে যায়।

এইভাবে এইসব প্রাচীন কবিতার মধ্যে দিয়ে যেন নিজেকে প্রকাশমান এক বেদ বা জ্ঞান আবির্ভূত হ'ল,—যা একটি মহান্ ও প্রাচীন ধর্মের শাস্ত্রে বরাবরই এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক সাধনা-যুক্ত,—সে শাস্ত্রের ভাবনা অসংলগ্ন বা সারবস্তু আদিম নয়, তা পরস্পর অসম্বদ্ধ ও অমার্জিত উপাদানের মিশ্রণ নয় কিন্তু এক, সম্পূর্ণ ও নিজের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সচেতন,—অবশ্য তা কখনও স্থূল, কখনও স্বচ্ছ, অন্যতর ও ভৌতিক অর্থের আচ্ছাদনে আবৃত কিন্তু কখনই তা একটি মুহূর্তের জন্যও নিজের উচ্চ আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের ও প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য হারায় না।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদের শব্দতাত্ত্বিক পদ্ধতি

বেদের যে কোন ব্যাখ্যাই সুদৃঢ় ও শক্ত ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা সারবান্ হতে পারে না; এই শাস্ত্র এক দুর্বোধ্য ও প্রাচীন ভাষায় রচিত একমাত্র বর্তমান গ্রন্থ, যা সেই ভাষার অনেক শব্দতাত্ত্বিক সমস্যা উপস্থাপিত করে। ভারতীয় পণ্ডিতদের চিরাচরিত ও প্রায় কল্পনা-প্রবণ অর্থের ওপর নির্ভর করা যে কোন সমীক্ষণশীল মনের পক্ষে অসম্ভব। আধুনিক শব্দ-বিজ্ঞান আরও দৃঢ় ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি গড়বার চেষ্টা করছে কিন্তু এখনও তা পাইনি।

বেদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দুটি সমস্যা আছে, শুধু সন্তোষজনক শব্দ-তাত্ত্বিক সমর্থন থাকলেই তাদের সমাধান হতে পারে। এইভাবে ব্যাখ্যার জন্যে বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দের অনেকগুলি নূতন অর্থ স্বীকার করা প্রয়োজন, যেমন, উতি, অবস, বয়স। এই নতুন অনুবাদগুলি একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়, যা আমরা সঙ্গতভাবে দাবী করতে পারি, প্রত্যেক প্রসঙ্গেই তারা বেশ খাপ খেয়ে যায়, অর্থ পরিষ্কার করে এবং বেদের মন্ত্র নির্দিষ্ট রূপ বিশিষ্ট গ্রন্থে একই শব্দের একেবারে বিভিন্ন অর্থ দেবার দায় থেকে মুক্ত করে। কিন্তু এ পরীক্ষাটি যথেষ্ট নয়, এছাড়াও আমাদের প্রয়োজন শব্দতত্ত্বের এক নতুন ভিত্তি যা শুধু নতুন অর্থের কৈফিয়ৎ দেবে না, কিন্তু একই শব্দের কি করে অনেকগুলি বিভিন্ন অর্থ সম্ভব হল, যে অর্থ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দেওয়া হয়, প্রাচীন বৈয়াকরণদের দেওয়া অর্থগুলি, পরবর্তী সংস্কৃত ভাষায় যদি ঐ শব্দের কোন অর্থ থাকে, এসব ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু এখন আমাদের জ্ঞানে যা পাই, তার চেয়ে আরও বিজ্ঞান-সম্মত ভিত্তি না খুঁজে পাই, তাহলে এ সহজে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বেদের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আছে এই মতবাদটি প্রায় প্রয়োজনীয় শব্দগুলির—রহস্যবিদ্যার প্রধান শব্দগুলির দ্বিবিধ অর্থ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। এই ভাষালঙ্কার সংস্কৃত সাহিত্যে চিরাচরিত ও পরবর্তী ক্লাসিক্যাল গ্রন্থসমূহে কখনও কখনও অতিরিক্ত রচনাকৌশলের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে, এই হ'ল শ্লেষ বা দ্ব্যর্থক অলঙ্কার। কিন্তু এই কৃত্রিমতার জন্যেই পূর্বা-

হেই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় যে এই কাব্যরীতি নিশ্চয়ই এক পরবর্তী ও আরও নাগর সংস্কৃতির জটিল অঙ্গ। এক অতি প্রাচীন গ্রন্থে এর নিরন্তর উপস্থিতির হিসাব করব কি করে? আরও বেদে এর একটা অদ্ভুত ও ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে—তা হ'ল একটি শব্দেই যতগুলি সম্ভব অর্থ ভরে দেখার জন্যে সংস্কৃত ধাতুসমূহের "বহুধা-অর্থের" ইচ্ছাকৃত প্রয়োগ যার জন্যে প্রথমদৃষ্টিতে সমস্যাটিকে অতিমাত্রায় কঠিন ক'রে তোলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অশ্ব শব্দটি, যার সাধারণ অর্থ হল ঘোটক, যা প্রাণ ও মনের সেতু, প্রাণের, স্নায়বিক শক্তির, জৈবিক নিশ্বাসের, অর্ধেক প্রাণিক, অর্ধেক মানসিক বলের, প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়। এর ধাতুর, অন্যান্য অর্থ ছাড়াও, প্রবেগ, শক্তি, অধিকার, ভোগ, এইসব মানেও হতে পারে, আর প্রাণিক শক্তির মূল প্রবণতাগুলি সূচিত করার উদ্দেশ্যে এসব অর্থগুলিই আমরা জীবন-অশ্বের এই আলেখ্যে মিলিত দেখতে পাই। আর্য্য পূর্বপিতাদের ভাষা যদি আমাদের আধুনিক ভাষার নিয়মসকল মেনে চলত বা ভাষার বিকাশের একই স্তরে থাকত তাহলে ভাষার এইরকম ব্যবহার সম্ভব হত না। কিন্তু আমরা যদি মনে করতে পারি যে বৈদিক ঋষিরা প্রাচীন আর্য্য ভাষা যেভাবে ব্যবহার করতেন, তার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে জন্যে শব্দসমূহ আরও জীবন্ত, ধারণারাজির ততটা শুধু প্রচলিত নিষ্প্রাণ প্রতীক নয় ব'লে ও এক অর্থ থেকে অর্থান্তরে আরও মুক্তগতি বলে বোধ হ'ত, তাহলে আমরা বুঝব যে ঐসব কৌশল তাদের প্রয়োগ-কর্তাদের কাছে আদৌ কৃত্রিম বা দূরাগত ছিল না; সেগুলি প্রথম ও স্বাভাবিক উপায় বলেই মনে হবে। যাঁরা যুগপৎ পামরজনদের দ্বারা অবোধিত তাত্ত্বিক ধারণারাজির জন্যে নতুন, সংক্ষিপ্ত ও যথেষ্ট ভাষাসূত্র আবিষ্কার করতে ও অশুদ্ধ বুদ্ধির কাছ থেকে সেই সব সূত্রে নিহিত ধারণাসমূহ লুকিয়ে রাখতে উন্মুখ ছিলেন, তাঁদের কাছে এইগুলি সেইভাবে স্বতঃই প্রতিভাত হবে। আমার বিশ্বাস যে এই হল প্রকৃত ব্যাখ্যা; আমার মনে হয় যে আর্য ভাষার গবেষণা করে এই কথা প্রমাণিত করা যায় যে ঐ ভাষা বাস্তবিকই এমন একটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল যা, যেসব শব্দের সাধারণ ব্যবহারে শুধু সরল, নির্দিষ্ট ও ভৌতিক অর্থ পাওয়া যায়, তাদের রহস্যময় ও তাত্ত্বিক প্রয়োগের বিশেষ অনুকূল ছিল।

আমি আগেই নির্দেশ করেছি যে তামিল শব্দ-সমূহের প্রাথমিক গবেষণা থেকেই আমি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার মূল ও গঠনের ইঙ্গিত পেয়েছিলাম

যা বলে মনে হয়েছিল, এবং ঐ সূত্র অনুসরণ করে আমি এতদূরে পৌঁছে-ছিলাম যে আমার যে বিষয়ে আগ্রহ ছিল—আর্য্য ও দ্রাবিড় ভাষার সম্বন্ধ—তা ভুলে যাই ও মানুষের ভাষা জিনিষটারই মূল ও বিকাশের নিয়মাবলীও অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক বিষয়ের গবেষণায় ডুবে যাই। আমার মনে হয় যে ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা যেসব সাধারণ বিষয় নিয়ে কাজ করেন তাদের এই মহান্ গবেষণাই প্রকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

আধুনিক শব্দতত্ত্বের উৎপত্তির সময়ে যেসব আশা করা হয়েছিল সেগুলি ব্যর্থ হওয়াতে, তার অতিশয় অল্প ফল ও তা একটি "হীন জল্পনা-ত্মক বিজ্ঞানে" পরিণত হওয়াতে ভাষাবিজ্ঞানের কল্পনা নিন্দিত হয়েছে ও তার সম্ভাবনাই অতি সামান্য যুক্তির ভিত্তিতে অস্বীকৃত হয়েছে। আমার মনে হয় এইরকম অন্তিম অস্বীকৃতিতে মত দেওয়া যায় না। আধুনিক বিজ্ঞান যদি কোন একটি জিনিস বিজয়ীর মত প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, তা হ'ল সকল আদিম বস্তুর ইতিহাসে বিধির শাসন ও ক্রমবিকাশের পদ্ধতি। ভাষার গভীরতর স্বভাব যাই হোক্, তার বাহ্যিক রূপে ও বিকাশে তা হ'ল একটি জীবন্ত বস্তু, তার আছে বৃদ্ধি ও জাগতিক বিকাশ। অবশ্যই তার মধ্যে একটি স্থির মানসিক অঙ্গ আছে ও সেইজন্যে তা শুদ্ধ ভৌতিক প্রাণীদের চেয়ে মুক্ততর আরও নমনীয় ও নতুন অবস্থায় তা সর্বদা সচেতন-ভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে; তার রহস্য অধিকার করা আরও কঠিন, তাকে গঠন করে যাকিছু তারা আরও সূক্ষ্ম ও অপেক্ষাকৃত কম ক্ষুরধার বিশ্লেষণের প্রণালীর কাছে নিজেদের ধরা দেয়। কিন্তু নির্দিষ্ট বিধান ও পদ্ধতি ভৌতিক প্রপঞ্চের চেয়ে মানসিক বস্তুতে কিছু কম পরিমাণে থাকেনা, যদিও তাদের বাইরের রূপ আরও প্রাণবন্ত ও পরিবর্তনশীল। ভাষার আরম্ভ ও বিকাশ ও বিধান ও পদ্ধতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল নিশ্চয়ই। প্রয়োজনীয় সূত্র ও উপাদান পাওয়া গেলে, ঐগুলি নিশ্চয় আবি-ষ্কার করা যায়। আমার মনে হয় যে সংস্কৃত ভাষায় ঐ সূত্র পাওয়া যেতে পারে; এতে গবেষণার জন্যে প্রস্তুত উপাদান রয়েছে।

ভাষাবিজ্ঞানের যে ভ্রম তাকে আরও এক সন্তোষজনক পরিণামে পৌঁছুতে দেয়নি, তা হ'ল ভাষার ভৌতিক অংশে ভাষার বাহ্যিক আকারের, ও তার মনস্তাত্ত্বিক অংশে, সজাতীয় ভাষাগুলিতে গঠিত শব্দসমূহের ও বৈয়াকরণ প্রত্যয়রাজির পারস্পরিক বাহ্য সম্বন্ধ নিয়েই ব্যাপৃত থাকা।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রকৃত পদ্ধতি হ'ল মূলে, 'ভ্রূণ'বিদ্যায়, উপাদানে ও আরও অস্পষ্ট প্রক্রিয়াসমূহে ফিরে যাওয়া। অতি স্পষ্ট থেকে শুধু অতি স্পষ্ট ও অগভীর ফল পাওয়া যায়। সব জিনিসের গভীর তত্ত্ব, তাদের প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করা যায় বাহ্যিক প্রপঞ্চের দ্বারা আবৃত জিনিসের মধ্যে, সেই অতীত বিকাশের মধ্যে, যার সম্পূর্ণ আকারগুলি শুধু গুপ্ত ও বিক্ষিপ্ত সূচনাগুলির পরিচয় দেয়, অথবা যেসব বাস্তবিক রূপাবলী আমরা দেখি সেগুলি যেসব সম্ভাবনার সংকীর্ণ চয়ন, তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। কোন এক সদৃশ প্রণালী মানুষের ভাষার প্রাচীন রূপগুলির প্রতি প্রযুক্ত হলে আমরা একটি প্রকৃত ভাষাবিজ্ঞান পেতে পারি।

আমি এই চিন্তাধারা অবলম্বন করে যে গবেষণা করেছি, তার ফল যে গ্রন্থ স্বয়ংই ক্ষুদ্র ও অন্য বিষয়ের আলোচনারত, তার একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়ে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি শুধু সংক্ষেপে দুটি একটি ইঙ্গিত দিতে পারি বৈদিক ব্যাখ্যার সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। আর, কয়েকটি বৈদিক শব্দের লব্ধ অর্থ থেকে অর্থান্তর গ্রহণ করাতে আমি আধুনিক শব্দতত্ত্বের যা যুগপৎ অন্যতম প্রধান চিত্তাকর্ষক অঙ্গ ও ভীষণতম দুর্বলতাগুলির মধ্যে একটি, সেই চাতুর্যপূর্ণ জল্পনার সুযোগ নিয়েছি, আমার পাঠকের মনে এমন কোন কল্পনা এড়াবার উদ্দেশ্যেই আমি এখানে সেগুলির উল্লেখ করছি।

আমার গবেষণার ফলে প্রথমে আমার এই দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যে গাছ-পালার মত, পশুদের মত, কোনভাবেই কৃত্রিম কার্য নয়, কিন্তু বৃদ্ধিশীল বস্তু,—ধ্বনির সজীব বৃদ্ধিশীল বিকাশ যার ভিত্তি কয়েকটি বীজ-ধ্বনি। সেই বীজ-ধ্বনিগুলির থেকে কতকগুলি প্রাথমিক মূলশব্দ বিকাশলাভ করে, যেগুলির অনেক সন্তান তাদের আবার থাকে ধারাবাহিক উত্তরপুরুষ এবং তারা নিজেদের গোষ্ঠী, বংশ পরিবার ও চয়নমূলক দলে সাজিয়ে নেয়, তাদের প্রত্যেকটিরই থাকে একটা সাধারণ বীজ ও একটা সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস। কারণ, ভাষার বিকাশের প্রধান হেতু হল আদিম মানুষের স্নায়বিক মানসের দ্বারা কয়েকটি সাধারণ অর্থের, বরঞ্চ কয়েকটি সামান্য প্রয়োজনের ও ঐন্দ্রিয়-মূল্যের স্পষ্টভাবে উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। এই মিলনের পদ্ধতিটিও কোন অর্থেই কৃত্রিম ছিল না, কিন্তু তা ছিল স্বাভাবিক ও সরল এবং নিশ্চিত মনস্তাত্ত্বিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রথমে ভাষা-ধ্বনিগুলি আমরা যাকে প্রত্যয় বলি, তা প্রকাশ করবার

জন্য ব্যবহৃত হ'ত না, বরং সেগুলি ছিল কতকগুলি সাধারণ ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও আবেগ-এর শাব্দিক সমকক্ষ। বুদ্ধি নয়, স্নায়ুমণ্ডলী, ভাষার সৃষ্টি করেছিল। বৈদিক প্রতীক ব্যবহার করতে হ'লে বলতে হয়, অগ্নি ও বায়ু, মানবীয় ভাষার মূল কুশলী শিল্পী কারিগর, ইন্দ্র নয়। মন প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের কার্যাবলী থেকে উদ্ভূত হয়েছে; মানুষের মধ্যে বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সংযোগের ও ঐন্দ্রিয় প্রতিক্রিয়ার ভিত্তির ওপর নিজেকে গঠিত করেছে। একটি সদৃশ প্রণালীর দ্বারা ভাষার বুদ্ধিগত ব্যবহারও একটি স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তার ইন্দ্রিয়জ ও আবেগাত্মক প্রয়োগ থেকে বিকশিত হয়েছে। শব্দ-সমূহ, যা মূলে ছিল একটি অস্পষ্ট ইন্দ্রিয়-সম্ভাবনাময় প্রাণিক নির্গতি, নিশ্চিত বৌদ্ধ অর্থের নির্দিষ্ট প্রতীকরূপে ক্রমবিকশিত হয়েছে।

ফলে, মূলে কোন পদ একটি নির্দিষ্ট ধারণার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তাদের একটা সাধারণ স্বভাব বা গুণ ছিল, যার অনেক প্রয়োগ-সামর্থ্য, সুতরাং বহু সম্ভাব্য অর্থ ছিল। এই বিশেষ গুণ ও তার ফল একটি পদের মত অন্য অনেক সদৃশ পদেরও থাকত। অতএব প্রথমে, শব্দের বংশ ও পরিবার আরম্ভ হয় গোষ্ঠীগত ভিত্তিতে, তাদের ছিল একটা সাধারণ সম্ভব ও সম্পন্ন অর্থের ভাণ্ডার ও তাদের সবগুলির ওপর একটা সাধারণ অধিকার; একই ধারণাসমূহের বিভিন্ন প্রকাশের তারতম্যে ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য, একটি চিন্তার প্রকাশ করার অধিকারে নয়। শব্দের এই গোষ্ঠীগত জীবনের থেকে যে ব্যবস্থায় এক বা একাধিক অর্থ তারা স্বকীয় সম্পত্তি বলে দাবী করতে পারল, তাতে বিকাশ হল ভাষার প্রাথমিক ইতিহাস। বিভাজনের নীতি প্রথমে দ্রবরূপ ছিল, পরে তা কঠিনতর হ'তে লাগল শব্দ-পবিবার ও শেষ পর্য্যন্ত একক শব্দ তাদের স্বতন্ত্র জীবন আরম্ভ করা পর্যন্ত। ভাষার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিকাশের শেষ অবস্থা তখন আসে যখন শব্দ যে চিন্তার প্রতীক তার সম্পূর্ণ অধীন হয়। কেন না ভাষার আদিম অবস্থায় শব্দ যে চিন্তার প্রতীক তারই সমান বা তার চেয়ে বেশী জীবন্ত শক্তি; ধ্বনি অর্থ নিয়ন্ত্রিত করে। ভাষার শেষ অবস্থায় এই স্থিতিগুলি বিপরীত হয়ে গিয়েছে; চিন্তাই সর্বপ্রধান হয়ে ওঠে, ধ্বনি গৌণ।

ভাষার গোড়াকার ইতিহাসের আর একটি ধর্ম হ'ল তা যেসব চিন্তা প্রকাশ করত তাদের স্বল্পতা লক্ষ্যণীয় ও সেগুলি যথাসম্ভব সামান্য ও সাধারণতঃ খুব বাস্তব, যেমন, আলো, গতি, স্পর্শ, দ্রব্য, বিস্তৃতি, শক্তি,

বেগ ইত্যাদি। পরে চিন্তার বৈচিত্র্যের ও ভাবের নির্দিষ্টতার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধির গতি হ'ল সামান্য থেকে বিশেষের, অস্পষ্ট থেকে নির্দিষ্টের, ভৌতিক থেকে মানসিকের, মূর্ত থেকে অমূর্তের সদৃশ বস্তু-সমূহের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির প্রচুর বৈচিত্র্যের থেকে একপ্রকার বস্তু, আবেগ ও কর্মরাজির নির্দিষ্ট বিভেদের প্রকাশের দিকে। এই গতি সম্পন্ন হয় চিন্তায় সম্পর্কের প্রক্রিয়ার দ্বারা; সেই ভাবগুলি সর্বদাই এক, সর্বদাই পুনরাবৃত্তি করে ও যদিও সেগুলি যে ব্যক্তিরা সেই ভাষা বলতেন তাঁদের পরিবেশ ও বাস্তবিক অভিজ্ঞতার নিঃসন্দেহ ফল, বিকাশের নির্দিষ্ট স্বাভা-বিক নিয়মরূপে প্রতিভাত হয়। আর শেষ পর্যন্ত, একটি স্বাভাবিক নিয়ম পরিবেশের প্রয়োজনের চাপে বস্তুর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাধিত ও তাদের ক্রিয়ার স্থিরীকৃত অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এরকম একটি প্রক্রিয়া ছাড়া আর কি।

ভাষার এই অতীত ইতিবৃত্ত থেকে কয়েকটি ফল পাওয়া যায় যেগুলি বৈদিক ব্যাখ্যার পক্ষে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, যে নীতিগুলি অনুসারে সংস্কৃত ভাষায় ধ্বনি ও অর্থের সম্বন্ধ নিজেদের গঠন করেছিল, তাদের জ্ঞানের দ্বারা ও ঐ ভাষার শব্দগোষ্ঠীর সজাগ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার দ্বারা ব্যষ্টি-শব্দের অতীত ইতিহাস অনেকখানি পর্যন্ত পুনঃস্থাপিত করা সম্ভব হয়। ঐসব শব্দের বাস্তবিক অর্থের যুক্তি দেওয়া যায়, দেখান যায় ভাষার বিকাশের নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে কিভাবে সেগুলিকে গঠন করা হয়েছিল, বিভিন্ন অর্থের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপিত করা যায়, তাদের ঐন্দ্রিয়-মূল্যের অধিক পার্থক্য ও কখনও কখনও সাক্ষাৎ বৈপরীত্য সত্ত্বেও কি করে ঐসব অর্থ একই শব্দের সঙ্গে সংলগ্ন হ'ল, তা ব্যাখ্যা করা যায়। নিশ্চিত ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনেক শব্দের লুপ্ত অর্থ উদ্ধার করা যায় এবং যেসব লক্ষিত নিয়ম প্রাচীন আর্য ভাষাগুলির বিকাশ নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তাদের প্রতি, শব্দটির গুহ্য রহস্যের সাক্ষ্যের প্রতি, ও তার সমজাতীয়ের সমর্থক সাক্ষ্যের প্রতি লক্ষ্য দিয়ে, ঐ অর্থগুলি যে ঠিক তা সমর্থন করা সম্ভব হয়। এইভাবে বৈদিক ভাষার শব্দসমূহের সম্বন্ধে কিছু করবার একটা মাত্র ভাসমান ও জল্পনাত্মক ভিত্তির বদলে আমরা একটা সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ভিত্তির উপরে ভরসার সঙ্গে কাজ করতে পারি।

অবশ্য এর থেকে একথা বলা চলে না যে কোন একটি বৈদিক শব্দের কোন সময়ে একটা বিশেষ অর্থ থেকে থাকতে পারে, বা নিশ্চয় ছিল,

বলেই বেদের কোন বিশেষ অংশে সেই অর্থটি নিরাপদে প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু একটি নির্ভরযোগ্য অর্থ ও সেইটিই যে প্রকৃত অর্থ---সেই স্পষ্ট সম্ভাবনা স্থাপিত হয় অবশ্যই। আমি দেখেছি যে এইভাবে পুনরুদ্ধৃত অর্থ যেখানে যেখানে প্রযুক্ত হয়, সেই অংশের উপরেই তা আলোকপাত করে ও অপরপক্ষে বেদের কোন একটি মন্ত্রাংশ যে অর্থ দাবী করে শব্দের ইতিহাসও তাতেই পৌঁছে দেয়। এটি সম্পূর্ণ না হ'লেও, একটি যুক্তিসহ নিশ্চয়তার ভিত্তি।

দ্বিতীয়তঃ, প্রারম্ভে ভাষার একটি লক্ষ্যণীয় অঙ্গ হল এই যে একটি শব্দের বহুসংখ্যক অর্থ হতে পারত ও একটি ভাব প্রকাশ করার জন্যে অনেক শব্দ ব্যবহার করা যেত। পরে এই প্রাচুর্য কেটে ফেলতে হয়েছিল। বুদ্ধি তার নির্দিষ্টতার বৃদ্ধিশীল প্রয়োজন, মিতব্যয়িতার বর্ধমান বোধ থেকে হস্তক্ষেপ করল। শব্দসমূহের অর্থ বহন করার শক্তি ক্রমশঃই কমে গেল; এবং একই ভাবের জন্য অনেকগুলি অনাবশ্যক শব্দের ও একটি শব্দের জন্য ভাবের অপ্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যের বোঝা ক্রমে ক্রমে কম সহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে খুব কঠোর নয়, কিন্তু বৈচিত্র্যের সংযত ঋদ্ধির দাবীর দ্বারা পরিবর্তিত মিতব্যয়িতা ভাষার নীতি হ'য়ে উঠল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কখনই এই বিকাশের শেষ অবস্থায় পৌঁছয়নি; তা খুব শীঘ্রই প্রাকৃৎ অবভাষাগুলির মধ্যে মিশে গেল। তার আধুনিকতম ও সবচেয়ে সাহিত্যিক রূপেও তা একই শব্দের নানা অর্থের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ; একার্থবাচক শব্দের অনাবশ্যক সমৃদ্ধির বান ডেকে যায় তাতে। তাই জন্যে তার অসামান্য শক্তি আলঙ্কারিক কৌশলের যা অন্য যে-কোন ভাষায় কঠিন, অস্বাভাবিক ও আশাতীতভাবে কৃত্রিম হবে,---বিশেষতঃ তার দ্ব্যর্থক আলেখ্যের বা শ্লেষের শক্তি।

বৈদিক সংস্কৃত ভাষার বিকাশের এক পূর্বতর অবস্থার পরিচয় দেয়। বাহ্যিক ধর্মে ও অন্য যে কোন ক্ল্যাসিক্যাল ভাষার চেয়ে তা কম নির্দিষ্ট; তাতে আছে রূপ ও প্রত্যয়ের বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য্য; স্থিরীকৃত; তা তরল ও অস্পষ্ট, তবুও কারক ও ক্রিয়ার কালের ব্যবহার তাতে অতিশয় সূক্ষ্ম। আর মনস্তত্ত্বের দিকে তা নির্দিষ্ট হয়ে ওঠেনি, বুদ্ধিগত নৈশ্চিত্যের কঠোর রূপসমূহে কঠিন হ'য়ে ওঠেনি। বৈদিক ঋষিদের কাছে শব্দ একটা প্রাণবন্ত, শক্তিমান্‌, সৃষ্টিশীল ও গঠনশীল বস্তু। শব্দ এখনও একটা ভাবের প্রাণহীন রীতিগত প্রতীক নয়, কিন্তু তা নিজেই ভাবের জনক ও

রূপদাতা। তা নিজের মধ্যে তার মূলের স্মৃতি বহন করে, নিজের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন।

ঋষিদের দ্বারা ভাষার প্রয়োগ শব্দের এই মনস্তত্ত্বের দ্বারা নিয়মিত ছিল। ইংরাজীতে যখন আমরা "উলফ"[১] বা "কাউ"[২] শব্দটি ব্যবহার করি, তখন শুধুই আখ্যাত পশুটীই উদ্দিষ্ট হয়; ঐ ভাষার চিরাচরিত রীতি ছাড়া ঐ বিশেষ ধ্বনিগুলি ভাবটীর জন্য কেন আমরা ব্যবহার করি, তার অন্য কোন কারণ সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; এবং লিখনশৈলীর একটি কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা ছাড়া আমরা ঐ ধ্বনিটি আর কোন অর্থে বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি না। কিন্তু বৈদিক ঋষির কাছে 'বৃক' মানে 'বিদারক' ও, সুতরাং, ঐ অর্থটির অন্যান্য প্রয়োগের অন্তর্গত বলে, নেকড়ে বাঘ, 'ধেনু' মানে ছিল বৃদ্ধিকারী, পোষণকারী, অতএব গাভী। কিন্তু মূল ও সামান্য অর্থই প্রধান; মূল থেকে প্রাপ্ত ও বিশেষটি অপ্রধান। এইজন্যেই মন্ত্রের রচয়িতার পক্ষে এইসব সামান্য শব্দগুলিকে অত্যন্ত নমনীয়তার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল; কখনও নেকড়ে বাঘ বা গাভীর ছবিটি সামনে উপস্থিত ক'রে; কখনও বা সেটীকে আরও সাধারণ অর্থ-টিকে রঞ্জিত করার জন্যে ব্যবহার ক'রে, সময়ান্তরে সেটীকে শুধু যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবটির ওপর তাঁর মনোযোগ ছিল, তার আচারগত চিত্র রূপে রেখে, কখনও বা ছবিটি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে। প্রাচীন ভাষাটির এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক স্বভাবের আলোকেই আমাদের বুঝতে হবে বৈদিক প্রতীকতার অলংকারগুলি, ঋষিরা যেভাবে সেগুলির প্রয়োগ করেছেন,—এমনকি সব-চেয়ে সাধারণ ও বাস্তবগুলিও। এই ভাবেই 'ঘৃত', শুদ্ধীকৃত মাখন ও পবিত্র মাদক 'সোম' ও আরও অনেকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছিল।

অধিকন্তু, বুদ্ধি একটি শব্দেরই বিভিন্ন অর্থের মধ্যে যেসব প্রাচীর তুলে দেয়, সেগুলি আধুনিক ভাষায় যতটা তার চেয়ে অনেক কম বিভাজক ছিল। ইংরাজীতে একাধিক জাহাজের অর্থে 'ফ্লীট' ও দ্রুতগতি অর্থে "ফ্লীট" দুটি ভিন্ন শব্দ; আমরা যখন প্রথম অর্থে 'ফ্লীট' শব্দ ব্যবহার করি, তখন জাহাজের গতির দ্রুততার কথা ভাবি না; ও যখন দ্বিতীয় অর্থে তার প্রয়োগ করি, তখন সমুদ্রের ওপরে দ্রুতগতি জাহাজের প্রতিকৃতি স্মরণ করি না। কিন্তু ভাষার বৈদিক প্রয়োগে এই জিনিসটি হবারই

১ বৃক বা নেকড়ে বাঘ ২ ধেনু

প্রবণতা ছিল। উপভোগ অর্থে 'ভগ' ও অংশ অর্থে 'ভগ' বৈদিক মানসের পক্ষে বিভিন্ন শব্দ ছিল না, কিন্তু তা ছিল একটি শব্দ যার দুটি ভিন্ন প্রয়োগ বিকশিত হয়েছিল। সুতরাং, ঐ শব্দটি তার দুটীর একটি অর্থে প্রয়োগ করা, অন্য অর্থটি মনের পিছনে রেখে কিন্তু তা স্পষ্ট তাৎপর্যটিকে রঞ্জিত করে এইভাবে অথবা, সমবেত অর্থের একপ্রকার আলেখ্যের দ্বারা শব্দটিকে যুগপৎ উভয় অর্থেই ব্যবহার করা ঋষিদের পক্ষে সহজ ছিল। 'চনস' মানে ছিল অন্ন, খাদ্য, কিন্তু তাতে 'ভোগ', 'সুখ'ও বোঝাত; এইজন্যে ইতরজনের যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত খাদ্য সূচিত করার জন্যে ঋষি ঐ শব্দটি ব্যবহার করতে পারতেন, কিন্তু দীক্ষিতের কাছে ওর মানে ছিল আনন্দ, দৈহিক চেতনাচারী দিব্য আনন্দের উল্লাস ও একই সঙ্গে তা সূচিত করত সোম, মদ্যের চিত্র, যা যুগপৎ দেবতাদের খাদ্য ও আনন্দের বৈদিক প্রতীক।

আমরা সর্বত্রই দেখতে পাই ভাষার এইরকম ব্যবহারই বৈদিক শব্দ-রাশির উপর প্রভুত্ব করছে। এই ছিল সেই উৎকৃষ্ট উপায় যার দ্বারা প্রাচীন মরমীরা তাঁদের কর্মের অসুবিধা কঠিনতা জয় করতেন। সাধারণ উপাসকের কাছে অগ্নির মানে হয়ত ছিল শুধু বৈদিক বহ্নির দেবতা, অথবা হয়ত তার মানে ছিল ভৌতিক প্রকৃতিতে তাপ ও আলোর তত্ত্ব, অথবা সবচেয়ে অজ্ঞানীদের কাছে তা হয়ত একজন অতিমানুষিক ব্যক্তি, ধনদাতাদের একজন, মানুষের বাসনা পূরণকারীদের একজন। যাঁরা গভীরতর ধারণা করতে সমর্থ, কি ক'রে তাদের কাছে ঐ দেবতার মন-স্তাত্ত্বিক ক্রিয়াবলীর ইঙ্গিত দেওয়া যায়? শব্দটি নিজেই ঐ কাজটি সমাধা করেছিল। কারণ, অগ্নি মানে বলবান্, উদ্দীপ্ত, এমন কি শক্তি, ঔজ্জ্বল্য। কাজেই যেখানেই শব্দটির প্রয়োগ সেখানেই তা দীক্ষিতদের সহজেই স্মরণ করিয়ে দিতে পারত এক জ্যোতির্ময় শক্তির ধারণা যা ভুবনসমূহ গঠন করে ও মানুষকে অনুত্তরে উন্নীত করে, মহৎ কর্মের সম্পাদক ও মানুষের যজ্ঞের পুরোহিত।

অথবা শ্রোতার মনে একথা কি করে রক্ষা করা যায় যে দেবতাবৃন্দ হলেন এক বিশ্বগত দেবের বিভিন্ন ব্যক্তিরূপ? দেবতাদের নামগুলির অর্থই স্মরণ করিয়ে দেয় যে এগুলি হল শুধু বিশেষণ, অর্থবান নাম, বর্ণনা, ব্যক্তিগত আখ্যা নয়। মিত্র হ'লেন দেবপ্রেম ও সুষমার অধিপতিরূপে, ভগ ভোগের প্রভুরূপে, সূর্য্য প্রজ্ঞার অধিপতিরূপে, বরুণ সর্বব্যাপক বৃহৎ

ও যে ভগবান জগতকে ধারণ করেন ও তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করেন তাঁর শুদ্ধিরূপে। "একং সৎ", বলেছেন ঋষি দীর্ঘতম, "বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"; "কিন্তু বিপ্রেরা জ্ঞানীরা, তাকে নানাভাবে প্রকাশ করেন, তাঁরা বলেন ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অগ্নি, তাঁরা তাকে অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা বলেন।" বৈদিকজ্ঞানের প্রথমযুগে দীক্ষিতদের এই স্পষ্ট বিবৃতির কোন প্রয়োজন ছিল না। দেবতাদের নামগুলিই তাঁর কাছে তাঁদের তাৎপর্য্য বহন করত ও যে মৌলিক সত্য সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকত তাকে স্মরণ করিয়ে দিত।

কিন্তু পরবর্তী যুগে ঋষিদের দ্বারা ব্যবহৃত উপায়টিই বৈদিক জ্ঞানের রক্ষার বিরোধী হল। কারণ ভাষা তার স্বভাব বদলে ফেলল, আপন পূর্বতন নমনীয়তা অস্বীকার করল, পুরাতন পরিচিত অর্থ সব ত্যাগ করল; শব্দ সংকুচিত হয়ে পড়ল ও বাহ্যিক ও বাস্তব অর্থে গুটিয়ে গেল। ভৌতিক আহুতির মধ্যে আনন্দের স্বর্গীয় আসব বিস্মৃত হয়ে গেল; ঘৃতের আলেখ্য শুধু কাল্পনিক দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত বস্তুর কথা স্মরণ করিয়ে দিল, অগ্নি, মেঘ আর দুরন্ত ঝড়ের অধিপতি, যাদের জড়শক্তি ও বাহ্যিক চাকচিক্য ছাড়া আর কিছুই নেই। অক্ষর রইল বেঁচে যখন তার আত্মা হ'য়ে গেল বিস্মৃত; প্রতীক ও মতবাদের কাঠামো থাকলো, কিন্তু জ্ঞানের আত্মা তার আচ্ছাদন থেকে পালিয়ে চলে গেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অগ্নি ও সত্য

ঋগ্বেদ তার সকল অংশেই এক। ইহার দশটি মণ্ডলের যেটিকেই আমরা নিই না কেন, আমরা একই তত্ত্ব, একই সব ভাবনা, একই সব চিত্র, একই সব পদসমষ্টি পাই। ঋষিরা একটিমাত্র সত্যের দ্রষ্টা এবং ইহাকে প্রকাশ করার জন্য এক সমান ভাষা ব্যবহার করেন। স্বভাবে ও ব্যক্তিত্বে তাঁরা ভিন্ন; কারও প্রবণতা হ'ল বৈদিক প্রতীক্-তন্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ, সূক্ষ্ম ও গভীরভাবে ব্যবহার করা; অন্যেরা তাঁদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বলেন আরো অলংকারশূন্য ও সরল কথায় যাতে মননের উর্বরতা, কবিত্বময় চিত্রের সমৃদ্ধি অথবা আভাসনের গভীরতা ও পূর্ণতা কম। প্রায়শঃই একই ঋষির গীতিগুলির মধ্যে কিছুর প্রকাশভঙ্গি অত্যন্ত সরল এবং কিছুর অতীব অদ্ভুত সমৃদ্ধ। অথবা একই সূক্তে উত্থান ও পতন আছে; যজ্ঞের সাধারণ প্রতীকের অতি সাধারণ সব রীতি থেকে সুরু ক'রে ইহা অগ্রসর হ'য়েছে নিবিড় ও জটিল ভাবনায়। কতকগুলি সূক্তের ভাষা সাদাসিধে এবং প্রায় আধুনিক; অন্যগুলি আবার প্রথমেই তাদের বিচিত্র অস্পষ্টতার নিদর্শনে আমাদের অবোধ্য। কিন্তু পদ্ধতির এই সব পার্থক্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির ঐক্যের কিছুই নষ্ট হয় না, আবার নির্দিষ্ট সংজ্ঞাগুলির ও সাধারণ সূত্রসমূহের তারতম্যের কারণে ইহারা জটিলতাপূর্ণও হয় না। যেমন মেধাতিথি কান্বর সুরমধুর স্বচ্ছতায়, তেমন দীর্ঘতমা ঔচথ্যের গভীর ও রহস্যময় রচনাভঙ্গিতে, যেমন বসিষ্ঠের সমতাপূর্ণ সমস্বরতায় তেমন বিশ্বামিত্রের শক্তিশালী ও তেজোময় সূক্তগুলিতে আমরা পাই জ্ঞানের সেই একই দৃঢ় প্রতিষ্ঠা এবং দীক্ষিতদের পবিত্র রীতিসমূহের প্রতি সেই একই ঐকান্তিক নিষ্ঠা।

বৈদিক রচনার এই বিশেষত্ব থেকে এই পাওয়া যায় যে ব্যাখ্যার যে পদ্ধতি আমি বর্ণনা করেছি তার সমর্থন দশটি মণ্ডলের মধ্য থেকে কতক-গুলি বিক্ষিপ্ত সূক্ত থেকে যেমন পাওয়া যায় ঠিক তেমনই পাওয়া যায় একটি মাত্র ঋষির সূক্তসমূহের যে কোন একটি ক্ষুদ্র সমষ্টি থেকে। আমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তি আদৌ সম্ভব নয় এই

দেখিয়ে যদি আমার এই ব্যাখ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা আমার উদ্দেশ্য হ'ত তাহ'লে আরো বিস্তারিত ও প্রভূত কাজের প্রয়োজন হ'ত। ইহার জন্য সমগ্র দশটি মণ্ডলেরই সমালোচনামূলক পরীক্ষা অপরিহার্য হ'ত। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, বৈদিক পদ "ঋতম্", সত্য সম্বন্ধে আমার যে ভাবনা তার সমর্থনে অথবা গাভী যে জ্যোতির প্রতীক্ তার সম্বন্ধে আমার ব্যাখ্যার সমর্থনে আমার কতর্ব্য হ'ত সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি উদ্ধৃত করা যাতে সত্যের ভাবনা বা গাভীর চিত্র বর্তমান এবং তাদের অর্থ ও পারিপার্শ্বিক ভাবনা পরীক্ষা ক'রে আমার তথ্যকে প্রতিষ্ঠা করা। অথবা যদি আমি প্রমাণ করতে ইচ্ছা করি যে বেদে ইন্দ্র তাঁর সব মনস্তাত্ত্বিক কার্যে সেই জ্যোতির্ময় মনের অধিপতি যাকে অভিহিত করা হয় তিনটি ভাস্বর রাজ্য, "রোচনা" সমেত "দ্যৌঃ" বা স্বর্গ বলে, তাহ'লে ইন্দ্রের উদ্দেশে রচিত সূক্তগুলি এবং যে সব অংশে বৈদিক লোক-সংস্থান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সেসব অংশ অনুরূপভাবে পরীক্ষা করা আমার কর্তব্য। আবার বেদের ভাবনাসমূহ এত পরস্পরের সহিত জড়িত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল যে অন্যান্য দেবতাদের, এবং সত্যের ভাবনার সহিত সংযুক্ত অপর সব গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক সংজ্ঞাগুলির এবং যে মানসিক দীপ্তির মধ্য দিয়ে মানব তাতে উপনীত হয় তাদের কিছু পরীক্ষা ব্যতীত পূর্বের পরীক্ষাও যথেষ্ট হ'ত না। আমার ব্যাখ্যার সমর্থনে এরূপ এক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি আর আমি আশা করি যে বৈদিক সত্য সম্বন্ধে, বেদের দেবতাদের সম্বন্ধে এবং বৈদিক সব প্রতীক্ সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনায় আমার কার্য সম্পূর্ণ করব। কিন্তু এই প্রভূত পরিমাণের কার্য বর্তমান গ্রন্থের সীমা ছাড়িয়ে যাবে, কারণ এই গ্রন্থ শুধু আমার পদ্ধতির সমর্থনে কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়াতে এবং আমার প্রস্তাবিত ব্যাখ্যার ফল সম্বন্ধে এক সংক্ষিপ্ত বিবরণেই নিবদ্ধ।

আমার পদ্ধতির সমর্থনে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি প্রথম মণ্ডলের প্রথম এগারটি সূক্ত নিয়ে দেখাতে চাই যে কিভাবে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক বা এক একটি সূক্ত থেকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার কিছু কিছু কেন্দ্রীয় ভাবনা উদিত হয় এবং কিভাবে শ্লোকগুলির চারিপাশের ভাবনা এবং সূক্তগুলির সাধারণ ভাবনা এই গভীরতর চিন্তাপ্রণালীর আলোকে এক সম্পূর্ণ নূতন রূপ গ্রহণ করে।

ঋগ্বেদসংহিতাকে আমরা যেভাবে পেয়েছি তা দশটি গ্রন্থে বা মণ্ডলে

সাজান। এই সাজানর বিষয়ে দুইটি নিয়ম দেখা যায়। ছয়টি মণ্ডলে একটি মাত্র ঋষির বা একটি ঋষিকুলের সূক্তগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হ'য়েছে। এইভাবে, দ্বিতীয় মণ্ডলে প্রধানতঃ ঋষি গৎসমদের সূক্তগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হ'য়েছে, সেইরকম তৃতীয় ও সপ্তম মণ্ডলে আছে যথাক্রমে বিখ্যাত বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের সূক্তগুলি, চতুর্থে আছে বামদেবের ও ষষ্ঠটিতে ভরদ্বাজের। পঞ্চম মণ্ডল অত্রিপরিবারের সূক্তে পূর্ণ। এই সূক্তগুলির প্রতিটিতেই অগ্নির উদ্দেশে সূক্তগুলি প্রথমে একত্র সংগৃহীত হ'য়েছে এবং ইহাদের পরে আছে সেইসব সূক্ত যাদের দেবতা ইন্দ্র; বৃহস্পতি, সূর্য, রিভুগণ, উষা প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাদের আবাহনে মণ্ডলের সমাপ্তি। সমগ্র নবম মণ্ডলটি একটিমাত্র দেবতা সোমের উদ্দেশেই প্রযুক্ত। প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডলগুলি বিভিন্ন ঋষিদের দ্বারা রচিত সূক্তের সংগ্রহ কিন্তু সাধারণতঃ এক একটি ঋষির সূক্তগুলিই একত্র সাজান হয় দেবতাদের ক্রমানুসারে, প্রথমে থাকেন অগ্নি, পরে ইন্দ্র এবং তার পর অন্যান্য সব দেবতা। এইরকম, প্রথম মণ্ডলের প্রথমেই আছে বিশ্বামিত্রপুত্র মধুচ্ছন্দার দশটি সূক্ত এবং একাদশ সূক্তটি হ'ল মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃর। কিন্তু এই শেষ সূক্তটি রচনাশৈলীতে, প্রকাশভঙ্গিতে ও ভাবে ইহার আগের দশটি সূক্তের সমান এবং ভাব ও ভাষার দিক থেকে এই সবগুলিকেই একত্র একটিমাত্র সূক্তসমষ্টি বলে নেওয়া যায়।

এই বৈদিক সূক্তগুলির বিন্যাসে মনন-বিকাশের একটি বিশেষ নিয়মও বর্তমান। প্রথম মণ্ডলটি এমন কৌশলে রচিত যে নানাবিধ বিষয়সমূহের মধ্যে বেদের সাধারণ ভাবনা প্রতিষ্ঠিত প্রতীক্‌সমূহের আবরণে ক্রমশঃ উন্মোচিত হবে আর ইহা বলা হ'য়েছে এমন কতকগুলি ঋষির দ্বারা যাঁদের প্রায় সকলেই মনস্বী ও পবিত্র গায়ক ব'লে উচ্চ আসন অধিকার করেন এবং যাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বৈদিক ঐতিহ্যানুসারে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। আবার যে দশম বা শেষ মণ্ডলটিতে রচয়িতার সংখ্যা আরো বহুবিধ তাতে যে বেদের ভাবনার শেষ ভাবনাসমূহ এবং অতি আধুনিক ভাষায় রচিত কতকগুলি সূক্ত পাওয়া যায় তা-ও কোন আকস্মিক ঘটনা হ'তে পারে না। এইখানেই আমরা পাই পুরুষ-যজ্ঞের কথা এবং সৃষ্টি সম্বন্ধে মহান্ সূক্তটি। এইখানেই আবার আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন যে বেদান্তদর্শনের, ব্রহ্মবাদের প্রথম উৎপত্তি দেখা যায়।

যাই হোক, বিশ্বামিত্রের পুত্র ও পৌত্রের যে সূক্তগুলি নিয়ে ঋগ্বেদের

আরম্ভ তাতে বৈদিক সমস্বরতার প্রথম মূল হৃদয়গ্রাহী সুরগুলি পাওয়া যায়। অগ্নির উদ্দেশে প্রথম সূক্তটিতে সত্যের কেন্দ্রীয় ভাবনার আভাসন পাওয়া যায় আর তা দৃঢ় হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূক্তগুলিতে যাতে ইন্দ্রকে আবাহন করা হয় অন্য দেবতাদের সহিত আগমনের জন্য। অবশিষ্ট যে আটটি সূক্তে ইন্দ্রই প্রধান দেবতা—অবশ্য ইহাদের মধ্যে যে একটি ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের উদ্দেশে রচিত সেটি ছাড়া—আমরা পাই সোম ও গো-র প্রতীক্, বাধাদায়ক বৃত্রের কথা এবং মানবকে জ্যোতির পথে নিয়ে যাওয়ায় এবং তার উন্নতির পথে বাধাসমূহ উৎপাটন করায় ইন্দ্রের মহৎ কর্মসাধনের কথা। সুতরাং এই সূক্তগুলি বেদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পক্ষে নিরতিশয় গুরুত্বপূর্ণ।

অগ্নির উদ্দেশে সূক্তের পঞ্চম থেকে অষ্টম যে চারটি শ্লোকে মনস্তাত্ত্বিক অর্থ প্রতীকের আবরণ থেকে মুক্ত হ'য়ে অতি জোরালো ও সুস্পষ্টভাবে বাহির হ'য়ে আসে সেগুলি এই :

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ, সত্যচিত্রশ্রবস্তমঃ,
দেবো দেবেভির্ আগমৎ।
যদ্ অঙ্গ দাশুষে ত্বম্, অগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি,
তবেৎ তৎ সত্যম্ অঙ্গিরঃ।
উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে, দোষাবস্তর্ ধিয়া বয়ম্,
নমো ভরন্ত এমসি।
রাজন্তম্ অধ্বরাণাম্, গোপাম্ ঋতস্য দীদিবিম্
বর্ধমানাং স্বে দমে।

এই অংশে আমরা এমন কতকগুলি সংজ্ঞা পাই যাদের অর্থ স্পষ্টই মনস্তাত্ত্বিক অথবা যারা স্পষ্টতঃই মনস্তাত্ত্বিক অর্থের উপযোগী এবং চারিধারের সমগ্র অংশটিরই উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সায়ণ জোর ক'রে শুধু যাজ্ঞিক ব্যাখ্যারই কথা বলেন আর কেমন ক'রে তিনি এই ব্যাখ্যা করেন তা দেখা কৌতূহলজনক। প্রথম পদসমষ্টিতে আমরা "কবি" পদটি পাই যার অর্থ দ্রষ্টা আর এমন কি যদি আমরা "ক্রতু" পদটির অর্থ করি যজ্ঞের কর্ম তাহ'লে তার ফলে আমরা এই অর্থ পাই, "পুরোহিত অগ্নি যার কর্ম বা অনুষ্ঠান হ'ল দ্রষ্টার কর্ম বা অনুষ্ঠান", কিন্তু এই অনুবাদে তৎক্ষণাৎ যজ্ঞের প্রতীকাত্মক চরিত্র ফুটে ওঠে এবং ইহা নিজেই বেদের গভীরতর অর্থবোধের বীজ হবার পক্ষে যথেষ্ট।

সায়ণ অনুভব করেন যে এই বাধাকে যে কোন প্রকারে দূর করা চাই এবং সেজন্য তিনি "কবি"র যে অর্থ দ্রষ্টা তা ত্যাগ করে ইহাকে অন্য এক অস্বাভাবিক তাৎপর্য দেন। তারপর তিনি ব্যাখ্যা করেন যে অগ্নি "সত্য", সঠিক, কারণ তিনি যজ্ঞের সত্য ফল আনেন। সায়ণ "শ্রবস্"-এর অনুবাদ করেন যশ, অগ্নির এক নিরতিশয় নানাবিধ কীর্তি আছে। পদটিকে "সম্পদ" অর্থে নিলেই নিশ্চয়ই আরো ভাল হ'ত, কারণ তাতে এই শেষ অনুবাদের অসংলগ্নতা আসত না। তাহ'লে পঞ্চম শ্লোকের আমরা এই অনুবাদ পাই, "পুরোহিত অগ্নি যিনি অনুষ্ঠানে সক্রিয়, (তার ফলে) সত্য—কারণ তাঁরই সর্বাপেক্ষা বিচিত্র সম্পদ—তিনি আসুন, দেবতাদের সহিত এক দেবতা।"

ষষ্ঠ ঋক্ সম্বন্ধে ভাষ্যকার এক অতি অদ্ভুত ও অসংলগ্ন অন্বয় করেন এবং ইহাতে এমন এক তুচ্ছ ভাবনা প্রয়োগ করেন যাতে শ্লোকটির প্রবাহ সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়। "সেই মঙ্গল (বিচিত্র সম্পদের আকারে) যা তুমি দাতার জন্য সাধন করবে তা তোমারই। ইহা সত্য, হে অঙ্গিরা", অর্থাৎ এই তথ্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, কারণ যদি অগ্নি দাতাকে সম্পদ দিয়ে তার মঙ্গল করেন তাহ'লে সে ইহার প্রতিদানে অগ্নির উদ্দেশে আরো যজ্ঞসাধন করবে এবং এইভাবে যজ্ঞসাধকের মঙ্গল দেবতার মঙ্গল হ'য়ে ওঠে। এখানেও এইরূপ অনুবাদ করলে ভাল হয়, "যে মঙ্গল তুমি দাতার জন্য করবে, তাহা তোমার সেই সত্য, হে অঙ্গিরা", কারণ তৎক্ষণাৎ এক এক আরো সরল অর্থ ও অন্বয় পাই এবং যজ্ঞীয় অগ্নির দেবতা সম্বন্ধে যে বিশেষণ "সত্য" প্রয়োগ করা হ'য়েছে তা স্পষ্ট হয়। ইহাই অগ্নির সত্য যে যজ্ঞদাতাকে তিনি প্রতিদানে নিশ্চয়ই মঙ্গল দেন।

সপ্তম শ্লোকের বেলায় "আমরা নমস্কার বহন ক'রে আসি" এই অদ্ভুত পদসমষ্টি ছাড়া যাজ্ঞিক ব্যাখ্যায় অন্য কোন বাধা দেখা দেয় না। সায়ণ ব্যাখ্যা করেন যে এখানে "বহন করে"-র অর্থ শুধু "করে" এবং তিনি এইভাবে অনুবাদ করেন, "তোমার কাছে দিনের পর দিন আমরা রাত্রিতে ও দিবসে আসি মনন নিয়ে নমস্কার সাধন ক'রে।" অষ্টম শ্লোকে তিনি "ঋতস্য" পদটিকে সত্যের অর্থে গ্রহণ করেন এবং ইহাকে অনুষ্ঠানের সত্যফল ব'লে ব্যাখ্যা করেন। "ভাস্বর তোমাকে, যে যজ্ঞসমূহের রক্ষাকর্তা, সর্বদা প্রকাশ করছ তাদের সত্য (অর্থাৎ তাদের অবশ্যম্ভাবী ফল), বৃদ্ধি পাচ্ছ তোমার স্বীয় ধামে।" আবার "ঋতম্"কে যজ্ঞের অর্থে

নিয়ে "যজ্ঞসমূহের মধ্যে দীপ্যমান তোমাকে, যে অনুষ্ঠানের রক্ষক, সদা জ্যোতির্ময়, তোমার স্বীয় ধামে বর্ধনশীল"—এইভাবে অনুবাদ করলে আরো সরল ও ভাল হয়। ভাষ্যকার বলেন অগ্নির "স্বীয় ধাম" যজ্ঞের স্থান এবং বাস্তবিক পক্ষে ইহাকেই সংস্কৃতে প্রায়শঃই বলা হয় "অগ্নি-গৃহ"।

সুতরাং আমরা দেখছি, যে অংশটিকে প্রথম দৃষ্টিতেই মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের প্রচুর সম্পদপূর্ণ বলে মনে হয় তাকে কিছু কৌশল করে সম্পূর্ণ ভাবনা-শূন্য কেবলমাত্র এক যাজ্ঞিক অর্থ দেওয়া সম্ভব। তবু যতই কৌশ-লের সহিত তা করা হোক না কেন, এমন সব ত্রুটি ও ছিদ্র থেকে যায় যাতে এইরূপ ব্যাখ্যার কৃত্রিমতা প্রকাশ পায়। 'কবি'র যে সরল অর্থ বেদে বরাবর তাতে সংশ্লিষ্ট থাকে তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে ইহাকে এক অপ্রকৃত অর্থে প্রয়োগ করতে হয়। "সত্য" ও "ঋত" যে দুটি পদ বেদে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত তাদের হয় বিচ্ছিন্ন করতে হয় অথবা "ঋত" পদটিতে একটি কষ্টকল্পিত অর্থ দিতে হয়। আর ঋষিদের ভাষার দ্বারা সেসব স্বাভাবিক আভাসন আমাদের উপর জোর ক'রে আসে সে সবকে বরাবর ত্যাগ করতে হয়।

ইহার পরিবর্তে এখন এক বিপরীত নিয়ম অনুসরণ করা যাক এবং আন্তরপ্রেরণা থেকে রচিত মূল গ্রন্থের কথাগুলিকে তাদের পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক মূল্য দেওয়া হোক। সংস্কৃতে "ক্রতু"-র অর্থ কর্ম বা ক্রিয়া এবং বিশেষ ক'রে যজ্ঞের অর্থে কর্ম; কিন্তু ইহার অর্থ আবার কর্মসাধক সামর্থ্য বা বল (গ্রীক্ ক্রাতোস, Kratos)। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ক্রিয়ার এই কর্ম-সাধক সামর্থ্য হ'ল সংকল্প। পদটির অর্থ মন বা বুদ্ধিও হ'তে পারে এবং সায়ণ স্বীকার করেন যে "ক্রতু"-র অর্থ মনন বা জ্ঞান হওয়াও সম্ভব। আক্ষরিক-ভাবে "শ্রবস্" পদটির অর্থ শ্রবণ এবং এই মুখ্য তাৎপর্য থেকে ইহার গৌণ অর্থ "যশ" এসেছে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকভাবে সংস্কৃতে শ্রবণের ভাবনা থেকে অন্য একটি অর্থ আসে যা দেখা যায় "শ্রবণ", "শ্রুতি", "শ্রুত" পদগুলিতে, অর্থাৎ দিব্যপ্রকাশিত জ্ঞান, আন্তর প্রেরণা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান। "দৃষ্টি" ও "শ্রুতি", দর্শন ও শ্রবণ, দিব্যপ্রকাশ ও আন্তর প্রেরণা এই দুটি সত্য, "ঋতম্"-এর প্রাচীন বৈদিক ভাবনার অন্তর্গত অতিমানসিক শক্তির দুই প্রধান সামর্থ্য। শব্দকোষপ্রণেতারা "শ্রবস্" পদটিকে এই অর্থে দেখেন না কিন্তু ইহাকে সূক্তের অর্থে,—বেদের চিদাবিষ্ট (আন্তরপ্রেরিত)

বাণী অর্থে গ্রহণ করেন। ইহা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এক সময় ইহাতে চিদাবেশের ভাবনা অথবা বাণী বা জ্ঞান যাই হোক না কেন চিদাবিষ্ট কিছুর ভাবনা বর্তমান ছিল। তাহ'লে অন্ততঃ সাময়িকভাবে আমরা এই অংশে এই পদটিতে সঙ্গত কারণেই এই তাৎপর্য দিতে পারি; অন্য যে অর্থ যশ তা সমগ্র অংশটির ভাবনার সহিত সম্পূর্ণ অসংলগ্ন ও অর্থহীন। আবার "নমস্" পদটিরও এক মনস্তাত্ত্বিক অর্থ হওয়া সম্ভব; কারণ আক্ষরিকভাবে ইহার অর্থ "নত হওয়া", এবং ইহাকে প্রয়োগ করা হয় দেবতার নিকট ভক্তির সহিত প্রপত্তির কাজে যাকে স্থূলভাবে দেখান হয় দেহের ভূমিষ্ঠ প্রণাম দিয়ে। সুতরাং যখন ঋষি "মননের দ্বারা অগ্নির নিকট নমস্কার বহন করার" কথা বলেন, তখন আমাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে তিনি "নমস্" পদটিতে আন্তর প্রণতির মনস্তাত্ত্বিক অর্থ প্রয়োগ করেন।

তাহ'লে আমরা চারটি শ্লোকের এই অনুবাদ করি:—

"যে অগ্নি নিবেদনের পুরোহিত, কর্মের প্রতি যাঁর সংকল্প দ্রষ্টার সংকল্পের ন্যায়, যিনি সত্য এবং বিচিত্র আন্তরপ্রেরণায় সমৃদ্ধ তিনি আসুন, এক দেবতা দেবতাদের সহিত।

"যে মঙ্গল তুমি দাতার জন্য সৃষ্টি করবে তাহা তোমারই সেই সত্য, হে অঙ্গিরা।

"তোমার নিকট দিনের পর দিন, হে অগ্নি রাত্রিতে ও আলোকে আমরা মনন দিয়ে আসি আমাদের প্রপত্তি বহন ক'রে,—

"তোমার নিকট যে তুমি সকল যজ্ঞ থেকে দীপ্ত হ'য়ে ওঠ (অথবা যে তুমি যজ্ঞসমূহ চালনা কর), সত্যের এবং ইহার দীপ্তির রক্ষক, তোমার স্বীয় ধামে বৃদ্ধি পাচ্ছ।"

এই অনুবাদের এই ত্রুটি যে "সত্যম্" ও "ঋতম্"-র জন্য আমাদের একই পদ ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু যেমন "সত্যম্ ঋতম্ বৃহৎ"—এই সূত্রের মধ্যে দেখা যায়, বেদের ঋষিদের মনে এই দুটি পদের সঠিক তাৎপর্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

তাহ'লে এই দেব অগ্নি কে যার উদ্দেশে এত রহস্যময় তেজোময় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং যাঁকে অত বিরাট ও গভীর কার্য দেওয়া হয়েছে? কে এই সত্যের রক্ষক যিনি তাঁর কর্মে ইহার দীপ্তি, কর্মের মধ্যে কার সংকল্প এমন এক দ্রষ্টার সংকল্প যিনি তাঁর সমৃদ্ধ ও বিচিত্র আন্তরপ্রেরণার

নিয়ামক দিব্যপ্রজ্ঞাসম্পন্ন? কি এই সত্য যা তিনি রক্ষা করেন? আর কি এই মঙ্গল যা তিনি দাতার জন্য সৃজন করেন যে তাঁর কাছে সর্বদা দিবসে ও রাত্রিতে মননে আসে তার যজ্ঞরূপে প্রপত্তি ও আত্ম-সমর্পণ বহন ক'রে? ইহা কি স্বর্ণ, অশ্ব এবং গরুর দল যা তিনি আনেন অথবা কোন দিব্যতর ঐশ্বর্য?

যজ্ঞীয় অগ্নি এই সব কার্যসাধনে সক্ষম নয় অথবা ভৌতিক উত্তাপ ও আলোকের কোন জড়ীয় শিখা বা তত্ত্বও ইহা হ'তে পারে না। অথচ বরাবর যজ্ঞীয় অগ্নির প্রতীক্ রাখা হ'য়েছে। ইহা স্পষ্ট যে আমরা এক রহস্যময় প্রতীক্-তন্ত্রের সম্মুখে এসেছি যাতে অগ্নি, যজ্ঞ, পুরোহিত এক গভীরতর শিক্ষার শুধু বাহ্য মূর্তি অথচ এগুলি এমন সব মূর্তি যা সর্বদা সম্মুখে রাখা ও ধারণ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হ'ত।

উপনিষদসমূহের আদি পর্বের বৈদান্তিক শিক্ষায় আমরা সত্যের এমন এক ভাবনা পাই যা প্রায়ই প্রকাশ করা হয় বেদের সূক্তগুলি থেকে লওয়া সব সূত্রের দ্বারা যেমন সেই পদসমষ্টি যা আগেই উদ্ধৃত করা হ'য়েছে—"সত্যম্ ঋতং বৃহৎ", সত্য, যথার্থ; বিরাট। বেদে এই সত্য সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা যেন এক পথ যা আনন্দে নিয়ে যায়, অমৃতত্বে নিয়ে যায়। উপনিষদগুলিতেও এই সত্যের পথ দিয়ে জ্ঞানী বা দ্রষ্টা, ঋষি বা কবি উত্তীর্ণ হন। তিনি উত্তীর্ণ হন অনৃতের মধ্য থেকে, মর্ত্য অবস্থার মধ্য থেকে এক অমৃতময় অস্তিত্বের মধ্যে। সুতরাং বেদ ও বেদান্ত; উভয়েই সেই একই ভাবনার কথা বলা হ'য়েছে তা ধরে নেওয়ায় আমাদের অধিকার আছে।

এই মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা এমন এক সত্যের ভাবনা যা দিব্য তত্ত্বের সত্য, ইহা কোন মর্ত্য ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও বাহ্য রূপের সত্য নয়। ইহা "সত্যম্", সত্তার সত্য; ইহার ক্রিয়ায় ইহা "ঋতম্", যথার্থ—দিব্য সত্তার সত্য যা মন ও দেহ উভয়েরই যথার্থ সক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করে; ইহা "বৃহৎ", সেই বিশ্বজনীন সত্য যা সোজা ও অবিকৃতভাবে আসে অনন্তের মধ্য থেকে। ইহার অনুরূপ যে চেতনা তা-ও অনন্ত, "বৃহৎ" বিশাল যার বিপরীত হ'ল সীমাবদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়মানসের চেতনা। এক-টিকে বলা হয় "ভূমা", মহৎ, অন্যটিকে বলা হয় "অল্প", ক্ষুদ্র। এই অতিমানসিক বা সত্য-চেতনার অন্য নাম হ'ল "মহঃ" যেটিরও অর্থ মহৎ, বিরাট। ইন্দ্রিয়-সংবিৎ ও বাহ্যরূপের যে তথ্যগুলি মিথ্যায় পূর্ণ

("অনৃতম্", অসত্য অথবা মানসিক ও দৈহিক ক্রিয়ায় "সত্যম্"-এর ভ্রান্ত প্রয়োগ) তাদের যন্ত্ররূপে আমরা যেমন পাই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-মানস ("মনস্") এবং বুদ্ধিশক্তি যা তাদের সাক্ষ্যের উপর কাজ করে তেমন সত্য-চেতনার বেলায় অনুরূপ শক্তি আছে—"দৃষ্টি", শ্রুতি", "বিবেক", সত্যের সরাসরি দর্শন, ইহার বাণীর সরাসরি শ্রবণ ও যথার্থের সরাসরি বিবেচনা। যে কেহ এই সত্য-চেতনার অধিকারী অথবা এইসব শক্তির ক্রিয়ায় উন্মুক্ত, তিনিই ঋষি বা কবি, জ্ঞানী বা দ্রষ্টা। "সত্যম্" ও "ঋতম্", সত্যের এই সব ভাবনাকেই আমাদের প্রয়োগ করতে হবে বেদের এই প্রথম সূক্তে।

বেদে অগ্নিকে সর্বদাই শক্তি ও আলোক, এই দুই বিভাবে উপস্থাপিত করা হয়। তিনিই সেই দিব্য শক্তি যা জগৎসমূহ গঠন করে, এমন শক্তি যা সর্বদাই কাজ করে পূর্ণজ্ঞানের সহিত, কারণ ইহা "জাতবেদস্", সকল জাতবিষয়ের জ্ঞাতা, "বিশ্বানি বয়ুনানি বিদ্বান্"—ইহা সকল অভিব্যক্তি বা ঘটনা জানে অথবা দিব্য প্রজ্ঞার সকল রূপ ও ক্রিয়াবৃত্তির অধিকারী। উপরন্তু ইহা বারবার বলা হ'য়েছে যে দেবগণ অগ্নিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন মর্ত্যগণের মধ্যে অমর্ত্যরূপে, মানবের মধ্যে দিব্য শক্তিরূপে, সার্থকতার সেই ক্রিয়াশক্তিরূপে যার মধ্য দিয়ে তাঁরা তার মাঝে তাঁদের কর্মসাধন করেন। এই কর্মেরই প্রতীক্ হ'ল যজ্ঞ।

তাহ'লে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে আমরা অগ্নিকে নিতে পারি সেই দিব্য-সংকল্প ব'লে যা দিব্য প্রজ্ঞার দ্বারা সম্পূর্ণ চিদাবিষ্ট এবং বস্তুতঃ ইহার সহিত এক এবং যা সত্য-চেতনার সক্রিয়া বা কার্যসাধিকা শক্তি। "কবি-ক্রতুঃ" পদটির ইহাই স্পষ্ট অর্থ, তিনিই কবিক্রতু যাঁর সংক্রিয় সংকল্প অথবা কার্যসাধনের শক্তি দ্রষ্টার মতো, অর্থাৎ যিনি কাজ করেন সত্য-চেতনার দ্বারা আগত জ্ঞান নিয়ে যাতে কোন ভ্রান্ত প্রয়োগ বা প্রমাদ নেই। ইহার পর যে বিশেষণগুলি প্রয়োগ করা হ'য়েছে তাতে এই ব্যাখ্যা দৃঢ় হয়। অগ্নি "সত্য", তাঁর সত্তায় সঠিক, তাঁর নিজের সত্যের উপর এবং বিষয়-সমূহের মূল সত্যের উপর তাঁর পূর্ণ অধিকার তাকে এমন শক্তি দেয় যা তিনি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ ক'রতে পারেন সকল কর্মে ও শক্তির গতিবৃত্তিতে। তিনি "সত্যম্" ও "ঋতম্", এই দুয়েরই অধিকারী। তাছাড়া, তিনি "সত্য-চিত্রশ্রবস্তমঃ"; "ঋতম্" থেকে সমৃদ্ধভাবে দীপ্ত ও বিচিত্র সব আন্তরপ্রেরণা উৎসারিত হয় যা সুষ্ঠু কর্মসাধনের সামর্থ্য দেয়। কারণ এই সব বিশেষণ

অগ্নির যিনি "হোতৃ", যজ্ঞের পুরোহিত, নিবেদনের কাজ সাধন করেন। সুতরাং অগ্নির এই যে শক্তি যাতে তিনি সত্যকে প্রয়োগ করতে পারেন কর্মে ("কর্ম" বা "অপস্") যার প্রতীক্ হ'ল যজ্ঞ সেই শক্তির জন্য তিনি মানবের দ্বারা আবাহনের পাত্র হন। বাহ্য অনুষ্ঠানে যজ্ঞীয় অগ্নির গুরুত্ব হ'ল অন্তর্মুখী অনুষ্ঠানের মধ্যে একীভূত জ্যোতি ও শক্তির এই আভ্যন্তরীণ শক্তির গুরুত্বের অনুরূপ আর ইহার দ্বারাই মর্ত্য ও অমর্ত্যের মধ্যে যোগাযোগ ও আদানপ্রদান হয়। অন্যত্র অগ্নিকে প্রায়শঃই বর্ণনা করা হয় "দূত" ব'লে, ঐ যোগাযোগ ও আদানপ্রদানের মাধ্যম ব'লে।

তাহ'লে আমরা দেখতে পাই অগ্নিকে যে যজ্ঞে আবাহন করা হয় তা কি কাজের জন্য। "তিনি আসুন, এক দেব দেবগণের সহিত।" "দেবো দেবেভিঃ", এই পুনরুক্তির দ্বারা দিব্যত্বের ভাবনার উপর যে জোর দেওয়া হ'য়েছে তা বোধগম্য হয় যখন আমরা স্মরণ করি যে অগ্নিকে নিয়তই বলা হয় মানুষদের মধ্যে দেবতা ব'লে, মর্ত্যগণের মধ্যে অমর্ত্য, দিব্য অতিথি ব'লে। "তিনি আসুন, এক দিব্যশক্তি সকল দিব্যশক্তির সহিত" এই অনুবাদের মধ্যে পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক অর্থটি দেওয়া যেতে পারে। কারণ বেদের বাহ্য অর্থে দেবতারা হ'লেন ভৌতিক প্রকৃতির সব সার্বিক শক্তি যাদের ব্যক্তিভাবাপন্ন করা হ'য়েছে; যে কোন আন্তর অর্থে তাঁরা নিশ্চয়ই প্রকৃতির আন্তর ক্রিয়াবলীর, সংকল্প, মন ইত্যাদির সার্বিক শক্তি। কিন্তু বেদে এই সব শক্তির সাধারণ মানুষী বা মানসিক ক্রিয়া, "মনুষ্বৎ" ও দিব্যক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই এক পার্থক্য আছে। ইহা মনে করা হয় দেবতাদের উদ্দেশে আন্তর যজ্ঞে তাদের মানসিক ক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহারের দ্বারা মানব সে সবকে পরিণত করতে পারে তাদের প্রকৃত অথবা দিব্য প্রকৃতিতে, মর্ত্য হ'য়ে উঠতে পারে অমর্ত্য। এইভাবে ঋভুগণ যাঁরা প্রথমে মানুষ ছিলেন অথবা মানবীয় শক্তিসমূহের প্রতিভূ ছিলেন তাঁরা কর্মে সুষ্ঠুতার দ্বারা, "সুকৃত্যয়া" "স্বপস্যয়া" দিব্য ও অমর শক্তি হ'য়ে উঠেছিলেন। দিব্য শক্তির নিকট মানুষের নিরন্তর আত্ম-নিবেদন এবং মানবের মাঝে দিব্যশক্তির নিরন্তর অবতরণ—ইহারই প্রতীক্ মনে হয় যজ্ঞ।

এইভাবে যে অমৃতত্বের অবস্থা পাওয়া যায় তাকে ভাবা হয় এমন এক পরমসুখ বা আনন্দের অবস্থা ব'লে যা প্রতিষ্ঠিত পূর্ণ সত্য ও যথার্থক্রিয়ার উপর, "সত্যম্ ঋতম্"। আমার মনে হয় পরবর্তী শ্লোকটিকে এই অর্থেই আমাদের বোঝা কর্তব্য। "যে মঙ্গল (সুখ) তুমি দাতার জন্য সৃজন

করবে তাহা তোমার ঐ সত্য, হে অগ্নি"। অন্য কথায় বলা যায়, এই সত্যের সার যা অগ্নির প্রকৃতি তা হ'ল অশুভ থেকে মুক্তি, পূর্ণ মঙ্গল ও সুখের অবস্থা যা "ঋতম্" নিজের মধ্যে বহন করে এবং যা মর্ত্যের মধ্যে নিশ্চিত সৃষ্ট হবে দিব্য পুরোহিতরূপী অগ্নির ক্রিয়ার দ্বারা যখন সে যজ্ঞ নিবেদন করে। "ভদ্রম্" পদটির অর্থ যা কিছু মঙ্গলময়, শুভ, সুখময় এবং ইহার মধ্যে কোন গভীর তাৎপর্য থাকার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা দেখি যে বেদে ইহাকে "ঋতম্"-এর মতো এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। একটি সূক্তে (৫-৮২-৪৪) ইহাকে বর্ণনা করা হ'য়েছে অশুভ স্বপ্নের ("দুঃস্বপ্ন্যম্") বিপরীত ব'লে, যা "ঋতম্" নয় তার মিথ্যা চেতনা ব'লে, "দুরিতম্", মিথ্যা গমন অর্থাৎ সকল অশুভ ও কষ্টভোগের বিপরীত বলে। সুতরাং "ভদ্রম্"-এর সমার্থক হ'ল "সুবিতম্", সত্য গমন যার অর্থ "ঋতম্"-এর, সত্যের অবস্থার অন্তর্গত সকল মঙ্গল ও পরম সুখ। ইহা "ময়স্", পরমসুখ, এবং দেবতারা যাঁরা সত্য-চেতনার প্রতিভূ তাঁদের বলা হয় "ময়োভুবঃ" ব'লে, যাঁরা তাঁদের সত্তায় পরম সুখ আনেন বা বহন করেন। এইভাবে দেখা যায় যে বেদের প্রতি অংশটি সঠিকভাবে বোঝা হ'লে অন্য সব অংশের উপর আলোকপাত করে। যখন আমরা ইহার সব আচরণের দ্বারা ভুল পথে চালিত হই, কেবল তখনই আমরা ইহার মধ্যে অসংলগ্নতা দেখি।

পরের শ্লোকে মনে হয় ফলপ্রসূ যজ্ঞের অবস্থার কথা বলা হ'য়েছে। অগ্নিরূপী দিব্যসংকল্প ও প্রজ্ঞার নিকট দিনের পর দিন, রাত্রিতে ও আলোকে প্রপত্তি, আরাধনা, আত্ম-সমর্পণের সহিত মানবের অন্তঃস্থ মননের নিরন্তর আশ্রয় ইহা। রাত্রি ও দিবা, "নক্তোষাসা"—ইহারাও বেদে অন্যান্য দেবতাদের মতো প্রতীকার্থক্, আর মনে হয় ইহার অর্থ দীপ্ত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন, যাই হোক না কেন চেতনার সকল অবস্থাতেই দিব্য নিয়ন্ত্রণের নিকট সকল ক্রিয়াবলীর নিরন্তর প্রপত্তি ও আনুগত্য।

কারণ দিনেই হোক বা রাত্রিতেই হোক, অগ্নি যজ্ঞসমূহের মধ্যে দীপ্ত হ'য়ে ওঠেন; তিনি মানবের মাঝে সত্যের, "ঋতম্"-এর রক্ষক এবং ইহাকে রক্ষা করেন অন্ধকারের বিভিন্ন শক্তি থেকে; তিনি ইহার সতত দীপ্তি যা প্রজ্জ্বলিত থাকে এমনকি মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শত্রু-বেষ্টিত অবস্থাসকলের মধ্যেও। অষ্টম শ্লোকে যে সব ভাবনা এইভাবে সংক্ষেপে দেখান হ'য়েছে তা সর্বদাই দেখা যায় ঋগ্বেদে অগ্নির উদ্দেশে

সকল সূক্তেই।

শেষকালে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি স্বীয় ধামে বৃদ্ধি পান। যে ব্যাখ্যায় অগ্নির স্বীয় ধামকে বলা হয় যে ইহা বৈদিক গৃহস্থের "অগ্নি-গৃহ" সে ব্যাখ্যায় আমরা আর সন্তুষ্ট হ'তে পারি না। অন্য ব্যাখ্যার জন্য আমাদের কর্তব্য বেদের মধ্যেই অন্বেষণ করা আর আমরা তা পাই প্রথম মণ্ডলের ৭৫তম সূক্তে।

"যজা নো মিত্রাবরুণা, যজা দেবান্ ঋতং বৃহৎ,
অগ্নে যক্ষি স্বং দমম্" (১-৭৫-৫)।

"যজ্ঞ কর আমাদের জন্য মিত্র ও বরুণের নিকট, যজ্ঞ কর দেব-গণের নিকট, সত্য ও বৃহৎ-এর নিকট; হে অগ্নি, যজ্ঞ কর তোমার স্বীয় ধামে।"

এখানে মনে হয় "ঋতং বৃহৎ" ও "স্বং দমম্" যজ্ঞের লক্ষ্যস্থলের কথাই প্রকাশ করে এবং ইহা বেদের সেই চিত্ররূপের সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত যাতে যজ্ঞকে প্রায়শঃই দেখান হয় দেবতাদের অভিমুখে যাত্রা রূপে এবং স্বয়ং মানবকেই বলা হয় সত্য, আলোক বা পরমসুখের দিকে যাত্রাকারী পথিক ব'লে। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে সত্য, বৃহৎ এবং অগ্নির স্বীয় ধাম একই বিষয়। অগ্নি ও অন্যান্য দেবগণ সম্বন্ধে প্রায়শঃই বলা হয় যে তাঁরা সত্যের মধ্যে জন্মেছেন এবং বিস্তার বা বৃহতের মধ্যে বাস করেন। তাহ'লে আমাদের অংশে এই অর্থ হবে যে, মানবের অন্তঃস্থ দিব্যসংকল্প ও শক্তি যে অগ্নি তা বৃদ্ধি পায় সত্য-চেতনার মধ্যে, ইহার যথার্থ ক্ষেত্রে যেখানে মিথ্যা সীমাগুলি ভেঙে পড়ে বিস্তৃত ও সীমাহীনের মধ্যে, "উরাব্ অনিবাধে"।

এইভাবে বেদের প্রথম সূক্তের এই চারটি শ্লোকে বৈদিক ঋষিদের প্রধান ভাবনাগুলির প্রথম নিদর্শনগুলি পাই—এক অতিমানসিক ও দিব্য সত্য-চেতনার ভাবনা, সত্যের শক্তিরূপে দেবতাদের আবাহন যাতে তাঁরা মানবকে তোলেন মর্ত্যমনের মিথ্যাসমূহের মধ্য থেকে এবং এই সত্যের মধ্যে ও এই সত্যের দ্বারা পূর্ণ কল্যাণ ও আনন্দের এক অমর অবস্থাপ্রাপ্তি এবং দিব্য পূর্ণতাসাধনের উপায়রূপে অমর্ত্যের উদ্দেশে মর্ত্যের দ্বারা তার যা আছে এবং যা সে নিজে সেসবের আন্তর যজ্ঞ ও নিবেদন। এইসব কেন্দ্রীয় ভাবনার চারিদিকেই বৈদিক মননের অবশিষ্ট সব তার আধ্যাত্মিক দিকগুলিতে একত্র করা হ'য়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

বরুণ মিত্র ও সত্য

বেদের একেবারে প্রথম মন্ত্রে আমরা সত্যের যে ধারণা পেয়েছি, তা যদি সত্যই আমরা তার অন্তর্গত যে সব ভাব আছে বলে মনে করছি, তা বহন করে, ও তা যদি হয় এক অতিমানস চেতনা যা অমৃতের অবস্থার সর্ত হয়, ও এই যদি বৈদিক ঋষিদের প্রধান ভাব হয়, তাহ'লে আমরা তাকে তার উপর নির্ভরশীল অন্য মনস্তাত্ত্বিক উপলব্ধির কেন্দ্র হিসাবে সমস্ত মন্ত্রগুলির মধ্যেই পুনরাবৃত্ত দেখবো নিশ্চয়ই। ঠিক পরের সূক্তেই--ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশ্যে মধুচ্ছন্দার দ্বিতীয় মন্ত্রে---আমরা আর একটি অংশ পাই যা স্পষ্ট ও এইবার বেশ অনস্বীকার্য্য তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ আর তাতে ঋতম্-এর ধারণার উপর অগ্নির মন্ত্রে যতটা তার চেয়েও বেশী দৃঢ়তার সঙ্গে তা উক্ত হয়েছে। এই অংশটীতে সূক্তটির শেষ তিনটি ঋক্ আছে:

মিত্রম্ হুবে পূতদক্ষম্ বরুণম্ চ রিসাদসম্,
ধিয়ম্ ঘৃতাচীম্ সাধন্তা।
ঋতেণ মিত্রাবরুণা, ঋতাবৃধা ঋতস্পৃশা,
ক্রতুম্ বৃহন্তম্ আশাথে।
কবি নো মিত্রাবরুণা তুবিজাতা উরুক্ষয়া,
দক্ষম্ দধাতে অপসম্॥

এই অংশটির প্রথম ঋকে আমরা পাচ্ছি দক্ষ শব্দটি যা সায়ণ সাধারণতঃ বল বা বীর্য্য বলে ব্যাখ্যা করেন কিন্তু যার একটা তাত্ত্বিক অর্থ থাকতে পারে, ও গুরুত্বপূর্ণ শব্দ 'ঘৃত' তার বিশেষণ 'ঘৃতাচী'তে ও লক্ষ্যণীয় বাক্যাংশ 'ধিয়ম্ ঘৃতাচীম্'। ঋকটির এইরূপ শব্দানুসারী অনুবাদ করা যেতে পারে--"আমি আবাহন করি পবিত্রীকৃত বীর্য্য যাঁর (বা, শুদ্ধীকৃত বিবেক যাঁর) সেই মিত্রকে ও শত্রুধ্বংসকারী, দীপ্তিমান্ বুদ্ধির সিদ্ধিকর্তা (বা, সম্পাদক) বরুণকে।"

দ্বিতীয় ঋকে 'ঋতম্' তিনবার পুনরাবৃত্ত, 'বৃহৎ' ও 'ক্রতু' আছে, বেদের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় যে শব্দ দুটির প্রতি আমরা বেশ গুরুত্ব আরোপ

করেছি, ক্রতুর মানে এখানে হ'তে পারে যজ্ঞের অনুষ্ঠান (যজ্ঞ কর্ম) বা ফলপ্রসবিনীশক্তি। প্রথম অর্থটির সমর্থনে আমরা আর একটি অংশ পাই যাতে বলা হয়েছে যে বরুণ ও মিত্র সত্যের দ্বারা একটি মহান্ যজ্ঞ প্রাপ্ত হন বা ভোগ করেন, 'যজ্ঞম্ বৃহন্তম্ আশাথে'। কিন্তু এই সদৃশ অংশটি থেকে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না; কারণ একদিকে যেমন একটি শব্দে বস্তুতঃ যজ্ঞেরই কথা বলা হয়েছে, অন্যটির অর্থ হতে পারে শক্তি বা বল যা যজ্ঞ সম্পাদন করে। ঋক্‌টির এই শব্দানুসারী অনুবাদ হতে পারে, "ঋতবৃদ্ধিকারী, ঋতস্পর্শী মিত্র ও বরুণ ঋতের বা সত্যের দ্বারা এক মহান কর্ম বা এক বিরাট ফলপ্রসবিণী শক্তি ভোগ কর (বা প্রাপ্ত হও)।"

অবশেষে আমরা তৃতীয় ঋকে আবার দক্ষ শব্দটি পাই; আর পাই কবি, দ্রষ্টা, শব্দটি যার সঙ্গে মধুচ্ছন্দা আগেই ক্রতু, কর্ম বা ইচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন; আমরা আরও পাই সত্যের ধারণা ও উরুক্ষয়া শব্দটি যাতে উরু বিস্তৃত বা বিরাট, বৃহৎ-এর সমানার্থক হতে পারে, যা অগ্নির স্বকীয় ধাম ঋতচিৎ-এর জগৎ বা স্তর বর্ণনা করবার জন্যে প্রযুক্ত হয়েছে। আমি ঋক্‌টির শব্দানুসারী অনুবাদ করছি—"আমাদের জন্য বহুধা-জাত, বিশালভবনস্থ ঋষিদ্বয় মিত্র-বরুণ কার্য্যকরী শক্তিকে (বা বিবেককে) ধারণ করেন।"

অচিরে স্পষ্ট হবে যে প্রথম সূক্তে যেসব ভাব ও যে শব্দাবলীর ভিত্তির ওপরে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, আমরা সেই একই স্তরের ভাব ও সেইসব পদের অনেকগুলি দ্বিতীয় সূক্তের এই অংশে পাই। কিন্তু প্রয়োগ ভিন্ন প্রকারের এবং শুদ্ধীকৃত বিবেক, অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধি, ধিয়ম্ ঘৃতাচীম্, ও যজ্ঞেকর্মে সত্যের ক্রিয়া, আপঃ, এই সবভাব কতকগুলি নতুন নির্দিষ্ট ভাবের সূচনা দেয় যা ঋষিদের কেন্দ্রস্থ ভাবসমূহের ওপর আরও আলোকপাত করেছে।

এই সূক্তাংশে একমাত্র দক্ষ শব্দটিরই অর্থ কি সে সম্বন্ধে কিছুটা সন্দেহ হতে পারে, সায়ণ তার অর্থ করেছেন বল। শব্দটি একটি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন যা তার অধিকাংশ স্বশ্রেণীভুক্ত ধাতুর মতই, যেমন দশ্, দিশ্, দহ্, প্রথমে তার বিশিষ্ট অর্থরূপে বোঝাত আক্রমণমূলক চাপ, সুতরাং যে কোন প্রকার আঘাত কিন্তু বিশেষ করে বিভাজন, ছেদন, পেষণ ও কখনও কখনও জ্বলনও বোঝাত। বল বা বীর্যবাচক অনেক শব্দেরই প্রথমে মানে ছিল আঘাত দেবার শক্তি, যোদ্ধার ও হত্যাকারীর

আক্রমণাত্মক বল, যেরকম শক্তিকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জগতে হিংসা ও শারীরিক বলের দ্বারা স্থান করে নিতে প্রযত্নশীল আদিম মানুষ সবচেয়ে মূল্যবান মনে করত ও আদর করত। আমরা এই যোগসূত্র দেখতে পাই সংস্কৃত ভাষার শক্তিবাচক সাধারণ শব্দ বলম্-এ, যা গ্রীক 'বল্লো', আমি আঘাত করি, এবং বেলস্, যার মানে শস্ত্র, এদের এক পরিবারভুক্ত। দক্ষ শব্দটির অর্থ 'শক্তি' ও মূলও একই।

কিন্তু ভাষাবিকাশের মনস্তত্ত্বে বিভেদের এই ধারণা আর একটি বেশ ভিন্ন স্তরে গিয়ে পড়ল; কারণ মানুষ যখন মানসিক ধারণাসমূহ প্রকাশ করার জন্যে শব্দাবলী খুঁজতে লাগল, তখন শারীরিক ক্রিয়ার শব্দচিত্রগুলি মানসিক কর্মে প্রয়োগ করাই হল তার সবচেয়ে ঝটিতি পদ্ধতি। ভৌতিক বিভাগের বা বিভেদের ধারণাটি এই ভাবে ব্যবহৃত হল ও তাকে মানসিক প্রভেদের ভাবে পরিবর্ত্তিত করা হ'ল। মনে হয় যে এটি প্রথমে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিভেদ করার প্রতি ও পরে মানসিক প্রভেদ, বিবেক ও বিচারের প্রতি প্রযুক্ত হয়, যেমন বিদ্ ধাতুটি, সংস্কৃতে যার অর্থ হ'ল আবিষ্কার করা বা জানা, গ্রীকে ও লাতিন ভাষায় 'দেখা' বোঝায়। দৃশ্, দেখা, প্রথমে বিদীর্ণ করা, ছিন্ন করা, পৃথক করা বোঝাত, পশ্, 'দেখা', তারও মূল একই রকম। আমরা তিনটি প্রায় অভিন্ন ধাতু পাই যেগুলি এবিষয়ে খুবই শিক্ষাপ্রদ,——পিস্ আঘাত দেওয়া, ক্ষত করা, বলবান হওয়া; পিষ্, আঘাত করা, ক্ষতি করা, বলশালী হওয়া, চূর্ণ করা, পেষণ করা; ও পিশ্, রূপায়িত করা, আকার দেওয়া, সংগঠন করা, গঠনকর অংশে পরিণত হওয়া——এই সব অর্থগুলিই পৃথক্, বিভেদ, বিখণ্ড করা এই মূল ভাবই প্রকাশ করছে——এই প্রকৃতিপ্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিও পাই,—— পিশাচ, ভূত; ও পিশুন, যার মানে এক দিকে কঠোর ক্রুর, দুষ্ট, বিশ্বাস-ঘাতক, নিন্দুক, এসবই আঘাতের ভাব থেকে, এবং যুগপৎ অন্য অর্থ প্রভেদ-এর থেকে "সূচক, প্রকাশক, প্রদর্শন করা, স্পষ্ট করা বোঝায়। তেমনি, ক্রি——আঘাত করা, বিভাগ করা, ছড়ান্, পাওয়া যায় গ্রীক 'ক্রিনো'-তে, আমি বিশ্লেষণ করি, বেছে নি, বিচার করি, সিদ্ধান্ত করি। দক্ষ শব্দটির একই রকম ইতিহাস। এ হ'ল দশ্ ধাতুটির সমগোত্রীয়, লাতিনে যার থেকে পাই 'ডোসেও', আমি শিক্ষা দি, ও গ্রীকে 'ডোকেও', আমি চিন্তা করি, বিচার করি, হিসাব করি, এবং ডোকাৎসো, আমি নিরীক্ষণ করি, আমি হচ্ছি এই মতের। তেমনি রয়েছে সমগোত্রীয় ধাতু দিশ্ যার মানে

হল দেখিয়ে দেওয়া বা শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া, গ্রীকে 'ডেইকনুমি', দক্ষের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হল গ্রীক 'দোক্সা', মত, সিদ্ধান্ত ও দেক্সিওস, চতুর, কুশলী, দক্ষিণহস্ত। সংস্কৃতে দক্ষ্ ধাতুর মানে হল আঘাত করা, বধ করা, এবং কুশলী হওয়া, সমর্থ হওয়া, তার বিশেষণ পদ দক্ষ মানে বুদ্ধিমান, কুশলী, সক্ষম, যোগ্য, সজাগ, মনযোগশীল; দেক্সিওস-এর মত দক্ষিণ মানে বুদ্ধিমান, কুশলী, দক্ষিণহস্ত, আর আহত করা এই অর্থ থেকে বল ও দুষ্টতা এই মানে ছাড়াও, বিশেষ্য দক্ষ-এর, ঐ পরিবারের অন্যান্য শব্দের মত, অর্থ হল মানসিক সামর্থ্য বা যোগ্যতা। আমরা তুলনা করতে পারি দশা শব্দটি, মন ও বুদ্ধি অর্থে। এ সমস্ত সাক্ষ্য এক-সঙ্গে নিলে যথেষ্ট স্পষ্টভাবে এই সূচিত হয় বলে মনে হয় যে দক্ষ শব্দটি এক সময়ে বিচার, বিবেকাত্মক চিন্তা-শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হত ও তার মানসিক বিভাগ অর্থ থেকে মানসিক যোগ্যতা অর্থটি এসেছে, শারীরিক বলের ধারণা মানসিক শক্তির ভাবে গৃহীত হবার ফলে নয়।

সুতরাং বেদে আমরা 'দক্ষ' শব্দটির তিনটি সম্ভাব্য অর্থ পাই, সাধা-রণতঃ শক্তি, মানসিক বল, বা, বিশেষতঃ, বিচার বা বিবেকশক্তি। দক্ষ অনবরতই ক্রতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; ঋষিরা উভয়ের একসঙ্গে অভীপ্সা করেন, দক্ষায় ক্রত্বে, যার সরল অর্থ হতে পারে সামর্থ্য ও কার্যকরী শক্তি অথবা "ইচ্ছাশক্তি ও বিবেক"। আমরা নিরন্তর দেখি শব্দটি রয়েছে এমন সূক্তাংশে যেখানে সমগ্র প্রসঙ্গটির সম্বন্ধ হ'ল মানসিক ক্রিয়াবলীর সঙ্গে। অবশেষে, আমরা পাই দক্ষিণা দেবীকে যিনি হতে পারেন দক্ষের শক্তির বিগ্রহ, যিনি নিজেই একজন দেবতা এবং পরে পুরাণো প্রজাপতিদের মূল পিতৃপুরুষদের অন্যতম,---আমরা পাই দক্ষিণাকে জ্ঞানের অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত ও কখনও কখনও দিব্যউষার সঙ্গে একীভূত রূপে, যিনি জ্যোতি নিয়ে আসেন। আমি এই ইঙ্গিত করছি যে দক্ষিণা হলেন আরও বিখ্যাত ইলা, সরস্বতী ও সরমার মত ঋতম্ বা ঋত-চিৎএর চারটি শক্তির প্রকা-শিকা চারজন দেবীদের একজন---ইলা সত্য-দৃষ্টি বা অলৌকিক উপায়ে প্রাপ্ত জ্ঞান, সরস্বতী সত্যশ্রুতি, দিব্যপ্রেরণা ও দিব্যবাক্, সরমা সম্বোধি, দক্ষিণা, সম্বোধিগত বিভাজক বিবেকের প্রতিভূ। দক্ষ মানে তাহলে এই বিবেক, মনোভূমিতে মানসিক বিচার বা ঋতম্-এর স্তরে সম্বোধিজাত বিবেক।

আমরা যে তিনটি ঋক্ নিয়ে আলোচনা করছি সেগুলি হল শেষাংশ

একটি সূক্তের যার প্রথম তিনটি পদ্য শুধু বায়ুর উদ্দেশ্যে ও পরের তিনটি ইন্দ্র ও বায়ুর উদ্দেশ্যে রচিত। আমরা পরে দেখব যে সূক্তগুলির মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ইন্দ্র মনন-শক্তির প্রতিনিধি। ইন্দ্রিয় শব্দটি একই শব্দ থেকে প্রাপ্ত। তাঁর নিজস্ব ধাম হ'ল স্বর, সূর ও সূর্য্যের সমগোত্র বলে যার মানে হল সূর্য বা জ্যোতির্ময় এবং যা বৈদিক ব্যাহৃতিগুলির তৃতীয়টি ও বৈদিক লোক-সমূহের তৃতীয়টিকে যা শুদ্ধ বা স্বচ্ছ মনের অনুরূপ সূচিত করার জন্যে প্রযুক্ত হয়। সূর্য্য হ'ল মনে উদীয়মান ঋতম্-এর আলোর প্রতীক; স্বর হল মানস চেতনার সেই স্তর যা সাক্ষাৎভাবে সেই আলো গ্রহণ করতে পারে। অপর পক্ষে বায়ুর সম্পর্ক সর্বদা প্রাণ শক্তির সঙ্গে মানুষের মধ্যে যার দান হল সেই সব স্নায়বিক ক্রিয়াবলীর সমষ্টি যেগুলি ইন্দ্রশাসিত মানসিক শক্তিসমূহের অবলম্বন। তাদের মিশ্রণ মানুষের স্বাভাবিক মানসিকতা গড়ে তোলে। সূক্তে দেবতাদ্বয়কে আসতে ও সোমরস পান করতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। মনের উপরে ও ভিতরে ঋতম্-এর মধ্য দিয়ে সত্তায় দিব্য আনন্দের উন্মাদনার যে ধারা নেমে আসে, সোমরস হ'ল তার প্রতীক––বেদে এর প্রচুর সাক্ষ্য আমরা পাই, বিশেষ করে সোমদেবতার উদ্দেশ্যে গীত এক শতাধিক সূক্তের সংগ্রহ নবম মণ্ডলে। আমরা যদি এই সব ব্যাখ্যা গ্রহণ করি তাহ'লে আমরা সহজেই সূক্তটিকে মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য অনুসারে অনুবাদ করতে পারি।

ইন্দ্র ও বায়ু সোমরসের ধারার সম্বন্ধে চেতনায় সজাগ হয়ে ওঠেন (চেততঃ), অর্থাৎ মানুষের মানসিকতায় একত্র ক্রিয়াশীল মনঃশক্তিকে ও প্রাণশক্তিকে উপর থেকে এই আনন্দের, এই অমৃতের, সুখের ও অমরত্বের এই প্রবাহের সম্বন্ধে চেতন হতে হবে। ঐ শক্তি দুটি এগুলিকে মানসিক ও প্রাণিক বলের প্রাচুর্য্যের মধ্যে গ্রহণ করে, চেততঃ সুতানাম বাজিনীবসূ[১]। এই ভাবে প্রাপ্ত আনন্দ একটি নতুন ক্রিয়া, যা মর্ত্যের মধ্যে অমৃত চেতনাকে গড়ে তোলে, এবং ইন্দ্র ও বায়ুকে বুদ্ধির দ্বারা এই নতুন ক্রিয়াবলীকে অচিরে সুসিদ্ধ করার জন্য আসতে আহ্বান করা হয়, আয়তম উপ নিষ্কৃতম মক্ষু ধিয়া[২], কারণ ধী হ'ল চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি বা বোধসামর্থ্য। এ হ'ল সাধারণ মানসিকতা, ইন্দ্র ও বায়ুর সম্মেলন যার প্রতিনিধি; ও ঋতম্ বা ঋতচিতের মধ্যবর্ত্তী।

এই স্থলে বরুণ ও মিত্রের আবির্ভাব ও আমাদের আলোচ্য অংশের আরম্ভ। মনস্তাত্ত্বিক সূত্র বিনা সূক্তের প্রথম ও শেষ অংশের মধ্যে, বা বরুণ-মিত্র এই দু'জনের ও ইন্দ্র ও বায়ু এই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক পরিষ্কার হয় না। ঐ সূত্র পেলে উভয় সম্পর্কই স্পষ্ট হয়ে ওঠে; বস্তুতঃ তারা পরস্পরের উপর নির্ভর করে। কারণ সূক্তটির প্রথম অংশের বিষয় হ'ল প্রস্তুতি, প্রথমতঃ সব প্রাণশক্তির যা'র প্রতীক হলেন বায়ু যাঁকে প্রথম তিনটি ঋকে আহ্বান করা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ মনের—ইন্দ্র-বায়ু যার প্রতীক, মানুষের মধ্যে ঋত-চিৎ-এর ক্রিয়ার জন্যে; শেষ অংশটির বিষয় হল বুদ্ধিকে সংসিদ্ধ করার জন্যে ও তার কাজের সম্প্রসারণের জন্যে মনে ঋতম্-এর ক্রিয়া। বরুণ ও মিত্র হলেন দুটি দেবতা চারটি দেবতার মধ্যে যাঁরা মানুষের মনে ও মতিতে সত্যের ক্রিয়ার প্রতীক।

বেদের রীতিতে যখন এই রকম একটি চিন্তার প্রবাহ থেকে, তারই ভিতর থেকে বিকাশমান আর একটি চিন্তার প্রবাহে গতি হয়, প্রায়ই পরস্পরের যোগসূত্রটি পূর্বগামী প্রবাহের শেষে প্রাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দের নূতন প্রবাহে পুনরাবৃত্তির দ্বারা সূচিত হয়। প্রতিধ্বনির দ্বারা ব্যঞ্জনার এই নীতিটি—একে এই নাম দেওয়া যায়—সূক্তগুলিতে পরিব্যাপ্ত ও ঋষিদের একটি সাধারণ রীতিগত বৈশিষ্ট্য। এখানে সম্পর্ক স্থাপক শব্দটি হল 'ধী', বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি। 'ধী' আরও ব্যাপক শব্দ 'মতি'র থেকে ভিন্ন যার মানে সাধারণতঃ হ'ল মানসিকতা বা মানসী ক্রিয়া ও যা কখনও চিন্তাশক্তি, কখনও আবেগ, কখনও সমগ্র মনোময় অবস্থাটিকে বোঝায়। ধী হল চিন্তা-মানস বা বুদ্ধি; ধারণশক্তি রূপে তার কাছে যা কিছু আসে তা ধারণ করে ও যথার্থ স্থানে স্থাপন করে,[1] অথবা প্রায়ই 'ধী' বুদ্ধির ক্রিয়া, বিশেষ চিন্তা বা চিন্তাসমূহ সূচিত করে। স্নায়বিক মানসিকতাকে চিন্তাশক্তির দ্বারা শুদ্ধ করার জন্য, 'নিষ্কৃতম্ ধিয়া', ইন্দ্র ও বায়ুকে আহ্বান করা হ'য়েছে। কিন্তু মন ঋতচিৎ-এর সঙ্গে মুক্তভাবে আদান-প্রদান করতে সমর্থ হবার আগে এই কারণটিকে, চিন্তাশক্তিকেই সংসিদ্ধ, সমৃদ্ধ ও শুদ্ধ হ'তে হবে। সুতরাং বরুণ ও মিত্র, "এক সমৃদ্ধ দীপ্তিমান্ বুদ্ধি সম্পন্নকারী" ঋতের শক্তি, আহূত হন।

বেদে এই প্রথম পরিবর্তিত বিশেষণরূপে ঘৃত শব্দটির প্রয়োগ, এবং তা যে

১ ধী ধাতুর মানে হ'ল ধারণ করা বা স্থাপন করা

বুদ্ধির বৈদিক প্রতিশব্দ ধী-এর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত, তা অর্থপূর্ণ। অন্যান্য সূক্তাংশেও আমরা শব্দটি অনবরত পাই মানস ও মনীষা এই দুইটি শব্দের সম্পর্কে বা এমন প্রসঙ্গে যেখানে বুদ্ধির কোন ক্রিয়া সূচিত হয়েছে। ঘৃ ধাতুটি তেজস্বী ঔজ্জ্বল্য বা তাপের ভাব প্রকাশ করে, যেমন আগুনের বা গ্রীষ্মকালের সূর্য্যের। সিঞ্চন করা বা লেপন করাও শব্দটির অর্থ, গ্রীক 'ক্রিও', এই শব্দটি যে কোন তরল পদার্থ, বিশেষতঃ উজ্জ্বল, ঘন তরল পদার্থ বোঝাবার জন্যেও ব্যবহৃত হতে পারে; বৈদিক ঋষিরা এই দুইটি সম্ভব অর্থের অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়েছিলেন এই শব্দটি দিয়ে বাহ্যিক ভাবে যজ্ঞের ঘৃতের ও আন্তরভাবে মেধা বা মস্তিষ্ক-শক্তির সমৃদ্ধ ও উদ্দীপ্ত অবস্থা বা ক্রিয়া, যা প্রকাশময় চিন্তার ভিত্তি বা সারবস্তু, তার ইঙ্গিত করার জন্য। সুতরাং ধিয়ম্ ঘৃতাচীম্-এর অর্থ হ'ল এক সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল মানসিক ক্রিয়া——পূর্ণ বুদ্ধি।

বরুণ ও মিত্র, যাঁরা বুদ্ধির এই অবস্থা সম্পূর্ণ করেন বা সুসিদ্ধ করেন, দুটি ব্যক্তিগত বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট। মিত্র হলেন পূতদক্ষ; শুদ্ধীকৃত বিচারশক্তিসম্পন্ন; বরুণ হলেন রিশাদস; তিনি সকল আঘাতকারীদের বা শত্রুদের ধ্বংস করেন। বেদে কোন বিশেষণ নেই যা শুধুই আলং-কারিক। প্রত্যেক শব্দই কিছু প্রকাশ করবে, অর্থে কিছু যোগ করবে ও যে বাক্যে তা আছে তার ভাবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রক্ষা করবে, এই অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়। দুটি বাধা আছে যা বুদ্ধিকে ঋত-চিৎ-এর নির্দোষ ও দেদীপ্যমান আদর্শ হতে দেয় না। প্রথম, বিচারের বা বিবেক-শক্তির অশুদ্ধি যার ফলে সত্যের সাঙ্কর্য হয়, দ্বিতীয়, অনেক কারণ বা প্রভাব যেগুলি সত্যের প্রয়োগ সীমিত ক'রে বা তার প্রকাশক ভাবসমূহের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সঙ্গতি ভঙ্গ ক'রে ঋতের বিকাশে হস্তক্ষেপ করে ও এইভাবে সত্যের মর্মের দারিদ্র্যের ও তা মিথ্যায় পরিণত হবার কারণ হয়। বেদে দেবতারা যেমন ঋত-চিৎ-থেকে অবরূঢ়, ভুবনসমূহের সামঞ্জস্য ও মানুষের মধ্যে তার সংসিদ্ধির সংগঠক বিশ্বগত শক্তিরাজির প্রতীক, তেমনি যেসব শক্তি এইসব লক্ষ্যের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল, তাদের প্রতীক হ'ল প্রতিকূল সব দস্যুরা ও বৃত্ররা, যারা ভেঙ্গে ফেলতে, সীমিত অবরোধ ও অস্বীকার করতে চেষ্টা করে। বেদে বরুণ সর্বদাই ব্যাপকতার ও শুদ্ধির শক্তি বলে বর্ণিত; সুতরাং বরুণ যখন মানুষের ঋতের একটি চৈতন্যময়ী শক্তিরূপে বর্তমান, তখন যা কিছু স্বভাবের মধ্যে দোষ, পাপ ও অশুভ

নিয়ে এসে তাকে সীমিত করে ও আঘাত করে, তা সবই তাঁর সম্পর্কে এসে বিনষ্ট হয়। বরুণ রিশাদস, শত্রু যা কিছু বিকাশ রোধ করতে চায় তার বিধ্বংসী। বরুণের মত জ্যোতির ও ঋতের একটি শক্তি মিত্র আনন্দের, বৈদিক 'ময়সের', ভিত্তিস্বরূপ, প্রেম, সুখ ও সুসঙ্গতির প্রতীক। বরুণের শুদ্ধির সাহায্যে কাজ ক'রে ও বিবেককে সেই শুদ্ধি দান ক'রে মিত্র তাকে সমস্ত অসঙ্গতি ও সাঙ্কর্য থেকে মুক্ত হ'তে ও জ্যোতির্ময় বুদ্ধির যথার্থ ক্রিয়া স্থাপন করতে সমর্থ করেন।

এই প্রগতির ফলে ঋতচিৎ মানুষের মানস চেতনায় ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়। প্রতিনিধি রূপে ঋতকে সঙ্গে নিয়ে ঋতেন, মানুষের মধ্যে ঋতের ক্রিয়াকে বর্দ্ধিত করে, ঋতাবৃধা, ঋতকে স্পর্শ করে বা তাতে উপনীত হ'য়ে অর্থাৎ মানস চেতনাকে ঋতচিৎ-এর সফল সংস্পর্শে আসতে ও ঋত-চিৎকে অধিকার করতে সক্ষম ক'রে, ঋতস্পৃশা, মিত্র ও বরুণ এক বিশাল ফল-প্রসবিনী ইচ্ছাশক্তির উপযোগ ভোগ করতে সমর্থ হন, ক্রতুম্ বৃহত্তম্ আশাথে। কারণ ইচ্ছাই হ'ল আন্তর যজ্ঞের প্রধান ফলদায়িনী শক্তি কিন্তু এমন এক ইচ্ছাশক্তি যা সত্যের সঙ্গে সঙ্গত, সুতরাং, শুদ্ধীকৃত বিবেকের দ্বারা পরিচালিত। ইচ্ছাশক্তি যখন ঋতচিৎ-এর বিশালতার মধ্যে প্রবেশ করে, তখন তা নিজেই ব্যাপক ও বিশাল হয়ে ওঠে, তার দৃষ্টির সীমা থেকে ও তার কার্য্যকারিতার প্রতিরোধক বাধা থেকে মুক্ত হয়ে ওঠে। তা কাজ করে, উরৌ অনিবাধে, সেই প্রশস্ততার মধ্যে যেখানে কোন বাধা বা সীমানার প্রাচীর নেই।

এই ভাবে যে দুটি আবশ্যকীয় বস্তুর উপর ঋষিরা সর্বদা জোর দেন, আলো ও শক্তি, জ্ঞানে ক্রিয়াশীল ঋতের আলো, ধিয়ম ঘৃতাচীম্, ও কার্য্য-করী ও জ্ঞানময়ী ইচ্ছাতে ঋতের শক্তি, ক্রতুম্ বৃহন্তম্ সে দুটি অধিকৃত হ'ল। তার ফলে সূক্তটির শেষ ঋকে তাঁদের সত্যের সম্পূর্ণ বোধ নিয়ে ক্রিয়া করছেন এইভাবে বরুণ ও মিত্রকে দেখানো হয়েছে, কবি তুবিজাতা উরুক্ষয়া। আমরা দেখেছি কবি মানে হ'ল ঋতচিৎসম্পন্ন ও তার দৃষ্টি, প্রেরণা, বোধি ও বিবেকের শক্তি প্রয়োগকারী। তুবিজাত হল বহুলভাবে জাত, কারণ মূলে তুবির অর্থ বল বা শক্তি হলেও, ফরাসী শব্দ 'ফোর্স'-এর মত 'বহু' অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বেদে দেবতাদের জন্ম সর্বদা তাঁদের প্রকট হওয়া বোঝায়; অতএব তুবিজাতার অর্থ "বহুল ভাবে প্রকট", নানা রূপে ও কর্মে। 'উরুক্ষয়া' মানে বিশালতায় বাস করা, যে ভাবটি

সূক্তগুলিতে প্রায়ই পাওয়া যায়; উরু ও বৃহৎ মানে একই ও ঋত-চিৎ-এর অসীম স্বাতন্ত্র্য সূচিত করে। সুতরাং ঋতচিৎ-এর বর্দ্ধনশীল ক্রিয়ার ফলে আমরা পাচ্ছি মানুষের মধ্যে প্রসারতা, শুদ্ধি, আনন্দ ও সামঞ্জস্যের শক্তি-সমূহের বিকাশরূপে সমৃদ্ধ, ঋতম্-এর বিশালতায় আসীন ও বিজ্ঞান-চৈতন্যের শক্তিসমূহের ব্যবহারকারী এক বিকাশ।

ঋতের শক্তির এই বিকাশ ক্রিয়াশীল বিচার-বৃত্তিকে ধারণ করে বা তাকে সমর্থন করে, দক্ষম্ দধাতে অপসম্। বিবেকশক্তি যা এখন শুদ্ধীকৃত ও সমর্থিত, ঋতমের বোধ নিয়ে ঋতমের শক্তিরূপে ক্রিয়া করে ও সকল চিন্তা ও সঙ্কল্পকে তাদের কর্মে ও ফলে সব দোষ ও বিভ্রান্তির মিশ্রণ থেকে মুক্ত করে' ইন্দ্র ও বায়ুর ক্রিয়াবলীর সংসিদ্ধি সম্পন্ন করে।

এই সূক্তাংশের শব্দগুলির আমরা যে ব্যাখ্যা করেছি তা সমর্থন করার জন্যে আমরা চতুর্থ মণ্ডলের দশম সূক্তের একটি ঋক্ উদ্ধৃত করতে পারি।

অধা হ্যগ্নে ক্রতোর্ভদ্রস্য দক্ষস্য সাধোঃ,
রথীর্ঋতস্য বৃহতো বভূথা। (৪-১০।২)

"তখন সত্যই, হে অগ্নি, তুমি হও সারথি স্বচ্ছন্দ সংকল্পের, সিদ্ধিসাধক বিচারণার, বিরাট ঋতের।"

প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে ও এখানে আমরা একই ভাব পাই,—কবিক্রতুঃ, ঋতমের ফলদায়িনী ইচ্ছাশক্তি, ও তা এক আনন্দের অবস্থায় 'ভদ্রম', শ্রেয়ঃ, সম্পাদন করে। 'দক্ষস্য সাধোঃ' এই বাক্যাংশে দ্বিতীয় সূক্তের অন্তিম বাক্যাংশ 'দক্ষম্ অপসম্'-এর—মানুষের আন্তর যজ্ঞের সিদ্ধিকারক ও সম্পাদক বিচারণার—আমরা যুগপৎ একটি অন্য রূপ ও ব্যাখ্যা পাই, সামর্থ্য ও জ্ঞান, সংকল্প ও বিচারণা, ক্রতু ও দক্ষ, এই দুইটি ক্রিয়ার চরম উৎকর্ষ রূপে আমরা বৃহৎ ঋতকে পাই। একই শব্দাবলী ও ভাবসমূহের ও চিন্তাগুলির একই সম্বন্ধের এই পুনরাবৃত্তির দ্বারা সর্বদাই বৈদিক সূক্তগুলি পরস্পরকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। এ সম্ভব হত না যদি এগুলি কবি, ক্রতু, দক্ষ, ভদ্রম্, ঋতম প্রভৃতি নির্দ্ধারিত শব্দের নির্দিষ্ট অর্থ সমেত একটি সুসংলগ্ন মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হত। ঋক্‌গুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই প্রমাণ করে যে এই অর্থ মনস্তাত্বিক, কারণ তা না হলে শব্দগুলি তাদের নির্দিষ্ট মূল্য, যথাযথ অর্থ, ন্যায়সঙ্গত সম্বন্ধ হারিয়ে ফেলে ও পারস্পরিক সংযোগে তাদের অবিরত পুনরাবৃত্তিকে আকস্মিক ও কোন কারণ বা উদ্দেশ্যবিহীন হিসাবে গণ্য করতে হয়। তাহ'লে আমরা

দেখছি যে প্রথম সূক্তের নির্ণায়ক ভাবগুলি আবার আমরা দ্বিতীয় সূক্তে পাই। সবকিছু প্রতিষ্ঠিত অতিমানস বা ঋত-চিৎ-এর এই কেন্দ্রস্থ বৈদিক ধারণার ওপরে যার দিকে চরমোৎকর্ষ ও লক্ষ্যরূপে মানুষের ক্রম-সংসিদ্ধ মানস, যাবার প্রচেষ্টা করছে। প্রথম সূক্তে শুধু যজ্ঞের উদ্দেশ্য ও অগ্নির বিশিষ্ট কর্ম হিসাবে বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। দ্বিতীয় সূক্তে আনন্দের শক্তির ও ঋতের ক্রমবর্দ্ধমান বিকাশের মাধ্যমে ইন্দ্র ও বায়ুর দ্বারা, মিত্র ও বরুণের দ্বারা, মানুষের সাধারণ মনের প্রস্তুতিরূপ প্রাথমিক কর্ম সূচিত হয়েছে।

আমরা দেখব যে কার্যতঃ সমগ্র বেদই দেহে ও মনে মানুষের প্রস্তুতি ও তার ঋত ও আনন্দ প্রাপ্তির ও বিকাশের ফলে তার মধ্যে দেবের বা অমৃতত্বের পূর্ণত্ব, এই যুগল বিষয়ের অবিরত রূপান্তর।

অষ্টম অধ্যায়

অশ্বিদ্বয়---ইন্দ্র---বিশ্বদেবসমূহ

মধুচ্ছন্দার তৃতীয় সূক্তটি সোম-যজ্ঞের আর একটি সূক্ত। এর আগে দ্বিতীয়টির মত এটিও তিনটি ক'রে স্তবকের গতিভঙ্গে রচিত---প্রথমটি অশ্বিনীদ্বয়ের, দ্বিতীয়টি ইন্দ্রের, তৃতীয়টি বিশ্বদেবের ও চতুর্থটি দেবী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে গীত। এই সূক্তটিরও শেষ স্তবকে, সরস্বতীর আবাহনে আমরা পাই স্পষ্ট মনস্তাত্ত্বিক অর্থপূর্ণ একটি অংশ, যার স্বচ্ছতা যে সব অংশগুলি আগেই আমাদের বেদের গূঢ় চিন্তা বুঝতে সাহায্য করেছে সেগুলির স্পষ্টতার চেয়ে অনেক বেশী।

কিন্তু এই সূক্তটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যঞ্জনায় পূর্ণ, আর চিন্তা ও তার চরম ও বিজয়ী জ্ঞানরাশি, কর্ম ও তার পরম ও অন্তিম সর্বসম্পাদক শক্তিরাজি, ভোগ ও উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দ সব, মানবাত্মার এই তিনটি প্রয়োজনের মধ্যে বৈদিক ঋষিরা যে নিকট সম্বন্ধ, এমনকি ঐক্য, স্থাপিত ও সুসিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, তাও আমরা এই সূক্তটিতে পাই। সোম আসব ছিল আমাদের সাধারণ ইন্দ্রিয়-ভোগের স্থানে দিব্য আনন্দের প্রতিষ্ঠার প্রতীক। আমাদের মননের দিব্যায়নের ফলে এই পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং তা যতই বেশী হয়, ততই তা নিজেই যে ক্রিয়া তা ঘটিয়েছিল তার পরাকাষ্ঠা সম্পাদনে তাকে সাহায্য করে। গো, অশ্ব ও সোম এই তিনটি যজ্ঞের প্রতীক। গাভী থেকে প্রাপ্ত ঘৃতের আহুতি, অশ্বের উৎসর্গ বা অশ্বমেধ, সোম আসবের নিবেদন, এর তিনটি প্রধান রূপ বা উপাদান। আর আছে, হয়ত কম লক্ষ্যণীয়, পিষ্টকের আহুতি যা সম্ভবতঃ দেহের, জড়ের, নিবেদনের প্রতীক।

আমরা অশ্বিনীদ্বয় বা দুজন অশ্বারোহীর, প্রাচীন মেডিটেরেনীয় পুরাণের ক্যাষ্টর ও পলিডিউসোস-এর, আবাহন থেকে আরম্ভ করি। তুলনাত্মক পুরাণবিজ্ঞানী কল্পনা করেন যে তারা আকাশে দুটি তারকার প্রতিনিধি যেগুলি, যে কোন কারণে হোক, স্বর্গীয় তারকাবাহিনীর চেয়ে অধিক ভাগ্যবান্ ছিল ও আর্যদের ভক্তি আকর্ষণ করেছিল। যাই হোক্ দেখা যাক্ আমাদের আলোচ্য সূক্তটিতে কিভাবে তারা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে তাদের

বর্ণনা হয়েছে এইভাবে—"বহু-ভোক্তা দ্রুতচরণ আনন্দের অধিপতি অশ্বিদ্বয়,—"দ্রবৎপাণি শুভস্পতি পুরুভুজা।" রত্ন ও চন্দ্র শব্দ দুটির মত শুভ কথাটিরও আলো অথবা ভোগ অর্থ হতে পারে; কিন্তু এই সূক্তাংশে তা আছে "পুরুভুজা", বহু-ভোক্তা, এই বিশেষণটি ও চনসত্যম্, "সুখ পাওয়া" এই ক্রিয়াপদের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে, সুতরাং ওটিকে মঙ্গল বা আনন্দ অর্থেই নিতে হবে।

তারপরেই এই যুগ্মদেবতারা, "অশ্বিদ্বয়, দিব্য আত্মা দুটি, বহুলকর্মযুক্ত, বুদ্ধিধারী", যাঁরা সানন্দে মন্ত্রের পদগুলি শক্তিময়ী বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করেন, "পুরুদংসসা নরা শরীরয়া ধিয়া ধিষ্ন্যা"। এইভাবে বর্ণিত হয়েছেন। বেদে নৃ শব্দটি দেবতা ও মানুষ উভয়ের প্রতিই প্রয়োগ করা যায়; আমার মনে হয় যে এর মানে ছিল সমর্থ বা ক্রিয়াশীল, পরে একটি পুরুষ ও পুংদেবতাদের, দিব্য আত্মা বা কর্মঠ শক্তিসমূহের প্রতি প্রযুক্ত, এঁরা হলেন বিপরীত, গ্নাঃ বা স্ত্রী দেবতাদের যাঁরা তাঁদের শক্তি। ঋষিদের মনে তখনও শব্দটির মৌলিক অর্থের অনেকটাই রক্ষিত ছিল, যেমন আমরা দেখতে পাই নৃম্ন, সামর্থ্য, এই শব্দটিতে ও নৃতমা নৃণাম্, 'দিব্য শক্তিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বলশালী' এই বাক্যাংশে। শবস্ ও তার বিশেষণ শবীর থেকে শক্তির ধারণা পাওয়া যায় কিন্তু সব সময়েই শিখা ও আলো এই অন্য ভাবটির সম্পর্কে; সুতরাং শবীর অতি সঙ্গত বিশেষণ ধী-এর, দীপ্তি বা শক্তিতে পূর্ণ বুদ্ধির। ধিষ্ন্যা ধীষণার, বুদ্ধির, সঙ্গে সম্পর্কিত ও সায়ণ তার অনুবাদ করেছেন, বুদ্ধিমন্তৌ, দুজন বুদ্ধিমান্।

তারপর আরও, দস্রা নাসত্যা রুদ্রবর্তানী "সিদ্ধকর্মী, গতির শক্তি, তাদের পথে উগ্রগতিশীল" এই ভাবে অশ্বিদ্বয়ের বর্ণনা করা হয়েছে। সায়ণ তাঁর খেয়াল বা সুবিধা অনুসারে দস্র ও দস্ম এই বৈদিক বিশেষণ দুটির "বিনাশশীল", "সুন্দর" বা "দানশীল" এই সব অনুবাদ করেছেন। আমি তাদের এদুটিকে দস্ ধাতুর সঙ্গে যুক্ত করছি, কাটা বা ভাগ করা অর্থে নয় যার থেকে এই ধাতুটির নাশ করা ও দেওয়া অর্থ দুটি পাওয়া যায়, "বিচার করা, দেখা" এই অর্থেও নয় যার থেকে তা সায়ণের দেওয়া "দর্শনীয়" সুন্দর অর্থটি আসে, কিন্তু কাজ করা, আচরণ করা, গঠন করা, আকার দেওয়া, সম্পাদন করা অর্থে, যেমন দ্বিতীয় ঋকে পুরুদংসসা শব্দে। কেউ কেউ 'নাসত্য' একটি বংশনাম বলে মনে করেন; প্রাচীন বৈয়াকরণরা চাতুর্য্যের সঙ্গে এর 'সত্য, মিথ্যা নয়,' এই অর্থে তৈরী করেছিলেন, কিন্তু

আমি নস্ শব্দটিকে চলা থেকে নিই। আমাদের মনে রাখতেই হবে যে অশ্বিদ্বয় অশ্বারোহী তাঁরা প্রায়ই গতিবাচক বিশেষণ দিয়ে বর্ণিত হন, যেমন, 'দ্রুতচরণ', 'নিজেদের পথে উগ্রগতিশীল', আরও মনে রাখতে হবে যে গ্রীক-লাতিন পুরাণে ক্যাস্টর ও পোলাক্স নাবিকদের তাদের জলযাত্রায় রক্ষা করেন ও ঝড়ে ও নৌকাডুবিতে তাদের ত্রাণ করেন, আরও, ঋগ্বেদেও ঋষিদের যেন একটা জাহাজে বহনকারী শক্তিরূপে বা তাঁদের সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া থেকে উদ্ধার করেন এইভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। সুতরাং জলপথে বা বায়ুপথে যাত্রা, ভ্রমণের বা গতির শক্তি সব নাসত্যির খুব স্বচ্ছন্দেই এই রকম অর্থ হ'তে পারে। আধুনিক পণ্ডিতরা রুদ্রবর্তানীর অনুবাদ করেন "রক্তিম পথযুক্ত", যে বিশেষণটি তারাদের পক্ষে খুব উপযোগী বলে ধরে নেওয়া হয়, ও তাঁরা হিরণ্যবর্তনী, সোনার বা উজ্জ্বল পথসম্পন্ন, এই সদৃশ দৃষ্টান্তটি দেন। নিশ্চয়ই, রুদ্র কোন সময়ে "উজ্জ্বল, গাঢ়বর্ণ, রক্তিম" বোঝাত; 'রুষ' ও 'রুশ' ধাতুর মত, ও "রুধির", রক্ত, লাল, এই সবের মত ও লাতিন "রুবের", 'রুতিলস', 'রুফুস', এর মত, সবগুলির মানেই রক্তিম। স্বর্গ ও পৃথিবী--সূচক যুগ্ম বৈদিক শব্দ "রোদসী", স্বর্গীয় ও পার্থিব জগতের জন্য বৈদিক শব্দ 'রজস' ও 'রোচনা'র মত, খুব সম্ভব দেদীপ্যমান বোঝাত। অপরপক্ষে, আঘাত ও উগ্রতা এই অর্থও এই শব্দ-গোষ্ঠীতে সহজাত ও ঐ শব্দগুলি যে সব ধাতু থেকে গঠিত তাদের প্রায় সবগুলিতেই আছে ব্যাপক। অতএব রুদ্রের রক্তিমের মত "প্রচণ্ড" বা "উগ্র" সঙ্গত অর্থ হতে পারে। অশ্বীরা হিরণ্যবর্তনী ও রুদ্রবর্তনী, কারণ তাঁরা দুজনেই হলেন জ্যোতির ও স্নায়বিক বলের শক্তি; প্রথম বিভাবে তাদের আছে স্বর্ণোজ্জ্বল গতি, দ্বিতীয় বিভাবে তাঁরা তাদের গতিতে উগ্র। একটি মন্ত্রে (৫।৭৫-৩) আমরা রুদ্রা হিরণ্যবর্তনী, আলোর পথে উগ্র ও চলমান এই মিশ্রণটি পাই; আমাদের অর্থের সঙ্গতির জন্যে কিছু মাত্র সমীহ থাকলে এর অর্থ এ রকম বুঝব যে তারাগুলি রক্তিম কিন্তু তাদের গতি বা পথ হল স্বর্ণময়।

এখানে তাহলে এই তিনটি চরণে রয়েছে আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দুটি তারার প্রতি প্রয়োগ করার পক্ষে এক অতি-অসাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়ার পরম্পরা। এ ত স্পষ্ট যে এই যদি অশ্বীদের ভৌতিক মূল হয়ে থাকে, তাহলে, গ্রীক পুরাণে যেমন, অনেক তারার প্রকৃতি হারিয়েছে; উষার দেবী এথিনীর মত, তাঁরা একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ক্রিয়া পেয়েছে।

তাঁদের বাহন অশ্ব, বলের, বিশেষতঃ জীবনী-শক্তি ও স্নায়বিক শক্তি, প্রাণের প্রতীক। তাঁদের সামান্য ধর্ম ছিল তাঁরা ভোগের দেবতা, মধু-র সন্ধানী; তাঁরা চিকিৎসক, ও তাঁরা ফিরিয়ে দেন বৃদ্ধকে যৌবন, রোগীকে স্বাস্থ্য, বিকলাঙ্গকে সম্পূর্ণতা আর একটি বিশিষ্ট ধর্ম হ'ল গতি, দ্রুত, উগ্র, অনিবার্য; তাঁদের ক্ষিপ্র ও অদম্য রথ সততই খ্যাতিমান বস্তু ও এখানে তাঁরা ক্ষিপ্র-চরণ ও তাঁদের পথ উগ্র বলে বর্ণিত। তাঁরা হলেন গতিমান পাখীদের মত, মনের মত, বাতাসের মত (৫-৭৭।৩ ও ৭৮।১)। মানুষের কাছে তাঁদের রথে করে নিয়ে আসেন সন্তোষ, তাঁরা ময়সের, আনন্দের, স্রষ্টা। এইসব ইঙ্গিত সম্পূর্ণ পরিষ্কার। এগুলি প্রমাণ করেন যে অশ্বীরা হলেন যুগ্ম দিব্যশক্তি যাঁদের বিশিষ্ট কাজ হ'ল মানুষের মধ্যে স্নায়বিক বা প্রাণময় সত্তাকে কর্মের ও ভোগের জন্য সুসিদ্ধ করা। কিন্তু তাঁরা ঋতের চৈতন্যময় কর্মের, যথার্থ ভোগের শক্তি, তাঁরা উষার সঙ্গে আবির্ভূত শক্তি, সত্তা-সমুদ্র থেকে জাত কর্মের ফলদায়িনী শক্তি দৈব ব'লে যাঁরা উচ্চতর সত্তার আনন্দকে মনোময় করতে পারেন একটি চিন্তা-শক্তির দ্বারা যা খুঁজে পায় ও জানতে পারে সেই প্রকৃত বস্তুকে ও প্রকৃত সম্পদকে;

যা দস্রা সিন্ধুমাতরা, মনোতরা রয়ীণাম্,
ধিয়া দেবা বসুবিদা। (১-৪৬।২)

তাঁরা প্রেরক শক্তি প্রদান করেন সেই মহৎ কর্মের জন্যে যা, সত্যের জ্যোতি তার স্বরূপ ও সার বস্তু বলে, মানুষকে অন্ধকারের পারে নিয়ে যেতে পারে:

যা নঃ পীপরাদ্ অশ্বিনা, জ্যোতিষ্মতী তমস তিরঃ,
তাম্ অস্মে রাসাথাম্ ইষম্। (১-৪৬।৬)

তাঁরা তাঁদের নৌকায় ক'রে মানুষকে চিন্তার ও মানস অবস্থার পারে, অর্থাৎ বিজ্ঞানময় চৈতন্যে বহন করে নিয়ে যান—নাবা মতীনাং পারায় (১-৪৬।৭)। সত্যের অধিপতি, সূর্যের দুহিতা, সূর্য্য তাঁদের বধূরূপে তাঁদের রথে আরোহণ করেন।

বর্তমান ঋক্তে অশ্বীদের আবাহন করা হয় বহুলভোগবহনকারী দ্রুত-গামী আনন্দাধিপতিরূপে যেন তাঁরা আনন্দ পান যজ্ঞের প্রচোদায়িকা শক্তি-সমূহের মধ্যে—"যজ্বরীর্ ইষো...চনস্যত্রম্"। স্পষ্টতঃই এই সব প্রচো-দায়িকা শক্তি উদ্ভূত হয় সোমমদিরার পান থেকে অর্থাৎ দিব্য আনন্দের অন্তঃপ্রবাহ থেকে। কারণ যে সব প্রকাশিকা বাণী "গিরঃ" চেতনার মধ্যে

নূতন গঠন তৈরী করবে সে সব পূর্বেই উদিত হ'চ্ছে, যজ্ঞের আসন প্রস্তুত করা হ'য়েছে, সোমমদিরার তেজোময় রস নিষ্কাশিত করা হয়।[১] অশ্বীরা আসবেন কর্মের ফলপ্রসূ সব শক্তিরূপে "পুরুদংসসা নরা", বাক্-সমূহে আনন্দ পাবার জন্য এবং সে সবকে গ্রহণ করবার জন্য বুদ্ধির মধ্যে যেখানে তাদের রাখা হবে দীপ্তশক্তিপূর্ণ মননের দ্বারা।[২] যজ্ঞকর্ম সাধনের জন্য "দস্রা" সোমমদিরার নিবেদনের নিকট তাঁরা আসবেন কর্মের পূর্ণতা সাধকরূপে, কর্মের আনন্দে তাঁদের সেই প্রচণ্ড গতি দিয়ে, "রুদ্রবর্তনী" যা তাঁদের পথে তাঁদের নিয়ে যায় অপ্রতিহতভাবে এবং সকল বাধা অতিক্রম করে। তাঁরা আসেন আর্যযাত্রার সব শক্তিরূপে, মহৎ মানুষী গতিবিধির অধিপতিরূপে, "নাসত্যা"। আমরা বরাবর দেখি যে এই অশ্বারোহীরা যা দেবেন তা শক্তি; তাঁদের কাজ যজ্ঞীয় শক্তিসমূহে আনন্দলাভ করা, বাণীকে তুলে নেওয়া শক্তিশালী মননের মধ্যে, পথের উপর তাঁদের নিজস্ব প্রচণ্ড গতি যজ্ঞে আনা। আর শক্তির জন্য এই প্রার্থনার উদ্দেশ্য হ'ল কর্মের ফলপ্রসূতা এবং মহাযাত্রায় দ্রুততা। আমি পাঠকের মনোযোগ নিরন্তর আকর্ষণ করব এই দেখতে যে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দ্বারা ঋষিদের মননে কিরূপ ভাবনার সঙ্গতি এবং রচনার সংলগ্নতা, রূপরেখার সহজ স্বচ্ছতা এবং সঠিকতা পাওয়া যায় এবং তা কত ভিন্ন সেই সব ব্যাখ্যার জটিল বিভ্রান্তি এবং অসংলগ্ন অসংবদ্ধতা থেকে যাতে বেদ যে প্রজ্ঞা ও গভীরতম জ্ঞানের গ্রন্থ, এই পরম ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা হয়।

তাহ'লে আমরা প্রথম তিনটি শ্লোকের এই অনুবাদ পাই:

"হে অশ্বারোহীরা, দ্রুতপদযুক্ত, আনন্দের বহুলভোগকারী অধিপতিগণ, আনন্দ লাভ কর যজ্ঞের শক্তিসমূহে।

"হে অশ্বারোহীরা, বহুবিধ কর্মসাধনকারী নরপুরুষরা, বাণীসমূহে আনন্দ পাও, হে বুদ্ধির মধ্যে ধারকগণ, দীপ্তভাবে শক্তিমান্ মননের দ্বারা।

"আমি যজ্ঞের আসন প্রস্তুত করেছি, আমি তেজোময় সব সোমরস নিষ্কাশিত করেছি, তাদের কাছে এস পথের উপর তোমার ভীষণ দ্রুতগতি নিয়ে।"

যেমন দ্বিতীয় সূক্তে, তেমন তৃতীয়টিতেও ঋষি সুরু করেন সেই সব

১ যুবাকবঃ সুতা বৃক্তবর্হিষঃ

২ শবীরয়া ধিয়া 'ধিষন্যা বনতং গীরঃ।

দেবতাদের আবাহন ক'রে যাঁরা কাজ করেন স্নায়বিক বা প্রাণিক শক্তি-সমূহে। কিন্তু সেখানে তিনি বায়ুকে ডেকেছিলেন যিনি সব প্রাণিক শক্তি জোগান দেন, তাঁর প্রাণের অশ্বগুলি আনেন; এখানে তিনি অশ্বীদের ডাকেন যাঁরা প্রাণিক শক্তিগুলিকে ব্যবহার করেন, অশ্বের উপর আরোহণ করেন। দ্বিতীয় সূক্তের মতো তিনি অগ্রসর হন প্রাণিক বা স্নায়বিক ক্রিয়া থেকে মানসিক ক্রিয়ায়, তাঁর দ্বিতীয় গতিছন্দে তিনি আবাহন করেন ইন্দ্রের বীর্যকে। আনন্দমদিরার সব নিষ্কাশন তাঁকে কামনা করে, "সুতা ইমে ত্বায়বঃ" তারা কামনা করে যে দীপ্ত মন যেন ইহার সব ক্রিয়াবৃত্তির জন্য তাদের অধিকার করে; তাদের পবিত্র করা হয়, "অন্বীভিস্ তনা", সায়ণের ব্যাখ্যানুসারে "অঙ্গুলিসমূহ ও দেহের দ্বারা", যার অর্থ আমার মনে হয় শুদ্ধ মনের সূক্ষ্ম মননশক্তিসমূহের দ্বারা এবং শারীরিক চেতনার মধ্যে তাদের প্রসারের দ্বারা। কারণ এই "দশ অঙ্গুলি", যদি ইহারা আদৌ অঙ্গুলি হয়, সূর্য্যার, সূর্যদুহিতার, অশ্বীদের বধূর দশ অঙ্গুলি। নবম মণ্ড-লের প্রথম সূক্তে এই একই ঋষি মধুচ্ছন্দা এই ভাবনাকে বিস্তৃত করেন যার কথা এখানে তিনি অত সংক্ষেপে বলেছেন। সোমদেবকে সম্বোধন ক'রে তিনি বলেন, "সূর্যদুহিতা তোমার সোমকে পবিত্র করেন যখন ইহা তাঁর ছাঁকনির মধ্যে চারিদিকে প্রবাহিত হয় নিরন্তর বিস্তারের দ্বারা" "বারেণ শশ্বতা তনা"। এবং তখনই তিনি আরো বলেন, "সূক্ষ্মজনেরা তাকে ধারণ করে তাদের পরিশ্রমের মধ্যে (অথবা মহৎ কর্মে, সংগ্রামে আস্পৃহায়, "সমর্যে"), দশটি বধূ, যে স্বর্গ পার হ'তে হবে তার মধ্যস্থ ভগিনীগণ," যে পদসমষ্টিতে তখনই মনে হয় অশ্বীদের পোতের কথা যা আমাদের পার ক'রে নিয়ে যায় মননগুলির ওপারে; কারণ বেদে স্বর্গ হ'ল শুদ্ধ মানসিক চেতনার প্রতীক্ যেমন পৃথিবী ভৌতিক চেতনার প্রতীক্। এই যে ভগিনীরা শুদ্ধ মনে বাস করেন, সূক্ষ্মজনেরা, "অন্বীঃ", দশটি বধূ, "দশ যোষণাঃ" তাঁদের অন্যত্র বলা হয় দশ নিক্ষিপ্তকারিণী, "দশ ক্ষিপঃ" কারণ তাঁরা সোমকে ধারণ ক'রে ইহাকে তার পথে দ্রুত চালনা করেন। সম্ভবতঃ তাঁরাই সেই দশ রশ্মি "দশ গাবঃ" যাদের কথা বেদে কখন কখন বলা হ'য়েছে। মনে হয় তাঁদের বর্ণনা করা হ'য়েছে সূর্যের প্রপৌত্র বা বংশধর ব'লে, "নপ্তীভির্ বিবস্বতঃ" (৯-১৪-৫)। শুদ্ধ করার কাজে তাঁরা সাহায্য পান মনন-চেতনার সপ্ত রূপের দ্বারা, "সপ্ত ধীতয়ঃ" (৯-৯-৪)। আবার বলা হয় যে "সোম অগ্রসর হন তাঁর দ্রুত রথে শৌর্যশালী হ'য়ে, সূক্ষ্ম

মননের শক্তির দ্বারা, "ধিয়া অণ্ব্যা" আর উপনীত হন ইন্দ্রের সৃষ্টু-করা সক্রিয়তায় (অথবা সুষ্টু-করা ক্ষেত্রে) এবং দেবত্বের যে বিশাল বিস্তারের (বা গঠনের) মধ্যে অমর্ত্যগণ অবস্থান করেন সেখানে উপস্থিত হবার জন্য মননের অনেক রূপধারণ করেন"---

এষা পুরু ধিয়ায়তে, বৃহতে দেবতাতয়ে,
যত্রামৃতাস আসতে। (৯-১৫, ১, ২)

আমি এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি এই দেখানর উদ্দেশ্যে যে বৈদিক ঋষিদের সোমমদিরা কত সম্পূর্ণভাবে প্রতীকার্থক্ আর মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার দ্বারা ইহা কত সমৃদ্ধভাবে বেষ্টিত---আর যিনিই নবম মণ্ডলটিকে যত্ন করে পড়বেন তিনিই তা বুঝবেন কারণ এই মণ্ডলটি প্রতীকাত্মক্ চিত্ররূপের শোভায় প্রায় পরিপূর্ণ এবং মনস্তাত্ত্বিক আভাসনসমূহে ভরপূর।

তা যাই হোক, এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সোম ও ইহার শুদ্ধিকরণ নয় কিন্তু ইন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক কার্য। তাঁকে সম্বোধন করা হয় সমৃদ্ধভাবে বিচিত্র প্রভাময় ইন্দ্র ব'লে, "ইন্দ্র চিত্রভানো"। সোমরসগুলি তাঁকে কামনা করে। যে ঋষি আনন্দের মদিরা নিষ্কাশিত ক'রে তাদের প্রকট করতে চান বাক্যে, চিদাবিষ্ট মন্ত্রসমূহে, "সুতাবতঃ উপ ব্রহ্মাণি বাঘতঃ" তাঁর অন্তঃপুরুষের মননসমূহে তিনি আসেন মননের দ্বারা প্রচোদিত হ'য়ে, অন্তঃস্থ দীপ্ত মনস্বীর দ্বারা সম্মুখে চালিত হ'য়ে, "ধিয়েষিতো বিপ্রজূতঃ"। ঐসব মননে তিনি আসেন দীপ্ত মনঃশক্তির দ্রুতগতি ও বেগের সহিত আর তাঁর সব উজ্জ্বল অশ্বের সহিত যুক্ত হ'য়ে "তূতুজান উপ ব্রহ্মাণি হরিবঃ", আর ঋষি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেন সোমনিবেদনের মধ্যে আনন্দকে দৃঢ় বা ধারণ করার জন্য, "সুতেদধিষ্ব নশ্চনঃ"। আনন্দের ক্রিয়ার মধ্যে অশ্বীরা প্রাণ-সংস্থানের সুখ এনেছেন ও শক্তিশালী করেছেন। ইন্দ্রের প্রয়োজন হ'ল সেই সুখকে দীপ্ত-করা মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা যাতে তা চেতনা থেকে বিচ্যুত না হ'তে পারে।

"এস, হে ইন্দ্র, তোমার সব সমৃদ্ধ প্রভাসমেত, এই সোমরসগুলি তোমাকে কামনা করে; তারা পূত হ'য়েছে সূক্ষ্মশক্তিসমূহের দ্বারা এবং দেহের মধ্যে বিস্তারের দ্বারা;

"এস, হে ইন্দ্র, মনের দ্বারা প্রচোদিত হ'য়ে, দীপ্ত মনস্বীর দ্বারা অগ্রে *চালিত হ'য়ে আমার অন্তঃপুরুষের মননসমূহে, যে আমি সোমরস বাহিরে*

ঢেলে দিয়েছি এবং বাক্যে তাদের প্রকাশ করতে চাই।

"এস, হে ইন্দ্র, বেগময় দ্রুতগতিতে আমার অন্তঃপুরুষের মননসমূহে, হে উজ্জ্বল অশ্বগণের অধিপতি; সোমরসের মধ্যকার আনন্দকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর।"

ইহার পর ঋষি বলেন বিশ্বদেবগণের কথা, সকল দেবতাদের অথবা সর্ব-দেবগণের কথা। বিশ্বদেবগণ কি কোন এক বিশেষ শ্রেণীর দেবতাগণ, না শুধু সাধারণভাবে সকলদেবতা---এই বিষয়ে মতের অনৈক্য আছে। আমি কথাটিকে দিব্যশক্তিসমূহের বিশ্বজনীন সমষ্টি অর্থে গ্রহণ করি; কারণ মনে হয় সূক্তগুলিতে যেসব পদ প্রয়োগ ক'রে তাঁদের আবাহন করা হয় তাদের সহিত এই অর্থ সবচেয়ে সঙ্গত হয়। এই সূক্তে তাঁদের আহ্বান করা হয় এমন এক সাধারণ ক্রিয়ার জন্য যাতে অশ্বীদের ও ইন্দ্রের কার্যগুলি সমর্থিত ও সম্পূর্ণ হয়। তাঁরা তাঁদের সমবায়ে যজ্ঞে আসবেন এবং স্পষ্টতঃই প্রত্যেকে যজ্ঞদাতা তাঁদের মধ্যে যে সোম বিতরণ করেন তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন তাঁর যথাযথ ক্রিয়ার দিব্য ও আনন্দ-পূর্ণ সাধনের জন্য; "বিশ্বে দেবাস আগত, দাশ্বাংসো দাশুষঃ সুতম্"। পরের ঋকে এই আহ্বান আবার করা হয় আরো বেশী জোরের সহিত; তাঁরা সোমনিবেদনের নিকট উপস্থিত হবেন দ্রুতবেগে, "তূর্ণয়ঃ" অথবা ইহার অর্থ হ'তে পারে চেতনার সকল লোকের মধ্য দিয়ে, "জলরাশির" মধ্য দিয়ে তাঁদের পথ ক'রে যে সব লোক মানবের স্থূল প্রকৃতিকে বিভক্ত করে তাদের দেবত্ব থেকে এবং পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে যোগাযোগের বিঘ্নে পূর্ণ; "অপ্তুরঃ সুতম্ আ গন্ত তূর্ণয়ঃ"। তাঁরা আসবেন যেমন সন্ধ্যার সময় গবাদিপশুরা তাদের বিশ্রামস্থলে দ্রুত আসে, "উস্রা ইব স্বসরাণি"। এইভাবে সানন্দে উপনীত হ'য়ে তাঁরা সানন্দে যজ্ঞ গ্রহণ ক'রে তাতে সংলগ্ন থাকবেন এবং তা ধারণ করবেন ইহার লক্ষ্যের অভিমুখে ইহার যাত্রায়, দেবতাদের নিকট অথবা দেবগণের ধামে, সত্য ও বৃহতে ইহার উত্তরণে ইহাকে ঊর্ধ্বে বহন ক'রে, "মেধং জুষন্ত বহ্নয়ঃ"।

বিশ্বদেবগণের যেসব বিশেষণে তাদের চরিত্র ও যেসব কার্যের জন্য তাঁদের সোমনিবেদনে নিমন্ত্রিত করা হয় সে সবকে বর্ণনা করা হয় সেসব বিশেষণ একই প্রকারের, ইহারা সকল দেবতা সম্বন্ধেই সামান্যবাচক এবং বেদে বরাবর ইহাদের যথেচ্ছভাবে কোন একটি দেবতা বা সকল দেবতা সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। তাঁরা মানবের পালক বা বর্ধক এবং কর্মে, যজ্ঞে

তার পরিশ্রম ও প্রয়াসের ধারণকর্তা,--"ওমাসশ্ চর্ষণীধৃতঃ"। সায়ণ ইহার অর্থ করেন মানুষদের রক্ষক ও পোষক। যেসব তাৎপর্য আমি ইহাদের দিতে ভাল মনে করি তার সমর্থনে বিস্তারিতভাবে এখানে কিছু বলা আমি প্রয়োজন মনে করি না; কারণ যে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি আমি অনুসরণ করি তার কথা আমি পূর্বেই বলেছি। সায়ণ নিজেই দেখেন যে "অব্" ধাতু থেকে উৎপন্ন "অবস্" "ঊতি", "ঊমা" প্রভৃতি যেসব পদ সূক্তসমূহে এত বেশী সেগুলিতে সর্বদাই রক্ষার অর্থ দেওয়া অসম্ভব এবং সেজন্য তিনি একই পদকে বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত ভিন্ন ও সম্বন্ধরহিত তাৎপর্য দিতে বাধ্য হন। সেইরূপ, "চর্ষণি" ও "কৃষ্টি"--এই দুটি সমজাতীয় পদ যখন তারা নিজেরা একলা থাকে তখন তাদের "মানব" অর্থ প্রয়োগ করা সহজ হ'লেও, ইহাদের "বিচর্ষণি", "বিশ্বচর্ষণি", "বিশ্ব-কৃষ্টি" প্রভৃতি সংযুক্তরূপে ঐ অর্থ বিনা কারণেই মনে হয় লোপ পায়। সায়ণ নিজেই বাধ্য হ'য়ে "বিশ্বচর্ষণি"র অর্থ করেন "সর্বদর্শনকারী", ইহার অর্থ "সর্বমানব" বা "সবমানবীয়" করেন না। বৈদিক নির্দিষ্ট সংজ্ঞাগুলিতে এইরূপ আকাশপাতাল পার্থক্যের সম্ভাবনা আমি স্বীকার করি না। "অব্"-এর অর্থ হ'তে পারে হওয়া, পাওয়া, রাখা; ধারণ করা, রক্ষা করা; হ'য়ে ওঠা, সৃষ্টি করা; পালন করা, বধন করা, উন্নতি করা, সমৃদ্ধ হওয়া; হৃষ্ট করা, হৃষ্ট হওয়া; কিন্তু আমার মনে হয় বর্ধন বা পালন অর্থই বেদে বেশী প্রচলিত। "চর্ষ্" এবং "কৃষ্" আদিতে "চর্" ও "কৃ" থেকে উৎপন্ন ধাতু ছিল আর এই দুটিরই অথ করা এবং "কৃষ্" পদটিতে শ্রমসাধ্য কর্ম বা সঞ্চরণ অর্থ যেমন টানা, লাঙল দেওয়া এখনো বর্তমান। বৈদিক কর্ম, যজ্ঞ, অভীপ্সু মানবজাতির পরিশ্রম, আর্যর "অরতি" বোঝাতে যেসব বহুপদ ("কর্ম", "অপস্", "কার", "কীরি", "দুবস্" ইত্যাদি) ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে ইহারাও দুটি।

মানবের সকল সারবস্তুতে ও তার মধ্যে বর্তমান সকল কিছুতে তার পালন বা বর্ধন, বৃহৎ সত্য-চেতনার পূর্ণতা ও সমৃদ্ধির অভিমুখে তার নিরন্তর বৃদ্ধিসাধন তার মহান্ সংগ্রামে ও পরিশ্রমে তাকে ধারণ করা--ইহাই বৈদিক দেবতাদের সাধারণ কাজ। তারপর, তাঁরা "অপতুরঃ", যাঁরা জলরাশি পা'র হ'য়ে যান, অথবা সায়ণের ব্যাখ্যা মতো যাঁরা জলরাশি দান করেন। তিনি ইহা বোঝেন "বৃষ্টিদাতা" অর্থে আর ইহা সম্পূণ সত্য যে সকল বৈদিক দেবতাই বৃষ্টিদাতা, স্বর্গের প্রাচুর্যদাতা (কারণ "বৃষ্টি"র

দুটি অর্থই হয়), যে প্রাচুর্যকে কখন কখন বর্ণনা করা হয় সৌর জলরাশি", "স্বর্বতীর্ আপঃ" ব'লে অথবা এমন জলরাশি ব'লে যাদের মধ্যে থাকে জ্যোতির্ময় স্বর্গের, "স্বর"-এর আলোক। কিন্তু বেদে মহাসমুদ্র ও জলরাশি, যেমন এই কথাটিতেই বোঝা যায়, চেতন সত্তার সমুদয়ে এবং তার সকল গতিবিধিতে তার প্রতীক্। দেবতারা মানবচেতনার মধ্যে সকল বাধা পার ক'রে বর্ষণ করেন এই সব জলরাশির, বিশেষতঃ উর্ধ্বতন জলরাশির, স্বর্গের জলরাশির পূর্ণতা, সত্যের ধারাসমূহ, "ঋতস্য ধারাঃ"। এই অর্থে তাঁরা সকলেই "অপ্তুরঃ"। কিন্তু মানব সম্বন্ধেও বলা হয় যে সে জলরাশি পার হ'য়ে উত্তীর্ণ হয় সত্যচেতনার মধ্যে তার নিজস্ব ধামে এবং দেবতাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা তাকে পার করিয়ে দেন; এইটিই যে এখানে প্রকৃত অর্থ হ'তে পারে না তাতে সন্দেহ হ'তে পারে, বিশেষতঃ যখন আমরা "অপ্তুরঃ" ও "তূর্ণয়ঃ" পদ দুটি কাছাকাছি পাই এমন এক সম্বন্ধে যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হ'তে পারে।

আবার দেবতারা সফল আক্রমণকারীদের থেকে মুক্ত, আঘাতকারী বা বিরুদ্ধাচারী শক্তিসমূহের ক্ষতি থেকে মুক্ত এবং সেজন্য তাঁদের সচেতন জ্ঞানের সৃজনশীল গঠনসমূহ, তাঁদের মায়া স্বচ্ছন্দে, ব্যাপকভাবে বিচরণ করে, তাদের যথার্থ লক্ষ্য লাভ করে,—"অস্রিধ অহিমায়াসো অদ্রুহঃ"। যদি আমরা বেদের সেই সব বহুসংখ্যক অংশ বিবেচনা করি যাতে দেখা যায় যে যজ্ঞের, কর্মের, যাত্রার, আলোকবৃদ্ধির এবং জলরাশির প্রাচুর্যের সাধারণ উদ্দেশ্য হ'ল সত্য-চেতনার, "ঋতম্"এর প্রাপ্তি এবং ইহার ফল-স্বরূপ আনন্দ "ময়স"-এর প্রাপ্তি এবং ইহাও বিবেচনা করি যে এই সব বিশেষণ সাধারণতঃ অনন্ত অখণ্ড সত্য-চেতনার শক্তিসমূহ সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় তাহ'লে আমরা দেখতে পাব যে এই সত্যপ্রাপ্তির কথাই এই তিনটি শ্লোকে বলা হ'য়েছে। বিশ্বদেবগণ মানবের বৃদ্ধি সাধন করেন, মহৎ কর্মে তাকে উর্ধ্বে ধারণ করেন, তার জন্য নিয়ে আসেন স্বর্-এর জলরাশির প্রাচুর্য, সত্যের ধারাসমূহ, তাঁরা সত্যচেতনার অধৃষ্য অখণ্ড ও ব্যাপক ক্রিয়া এবং ইহার জ্ঞানের বিস্তৃত গঠনসমূহ, "মায়াঃ"র সংযোগ স্থাপন করেন।

"উস্রা ইব স্বসরাণি" পদসমষ্টিকে আমি সম্ভবপর অতীব বাহ্য অর্থে অনুবাদ করেছি; কিন্তু বেদে এমনকি কবিত্বময় উপমাও শুধু শোভার জন্য কৃচিৎ প্রযুক্ত হয় অথবা কখনই প্রযুক্ত হয় না; ইহাদেরও ব্যবহার করা

হয় মনস্তাত্ত্বিক অর্থ গভীর করার জন্য এবং এক প্রতীকাত্মক্ বা দ্বিবিধ অর্থের অলংকার দিয়ে। "গো"র মতো "উস্রা" পদটিও বেদে সর্বদাই ব্যবহৃত হয় দুই অর্থে, অর্থাৎ মূর্ত অলংকার বা প্রতীক্ বৃষ বা গাভীর অর্থে এবং সেই সাথে উজ্জ্বল বা দীপ্ত জনদের, মানবের মাঝে সত্যের দীপ্ত শক্তিসমূহের মনস্তাত্ত্বিক অর্থে। এইরূপ সব দীপ্ত শক্তিরূপেই বিশ্বদেবগণ আসবেন এবং তাঁরা আসেন সোমরসের, "স্বসরাণি"-র সমীপে যেন শান্তি বা আনন্দের সব আসনে বা রূপে; কারণ "সস্" এবং বহু অন্যান্য ধাতুদের মতো "স্বস্" ধাতুটিরও অর্থ বিশ্রাম করা এবং ভোগ করা, উভয়ই। তাঁরা সত্যের বিভিন্নশক্তি যা মানবের মাঝে আনন্দের বহি-বর্ষণের মধ্যে প্রবেশ করে যখনই ঐ সঞ্চরণ প্রস্তুত হ'য়েছে অশ্বীদের প্রাণিক ও মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা এবং ইন্দ্রের শুদ্ধ মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা।

"হে পালকগণ যাঁরা কর্মীকে তার কর্মে ঊর্ধ্বে ধারণ করেন, হে বিশ্ব-দেবগণ, আসুন এবং যে সোমমদিরা আমি বিতরণ করি তা ভাগ করে নিন।

"হে বিশ্বদেবগণ, যাঁরা আমাদের কাছে জলরাশি নিয়ে আসেন, আমার সব সোমনিবেদনের মধ্য দিয়ে পার হ'য়ে দীপ্ত শক্তিসমূহ রূপে আসুন আপনাদের আনন্দের স্থানগুলিতে।

"হে বিশ্বদেবগণ আপনারা যাঁরা আক্রান্ত হন না অথবা আঘাত করতেও আসেন না, যাঁরা আপনাদের জ্ঞানের বিভিন্ন রূপের মধ্যে স্বচ্ছন্দবিহারী, আমার যজ্ঞে সংলগ্ন থাকুন ইহার সব ধারকরূপে।"

এবং অবশেষে সূক্তটির শেষভাগে আমরা এই স্পষ্ট ও অভ্রান্ত নিদর্শন পাই যে সত্যচেতনাই যজ্ঞের লক্ষ্য, সোমনিবেদনের উদ্দেশ্য, প্রাণশক্তি ও মনের মধ্যে অশ্বীদের, ইন্দ্রের এবং বিশ্বদেবগণের কর্মের চরম ফল। কারণ এই সেই তিনটি ঋক্ যাতে বলা হয়েছে সরস্বতীর, দিব্য বাক্-এর কথা যিনি সত্যচেতনা থেকে অবতীর্ণ আন্তর প্রেরণার ধারার প্রতিভূ এবং এইভাবে তাদের অর্থ প্রকাশিত হয় স্বচ্ছ ও স্পষ্ট ভাবে ঃ

"পাবকা সরস্বতী তাঁর ঋদ্ধির সকল রূপের সকল প্রাচুর্য নিয়ে মননের সত্তায় সমৃদ্ধা তিনি যেন আমাদের যজ্ঞ কামনা করেন।

"তিনি, সুখময় সত্যসমূহের প্রচোদায়িকা, সুষ্ঠুমতিসমূহের প্রতি চেতনার জাগয়িত্রী, সরস্বতী যজ্ঞকে ঊর্ধ্বে ধারণ করেন।

"সরস্বতী বোধের দ্বারা চেতনার মধ্যে জাগ্রত করেন মহান্ প্রবাহ

(ঋতম্-এর বিশাল সঞ্চরণ) এবং সকল মননকে সম্পূর্ণভাবে দীপ্ত করেন।”

এই স্পষ্ট ও দীপ্তিময় শেষ অংশটি ইহার পূর্বের সকল কিছুর উপর আলোকপাত করে। ইহাতে দেখা যায় বৈদিক যজ্ঞ এবং মন ও অন্তঃ-পুরুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, ঘৃত ও সোমরসের নিবেদনের মধ্যে, এবং দীপ্তিময় মনন, মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের সমৃদ্ধি, মননের যথার্থ অবস্থা এবং সত্য ও জ্যোতির দিকে ইহার জাগরণ ও সংবেগের মধ্যে অন্যোন্যাশ্রয়তা। সরস্বতীর মূর্তিকে ইহা প্রকাশ করে আন্তর প্রেরণার, শ্রুতির দেবী রূপে। এবং ইহা বৈদিক নদীসমূহের ও মনের সব মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। ঋষিরা তাঁদের প্রতীকপূর্ণ রচনাশৈলীর স্বেচ্ছাকৃত দ্ব্যর্থবাচক কথাগুলির মধ্যে যেসব দীপ্ত ইঙ্গিত বিক্ষিপ্ত ভাবে রেখেছেন তাদের রহস্যের দিকে আমাদের চালনা করার জন্য, এই অংশটি তাদের অন্যতম।

নবম অধ্যায়

সরস্বতী ও তাঁর সহচরীবৃন্দ

বেদের প্রতীকার্থ সর্বাপেক্ষা বিশদভাবে পরিস্ফুট হয় দেবী সরস্বতীর মূর্তিতে। অন্য অনেক দেবতাদের বেলায় আন্তর অর্থ ও বাহ্য মূর্তির মধ্যে একটি সমতা সযত্নে রাখা হয়। কখন কখন আবরণ স্বচ্ছ হ'য়ে ওঠে, কখন বা ইহার এক প্রান্ত তুলে দেওয়া হয় যাতে এমন কি সাধারণ শ্রোতাও বেদবাণীর আন্তর অর্থ বুঝতে পারে; তবে এই আবরণ কখনই সম্পূর্ণভাবে অপসারণ করা হয় না। সেজন্য সন্দেহ থাকতে পারে যে অগ্নি যজ্ঞীয় অগ্নির ব্যক্তিকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়, অথবা ইহা শুধু বিষয়সমূহের আলোক ও উত্তাপের ভৌতিকতত্ত্ব, অথবা ইন্দ্র আকাশ ও বৃষ্টি অথবা ভৌতিক আলোকের দেবতা বৈ অন্য কিছু নয়, অথবা বায়ু শুধু ঝড় বাতাসের দেবতা, অথবা বড়জোর দৈহিক প্রাণের শ্বাসপ্রশ্বাস। অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাদের সম্বন্ধে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার যুক্তির জোর তত বেশী নয়; কারণ স্পষ্টতঃই বরুণ শুধু বৈদিক ইউরেনাস (Uranus) বা নেপচুন (Neptune) নয়, বরং ইহা এমন এক দেব যার প্রভূত ও গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কর্ম আছে; সেইরকম মিত্রের ও ভগেরও ঐরূপ মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে। যে ঋভুগণ মনের সাহায্যে বিষয়ের রূপ দেন এবং কর্মের দ্বারা অমৃতত্ব সৃজন করেন তাঁদের জোর ক'রে প্রাকৃতিক উপাখ্যানের কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ করা দুরূহ। তবে বৈদিক সূক্তসমূহের কবিদের ভাবনা বিষম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ছিল এই কথা বলে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা অসঙ্গত হ'লেও সে অসঙ্গতি উপেক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু সরস্বতীর বেলায় এরূপ কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। সরস্বতী যে বাগ্‌দেবী, দিব্য আন্তর প্রেরণার অর্থাৎ চিদাবেশের দেবী তা সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত।

যদি ইহাই সব কিছু হ'ত তাহ'লেও তাতে শুধু এই কথাই স্পষ্ট হ'ত যে বৈদিক ঋষিরা শুধু প্রকৃতিচারী অসভ্যই ছিলেন না, তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবনাও ছিল এবং তাঁরা যে শুধু উপাখ্যানের মাধ্যমে এমন সব প্রতীক্ রচনা করতে সমর্থ ছিলেন যাতে তাদের প্রিয় কৃষিকার্য, গোচারণ ও উন্মুক্ত জীবনযাপনের সহিত জড়িত ভৌতিক প্রকৃতির সুস্পষ্ট ক্রিয়াবলী বোঝাত

তা নয় তাতে মন ও অন্তঃপুরুষের আন্তর ক্রিয়াবলী বোঝাত। যদি আমরা মনে করি যে পুরাতন ধর্মীয় ভাবনার ইতিহাস হ'ল ভৌতিক থেকে আধ্যাত্মিকে অগ্রসরতা, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক দৃষ্টি থেকে প্রকৃতি ও জগৎ ও দেবতাদের সম্বন্ধে ক্রমেই আরো নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টির দিকে অগ্রগতি—অবশ্য এই মত কোনরূপেই নিশ্চিত না হ'লেও বর্তমানে ইহাই স্বীকৃত[১]—তাহ'লে আমাদের একথা অন্ততঃ স্বীকার করতে হবে যে দেবতাদের সম্বন্ধে বৈদিক কবিগণ পূর্ব থেকেই ভৌতিক ও প্রাকৃতিক ভাবনা থেকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু সরস্বতী শুধু যে চিদাবেশের দেবী তা নয়, তিনি আবার একই সময়ে আদি আর্য দেশের সপ্ত নদীর অন্যতমা। তখনই এই প্রশ্ন ওঠে যে কোথা থেকে এই দুই ভাবনার এই অদ্ভুত মিল হ'ল? আর কেমন ক'রেই বা বৈদিক সূক্তসমূহে এই দুই ভাবনার সংযোগ হ'ল? আর তাছাড়া অন্য কথাও আছে; কারণ সরস্বতীর গুরুত্ব শুধু তাঁর নিজের জন্য নয়, অন্যদের সহিত তাঁর যেসব সম্পর্ক আছে তার জন্য তাঁর গুরুত্ব। এবিষয়ে আরো অগ্রসর হবার পূর্বে এইসব সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রে দেখা যাক ত' থেকে কিছু জানা যায় কি না।

গ্রীক্ উপাখ্যানেও কাব্যপ্রেরণার সহিত নদীর সম্পর্ক বর্তমান; কিন্তু সেখানে কবিতা ও সঙ্গীতের দেবীদের (Muses) নদী ব'লে ভাবা হয় না; তাদের সম্পর্ক শুধু এক পার্থিব স্রোতের সহিত আর তা-ও খুব স্পষ্টভাবে নয়। এই স্রোত হ'ল হিপ্পোক্রিন (Hippocrene) নদী, ইহাকে বলা হয় অশ্বের প্রস্রবণ আর এই নামকরণ সম্বন্ধে এই উপাখ্যান আছে যে ইহার উৎপত্তি হ'য়েছিল দিব্য অশ্ব পেগাসাসের (Pegasus) ক্ষুর থেকে; অশ্বটি তার ক্ষুর দিয়ে প্রস্তরকে আঘাত করেছিল এবং পর্বতের যেখানে সে আঘাত করেছিল সেখান থেকে প্রেরণার স্রোতের প্রবাহ বার হ'ল। এই উপাখ্যানটি কি শুধু এক গ্রীসদেশীয় রূপকথা, না ইহার কোন বিশেষ অর্থ ছিল? আর ইহা স্পষ্ট যে যদি ইহার কোন অর্থ থাকে তাহ'লে সে অর্থ মনস্তা-

১ আমার মনে হয় না যে ধর্মীয় ভাবনার প্রথম উদ্ভব ও আদিম ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের কোন তথ্য আছে। বস্তুতঃ তথ্যগুলি থেকে এমন এক আদি শিক্ষার নির্দেশ পাওয়া যায় যা একই সাথে মনস্তাত্ত্বিক ও প্রাকৃতিক, অর্থাৎ তার দুটি দিক ছিল যাদের প্রথম দিকটি কমবেশী ঢাকা পড়ে গেল তবে অসভ্য জাতিদের মধ্য থেকে এমনকি উত্তর আমেরিকার উপজাতিদের মধ্য থেকেও তা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি। কিন্তু এই শিক্ষা প্রাগৈতিহাসিক হ'লেও আদিম অবস্থার শিক্ষা বৈ আর কিছু নয়।

ত্ত্বিক অর্থ হবে কেননা স্পষ্টতঃই ইহার সম্পর্ক এক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারের সহিত, অর্থাৎ কাব্যপ্রেরণারূপী স্রোতের উৎপত্তির সহিত; ইহা নিশ্চিত যে এই উপাখ্যানের মাধ্যমে কিছু মনস্তাত্ত্বিক ঘটনাকে রূপ দেওয়া হ'য়েছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হ'ল 'পেগেসাস্' কথাটিকে আদি আর্য স্বরে রূপান্তরিত করা হ'লে ইহার রূপ হয় 'পাজস' আর স্পষ্টতঃই ইহা সংস্কৃত পদ 'পাজস্'-এর সহিত সম্পর্কযুক্ত; সংস্কৃত 'পাজস্'-এর আদি অর্থ ছিল শক্তি, সঞ্চরণ বা কখন কখন পদ বা ভূমি। গ্রীকেও ইহার সম্পর্ক 'পেজে' নদীর সহিত। সুতরাং এই উপাখ্যানের পদসমূহে সর্বদাই আন্তর প্রেরণার এক জোরালো সঞ্চরণের ভাবনার সম্পর্ক ছিল। আমরা যদি বৈদিক প্রতীক্গুলির দিকে লক্ষ্য দিই আমরা দেখি যে অশ্ব অর্থাৎ ঘোটক হ'ল প্রাণের স্ফুরন্ত মহাশক্তির, প্রাণিক ও স্নায়বিক শক্তির মূর্তি এবং যেসব মূর্তি চেতনার প্রতীক্ তাদের সহিত ইহা সর্বদাই যুক্ত। অদ্রি অর্থাৎ পর্বত বা প্রস্তর রূপায়িত অস্তিত্বের এবং বিশেষতঃ ভৌতিক প্রকৃতির প্রতীক্ এবং এই পর্বতের বা প্রস্তরের মধ্য থেকেই সূর্য্যের গোযূথ মুক্ত হয় এবং জলরাশি প্রবাহিত হয়। ইহাও বলা হয় যে মধুধারা সোম এই পর্বত বা প্রস্তর থেকেই দোহন করা হয়। সুতরাং প্রস্তরে অশ্বের ক্ষুরের দ্বারা আন্তর প্রেরণার জলরাশির নির্গমন স্পষ্টতঃই একটি মনস্তাত্ত্বিক রূপক হবে। আর প্রাচীন গ্রীকরা বা ভারতীয়রা যে এইরূপ মনস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষণে অথবা ইহাকে কবিতায় ও রহস্যার্থক মূর্তিতে প্রকাশ করতে অক্ষম ছিল তা মনে করার কোন যুক্তি নেই; বস্তুতঃ এইরূপ রূপক মূর্তিই প্রাচীন রহস্যের মূল বস্তু ছিল।

বস্তুতঃ আমরা আরো অগ্রসর হ'য়ে অনুসন্ধান করতে পারি যে বেদে বর্ণিত যে ইন্দ্র শত্রু বলকে বধ করেছিলেন এই কারণে যে বল নিজের জন্য আলোক রেখেছিল সেই বলহা ইন্দ্রের সহিত বেলেরাস হন্তা দিব্য অশ্বারোহী বীর বেলেরোফনের কোন সংযোগ আছে কিনা। তবে এই অনুসন্ধান আমাদের বিষয়বস্তুর সীমার বাহিরে যাবে। তাছাড়া পেগেসাস উপাখ্যানের ব্যাখ্যাও শুধু এই প্রকাশ করবে যে প্রাচীনদের স্বাভাবিক কল্পনাবৃত্তি কেমন ছিল এবং কেমন করে তাঁরা আন্তরপ্রেরণার প্রবাহকে স্রোতস্বতী নদীর প্রবাহের রূপ দিয়েছিলেন। সরস্বতী কথাটির অর্থ "স্রোতস্বতী, প্রবাহিনী"; সুতরাং এই নামটিতে যেমন নদী বোঝায় তেমন আন্তর প্রেরণার দেবীও বোঝায়। কিন্তু কোন্ চিন্তা ধারার অথবা ভাবানুষঙ্গের প্রণালীতে আন্তর-

প্রেরণার সাধারণ ভাবনা একটি বিশেষ পার্থিব জলধারার সহিত সংযুক্ত হল? আর বেদে শুধু যে একটি নদীকেই তার প্রাকৃতিক ও উপাখ্যান-সম্বন্ধীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য অন্যগুলি অপেক্ষা পবিত্র আন্তরপ্রেরণার সহিত যুক্ত করা হয়েছে তা নয়। কারণ এখানে একটি নদীর কথা নয়, এখানে ঋষিদের মনে সর্বদাই সপ্তনদীর ভাবনা রয়েছে আর এইসব-গুলিকেই দেব ইন্দ্র একসাথে মুক্ত করেছিলেন; যে সর্ব্বরাজ তাদের উৎসে কুণ্ডলীভূত হ'য়ে প্রবাহকে রুদ্ধ করেছিল তাকে তিনি আঘাত করে রুদ্ধ-ধারা মুক্ত করেছিলেন। এই কথা মনে করা অসম্ভব হবে যে এই সাত সাতটি নদীর মধ্যে মাত্র একটিরই মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য থাকবে আর বাকী-গুলি শুধু পাঞ্জাবের বাৎসরিক বর্ষা-আগমনের সহিত সংযুক্ত হবে। সর-স্বতীর মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের সহিত বৈদিক জলধারার সব প্রতীকেরই তাৎপর্য রয়েছে।[১]

সরস্বতীর সংযোগ শুধু অন্য নদীর সহিত নয়, এমন অন্য সব দেবী-দের সহিত তাঁর সংযোগ যারা স্পষ্টতঃ মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্; বিশেষ করে তিনি ভারতী ও ইলার সহিত সংযুক্ত। পরবর্তী পৌরাণিক পূজাপদ্ধতিতে সরস্বতী হ'লেন বাক্, বিদ্যা ও কাব্যের দেবী, আর ভারতী তাঁর অন্য একটি নাম কিন্তু বেদে ভারতী ও সরস্বতী দুটি বিভিন্ন দেবী। ভারতীকে মহীও বলা হয় আর এ কথাটির অর্থ বৃহৎ, মহৎ বা বিশাল। যেসব প্রার্থনাসূক্তে অগ্নি দেবতাদের যজ্ঞে আবাহন করেন তাতে সর্বদাই এই তিন দেবীর ইলা, মহী বা ভারতী এবং সরস্বতীর একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ।
বর্হিঃ সীদন্ত্বস্রিধঃ। (১-১৩-৯)

"ইলা, সরস্বতী ও মহী—এই যে তিন দেবী আনন্দ উৎপাদন করেন তাঁরা যেন যজ্ঞাসনে উপবেশন করেন, তাঁরা যাঁরা স্খলিত হন না" অথবা "যাঁরা আঘাত করতে আসেন না" অথবা "যাঁরা আঘাত করেন না"। আমার মনে হয় এই বিশেষণটির এই অর্থ যে তাঁদের মধ্যে কোন অশুভ-ফলদায়ী দুরাচরণ নেই, 'দুরিতম্' নেই, পাপ ও ভ্রমের গর্তের মধ্যে কোন

১ পরবর্তী ভারতীয় ভাবনাতেও নদীর প্রতীকার্থ আছে; যেমন তান্ত্রিক রূপকে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম যৌগিক প্রতীক্ অর্থে ব্যবহৃত হয়; আর সাধারণতঃ ইহাদের অন্যভাবে হ'লেও যৌগিক প্রতীকার্থেই ব্যবহার করা হয়।

পদস্খলন নেই। এই কথাটিই ১০ম মণ্ডলের ১১০ম সূক্তে আরো বিস্তৃত-ভাবে বলা হ'য়েছে :

আ নো যজ্ঞানাং ভারতী তূয়ম্ এতু
ইলা মনুষ্বদ্ ইহ চেতয়ন্তী,
তিস্রো দেবীর্বহিরেদং স্যোনম্
সরস্বতী স্বপসঃ সদন্তু।

"আমাদের যজ্ঞে ভারতী আসুন দ্রুতগতিতে, ইলা মানুষের মতো এখানে আসুন আমাদের চেতনা, (বা জ্ঞান বা দৃষ্টি) জাগ্রত ক'রে,—আর সরস্বতী—এই তিন দেবী এই আনন্দময় আসনে উপবেশন করুন কর্ম সুসম্পন্ন ক'রে"।

ইহা স্পষ্ট এবং আরো স্পষ্ট হবে যে এই তিন দেবীর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এমন ক্রিয়া আছে যা সরস্বতীর আন্তরপ্রেরণাশক্তির সদৃশ। আমি যা বলি তাতে সরস্বতী বাক্, আন্তরপ্রেরণা আর তা আসে 'ঋতম্', সত্য-চেতনা থেকে। ভারতী এবং ইলাও নিশ্চয়ই সেই একই বাক্ বা জ্ঞানের অন্য রূপ হবে। মধুচ্ছন্দার অষ্টম সূক্তের একটি ঋকে ভারতীকে মহী বলা হয়েছে

এবা হ্যস্য সূনৃতা বিরপ্শী গোমতী মহী।
পক্বা শাখা ন দাশুষে॥

"এইভাবে মহী ইন্দ্রের জন্য আলোকপূর্ণা, প্রাচুর্যে উচ্ছলা ও সুখময়-সত্যসম্পন্না হ'য়ে যজ্ঞদাতার কাছে পক্কশাখার মতো হন্"। (১-৮-৮)

বেদের রশ্মি হ'ল সূর্যের রশ্মি। আমাদের কি মনে করতে হবে যে এই দেবী ভৌতিক আলোকের দেবী, না আমরা "গো"র অর্থ করব গরু এবং মনে করব যে মহী যজ্ঞদাতার পক্ষে গরুতে পূর্ণ? এই শেষোক্ত অসঙ্গত অর্থের বিরুদ্ধে সরস্বতীর মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র আমাদের সাহায্য করে কিন্তু ইহা আবার সমভাবেই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যাও অপনোদন করে। যজ্ঞে সরস্বতীর সহচরী রূপে, আন্তরপ্রেরণার দেবীর ভগিনী রূপে, এবং পরবর্তী পুরাণে ইঁহার সহিত সম্পূর্ণ মিলিয়ে দিয়ে মহীকে যেভাবে চিত্রিত করা হ'য়েছে তাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায়—আর অন্য বহু প্রমাণও আছে—যে বেদে আলোক হ'ল জ্ঞানের প্রতীক্, আধ্যাত্মিক দীপ্তির প্রতীক্। সূর্য হ'লেন পরমা দৃষ্টির অধিপতি, "বৃহৎ জ্যোতিঃ" বিশাল আলোক, অথবা কখন কখন যেমন বলা হয় ইহা সত্য আলোক, "ঋতম্ জ্যোতিঃ"।

আর বেদে 'ঋতম্' ও 'বৃহৎ'—এই দুইটি পদ সততই একসাথে যুক্ত থাকে।

এই সব পদের প্রয়োগ থেকে আমার কাছে এই অর্থ মনে হয় যে ইহা এক প্রবুদ্ধ চেতনার অবস্থা, যা প্রকৃতিতে বিশাল বা 'বৃহৎ', সত্তার সত্য পূর্ণ, "সত্যম্" এবং জ্ঞান ও ক্রিয়ার সত্যেও পূর্ণ "ঋতম্"। অন্য কিছু অর্থ অসম্ভব বলে মনে হয়। দেবগণের এই চেতনা আছে। যেমন অগ্নিকে বলা হয় 'ঋতচিৎ', অর্থাৎ যে সত্যচেতনাসম্পন্ন। মহী এই সূর্যের রশ্মিমালায় পূর্ণা; তিনি তাঁর মধ্যে এই দীপ্তি বহন করেন। তাছাড়া তিনি "সূনৃতা", তিনি সুখময় সত্যের বাক্, যেমন সরস্বতীকে বলা হ'য়েছে যে তিনি সুখময় সত্যের প্রেরয়ত্রী, "চোদয়ত্রী সূনৃতাম্"। শেষ পর্যন্ত ইহাও বলা হ'য়েছে যে তিনি 'বিরপ্শী', অর্থাৎ বৃহতী বা প্রাচুর্যে উচ্ছলা। এই কথাটি থেকে আমাদের স্মরণ হয় যে সত্য বৃহৎও বটে, "ঋতং বৃহৎ"। আবার অন্য একটি সূক্তে (১-২২-১০) মহীকে বলা হ'য়েছে "বরূত্রী ধিষণা" অর্থাৎ বিশালব্যাপিনী ধীশক্তি। তাহ'লে মহী হল সত্যের দীপ্তিময় বৃহত্ত্ব, ইহার অর্থ আমাদের মধ্যে সত্যের, 'ঋতম্'-এর ধারক যে অতি-চেতন সত্তা আছে তার বৃহত্ত্ব। সেজন্য যজ্ঞদাতার কাছে তিনি পক্বফলপূর্ণা শাখার মতো।

ইলা পদটিরও অর্থ সত্য; পরে বিভ্রান্তিবশে তাঁর নাম বাণীর ভাবনার সহিত এক হ'য়ে গেছে। যেমন সরস্বতী মনের সত্যচিন্তনে বা সত্য অবস্থায় চেতনাকে জাগিয়ে তোলেন, "চেতন্তী সুমতীনাম্", তেমন ইলাও যজ্ঞে আসেন চেতনাকে জ্ঞানে প্রবুদ্ধ ক'রে "চেতয়ন্তী"। তিনি শক্তিপূর্ণা, "সুবীরা" এবং জ্ঞান আনেন। সূর্যের সহিত তাঁরও সম্পর্ক আছে, যেমন এক মন্ত্রে (৫-৪-৪) আছে যে অগ্নি, অর্থাৎ সংকল্পকে আবাহন করা হ'চ্ছে ইলার সহিত একমনা হ'য়ে সত্যজ্যোতির অধিপতি সূর্যের রশ্মির দ্বারা যত্নশীল হ'তে, "ইশয়া সজোসা যতমানো রশ্মিভিঃ সূর্যস্য"। তিনি হ'লেন রশ্মিসমূহের, সূর্যের গোযূথের মাতা। তাঁর নামের অর্থ এই যে তিনি অন্বেষণ করেন ও লাভ করেন এবং ঋতম্ ও ঋষি পদগুলিতে যে ভাবনা থাকে ইহাতেও সেই ভাবনা যুক্ত থাকে। সুতরাং ইলার অর্থ ঋষির সেই দৃষ্টি যাতে সত্য পাওয়া যায়।

যেমন সরস্বতী সেই সত্য-শ্রবণ, 'শ্রুতি'র প্রতীক্ যা চিদাবিষ্ট বাণী দেয়, তেমন ইলা দৃষ্টির, সত্য-দর্শনের প্রতীক্। যদি ইহা সত্য হয়—কারণ "দৃষ্টি" ও "শ্রুতি" ঋষির, কবির সত্যদ্রষ্টার দুইটি শক্তি, তাহ'লে

আমরা বুঝতে পারি ইলা ও সরস্বতীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ কেন। ভারতী বা মহী হ'ল সত্য-চেতনার বৃহত্ত্ব; মানবের সীমিত মনে উদিত হ'য়ে ইহা ভগিনীদ্বয়রূপী দুই শক্তিকে আনয়ন করে। আমরা আরো বুঝতে পারি যে পরে বৈদিক জ্ঞানের অবনতির ফলে কেমন করে এই সব সূক্ষ্ম ও জীবন্ত পার্থক্যগুলিকে অবহেলা করা হ'ল আর ভারতী, সরস্বতী ও ইলা মিশে এক হ'য়ে উঠল।

আরো লক্ষণীয় এই যে এই তিন দেবীর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তাঁরা মানবের জন্য আনন্দ, "ময়ঃ", উৎপাদন করেন। বৈদিক ঋষিদের ভাবনায় সত্য ও আনন্দের মধ্যে যে সতত সম্পর্ক ছিল সে কথা পূর্বেই স্পষ্ট ক'রে বলা হ'য়েছে। মানবের মধ্যে সত্য অর্থাৎ অনন্ত চেতনার উদয় হ'লেই সে দুঃখ ও কষ্টভোগের এই দুঃস্বপ্ন থেকে, এই দ্বন্দ্বময় সৃষ্টি থেকে উপনীত হয় আনন্দের মধ্যে, সেই সুখময় অবস্থায় যাকে বেদে "ভদ্রম্", "ময়ঃ" (প্রেম ও আনন্দ), "স্বস্তি" (অস্তিত্বের সদবস্থা, সুস্থতা) এবং "বার্যম্", "রয়িঃ", "রায়ঃ" প্রভৃতি আরো সাধারণ কথায় বর্ণিত হ'য়েছে। বৈদিক ঋষিদের কাছে সত্য হ'ল পথ এবং উপশালা আর দিব্য অস্তিত্বের আনন্দ হ'ল নিশানা, অথবা সত্য ভিত্তিস্বরূপ এবং আনন্দ পরম পরিণাম। তাহ'লে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব হিসাবে ইহাই সরস্বতীর চরিত্র, তাঁর বিশিষ্ট কার্য এবং দেবগণের মধ্যে তাঁর অতীব নিকট আত্মীয়গণের সহিত সম্পর্ক। বৈদিক নদী হিসাবে তার অন্য ছয় ভগিনী নদীগণের সহিত সম্পর্কের উপর এইগুলি কতদূর আলোকপাত করে? অন্যান্য প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতো বৈদিক ভাবনাতেও 'সপ্ত' সংখ্যাটির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আছে। সপ্ত পদটির প্রয়োগ আমরা সর্বদাই দেখি—সপ্ত আনন্দ, "সপ্ত রত্নানি", অগ্নির সপ্ত শিখা, জিহ্বা বা রশ্মি, "সপ্ত অর্চিষঃ, সপ্ত জ্বালাঃ", মননতত্ত্বের সপ্ত রূপ "সপ্ত ধীতয়ঃ" সপ্ত রশ্মি অথবা গো, অবধ্য গোর, অর্থাৎ দেবগণের মাতা অদিতির সপ্তরূপ, "সপ্ত গাবঃ"; সপ্ত মাতা অথবা পালিকা গাভী, "সপ্ত মাতরঃ, সপ্ত ধেনবঃ" আর এই সংজ্ঞাটি রশ্মি ও নদী উভয় সম্বন্ধেই বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়। আমার মনে হয় এই সব সপ্তসংখ্যক বিষয়গুলি বেদে অস্তিত্বকে যে মূল তত্ত্বসমূহে ভাগ করা হ'য়েছে তাদের সহিত সম্পর্কিত। চিন্তাশীল প্রাচীনদের কাছে এই তত্ত্বগুলির সংখ্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল আর আমরা দেখি যে ভারতীয় দর্শনে ইহার নানাবিধ উত্তর—এক থেকে আরম্ভ ক'রে

ঊর্ধ্বে বিংশসংখ্যক তত্ত্বের কথা বলা হ'য়েছে। বৈদিক ভাবনায় মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বের সংখ্যার উপর অস্তিত্বের সংখ্যা নির্ণীত হত, কেন না ঋষিরা মনে করতেন যে সমগ্র অস্তিত্ব চিন্ময় সত্তার ক্রিয়া। আধুনিক মনের কাছে এইরূপ কল্পনা ও শ্রেণীবিভাগ যতই অদ্ভূত বা নিষ্ফল ভাবা হ'ক না কেন, এইগুলি কেবলমাত্র শুষ্ক দার্শনিক পার্থক্য ছিল না, বরং ইহারা এক জীবন্ত মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল আর বহু পরিমাণে এই অনুশীলনের মননের ভিত্তি ছিল; যাই হ'ক যদি আমরা এই প্রাচীন ও দূরবর্তী চিন্তাধারা সম্বন্ধে কোন যথার্থ ভাবনা গঠন করতে চাই তাহ'লে এইগুলিকে আমাদের বিশদভাবে প্রণিধান করা দরকার।

আমরা দেখি যে বেদে এই তত্ত্বগুলির নানাবিধ সংখ্যার কথা বলা হ'য়েছে। স্বীকার করা হ'ত যে 'একম্' ভিত্তি ও উপাদান; এই "একম্"-এ দুইটি তত্ত্ব আছে--দিব্য ও মানুষী, মর্ত্য ও অমর্ত্য। এই দ্বিসংখ্যাকে আবার স্বর্গ ও পৃথ্বী, মন ও দেহ, পুরুষ ও প্রকৃতি--এই সব দুই তত্ত্বের বেলাতেও প্রয়োগ করা হয়; এই সব দুই তত্ত্বকে সকল সত্তার পিতা ও মাতা বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু ইহা তাৎপর্যপূর্ণ যে যখন স্বর্গ ও পৃথ্বী মানসিক ও শারীরিক চেতনার অর্থাৎ প্রাকৃতিক শক্তির এই দুই রূপের প্রতীক্ হিসাবে গণ্য হয় তখন ইহারা আর পিতা ও মাতা নয়, ইহারা দুই মাতা। এই ত্রিতত্ত্বকে দুইবার স্বীকার করা হ'য়েছে--প্রথমতঃ ত্রিবিধ দিব্যতত্ত্বে যাকে পরে বলা হ'ল সচ্চিদানন্দ, অর্থাৎ দিব্য সৎ, চেতনা ও আনন্দ; দ্বিতীয়তঃ মন, প্রাণ ও শরীর--এই ত্রিবিধ ঐহিক তত্ত্বে আর ইহাদের নিয়েই বেদ ও পুরাণের ত্রিলোক গঠিত। কিন্তু সাধারণতঃ স্বীকার করা হয় যে পূর্ণ সংখ্যা হ'ল সাত। তিনটি ঐহিক তত্ত্বের সহিত তিনটি দিব্যতত্ত্ব যোগ দিয়ে আর তার মধ্যে একটি সপ্তম তত্ত্ব অর্থাৎ যোগসূত্ররূপ অন্য তত্ত্ব যোগ দেওয়া হয়। এই সপ্তম তত্ত্বটিই সত্য-চেতনা, "ঋতম্ বৃহৎ" যার নাম পরে হ'ল বিজ্ঞান বা মহঃ। এই শেষ পদটির অর্থ মহৎ; সুতরাং ইহা 'বৃহৎ'-এর সমার্থক। অন্য শ্রেণী-বিভাগও আছে যেমন পঞ্চ, অষ্ট, নব ও দশ এবং এমনকি মনে হয় দ্বাদশ; কিন্তু এইগুলি সম্বন্ধে আমাদের এখনই কোন চিন্তার প্রয়োজন নেই।

ইহা বলা দরকার যে এই সব তত্ত্বকে যথার্থই অচ্ছেদ্য ও সর্বব্যাপী বলে মনে করা হ'ত এবং সেজন্য প্রকৃতির প্রতি পৃথক রূপায়ণেই তারা

প্রয়োজ্য। যেমন "সপ্ত ধীতয়ঃ" হ'ল আমাদের বর্তমান বর্ণনামতো সপ্তলোকের প্রতিটির মনের বেলায় প্রযোজ্য, আর বলা যেতে পারে যে তাদের রূপায়ণ হল জড় মন, স্নায়বিক মন, শুদ্ধ মন, সত্য মন ইত্যাদি যাদের সর্বোচ্চ শিখর হ'ল "পরম পরাবৎ"। সপ্ত রশ্মি বা গো হ'ল অদিতি যিনি অনন্ত মাতা, অবধ্যা গাভী, পরমা প্রকৃতি বা অনন্ত চেতনা, পরবর্তী ভাবনা যে প্রকৃতি বা শক্তি তার আদি উৎস; আর এই প্রাথমিক গ্রাম্য জীবনের রূপকে পুরুষ হ'ল বৃষ, বৃষভ; সকল বিষয়ের আদি মাতা তাঁর জগৎ ক্রিয়ার সপ্ত লোকে সচেতন সত্তার শক্তি হিসাবে রূপগ্রহণ করেন। সেইরকম আবার সপ্ত নদী হল সত্তা সমুদ্রের সপ্তবিধ ধাতুর অনুরূপ সপ্ত সচেতন স্রোত আর আমাদের কাছে পুরাণে এইগুলিকেই সপ্ত লোক বলে রূপান্বিত করা হ'য়েছে। মানবচেতনার মধ্যে তাদের পূর্ণ প্রবাহই সত্তার সমগ্র ক্রিয়া সামর্থ্যের উপাদান, তার ধাতুর পূর্ণ সম্পদ, তার শক্তির পূর্ণ বিলাস। বৈদিক রূপকে তাঁর গাভীরা সপ্ত নদীর জল-পান করে।

প্রাচীন আর্যদের মতো যারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে তাদের পক্ষে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মিল করে এইরূপ রূপকই স্বাভাবিক হবে; যেমন আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় (theosophical.) ভাবনার দ্বারা বিভিন্ন 'লোকের' রূপকের সহিত পরিচিত হ'য়েছি, তেমন তাদের পক্ষে ঐসব রূপকই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। সুতরাং এই সব রূপকের চিত্র ও ভাবনার অস্তিত্ব স্বীকার করা হ'লে সপ্ত নদীর অন্যতমা হিসাবে সরস্বতীর স্থান কোথায় তা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। তিনি সেই স্রোত যা সত্য-তত্ত্ব থেকে, ঋতম্ বা মহম্ থেকে আসে আর আমরা দেখি যে বেদে, যেমন তৃতীয় সূক্তের শেষ শ্লোকে, ইহাকে বলা হ'য়েছে মহা বারি, "মহো অর্ণঃ", আবার কখন কখন মহান্ অর্ণবঃ আর এ থেকেই পরবর্তী সংজ্ঞা "মহস্"-এর উৎপত্তি। সরস্বতী ও মহা বারির সহিত সম্পর্ক কিরূপ ঘনিষ্ঠতা আমরা দেখি তৃতীয় সূক্তে। প্রথমে আমরা এই সম্পর্ক সম্বন্ধে আরো কিছু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করব, ইহার পর আমরা বিচার করব বৈদিক "গো"র অর্থ কি এবং দেব ইন্দ্র এবং সরস্বতীর আত্মীয়া দেবী সরমার সহিত 'গো'র কি সম্পর্ক। প্রথমে এই সব সম্পর্কের পরীক্ষাই প্রয়োজনীয়। ইহার পর মধুচ্ছন্দার অন্যান্য যে সব সূক্তে মহান্ বৈদিক দেব দ্যৌকাতির (স্বর্গের

রাজার) উল্লেখ আছে--যে দেবতা আমাদের মতে মনঃশক্তির এবং বিশেষ করে মানুষের মধ্যে দিব্য বা স্বয়ং-দীপ্ত মনের প্রতীক্--তাদের সম্বন্ধে আলোচনা করার সুবিধা হবে।

দশম অধ্যায়

সমুদ্র ও নদীর চিত্র

মধুচ্ছন্দার তৃতীয় সূক্তে যে তিনটি ঋকে সরস্বতীকে আবাহন করা হ'য়েছে সেগুলি সংস্কৃতে এই:

পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥
চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥
মহো অর্ণঃ সরস্বতী প্রচেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজিত॥

সত্যের যে শক্তিকে আমরা আন্তরপ্রেরণা (বা চিদাবেশ) বলি সরস্বতী তা-ই একথা জানা থাকলে প্রথম দুটি শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট। সত্য থেকে যে আন্তরপ্রেরণা আসে তা সকল অনৃত দূর ক'রে পবিত্র করে, কারণ ভারতীয় ভাবনায় সকল পাপ শুধু মিথ্যা, অনৃত, অনুচিতভাবে উত্থিত ভাবাবেগ, অনুচিতভাবে চালিত সংকল্প ও ক্রিয়া। জীবন ও আমাদের সম্বন্ধে যে প্রধান ভাবনা থেকে আমরা শুরু করি তা মিথ্যা এবং বাকী সব ইহার দ্বারা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। আমাদের কাছে সত্য আসে এমন এক আলোক ও স্বর হিসাবে যা জোর করে আমাদের মননের পরিবর্তন আনে এবং আমাদের নিজেদের ও আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকল কিছু সম্বন্ধে নূতন জ্ঞান দেয়। মননের সত্য সৃষ্টি করে সত্যের দৃষ্টি আর সত্যের দৃষ্টি আমাদের মধ্যে তৈরী করে সত্তার সত্য এবং সত্তার সত্য থেকে (সত্যম্) স্বভাবতঃই প্রবাহিত হয় ভাবাবেগ, সংকল্প ও ক্রিয়ার সত্য। বস্তুতঃ ইহাই বেদের মূল ধারণা।

আন্তরপ্রেরণারূপী সরস্বতী তাঁর দীপ্ত প্রাচুর্যে পূর্ণা, মননের ধাতুতে সমৃদ্ধা। তিনি যজ্ঞ ধারণ করেন অর্থাৎ মর্ত্য মানবের চেতনাকে জাগ্রত ক'রে তার ক্রিয়াবলীর নিবেদনকে ধারণ করেন যাতে এই চেতনা সত্যানু-যায়ী ভাবাবেগের সঠিক অবস্থা এবং মননের সঠিক ক্রিয়াবলী পায়, এই সত্য থেকেই তিনি তাঁর দীপ্তি বর্ষণ করেন এবং চেতনার মধ্যে ঐ সব

সত্যের উদয় প্রবর্তন করেন। বৈদিক ঋষিদের মতে ঐ সব সত্যই প্রাণ ও সত্তাকে মিথ্যা, দুর্বলতা ও সসীমতা থেকে মুক্ত ক'রে তার কাছে উন্মুক্ত করে পরম আনন্দের দ্বার।

এই নিরন্তর জাগরণ ও প্রবর্তনাকে সংক্ষেপে বলা হ'য়েছে 'কেতু' যার অর্থ দৃষ্টি। বিষয়সমূহ সম্বন্ধে মানবের মিথ্যাদৃষ্টি থেকে ইহার পার্থক্য বোঝাবার জন্য কখন কখন ইহাকে দিব্য দৃষ্টি, "দৈব্য কেতু"ও বলা হয়। সরস্বতী মানবসত্তার চেতনায় সক্রিয় করে তোলেন মহাপ্লাবন বা মহাসঞ্চরণ অর্থাৎ স্বয়ং সত্য-চেতনা এবং ইহার দ্বারা আমাদের সকল মননকে দীপ্তি-ময় করে তোলেন। আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বৈদিক ঋষিদের এই সত্য-চেতনা একটি অতিমানসিক লোক, আমাদের সত্তা পর্বতের এমন এক স্তর ("অদ্রেঃ সানু") যা আমাদের সাধারণ নাগালের বাহিরে আর এখানে আমাদের উঠতে হয় কষ্ট করে। ইহা আমাদের জাগ্রত সত্তার কোন অংশ নয়, ইহা আমাদের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন আছে অতিচেতনের সুষুপ্তির মধ্যে। মধুচ্ছন্দা যে বলেছেন যে সরস্বতী আন্তরপ্রেরণার নিরন্তর ক্রিয়ার দ্বারা আমাদের মননের মধ্যে চেতনায় সত্য জাগিয়ে তোলেন তার অর্থ কি তাহ'লে আমরা তা এখন বুঝতে পারি।

অবশ্য ব্যাকরণের দিক থেকে এই বাক্যটিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে অনুবাদ করা সম্ভব; "মহো অর্ণঃ" কথাটিকে সরস্বতীর বিশেষণস্বরূপ ভেবে এই-রকম একটা অনুবাদ হ'তে পারে, "মহানদী সরস্বতী দৃষ্টির দ্বারা আমাদের জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করেন এবং আমাদের সকল মননে ভাস্বর হন।" মনে হয় সায়ণের অর্থ এইরূপ, কিন্তু মহানদীর অর্থ যদি পাঞ্জাবদেশের কোন পার্থিব নদী হয় তাহ'লে আমরা এমন এক অসংলগ্ন চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির সম্মুখীন হই যা দুঃস্বপ্ন বা উন্মাদাগার ছাড়া অন্যত্র অসম্ভব। তবে এটা মনে করা সম্ভব যে ইহার অর্থ আন্তরপ্রেরণার মহাপ্লাবন কিন্তু ইহার সহিত সত্য-চেতনার মহাসমুদ্রের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু অন্যত্র বারবার বলা হ'য়েছে যে দেবতারা কাজ করেন মহাপ্লাবনের বিশাল শক্তির দ্বারা, "মহ্না মহতো অর্ণবস্য" (১০-৬৭-১২), আর এসবে সরস্বতীর কোন উল্লেখ না থাকায় এখানে সরস্বতীর অর্থ অসম্ভব। একথা সত্য যে বৈদিক রচনায় সরস্বতীকে ইন্দ্রের গোপন আত্মা বলা হ'য়েছে—কিন্তু ইহা লক্ষণীয় যে যদি সরস্বতী শুধু এক উত্তর অঞ্চলের নদী হয় আর ইন্দ্র আকাশের দেবতা হন তাহ'লে ইহাও অর্থশূন্য হ'য়ে পড়ে; কিন্তু যদি ইন্দ্রের অর্থ হয় দীপ্ত মানস এবং

সরস্বতীর অর্থ অতিমানসিক সত্যের গুপ্ত লোক থেকে উদ্ভূত আন্তর প্রেরণা তাহ'লে ঐ কথাটির একটি গভীর ও চমৎকার তাৎপর্য পাওয়া যায়। কিন্তু যদি আমরা "মহ্না মহতো অর্ণবস্য" কথাটির অর্থ করি "সরস্বতীর মহিমার দ্বারা", তাহ'লে অন্য দেবতাদের বেলায় ঐ কথাটি দিয়ে সরস্বতীকে অত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া অসম্ভব। বারবার বলা হ'য়েছে যে দেবগণ কাজ করেন সত্যের শক্তির দ্বারা, "ঋতেন", কিন্তু সরস্বতী সত্যের একটিমাত্র দেবতা এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠাও নন বা সর্বময়ীও নন। সুতরাং আমি যে অর্থ করেছি তা-ই অন্যান্য শ্লোকের কথার সহিত একমাত্র সঙ্গতিপূর্ণ ভাষ্য।

তাহ'লে এই শ্লোকটি থেকে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হ'ল যে—মহাস্রোত সরস্বতীই হ'ক বা সত্য-সমুদ্রই হ'ক—বৈদিক ঋষিরা বারি, নদী বা সমুদ্রের মূর্তিকে রূপকার্থে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্ হিসাবে ব্যবহার করতেন। এই অর্থে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারি দেখা যাক। আমরা প্রথমেই লক্ষ্য করি যে হিন্দুরচনাবলীতে, বেদে, পুরাণে ও এমনকি দার্শনিক যুক্তি-ধারায় ও উদাহরণে অস্তিত্বকে সর্বদাই সমুদ্র হিসাবে বলা হ'য়েছে। বেদে দুইটি সমুদ্রের উল্লেখ আছে—একটি ঊর্ধ্বের বারিরাশি, অন্যটি নিম্নের বারিরাশি। ইহারা হ'ল অবচেতন সমুদ্র যা অন্ধকারময় ও অপ্রকাশমান, অন্যটি অতিচেতন সমুদ্র যা দীপ্ত ও সদাপ্রকাশমান তবে মানুষী মনের অতীত। ৪র্থ মণ্ডলের শেষ সূক্তে বামদেব এই দুটি সমুদ্রের কথা বলেন। তিনি বলেন, সমুদ্র থেকে একটি মধুময় তরঙ্গ ওঠে আর এই যে ঊর্ধ্বগামী তরঙ্গ সোম ("অংশু") তার দ্বারা সম্যক্ অমৃতত্ব লাভ হয়; সেই তরঙ্গ বা সেই সোম হ'ল শুদ্ধতার গোপন নাম (ঘৃতস্য, ইহা পার্থিব ঘৃতের প্রতীক্); ইহা দেবতাদের জিহ্বা; অমৃতত্বের নাভি ইহা।

"সমুদ্রাদ্ ঊর্মির্মধুমান্ উদারদুপাংশুনা সমমৃতত্বমানট্।
ঘৃতস্য নাম গুহ্যং যদস্তি জিহ্বা দেবানামমৃতস্য নাভিঃ ॥

(৪-৫৮-১)

আমি ধরে নিচ্ছি যে অন্ততঃ এই শ্লোকটিতে সমুদ্র, মধু, সোম, ঘৃত মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্। একথা নিশ্চিত যে বামদেব এই কথা বলতে চাননি যে ভারত মহাসাগর বা বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জল থেকে অথবা এমনকি সিন্ধু বা গঙ্গা নদীর মিষ্ট জল থেকে মদ্যের একটি তরঙ্গ বা প্লাবন উঠে এল এবং মদ্য ঘৃতের গুহ্য নাম। স্পষ্টতঃ তাঁর অর্থ এই যে আমাদের

অন্তঃস্থ অবচেতন সমুদ্র থেকে আনন্দের একটি মধুময় তরঙ্গ অর্থাৎ অস্তিত্বের শুদ্ধ আনন্দ ওঠে আর এই আনন্দ বলেই আমরা অমৃতত্ব লাভ করি; এই আনন্দ দীপ্তিমান্ শুদ্ধ মনের ক্রিয়ার পশ্চাদস্থিত গোপন সত্তা, গুহ্য সদ্‌বস্তু। বেদান্তও বলে যে আনন্দের দেব সোম মন বা ইন্দ্রিয়গত জ্ঞান হয়েছে; অর্থাৎ সকল মানসিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যেই অস্তিত্বের প্রচ্ছন্ন আনন্দ বর্তমান আর ইহাদের চেষ্টা হ'ল তার আপন সত্তার গুহ্যসত্য প্রকাশ করা। সেজন্যই আনন্দ দেবতাদের জিহ্বা যা দিয়ে তাঁরা অস্তিত্বের আনন্দ আস্বাদন করেন, ইহাই নাভি যাতে অমৃতময় অবস্থার বা দিব্য অস্তিত্বের সকল ক্রিয়াবলী একত্র সন্নিবেশিত। বামদেব আরো বলেছেন, "এস, আমরা এই শুদ্ধতার গুহ্য নাম প্রকাশ করি---অর্থাৎ এই সোমরসকে, অস্তিত্বের এই প্রচ্ছন্ন আনন্দকে এস আমরা বাহির করি; এস, আমরা এই জগৎ-যজ্ঞে ইহাকে ধারণ করি অগ্নির কাছে আমাদের সমর্পণের দ্বারা অথবা নিবেদনের দ্বারা যিনি সেই দিব্যসংকল্প বা চিৎশক্তি যা আমাদের সত্তার প্রভু। তিনি জগৎসমূহের চতুঃশৃঙ্গী বৃষভ আর যখন তিনি মানবের অন্তঃপুরুষ থেকে উত্থিত মননের আত্মপ্রকাশ শোনেন তখন তিনি আনন্দের এই গুহ্য নাম নিষ্কাশিত করেন তার গোপন স্থান থেকে।"

বয়ম নাম প্র ব্রবামা ঘৃতস্য অস্মিন্ যজ্ঞে ধারায়ামা নমোভিঃ।
উপ ব্রহ্মা শৃণবচ্ছস্যমানং চতুঃশৃঙ্গো ঽবমীদ্ গৌর এতৎ ॥

(৪-৫৮-২)

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে যেহেতু সোমরস ও ঘৃত প্রতীকার্থক্, সেহেতু যজ্ঞও প্রতীকার্থক্ হতে বাধ্য। বামদেবের এই সূক্তের মতো অন্য যেসব সূক্ত আছে তাতে বৈদিক রহস্যবাদীরা যে যজ্ঞার্থক আবরণ বিস্তৃতভাবে রচনা করেছিলেন তা আমাদের সম্মুখ থেকে বিলীয়মানা কুহেলিকার মতো অপসৃত হয় আর প্রকাশিত হয় বৈদান্তিক সত্য, বেদের রহস্য।

যে সমুদ্রের কথা বামদেব বলেছেন তা কেমন সে সম্বন্ধে তিনি কোন সন্দেহের অবকাশ রাখেন নি; কারণ পঞ্চম শ্লোকে তিনি স্পষ্টভাবে ইহাকে হৃদয়ের সমুদ্র বলে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন "হৃদ্যাৎ সমুদ্রাৎ", হৃদয়সমুদ্র থেকেই শুদ্ধতার জলধারা, "ঘৃতস্য ধারা" প্রবাহিত হয়; তিনি বলেন যে এই প্রবাহ মন ও আন্তর হৃদয় দ্বারা ক্রমশঃ বিশুদ্ধ হয়, "অন্তর্হৃদা মনসা পূয়মানাঃ"। আর শেষ শ্লোকটিতে তিনি বলেন যে সমগ্র অস্তিত্ব তিন ধামে প্রতিষ্ঠিত---প্রথমতঃ অগ্নির আসনে---অন্য ঋক্ থেকে আমরা জানি

যে অগ্নির আসন সত্য-চেতনা, অগ্নির স্বীয় ধাম, "স্বম্ দমম্ ঋতম্ বৃহৎ"; দ্বিতীয়তঃ ইহা অবস্থিত হৃদয়ে, সাগরে, যা স্পষ্টতঃই "হৃদ্‌সমুদ্র",—আর তৃতীয়তঃ মানবের প্রাণে।

"ধামন্ তে বিশ্বং ভুবনমধিশ্রিতম্ অন্তঃসমুদ্রে হৃদ্যন্তরায়ুপি"।

(৪-৫৮ ১১)

অতিচেতন, অবচেতনার সমুদ্র এবং ইহাদের মধ্যে প্রাণীর প্রাণ—অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইহাই বৈদিক ভাবনা।

অন্তঃস্থ হৃদয়ের অবচেতনার সমুদ্র যেমন শুদ্ধতার নদীসমূহের, মধুময় ঊর্মির উদয়স্থল, তেমন তাদের লক্ষ্য হ'ল অতিচেতনার সমুদ্র। এই ঊর্ধ্বের সাগরকেই বলা হয় সিন্ধু যার অর্থ নদীও হ'তে পারে আবার সমুদ্রও হ'তে পারে; কিন্তু এই সূক্তে ইহার অর্থ স্পষ্টতঃই সমুদ্র। যে অত্যাশ্চর্য ভাষায় বামদেব এই শুদ্ধতার নদীসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন তা লক্ষণীয়। তিনি প্রথম বলেছেন যে দেবগণ এই শুদ্ধতা, 'ঘৃতম্' চেয়েছিলেন ও পেয়েছিলেন আর এই 'ঘৃতম্'কে পণিরা তিন স্থানে লুকিয়ে রেখেছিল গরুর মধ্যে, "গবি"। বেদে 'গৌ' গাভী ও আলোক এই দুই অর্থে যে ব্যবহৃত হ'য়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; গাভী হ'ল বাহিরের প্রতীক্, আর আন্তর অর্থ হ'ল জ্যোতিঃ। পণিদের দ্বারা "গো" হরণ করা ও লুকিয়ে রাখার চিত্রটি বেদে সততই বর্তমান। এখানে ইহা স্পষ্ট যে যেহেতু সমুদ্র একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্—হৃদয়সমুদ্র, "সমুদ্রে হৃদি" আর সোম একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্ আর 'ঘৃত'ও একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক, সেহেতু যে গো'র মধ্যে দেবতারা পণিদের লুকানো ঘৃত পান, তা-ও নিশ্চয়ই আন্তর দীপ্তি হ'বে, ইহা কোন ভৌতিক আলোক নয়। বস্তুতঃ 'গো' হল অবচেতনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অদিতি, অনন্ত চেতনা, আর ত্রিবিধ 'ঘৃতম্' হ'ল ত্রিবিধ শুদ্ধতা—আনন্দের রহস্য লাভ করেছে এমন মুক্ত ইন্দ্রিয়সংবিৎ-এর আলোক ও বোধি প্রাপ্ত হ'য়েছে এমন চিন্তামানসের এবং স্বয়ং সত্যের, অন্তিম অতিমানসিক দৃষ্টির শুদ্ধতা। পঞ্চম শ্লোকের শেষার্ধে একথা স্পষ্ট করে বলা হ'য়েছে (৪-৫৮-৪)—"একটিকে ইন্দ্র সৃষ্টি করেছিলেন এবং একটিকে সূর্য আর দেবতারা একটিকে নির্মাণ করেছিলেন বেনর মধ্য থেকে স্বাভাবিক বিকাশ অনুযায়ী"; কারণ ইন্দ্র হ'লেন চিন্তা-মানসের অধিপতি, সূর্য অতিমানসিক আলোকের অধিপতি আর বেনর অর্থ সোম যিনি অস্তিত্বের মানসিক আনন্দের অধিপতি, ইন্দ্রিয়মানসের স্রষ্টা।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন যে এখানে পণির অর্থ যে আধ্যাত্মিক শত্রু, তমসের শক্তি তা নিশ্চিত, ইহারা দ্রাবিড় দেবতা, বা দ্রাবিড় উপজাতি বা দ্রাবিড় বণিক্ নয়। পরের শ্লোকটিতে বামদেব 'ঘৃতম্'এর ধারা সম্বন্ধে বলেন যে তারা হৃদয়সমুদ্র থেকে ওঠে, সেখানে তারা শত্রুর দ্বারা শত কারাগারের (অবরোধের) মধ্যে বদ্ধ ছিল যাতে তাদের দেখা না যায়। নিশ্চয়ই ইহার এই অর্থ নয় যে ঘি বা জলের নদীসমূহ হৃদয়সমুদ্র বা অন্য কোন সমুদ্র থেকে উত্থিত হবার পর দুষ্ট এবং বিচারবুদ্ধিরহিত দ্রাবিড়গণ তাদের ধরে শত অবরোধের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল যাতে আর্যগণ আর তাদের দেখাও না পায়। পরিষ্কার বোঝা যায় যে সূক্তগুলিতে উল্লিখিত শত্রু, পণি, বৃত্র শুধু মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা, আদি ভারতীয় ইতিহাসের তথ্যগুলিকে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে তাদের বংশধরগণের কাছ থেকে এইরূপ জটিল ও অমোচনীয় কাহিনীর মধ্যে গোপন রাখার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়। যজ্ঞীয় চিত্রগুলির এইরূপ অভূতপূর্ব বিকৃত ব্যাখ্যা দেখলে ঋষি বামদেব বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে যেতেন। যদি আমরা ঘৃতের অর্থ করি জল, আর হৃদ্যসমুদ্রের অর্থ করি আনন্দদায়ক সরোবর আর মনে করি যে আর্যদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য দ্রাবিড়রা নদীগুলির জলকে শত বাঁধের মধ্যে আঁটক রেখেছিল তাতেও কোন সুবিধা হয় না। কারণ যদি পাঞ্জাবদেশের সব নদী একটিমাত্র মনোরম সরোবর থেকে প্রবাহিত হয় তাহ'লেও জলের ধারাগুলিকে একটি গরুর মধ্যে তিনস্থানে রাখা এবং গরুটিকে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন দ্রাবিড়ের পক্ষেও সম্ভব নয়।

বামদেব বলেন, "ইহারা উঠছে হৃদয়সমুদ্র থেকে কিন্তু শত্রুর দ্বারা শত অবরোধের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় তাদের দেখা যায় না; ঘৃতের ধারাগুলির দিকে আমি তাকাই কারণ তাদের মধ্যে আছে স্বর্ণবেতস গাছ। ইহারা সম্যক্‌ভাবে বয়ে যায় প্রবহমানা নদীর মতো আন্তর হৃদয় ও মনের দ্বারা পূত হ'য়ে; ঘৃতের এই তরঙ্গগুলি বয়ে যায় চালকের নির্দেশে চালিত পশুর মতো। যেন মহাসমুদ্রের ('সিন্ধু', ঊর্ধ্বস্থ মহাসমুদ্র) সম্মুখে একটি পথের উপর বীর্যবান্ যারা তারা সংহত হ'য়ে তীব্রবেগে চলে কিন্তু তারা সীমিত হয়ে থাকে প্রাণিক শক্তির দ্বারা ("বাত", "বায়ু") শুদ্ধতার ধারাসমূহ; তারা যেন এক সচেষ্ট অশ্ব যা তার বাঁধন ভেঙে ফেলে কারণ ইহা পুষ্ট হয় তরঙ্গমালার দ্বারা"। (৪-৫৮-৫,৭)। দেখলেই বুঝতে পারা

যায় যে ইহা এক রহস্যবাদীর কবিতা যিনি অধার্মিকের কাছ থেকে ইহার অর্থকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন চিত্রের আবরণে তবে এই আবরণকে তিনি মাঝে মাঝে স্বচ্ছ করেছেন জ্ঞানেচ্ছুদের দেখার জন্য। তিনি বলতে চান যে দিব্যজ্ঞান সব সময়ই আমাদের চিন্তাসমূহের পশ্চাতে নিরন্তর প্রবহমান, কিন্তু আমাদের আন্তর শত্রুরা আমাদের কাছ থেকে তাদের আটক রাখে কারণ তারা আমাদের মনের উপাদানকে সীমিত রাখে ইন্দ্রিয়গত ক্রিয়া ও ইন্দ্রিয়গত দৃষ্টির মধ্যে; ফলে যদিও আমাদের সত্তার তরঙ্গগুলি অতি-চেতনের সীমাস্থিত তীরের উপর এসে পড়ে তবু ইন্দ্রিয়মানসের প্রাণিক ক্রিয়ার দ্বারা তারা সীমিত হ'য়ে পড়ে এবং সেজন্য তাদের রহস্য প্রকাশিত হ'তে পারে না। তারা যেন লাগামে বদ্ধ সংযত অশ্বের মতো; শুধু যখন আলোকের তরঙ্গগুলি পূর্ণমাত্রায় তাদের বীর্য পুষ্ট করে তখন সচেষ্ট অশ্ব বাঁধন ভেঙে ফেলে এবং তারা অবাধে প্রবাহিত হয় 'তৎ' এর দিকে যা থেকে সোমরস নিষ্কাশিত হয় এবং যজ্ঞ জন্ম নেয়।

"যত্র সোমঃ সূয়তে যত্র যজ্ঞো
ঘৃতস্য ধারা অভি তৎ পবন্তে।" (৪-৫৮-৯)

এই লক্ষ্য সম্বন্ধে আবার বলা হয়েছে যে ইহা মধুময়—"ঘৃতস্য ধারা মধুমৎ পবন্তে" (৪-৫৮-১০); ইহা আনন্দ, দিব্যপরমানন্দ। আর এই লক্ষ্যস্থল যে সিন্ধু, অতিচেতন সমুদ্র তা স্পষ্ট ক'রে বলা হ'য়েছে শেষ ঋকে; এখানে বামদেব বলেছেন, "আমরা যেন আস্বাদন করতে পারি তোমার সেই মধুময় তরঙ্গ" অর্থাৎ অগ্নির, দিব্যপুরুষের, জগৎসমূহের চতুঃশৃঙ্গ বৃষভের তরঙ্গ "যে তরঙ্গ বাহিত হয় সেই বারিরাশির শক্তিতে যেখানে তারা সম্মিলিত হ'য়েছে।"

"অপাম্ অনীকে সমিথে য আভৃতঃ,
তম্ অশ্যাম মধুমন্তং ত ঊর্মিম্"। (৪-৫৮-১১)

আমরা দেখি যে বৈদিক ঋষিদের এই মূল ভাবনা সৃষ্টির সূক্তে (১০-১২৯-৩, ৪, ৫) স্পষ্ট করা হ'য়েছে; এখানে অবচেতনকে এইভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে "আদিতে এইসব অন্ধকার ছিল অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হ'য়ে—মানসিকচেতনারহিত এক মহাসমুদ্র...ইহার মধ্য থেকে 'একম্' জন্ম নিলেন নিজের শক্তির মহিমার দ্বারা। কামনারূপে ইহা তার মধ্যে প্রথমে সঞ্চরণ করল, এই কামনাই মনের প্রথম বীজ। অসতের মধ্যে প্রাজ্ঞরা তাকে দেখতে পেলেন যা সত্তা নির্মাণ করে; হৃদয়ের মধ্যে তাঁরা

তাকে পেলেন সংকল্পপূর্ণ প্রবেগের দ্বারা এবং চিন্তা-মানসের দ্বারা। তাদের রশ্মি বিস্তৃত হল আনুভূমিকভাবে; কিছু একটা ছিল উপরে, কিছু একটা ছিল নিম্নে।" বামদেবের সূক্তে যেসব ভাবনা, এই শ্লোকগুলিতেও সেই ভাবনার কথা বলা হ'য়েছে তবে ইহাতে চিত্রের কোন আবরণ নেই। অবচেতন সমুদ্রের মধ্য থেকে এক হৃদয়ে উদিত হলেন প্রথমে কামনা রূপে; তিনি সেখানে হৃদয়সমুদ্রে সঞ্চরণ করেন অস্তিত্বের আনন্দের অপ্রকাশিত কামনারূপে এবং এই কামনাই তার প্রথম বীজ যা পরে প্রকাশিত হয় ইন্দ্রিয়মানসরূপে। এইভাবে দেবতারা অবচেতন অন্ধকারের মধ্য থেকে সত্তা, সচেতন সত্তা নির্মাণের উপায় খুঁজে পেলেন; তাঁরা ইহাকে পেলেন হৃদয়ের মধ্যে এবং ইহাকে বাহিরে আনলেন মনন ও সংকল্পপূর্ণ প্রবেগের বৃদ্ধির দ্বারা, "প্রতীষ্যা" যার অর্থ মানসিক কামনা; অবচেতনার মধ্য থেকে প্রকৃতির শুধু প্রাণিক গতিবৃত্তিতে যে প্রাথমিক অস্পষ্ট কামনা ওঠে তা থেকে ভিন্ন এই মানসিককামনা। যে সচেতন অস্তিত্ব তাঁরা এইভাবে সৃষ্টি করেন তা যেন অন্য দুইটি প্রসারের মধ্যে আনুভূমিকভাবে বিস্তৃত; নিম্নে আছে অবচেতনের অন্ধকারময় নিদ্রা আর উপরে আছে অতিচেতনের জ্যোতির্ময় গুপ্ত তত্ত্ব। ইহারাই ঊর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ মহাসমুদ্র।

এই বৈদিক চিত্র পুরাণের অনুরূপ প্রতীকার্থক্ চিত্রগুলির উপর উজ্জ্বল আলোকপাত করে—বিশেষতঃ সেই বিখ্যাত প্রতীকের উপর যাতে বলা হয় যে প্রলয়ের পর বিষ্ণু ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তনাগের কুণ্ডলীর উপর নিদ্রিত রয়েছেন। হয়ত আপত্তি হ'বে যে পুরাণপ্রণেতারা ছিলেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু পুরোহিত বা কবি যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে এক দৈত্য সূর্য ও চন্দ্র গ্রাস করত বলেই গ্রহণ ঘটত এবং সেজন্য তাঁরা সহজেই বিশ্বাস করতেন পরমদেবতা ভৌতিক শরীর নিয়ে এক বাস্তব দুগ্ধের জড়ীয় মহাসাগরের মধ্যে এক ভৌতিক সর্পের উপর নিদ্রামগ্ন ছিলেন আর সেজন্য এই সব গল্পের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক অর্থ সন্ধান করা এক নিরর্থক কুশলতা। আমার উত্তর এই যে বস্তুতঃ এই সব অর্থ খোঁজার কোন দরকার নেই কারণ এইসব কুসংস্কারাচ্ছন্ন করিয়া গল্পের উপরভাগেই ঐরূপ অর্থ স্পষ্ট করে রেখেছেন যাতে যারা অন্ধ না থাকতে চায় তারা তা দেখতে পায়। কারণ তাঁরা বিষ্ণুর সর্পের নাম দিয়েছেন 'অনন্ত' আর অনন্তের অর্থ অন্তহীন, অসীম। সুতরাং তাঁরা স্পষ্টই বলেছেন যে চিত্রটি রূপক, এবং বিষ্ণু, যিনি সর্বব্যাপী দেবতা তিনি সৃষ্টিহীন সময়ে অনন্তের কুণ্ডলীর

মধ্যে নিদ্রা যান। সমুদ্র সম্বন্ধে এই বলা যায় যে বৈদিক চিত্রটি থেকে দেখা যায় যে ইহা নিশ্চয়ই শাশ্বত অস্তিত্বের সমুদ্র আর এই শাশ্বত অস্তিত্বের সমুদ্র একান্ত মাধুর্যের অর্থাৎ শুদ্ধ আনন্দের সমুদ্র। কারণ ক্ষীর অর্থাৎ মিষ্ট দুধ (যেটি এক বৈদিক চিত্র) বামদেবের সূক্তে কথিত 'মধু', বা মিষ্টতা থেকে মূলতঃ পৃথক কিছু নয়।

অতএব আমরা দেখি যে বেদে ও পুরাণে একই প্রতীকার্থক্ চিত্র ব্যবহার করা হ'য়েছে; তাদের কাছে সমুদ্র হ'ল অনন্ত ও শাশ্বত অস্তিত্বের চিত্র। আমরা আরো দেখি যে নদী বা প্রবহমাণা স্রোতধারাকে সচেতন-সত্তার ধারার প্রতীক্ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমরা ইহাও পাই যে সপ্ত নদীর অন্যতমা সরস্বতী হ'ল ঋত-চেতনা থেকে প্রবাহিত আন্তর প্রের-ণার নদী তাহ'লে অন্য ছয়টি নদীকেও মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্ হিসাবে গণ্য করা সঙ্গত হবে।

কিন্তু এইসব প্রকল্প ও অনুমান যতই জোরালো ও সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত হ'ক না কেন তাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করার প্রয়োজন নেই। আমরা যেমন বামদেবের সূক্তে দেখেছি যে সেখানে কথিত নদীসমূহ, "ঘৃতস্য ধারাঃ" ঘৃতের নদীও নয়, পার্থিব জলের নদীও নয়, ইহারা মনস্তাত্ত্বিক প্রতীক্, সেইরকম আমরা অন্য অনেক সূক্তে সপ্ত নদীর চিত্র সম্বন্ধে ঐরূপ জোরালো প্রমাণ পাই। এই উদ্দেশ্যে আর একটি সূক্ত পরীক্ষা করব, এইটি হ'ল অগ্নিদেবতার উদ্দেশে ঋষি বিশ্বামিত্রের দ্বারা উদ্‌গীত তৃতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্ত; শুদ্ধতার নদী সম্বন্ধে বামদেব যে সব কথায় আশ্চর্য-জনকভাবে সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন, তেমন বিশ্বামিত্রও সপ্ত নদী সম্বন্ধেও বলেছেন। আমরা দেখব যে এই দুই পুণ্যবান্ উদ্‌গাতার স্তোত্রে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে ঠিক একই ভাবনার কথা বলা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

সপ্ত নদী

বেদে সততই জলরাশি বা নদী সম্বন্ধে, বিশেষতঃ দিব্য জলরাশি সম্বন্ধে "আপো দেবীঃ" বা "আপো দিব্যাঃ" বলা হ'য়েছে, আবার মাঝে মাঝে এমন জলরাশির কথা বলা হ'য়েছে যার মধ্যে জ্যোতির্ময় সৌর লোকের আলোক বা সূর্যের আলোক, "স্বর্বতীর্ আপঃ" বিদ্যমান। দেবতাদের দ্বারা অথবা দেবতাদের সাহায্যে মানবের দ্বারা জলরাশির জন্য নির্মিত পথের কথা প্রতীকার্থে সতত ব্যবহৃত হ'য়েছে। যে তিনটি মহৎ বস্তু জয় করতে মানুষ আস্পৃহা করে এবং যা মানুষকে দেবার জন্য দেবগণ সর্বদা বৃত্র ও পণিদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত সেগুলি হ'ল গোযূথ, জলরাশি ও সূর্য বা সৌরলোক, "গাঃ, আপঃ, স্বঃ"। প্রশ্ন হ'ল এইগুলিতে কি আকাশের বৃষ্টির কথা, দ্রাবিড়গণের অধিকারভুক্ত বা তাদের দ্বারা আক্রান্ত উত্তর ভারতের নদীসমূহের কথা (কখন কখন দ্রাবিড়দের বৃত্র বলা হ'য়েছে আবার কখন বৃত্র হ'ল দ্রাবিড়দেবতা) আর আদি অধিবাসী "দস্যু"দের অধিকৃত গোযূথের কথা বা বহিরাগত আর্যদের কাছ থেকে ঐসব দস্যুদের দ্বারা অপহৃত গোযূথের কথা বলা হ'য়েছে? এই দস্যুরা হ'ল পণি, যারা গোযূথ অধিকার করে বা অপহরণ করে আর তারা কখন কখন দ্রাবিড় আবার কখন কখন তাদের দেবতা। অথবা এইসবের মধ্যে কি কোন গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ বিদ্যমান? 'স্বর্' জয় করার অর্থ কি ঝড়ের মেঘের দ্বারা আচ্ছন্ন সূর্যের অথবা রাহুগ্রস্ত সূর্যের অথবা রাত্রির অন্ধকারে আবৃত সূর্যের পুনরভ্যুদয়? কারণ অন্ততঃ এখানে বলা চলবে না যে আর্যদের কাছ থেকে এইসব মানুষী "কৃষ্ণচর্মবিশিষ্ট" বা "নাসিকাহীন" শত্রুরা সূর্যকে আটক রেখেছিল। অথবা স্বর্জয়ের অর্থ কি শুধু যজ্ঞের দ্বারা? স্বর্গজয়? আর যাই হ'ক না কেন, গাঃ, আপঃ ও সূর্যঃ অথবা গাঃ, আপঃ ও দ্যৌঃ—এই সবের এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের কি অর্থ? ইহাতে কি এই বোঝায় না যে যেহেতু গোযূথের কথা বলার জন্য যে "গাঃ" পদটি ব্যবহৃত হ'য়েছে তার অর্থ যেমন গাভী তেমন রশ্মি, সেহেতু গোযূথের অর্থ সেই উচ্চতর চেতনা থেকে আসা দীপ্তিসমূহ যার উৎস হল জ্যোতির সূর্য,

সত্যের সূর্য। স্বর্‌ও কি সর্বদীপ্তকারী সূর্যের ঐ জ্যোতি বা সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অমৃতত্বের জগৎ বা লোক নয় কারণ বেদে সূর্যকে বলা হ'য়েছে বৃহৎ সত্য "ঋতম্ বৃহৎ" এবং ঋতম্ জ্যোতিঃ? দিব্য জলরাশি, "আপো দেবীঃ", "দিব্যাঃ" বা "স্বর্বতীঃ" কি মর্ত্য মনের উপর ঐ অমৃতত্বের লোক থেকে এই উচ্চতর চেতনার প্রভূত বর্ষণ নয়?

অবশ্য একথা সত্য যে এমন অনেক শ্লোক বা সূক্ত আছে যার উপর-ভাসা অর্থে এইরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না আর বৃষ্টি দানের জন্য অথবা পাঞ্জাবের নদীসমূহের জন্য প্রার্থনা বা প্রশংসা হিসাবে সূক্তটির অর্থ করা যায়। কিন্তু বেদকে এরূপভাবে পৃথক পৃথক শ্লোক বা সূক্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। যদি ইহার কোন সুসংলগ্ন বা সঙ্গতি-পূর্ণ অর্থ থাকে তাহ'লে বেদকে সমগ্রভাবে ব্যাখ্যা করা দরকার। বিভিন্ন অংশে 'স্বর্' বা 'গাঃ'-র সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থ ক'রে আমরা সমস্যাকে এড়াতে পারি—যেমন সায়ণ কখন 'গাঃ'র অর্থ করেছেন গাভী, কখন রশ্মি, আবার কখনও দেখলে অবাক লাগে যে তিনি অবলীলাক্রমে ইহার অর্থ করেছেন জলরাশি।[১] কিন্তু ব্যাখ্যার এরূপ পদ্ধতিতে একটি "যুক্তিসঙ্গত" বা "সাধারণ জ্ঞানসম্মত" অর্থ পাওয়া যাবে এই কারণে ইহা সমীচীন হ'তে পারে না। ইহা যেমন যুক্তিবিরুদ্ধ, তেমন সাধারণ জ্ঞানবর্জিত। অবশ্য এরূপ পদ্ধতিতে খুসীমতো যে কোন অর্থ করা সম্ভব কিন্তু ইহাই যে বৈদিক সূক্তগুলির আদি অর্থ তা কোন বুদ্ধিমান্ অপক্ষপাতী ব্যক্তির মন বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবে না।

কিন্তু যদি আমরা আরো সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহ'লে প্রাকৃতিক বা ঐরূপ স্থূল ব্যাখ্যায় অসম্ভব বাধার সম্মুখীন হ'তে হ'বে। উদাহরণস্বরূপ, দিব্য জলরাশি, "আপো দেবীঃ" "আপো দিব্যাঃ" সম্বন্ধে বশিষ্ঠের একটি সূক্ত (৭-৪৯) আছে যার দ্বিতীয় শ্লোক এইরূপ: "যে দিব্য জলরাশি খনন-করা খাতে বয়ে যায় অথবা স্বয়ংজাত, যাদের গতি সমুদ্রের দিকে, যারা পবিত্র ও পাবক—সেই জলরাশি যেন আমাকে পালন করে।" বলা হ'বে যে এখানে শ্লোকের অর্থ সুস্পষ্ট, জড়ীয় জলরাশি সম্বন্ধে, পার্থিব নদী, খাল অথবা "খনিত্রিমাঃ" পদটির অর্থ যদি শুধু "খনন

১ সেইরূপ তিনি বেদের গুরুত্বপূর্ণ পদ "ঋতম্"-এর অর্থ কখন করেছেন যজ্ঞ, কখন সত্য, কখন জল আর এই সব বিভিন্ন অর্থ করেছেন পাঁচটি বা ছয়টি শ্লোকের একই সূক্তে।

করা হ'য়েছে এমন" হয় তাহ'লে কূপ সম্বন্ধেই বশিষ্ঠ ঐ সূক্ত বলেছেন এবং "দিব্যাঃ" পদটি একটি প্রশংসাসূচক অলঙ্কারবিশেষ; অথবা এমনকি হয়ত শ্লোকটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আমরা মনে করতে পারি যে তিন প্রকার জলরাশির বর্ণনা করা হ'য়েছে—স্বর্গের জল অর্থাৎ বৃষ্টি, কূপের জল এবং নদীর জল। কিন্তু যদি আমরা সূক্তটিকে সমগ্রভাবে বিচার করি তাহ'লে এইরূপ কোন অর্থ অসম্ভব। কারণ আরো যা বলা হ'য়েছে তা এই: "সেই দিব্য জলরাশি যেন আমাকে পালন করেন, প্রবহমাণা বন্যার মধ্য থেকে যে জ্যেষ্ঠ (বা শ্রেষ্ঠ) সমুদ্র বয়ে যায় ইহা পবিত্র করে চলে, ইহা স্তব্ধ হয় না, আর বজ্রী ইন্দ্র, বৃষভ ইহাকে বিদীর্ণ করেছিলেন। যে দিব্য জলরাশি খনন-করা খাতে বয়ে যায় অথবা স্বয়ংজাত, যাদের গতি সমুদ্রের দিকে, যারা পবিত্র ও পাবক—সেই দিব্য জলরাশি যেন আমাকে পালন করে। যাদের মাঝে বিরাজিত বরুণ যাত্রা করেন নিম্নে জীবের সত্য ও মিথ্যা অবলোকন ক'রে, যারা মধুস্রাবী, পবিত্র ও পাবক—সেই জলরাশি যেন আমাকে পালন করে। যাদের মধ্যে রাজা বরুণ, যাদের মধ্যে সকল দেবতারা শক্তির মত্ততা লাভ করেন, যাদের মধ্যে বৈশ্বানর অগ্নি প্রবেশ করেছেন—সেই দিব্য জলরাশি যেন আমাকে পালন করে।"
(৭-৪৯-১, ২, ৩, ৪)

ইহা স্পষ্ট যে বামদেব যে জলরাশির, যেসব স্রোতধারার স্তুতি করেছেন তাদেরই কথা বশিষ্ঠ এখানে বলেছেন, সেই জলরাশি যা সমুদ্র থেকে উদ্ভূত হ'য়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হয়, সেই মধুময় তরঙ্গ যা ঊর্ধ্বে ওঠে সমুদ্র থেকে, সেই প্লাবন থেকে যা বিষয়সমূহের হৃদয়, সেই শুদ্ধতার প্রবাহ, "ঘৃতস্য ধারাঃ"। ইহারা পরম ও বিশ্বময় চিন্ময় অস্তিত্বের প্লাবন যার মধ্যে বরুণ সঞ্চরণ করেন এবং নিম্নে মর্ত্যজীবেব সত্য ও মিথ্যার উপর দৃষ্টিপাত করেন—এই কথাগুলি এমন যা বৃষ্টিপাতের পক্ষে অথবা জড়ীয় সমুদ্রের পক্ষেও প্রযোজ্য নয়। বেদের বরুণ ভারতীয় নেপচুনও নয়, অথবা ইউরোপীয় পণ্ডিতরা যা প্রথমে ভেবেছিলেন, ঠিক গ্রীসীয় ঔরেনাস (Ouranos), অর্থাৎ আকাশ নয়। তিনি আকাশীয় ব্যাপ্তির, ঊর্ধ্বস্থ সমুদ্রের, সত্তার বৃহত্ত্বের, ইহার শুদ্ধতার অধিপতি। অন্যত্র বলা হ'য়েছে যে ঐ বৃহত্ত্বের মধ্যে তিনি পথহীন অনন্তে পথ নির্মাণ করেছেন যা দিয়ে সত্য ও জ্যোতির অধিপতি সূর্য সঞ্চরণ করতে পারেন। সেখান থেকে তিনি নিম্নে মর্ত্য চেতনার সংমিশ্রিত সত্য ও মিথ্যাসমূহ অবলোকন

করেন।...আর আমরা আরো দেখি যে এইসব দিব্য জলধারাকে ইন্দ্র বিদীর্ণ করেছিলেন এবং পৃথিবীর উপর প্রবাহিত করেছিলেন; সমগ্র বেদে সপ্ত নদী সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনাই করা হ'য়েছে।

বশিষ্ঠের স্তুতির এই সব জলরাশি যে বামদেবের মহাসূক্তেরই জলরাশি, "মধুমান্ ঊর্মিঃ" "ঘৃতস্য ধারাঃ" সে সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে তার সম্পূর্ণ নিরসন হয় ঋষি বশিষ্ঠের অন্য একটি সূক্তের দ্বারা (৭-৪৭)। ৪৯তম সূক্তে তিনি দিব্য জলরাশি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেছেন যে ইহা মধুস্রাবী, "মধুশ্চুতঃ আর দেবতারা ইহাতে শক্তির মত্ততা উপভোগ করেন, "উর্জং মদন্তি"; এ থেকে বোঝা যায় যে মধু বা মিষ্টতা হ'ল "মধু", সোম, আনন্দের মদিরা আর দেবগণ ইহার উল্লাস লাভ করেন। কিন্তু ৪৭তম সূক্তে তিনি নিঃসন্দেহভাবে তাঁর অর্থ সুস্পষ্ট করেছেন।

"হে জলরাশি, তোমার ঐ পরম তরঙ্গ, ইন্দ্রের সেই পানীয়, যাকে দেবত্ব-অভিলাষীরা নিজেদের জন্য তৈরী করেছিলেন, তোমার সেই পবিত্র, অজেয়, মধুক্ষরা, সর্বাপেক্ষা মধুময় ("ঘৃতপ্রুষং মধুমন্তম্") তরঙ্গ যেন আমরা আজ উপভোগ করতে পারি। হে জলরাশি, জলরাশির পুত্র (অগ্নি) যিনি দ্রুতধাবমান, তিনি যেন তোমার ঐ সর্বাপেক্ষা মধুময় তরঙ্গ পালন করেন; সেই যে তোমার তরঙ্গ যাতে ইন্দ্র বসুগণের সহিত উল্লাসে মত্ত হন আমরা দেবত্ব-অভিলাষীরা যেন আজ তা আস্বাদন করতে পারি। শত ছাঁকনির মধ্য দিয়ে পূত সেই জলরাশি যা তাদের নিজের প্রকৃতিতেই উল্লাসময় তারা দিব্য এবং চলে দেবতাদের গতির লক্ষ্যের দিকে (পরম সমুদ্র); তারা ইন্দ্রের কাজ সীমিত করে না; তারা নদীসমূহের উদ্দেশে শুদ্ধতাপূর্ণ ("ঘৃতবৎ") আহুতি প্রদান করে। যে নদীসমূহকে সূর্য তাঁর রশ্মির দ্বারা গঠন করেছেন, যাদের জন্য ইন্দ্র একটি চলন্ত তরঙ্গকে বিভক্ত করেছিলেন তারা যেন আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করে পরম মঙ্গল। আর হে দেবগণ, তোমরা আমাদের সদা রক্ষা কর স্বস্তির দ্বারা।"

(৭-৪৭-১, ২, ৩, ৪)

এখানে আমরা পাই বামদেবের "মধুমান্ ঊর্মিঃ", মিষ্ট মত্ততাকারক তরঙ্গ, আর স্পষ্ট বলা হ'য়েছে যে এই মধু, এই মিষ্টতা হ'ল ইন্দ্রের পানীয় সোম। ইহা আরো স্পষ্ট করা হ'য়েছে "শতপবিত্রাঃ" বিশেষণ পদটির দ্বারা কারণ বৈদিক ভাষায় ইহার একমাত্র অর্থ হ'ল সোম; আর ইহাও লক্ষণীয় যে এই বিশেষণটি নদীদেরও সম্বন্ধে প্রযুক্ত আর মধুময়

তরঙ্গকে ইন্দ্র তাদের মধ্য থেকে বহিয়ে এনেছেন, তিনিই তার পথ নির্মাণ করেছেন পর্বতের উপর পর্বতকে বিদীর্ণ করে বৃত্রঘাতী বজ্রের দ্বারা। আবার ইহাও স্পষ্ট করা হ'য়েছে যে এই বারিরাশি হ'ল সেই সপ্ত নদী যা ইন্দ্র মুক্ত করেছিলেন অবরোধকারী, আবরক, বৃত্রের কবল থেকে এবং প্রবাহিত করেছিলেন পৃথিবীর উপর।

এই যেসব নদী যাদের তরঙ্গ সোমমদিরাপূর্ণ, ঘৃতপূর্ণ 'উর্জে', শক্তিতে পূর্ণ সেই সব নদী কি হ'তে পারে? যেসব জলধারা দেবতার গতির লক্ষ্যের দিকে প্রবাহিত হয়, মানবের জন্য পরমমঙ্গল প্রতিষ্ঠা করে তারা কি? এইসব পাঞ্জাবের নদী নয়; বৈদিক ঋষিরা অসভ্য বর্বর ছিল, তাদের চিন্তাধারায় বর্বরোপযোগী অসংলগ্নতা ও উন্মত্ত প্রলাপ ছিল—এইসব উক্তি সত্ত্বেও আমাদের পক্ষে ঐরূপ বিবরণের এই প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা দেওয়া অসম্ভব। স্পষ্টতঃই এই সব নদী হ'ল পরমসমুদ্র থেকে প্রবাহিত সত্য ও আনন্দের জলধারা। এই সব নদী পৃথিবীতে প্রবাহিত হয় না, তারা প্রবাহিত স্বর্গে কিন্তু বৃত্র অর্থাৎ অবরোধক, আবরক আমাদের মর্ত্যবাসীদের পৃথ্বীচেতনার মধ্যে তাদের নেমে আসতে দেয় না যতক্ষণ না ইন্দ্র অর্থাৎ দেব-মন আবরককে তার দীপ্তিময় বিদ্যুতের দ্বারা আঘাত করেন এবং তাদের প্রবাহের জন্য পৃথ্বীচেতনার শিখরের উপর পথ খনন করেন। ইহাই বৈদিক ঋষিদের ভাবনা ও ভাষার একমাত্র যুক্তিসম্মত, সুসংলগ্ন ও সঙ্গত ব্যাখ্যা। বাকী অংশগুলি সম্বন্ধে বশিষ্ঠ যথেষ্ট স্পষ্ট করে বলে-ছেন; কারণ তিনি বলেন যে ইহারা সেই সব জলরাশি যাদের সূর্য গঠন করেছে তার রশ্মি দিয়ে আর পার্থিব গতিবৃত্তিতে ইন্দ্রের অর্থাৎ পরম মানসের ক্রিয়াবলী যেমন ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ হয়, এই সব জলরাশির দ্বারা তা হয় না। অর্থাৎ ইহারা হল বৃহৎ সত্যের, 'ঋতম্ বৃহৎ'-এর জলরাশি আর যেমন সর্বদা দেখেছি এই সত্য আনন্দ সৃজন করে; সেজন্য আমরা এখানে দেখি যে সত্যের এই সব জলরাশি (যাদের অন্যান্য সূক্তে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে "ঋতস্য ধারাঃ" (যেমন, ৫-১২-৩ শ্লোকে হে সত্যদ্রষ্টা, একমাত্র সত্যকেই দর্শন কর, সত্যের বহু ধারা খনন করে বাহির কর) মানুষের জন্য প্রতিষ্ঠা করে পরম শ্রেয়ঃ আর পরম শ্রেয়ঃ[১] হ'ল পরম স্বস্তি, দিব্য অস্তিত্বের আনন্দ।

১ সাধারণতঃ পদটির অর্থ করা হয় "স্বস্তি"।

তবু এই সূক্তগুলিতে অথবা বামদেবের সূক্তগুলিতে স্পষ্ট করে সপ্ত নদীর কথা বলা হয়নি। সেজন্য আমরা অগ্নির উদ্দেশে বিশ্বামিত্রের প্রথম সূক্তের (৩-১) দ্বিতীয় থেকে চতুর্দশ শ্লোকগুলির আলোচনা করব। এই অংশটি দীর্ঘ বটে কিন্তু ইহার গুরুত্ব এত বেশী যে এখানে ইহার উদ্ধৃতি ও অনুবাদ প্রয়োজনীয়।

প্রাঞ্চং যজ্ঞং চকৃম বর্ধতাং গীঃ
সমিদ্ভির্ অগ্নিং নমসা দুবস্যন্।
দিবঃ শশাসুর্ বিদথা কবীনাং
গৃৎসায় চিৎ তবসে গাতুম্ ঈষুঃ॥ (২)

ময়ো দধে মেধিরঃ পূতদক্ষো
দিবঃ সুবন্ধুর্ জনুষা পৃথিব্যাঃ।
অবিন্দন্ নু দর্শতম্ অপ্স্বন্তর্
দেবাসো অগ্নিম্ অপসি স্বসৃণাং॥ (৩)

অবর্ধয়ন্ত সুভগং সপ্ত যহ্বীঃ
শ্বেতং জজ্ঞানাম্ অরুষং মহিত্বা।
শিশুং ন জাতম্ অভ্যারুর্ অশ্বা
দেবাসো অগ্নিং জনিমন্ বপুষ্যন্॥ (৪)

শুক্রেভির্ অঙ্গৈ রজ আততন্বান্
ক্রতুং পুনানঃ কবিভিঃ পবিত্রৈঃ।
শোচির্ বসানঃ পরি আয়ুর্ অপাম্
শ্রিয়ো মিমীতে বৃহতীর্ অনূনাঃ॥ (৫)

বব্রাজ সীম্ অনদতীর্ অদব্ধাঃ
দিবো যহ্বীর্ অবসানা অনগ্নাঃ।
সনা অত্র যুবতয়ঃ সয়োনীর্
একং গর্ভং দধিরে সপ্ত বাণীঃ॥ (৬)

স্তীর্ণা অস্য সংহতো বিশ্বরূপা
    ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্।
অস্থুর্ অত্র ধেনবঃ পিন্বমানা
    মহী দস্মস্য মাতরা সমীচী॥ (৭)

বভ্রাণঃ সূনো সহসো ব্যদ্যৌদ্
    দধানঃ শুক্রা রভসা বপূংষি।
শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য
    বৃষা যত্র বাবৃধে কাব্যেন॥ (৮)

পিতুশ্চিদ্ ঊধর্ জনুষা বিবেদ
    ব্যস্য ধারা অসৃজদ্ বি ধেনাঃ।
গুহা চরন্তং সখিভিঃ শিবেভির্
    দিবো যহ্বীভির্ গুহা বভূব॥ (৯)

পিতুশ্ চ গর্ভং জনিতুশ্চ বভ্রে
    পূর্বীরেকো অধয়ৎ পীপ্যানাঃ।
বৃষ্ণে সপত্নী শুচয়ে সবন্ধূ
    উভে অস্মৈ মনুষ্যে নি পাহি॥ (১০)

উরৌ মহান্ অনিবাধে ববর্ধ
    আপো অগ্নিং যশসঃ সং হি পূর্বীঃ;
ঋতস্য যোনাব্ অশয়দ্ দমূনা
    জামীনাম্ অগ্নির্ অপসি স্বসৃণাম্॥ (১১)

অক্রো ন বভ্রিঃ সমিথে মহীনাম্
    দিদৃক্ষেয়ঃ সূনবে ভা-ঋজীকঃ।
উদ্ উস্রিয়া জনিতা যো জজান
    অপাং গর্ভো নৃতমো যহ্বো অগ্নিঃ॥ (১২)

অপাং গর্ভং দর্শতম্ ওষধীনাম্
বনা জজান সুভগা বিরূপম্।
দেবাসশ্চিন্ মনসা সং হি জগ্মুঃ
পনিষ্ঠং জাতং তবসং দুবস্যন্॥ (১৩)

বৃহন্ত ইদ্ ভানবো ভা-ঋজীকম্
অগ্নিং সচন্ত বিদ্যুতো ন শুক্রাঃ।
গুহেব বৃদ্ধং সদসি স্বে অন্তর্
অপার ঊর্বে অমৃতং দুহানাঃ॥ (১৪)

"পরমের দিকে ওঠবার জন্য আমরা যজ্ঞ করেছি, গীঃ (বাক্) বৃদ্ধিলাভ করুক। তার আগুনের প্রজ্বলনের দ্বারা, প্রপত্তির নমস্কারের দ্বারা তাঁরা অগ্নিকে তাঁর কার্যে প্রবৃত্ত করলেন; স্বর্গে তাঁরা প্রকাশ করেছেন দ্রষ্টাদের জ্ঞান এবং তাঁর জন্য তাঁর শক্তিতে, বাণীর কামনায় তাঁরা তাঁর জন্য একটি পথ কামনা করেন। (২)

মেধাবী, বিবেকজ্ঞানে পূত, শ্রেষ্ঠ বন্ধু (বা শ্রেষ্ঠ নির্মাতা) তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর জন্ম থেকে আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করেন; দেবগণ অগ্নির দেখা পেলেন জলরাশির মধ্যে, ভগিনীদের ক্রিয়াপ্রণালীর মধ্যে। (৩)

যিনি একান্তভাবে পরমসুখ উপভোগ করেন তাঁকে সপ্ত বীর্যবান্ পুরুষ বর্ধন করলেন, তিনি তার জন্মে শ্বেতবর্ণ, আর যখন বৃদ্ধিলাভ করেন তখন তিনি অরুণবর্ণ। তাঁরা তাঁর চারিদিকে সঞ্চরণ করে যত্নশীল হ'লেন ---সেই অশ্বারা নবজাত শিশুর চারিদিকে; দেবগণ অগ্নিকে তার জন্মে দেহ দান করলেন। (৪)

তাঁর শুদ্ধ উজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তিনি বিস্তার লাভ করলেন এবং পবিত্র প্রজ্ঞাধিপতিদের সাহায্যে কর্ম-সংকল্পকে বিশুদ্ধ ক'রে তিনি অন্তর্লোক গঠন করলেন; জলরাশির সকল প্রাণের চারিদিকে বসনের মতো আলোক পরিধান ক'রে তিনি নিজের মধ্যে গঠন করলেন বৃহৎ ও ন্যূনতাহীন ঐশ্বর্যসমূহ। (৫)

স্বর্গের বীর্যবান্ পুরুষদের চারিদিকে তিনি সর্বত্র সঞ্চরণ করলেন আর তাঁরা গ্রাস করলেন না, আবার পরাস্তও হ'লেন না, তাঁদের কোন বসন ছিল না, আবার তাঁরা নগ্নও ছিলেন না। এখানে সনাতন ও সদা-যৌবনসম্পন্না দেবীরা যারা একই গর্ভ থেকে উদ্ভূত একটিমাত্র অপত্যকে ধারণ করলেন, তাঁরা সেই সপ্ত বাণী। (৬)

বিশ্বরূপের মধ্যে তাঁর সংহত আকার বিস্তীর্ণ হ'ল বিশুদ্ধতার গর্ভে, মধুময় সব কিছুর স্রবণে; এখানে ধাত্রী নদীগুলি দাঁড়িয়েছিল নিজেদের পুষ্ট ক'রে; সাধক দেবের দুই মাতা বৃহৎ ও সুসমঞ্জস হ'লেন। (৭)

হে শক্তি-পুত্র, তাদের দ্বারা বাহিত হ'য়ে তুমি প্রজ্জ্বলিত হ'য়েছিলে, তুমি ধারণ করেছিলে তোমার উজ্জ্বল ও উল্লাসভরা মূর্তিসকল; বাহিরে প্রবাহিত হয় মিষ্টতার, শুদ্ধতার ধারাগুলি যেখানে প্রাচুর্যের বৃষ বৃদ্ধিলাভ করেছিলেন প্রজ্ঞার দ্বারা। (৮)

পিতার প্রাচুর্যের উৎসকে তিনি তাঁর জন্মসময়ে জেনেছিলেন এবং চতুর্দিকে তিনি তাঁর বিভিন্ন ধারা ও নদী মুক্ত করেছিলেন। সহায়কারী সখাদের দ্বারা এবং স্বর্গের বীর পুরুষদের দ্বারা তিনি তাঁকে দেখেছিলেন অস্তিত্বের সকল গোপন স্থানে, তবে তিনি নিজে তাদের গোপনীয়তার মধ্যে গূঢ় হননি। (৯)

পিতার শিশুকে তিনি ধারণ করলেন এবং তার জনকেরও শিশুকে; এক তিনি তাঁর অনেক মাতাদের ভোজন করলেন তাদের বৃদ্ধিতে। এই শুদ্ধ পুরুষের মধ্যে মানবের উভয় শক্তিরই (পৃথ্বী ও দ্যৌ) সাধারণ প্রভু ও প্রেমিক আছে; তাদের উভয়কেই তুমি রক্ষা কর। (১০)

বাধাহীন বৃহতের মধ্যে মহান্ তিনি বৃদ্ধিলাভ করলেন; বহু জলরাশি অগ্নিকে বর্ষণ করলেন বিজয়ী হ'য়ে; সত্যের উৎসে তিনি শয়ান ছিলেন, সেখানেই তাঁর ধামের প্রতিষ্ঠা হ'ল—এই সেই অগ্নি অবিভক্ত ভগিনীদের ক্রিয়াপ্রণালীর মধ্যে। (১১)

বিষয়সমূহের সঞ্চালকরূপে এবং মহান্‌দের মিলনে তাদের পোষকরূপে দর্শনেচ্ছু ও সোমরসের পেষণকারীর প্রভায় ঋজু হ'য়ে তিনি যিনি দ্যুতি-সমূহের জনক ছিলেন এখন তাদের উচ্চতর জন্ম দিলেন—তিনিই জল-রাশির শিশু, শক্তিমান্‌ ও বলবত্তম অগ্নি। (১২)

জলরাশির ও পৃথিবীজাত বিষয়সমূহের দৃশ্যমান জন্মকে আনন্দের দেবী এখন জন্মালেন নানা রূপে পূর্ণানন্দময়ী তিনি। দেবতারা মনের দ্বারা তাঁতে যুক্ত হ'লেন এবং যিনি শক্তিপূর্ণ ও উদ্যমের জন্য বীর্যবান্‌ হ'য়ে জন্ম নিলেন তাঁকে প্রবৃত্ত করলেন তাঁর কর্মধারায়। (১৩)

ঐ সব বৃহৎ কিরণ সংলগ্ন হ'ল অগ্নিতে যিনি প্রভায় ঋজু; ইহারা উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-সম; যিনি তাঁর স্বীয় আসনে অস্তিত্বের সকল গোপন স্থানে অকুল বৃহতের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিলেন তাঁর থেকে তাঁরা দোহন করলেন অমৃতত্ব। (১৪)

এই অংশটির অর্থ যাই হোক না কেন—আর ইহা একান্তই স্পষ্ট যে ইহার একটি রহস্যার্থক তাৎপর্য আছে, ইহা শুধু বাহ্য অনুষ্ঠানরত অসভ্যের যজ্ঞীয় স্তুতিগীতি নয়—এখানে উল্লিখিত সপ্ত নদী, জলরাশি, সপ্ত ভগিনী কখনই পাঞ্জাবের সপ্ত নদী নয়। যে সব জলরাশির মধ্যে দেবতারা দৃশ্যমান্‌ অগ্নিকে দেখতে পেয়েছিলেন তা পার্থিব ও জড়ীয় জল-ধারা হ'তে পারে না; এই যে অগ্নি যিনি জ্ঞানের দ্বারা বৃদ্ধিলাভ করেন এবং সত্যের উৎসে তার গৃহ ও বিশ্রামস্থল করেন, দ্যৌ ও পৃথ্বী যাঁর স্ত্রী ও প্রেমিকা, যিনি নিজের আসনে, সেই বাধাহীন বৃহতের মধ্যে দিব্য জলরাশির দ্বারা সমৃদ্ধ হন এবং সেই অকূল আনন্ত্যের মাঝে বাস ক'রে ভাস্বর দেব-গণের কাছে পরম অমৃতত্ব দান করেন—সেই অগ্নি ভৌতিক অগ্নির দেবতা হ'তে পারেন না। অন্য অনেক অংশের মতো এই অংশে বেদের মর্মকথার রহস্যময়, আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবটি ফুটে ওঠে আর তা প্রচ্ছন্নভাবে নয়, শুধু বাহ্যানুষ্ঠানের আবরণের পশ্চাতে নয়, বরং খোলাখুলি ও জোরালো ভাবে; অবশ্য একটা ছদ্মবেশ আছে তবে এই ছদ্মবেশ এত স্বচ্ছ যে এখানে বেদের গূঢ় সত্য বিশ্বামিত্রের সূক্তের নদীগুলির মতো মনে হয় অবগুণ্ঠিতও নয়, আবার নগ্নও নয়।

আমরা দেখি যে বামদেবের ও বশিষ্ঠের সূক্তের জলরাশিও যা ইহারা তা-ই—শুদ্ধতা ও মধুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—"ঘৃতস্য যোনৌ স্রবথে মধূনাম্ শ্চোতন্তি ধারা মধুনো ঘৃতস্য"; তারা সত্যে নিয়ে যায়, তারা নিজেরাই সত্যের উৎস আর তারা যেমন অবাধ, অকূল বৃহতের মধ্যে প্রবাহিত হয়, তেমন এখানে পৃথিবীরও উপর প্রবাহিত হয়। তাদের বর্ণনার রূপ হ'ল ধাত্রী-গাভী ("ধেনবঃ")· স্ত্রী-অশ্ব ("অশ্বা") তাদের বলা হয় "সপ্ত বাণীঃ"—সৃজনশীলা দেবী বাক্-এর সপ্ত বাণী—এই বাক্ হ'ল অদিতির, পরমা প্রকৃতির বাক্, প্রকাশশীল সামর্থ্য আর যেমন বেদে দেব বা পুরুষকে বলা হয় বৃষভ বা বৃষন্ (ষাঁড়) তেমন অদিতিকে বলা হয় গৌ (গাভী)। সুতরাং এইসব হ'ল সর্বসত্তার সপ্ত তন্ত্রী, এক চিন্ময় অস্তিত্বের সপ্ত স্রোত বা ধারা অথবা গতিবৃত্তির রূপ।

আমরা দেখব যে বেদে মধুচ্ছন্দার সূক্তের আদিতেই যে ভাবনা পেয়েছি তার এবং যে প্রতীকার্থক্ ব্যাখ্যা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'চ্ছে তার আলোকে এই অংশটি যেটি ঐ সব রূপে চিত্রিত করা হয়েছে, ও প্রথমে মনে হয় রহস্যময় ও দুর্জ্ঞেয় সেটি সম্পূর্ণ সরল ও সুসংলগ্ন হ'য়ে ওঠে; আর বাস্তবিকই যথার্থ সূত্রটি পাওয়া গেলে বেদের যে সব অংশ এখন মনে হয় প্রায় অবোধ্য সেগুলিও সম্পূর্ণ সরল ও সুসঙ্গত হয়ে ওঠে। আমাদের শুধু ঠিক করতে হবে অগ্নির মনস্তাত্ত্বিক কাজটি কি, যে অগ্নি হলেন পুরোহিত, যোদ্ধা, কর্মী, সত্যজিৎ, মানবের জন্য আনন্দময়ী আর ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই মধুচ্ছন্দার বর্ণনায় এই কাজটি সম্বন্ধে আগেই বলা হ'য়েছে যে তিনি "কবিক্রতু সত্য চিত্রশ্রবস্তমঃ" (দ্রষ্টার কর্মসংকল্প যা সত্য এবং বিচিত্র আন্তরপ্রেরণায় সমৃদ্ধ)। অগ্নি হ'লেন সেই দেব, সর্বদ্রষ্টা যিনি চেতন-শক্তি রূপে প্রকাশিত হন; আধুনিক ভাষায় এই চেতনশক্তিকে বলা যায় দিব্য বা বিশ্বজনীন সংকল্প যা প্রথমে গূঢ় থেকে সনাতন জগৎসমূহ নির্মাণ করে এবং পরে প্রকাশিত হয়ে, 'জাত' হয়ে মানবের মাঝে গড়ে তোলে সত্য ও অমৃতত্ব।

বিশ্বামিত্র যা বলেন তার প্রকৃত অর্থ এই: দেবতারা ও মানুষরা আন্তর যজ্ঞের সব অগ্নি জ্বালিয়ে এই দিব্যশক্তিকে প্রজ্জ্বলিত করে; তাদের অর্চনা ও নমস্কারের দ্বারা তারা ইহাকে কাজ করতে সক্ষম করে; স্বর্গের মধ্যে অর্থাৎ শুদ্ধ মানসিকতার মাঝে (ইহার জন্য 'দ্যৌঃ' কথাটি প্রতীক্-রূপে ব্যবহৃত হ'য়েছে) তারা প্রকাশ করে দ্রষ্টাদের জানা বিষয়সমূহ

অর্থাৎ মনের অতিরিক্ত যে ঋতচেতনা তার সব দীপ্তি; আর তারা তা করে যাতে এই যে দিব্যশক্তি তার বলে সর্বদাই যথার্থ আত্ম-প্রকাশের বাণী পেতে চাইছে এবং মনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে চায় তার জন্য একটি পথ নির্মিত হয়। এই দিব্যসংকল্প যার সকল ক্রিয়াপ্রণালীর মধ্যে দিব্যজ্ঞানের রহস্য আছে, "কবিক্রতুঃ" মানুষের অন্তঃস্থ মানসিক ও শারীরিক চেতনাকে সাহায্য বা গঠন করে, "দিবঃ পৃথিব্যাঃ", ধীশক্তিকে সুষ্ঠু ও বিবেচনা-শক্তিকে শুদ্ধ করে যাতে তারা "দ্রষ্টাদের জ্ঞানাবিষয়সমূহে"র জন্য সমর্থ হ'য়ে ওঠে এবং আমাদের মধ্যে অতিচেতন সত্যকে এইভাবে চেতন ক'রে দৃঢ়ভাবে আনন্দ প্রতিষ্ঠিত করে (ঋক্ ২, ৩)।

বাকী অংশটিতে এই দিব্য চেতন-শক্তির, অগ্নির, মর্ত্যগণের মধ্যে অমর্ত্যের আরোহণের কথা বলা হয়েছে; এই অমর্ত্য অগ্নি যজ্ঞের মাঝে সাধারণ জ্ঞান ও সংকল্পের স্থান অধিকার করে অর্থাৎ মর্ত্য ও শারীরিক চেতনাকে নিয়ে যায় পরম সত্য ও আনন্দের অমৃতত্বে। বৈদিক ঋষিরা মানবের জন্য পাঁচটি জন্মের কথা বলেন, পাঁচটি জীবলোকের কথা বলেন যেখানে কর্ম করা হয়, "পঞ্চ জনাঃ", "পঞ্চ কৃষ্টীঃ বা ক্ষিতীঃ"। "দ্যৌঃ" ও "পৃথ্বী" হ'ল শুদ্ধ মানসিক ও শারীরিক চেতনার প্রতিরূপ; তাদের মধ্যে আছে "অন্তরিক্ষ" অর্থাৎ প্রাণিক বা স্নায়বিক চেতনার মধ্যবর্তী বা সংযোগকারী স্তর। "দ্যৌঃ" ও "পৃথ্বী" হ'ল "রোদসী", আমাদের দুইটি আকাশ; কিন্তু এই দুটিকে অতিক্রম করা চাই, কারণ তাহ'লেই আমরা শুদ্ধ মনের স্বর্গ অপেক্ষা অন্য এক স্বর্গে প্রবেশ লাভ করব—সেই বৃহতে যা অনন্ত চেতনার অদিতির ভিত্তি, প্রতিষ্ঠা ("বুধ্ন")। এই বৃহৎ হ'ল সেই পরম সত্য যা ধারণ করে পরম ত্রিলোক, অগ্নির, বিষ্ণুর সেইসব পরম পদ বা আসন ("পদানি, সদাংসি"), মাতার, গাভীর, অদিতির সেই সব পরম নাম। বৃহৎ বা সত্যকে বলা হয় অগ্নির স্বীয় বা উপযুক্ত আসন বা ধাম, "স্বং দমম্", "স্বং সদঃ"। এই সূক্তে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি পৃথিবী থেকে আরোহণ করেন তাঁর নিজের আসনে।

এই দিব্যশক্তিকে দেবতারা দেখতে পান জলরাশির মধ্যে, ভগিনীদের (স্বসাদের) কর্মধারায়। ইহারাই সত্যের সপ্তবিধ জলধারা, সেই দিব্য "আপঃ" যা ইন্দ্র আনেন আমাদের সত্তার শীর্ষ থেকে। প্রথমে ইহা গোপন থাকে পৃথিবীজাত বিষয়সমূহের মধ্যে, "ওষধীঃ", সেই সব বিষয় যা তার তেজধারণ করে এবং যাকে বাহিরে আনতে হবে একপ্রকার শক্তির দ্বারা,

পৃথিবী ও স্বর্গ, এই দুই "অরণি"র চাপে। সেজন্য ইহাকে বলা হয় পৃথিবীজাত বিষয়সমূহের সন্তান, স্বর্গ ও পৃথিবীর সন্তান; এই অমর শক্তিকে মানব উৎপাদন করে শারীরিক সত্তার উপর শুদ্ধমনের ক্রিয়া থেকে; আর তা করা হয় কষ্ট ও আয়াসের সহিত। কিন্তু দিব্য জল-রাশিতে অগ্নিকে দেখা যায়, সেখানে তিনি সহজেই জন্ম নেন তাঁর সকল বীর্যে, তাঁর সকল জ্ঞানে এবং তাঁর সকল উপভোগে, সেখানে তিনি সম্পূর্ণ শুভ্র ও শুদ্ধ এবং যেমন তিনি বৃদ্ধিলাভ করেন তেমন তার ক্রিয়ায় তিনি রক্তিমবর্ণ হন। (ঋক্ ৩)। তাঁর জন্ম থেকেই দেবতারা তাঁকে প্রদান করেন শক্তি, কান্তি ও দেহ; সপ্ত বেগবতী নদী তাঁর আনন্দে তাঁকে বর্ধন করে; এই নবজাত শিশুর চারিদিকে তারা সঞ্চরণ করে ও যত্নশীল হয়, স্ত্রী-অশ্বের মতো, "অশ্বাঃ" (ঋক্ ৪)।

নদীগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় "ধেনবঃ", ধাত্রীগাভী, কিন্তু এখানে তাদের বলা হয়েছে স্ত্রী-অশ্বা, "অশ্বাঃ", কারণ গো হ'ল চেতনা যে রূপে জ্ঞান তার প্রতীক্ আর অশ্ব হ'ল চেতনা যে রূপে শক্তি তার প্রতীক্। অশ্ব হ'ল প্রাণের স্ফুরন্ত শক্তি আর নদীগুলি পৃথিবীর উপর অগ্নির প্রতি যত্নশীল হ'য়ে ওঠে প্রাণের, প্রাণিক স্ফুরত্তার বা গতিমত্তার, যে প্রাণ চলে, কাজ করে, কামনা ও উপভোগ করে তার জলরাশি। অগ্নি নিজে প্রথমে আবির্ভূত হন জড়ীয় তাপ ও শক্তিরূপে, দ্বিতীয়তঃ তিনি হন অশ্ব, এবং কেবল তার পরই হ'য়ে ওঠেন স্বর্গীয় অগ্নি। তাঁর প্রথম কাজ হ'ল জল-রাশির সন্তান হিসাবে মধ্যলোককে, প্রাণিক বা স্ফুরন্ত স্তরকে তার পূর্ণ রূপ ও প্রসার দেওয়া, "রজ আততন্বান্"। মানবের অন্তঃস্থ স্নায়বিক প্রাণকে তিনি শুদ্ধ করেন ইহাকে তার শুদ্ধ উজ্জ্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে এবং অতিচেতন সত্য ও প্রজ্ঞার পবিত্র শক্তিসমূহের দ্বারা "কবিভিঃ পবিত্রৈঃ" স্নায়বিক প্রাণের সকল সংবেগ ও কামনাকে ও কর্মের মধ্যে ইহার বিশুদ্ধ সংকল্পকে ("ক্রতুম্") উর্ধ্বে উত্তোলন ক'রে। তখন আর তাঁর কামনা ও সহজাত সংস্কারের খণ্ডিত ও সীমিত ক্রিয়াশক্তি থাকে না, তখন তিনি তাঁর সব বিশাল ঐশ্বর্য ধারণ করেন জলরাশির প্রাণের চতুর্দিকে (ঋক্ ৪, ৫)।

এইভাবে সপ্তবিধ জলরাশি উর্ধ্বে ওঠে এবং হ'য়ে ওঠে শুদ্ধ মানসিক ক্রিয়াশক্তি, স্বর্গের বীর্যবান্ পুরুষ। সেখানে তারা নিজেদের প্রকাশিত করে আদি শাশ্বত সদাযৌবনসম্পন্ন শক্তিরাজি হিসাবে, তারা পৃথক পৃথক স্রোত-

ধারা তবে তাদের উৎস একই—কারণ তারা সকলেই প্রবাহিত হ'য়েছে অতিচেতন সত্যের একই গর্ভ থেকে—তারা "সপ্ত বাণীঃ", দিব্যমনের মৌলিক সৃজনধর্মী প্রকাশ। স্নায়বিক জীবনের প্রাণ তার মর্ত্য অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য বিষয়সমূহ গ্রাস করে, কিন্তু শুদ্ধ মনের প্রাণ তেমন নয়; ইহার জলরাশি গ্রাস করে না, কিন্তু তারা বিফল হয় না, তারা হ'ল শাশ্বত সত্য যা বেষ্টিত থাকে মানসিক রূপের স্বচ্ছ আবরণে; সেজন্য বলা হ'য়েছে যে তারা বস্ত্রাবৃতও নয় আবার নগ্নও নয় (ঋক্ ৬)।

কিন্তু ইহাই শেষ পর্যায় নয়। ঐ শক্তি উঠে যায় এই মানসিক শুদ্ধতার ("ঘৃতস্য") গর্ভে বা উৎসে যেখানে জলরাশি প্রবাহিত হয় দিব্য মিষ্টতার ধারারূপে ("স্রবথে মধূনাম্"); সেখানে যেসব রূপ ইহা ধারণ করে সেগুলি সার্বিক রূপ, বৃহৎ ও অনন্ত চেতনার বিভিন্ন পুঞ্জ। ফলে, নিম্নলোকের পালিকা নদীগুলি পুষ্ট হয় এই নিম্নমুখী উচ্চতর মিষ্টতার দ্বারা, আর পরম সত্যের এই আলোকের দ্বারা, অনন্ত আনন্দের দ্বারা ঐরূপ পুষ্ট হ'য়ে মানসিক ও শারীরিক চেতনা, সর্বসাধিকা সংকল্পের দুই প্রথম মাতা তাদের সমগ্র বৃহত্ত্বে হ'য়ে ওঠে সম্পূর্ণ সম ও সুসমঞ্জস। তারা ধারণ করে অগ্নির পূর্ণ শক্তি, তাঁর বিদ্যুতের প্রভা, তাঁর সার্বিক রূপসমূহের মহিমা ও আনন্দ। কারণ যেখানে প্রাচুর্যের অধিপতি, পুরুষ, বৃষভ অতি-চেতন সত্যের প্রজ্ঞার দ্বারা বর্ধিত হন সেখানে সর্বদাই প্রবাহিত হয় শুদ্ধতার স্রোত ও আনন্দের ধারা (ঋক্ ৭-৮)।

সকল বিষয়সমূহের পিতা হ'লেন অধিপতি ও বৃষভ; তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন বিষয়সমূহের গূঢ় উৎসে, অতি-চেতনের মধ্যে; অগ্নি তাঁর সঙ্গী-দেবতাদের সহিত এবং সপ্তবিধ জলরাশির সহিত অতিচেতনের মধ্যে প্রবেশ করেন কিন্তু আমাদের চেতনাময় অস্তিত্ব থেকে তিরোহিত হন না; এইভাবে অগ্নি বিষয়সমূহের মধুময় প্রাচুর্যের উৎস পেয়ে তা বর্ষণ করেন আমাদের জীবনের উপর। তিনি ধারণ করেন এবং নিজেই হ'য়ে ওঠেন পুত্র, পবিত্র কুমার, শুদ্ধ পুরুষ, এক, ও মানবের অন্তঃপুরুষ যা প্রকাশিত হয় তার সার্বিকতায়; মানুষের মাঝে মানসিক ও শারীরিক চেতনা তাঁকে তাদের প্রভু ও প্রেমিকরূপে গ্রহণ করে; কিন্তু যদিও তিনি এক, তথাপি তিনি উপভোগ করেন নদীসমূহের বহুবিধ গতিধারা, বহুল বিশ্বশক্তি নিচয় (ঋক্ ৯-১০)।

তারপর স্পষ্ট বলা হয় যে এই যে অনন্ত যার মধ্যে তিনি প্রবেশ

করেন ও যার মধ্যে তিনি বৃদ্ধিলাভ করেন, যার মধ্যে বহু জলরাশি সবিজয়ে তাদের লক্ষ্যে ("যশসঃ") উপনীত হ'য়ে তাঁকে বর্ধন করে তা হ'ল অকূল অনন্ত, তার স্বীয় স্বাভাবিক আসন যা এখন হয়ে ওঠে তাঁর নিজের ধাম। সেখানে সপ্ত নদী, সপ্ত স্বসা এক উৎস থেকে এসেও আর পৃথকভাবে কাজ করে না, যদিও তারা পৃথিবীর উপর এবং মর্ত্যজীবনে পৃথকভাবে কাজ করে; বরং সেখানে তারা কাজ করে অচ্ছেদ্য সখারূপে (জামীনাম্ অপসি স্বসৃণাম্)। এইসব মহৎদের সম্মেলনে অগ্নি সকল বিষয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করেন এবং সে সবকে ঊর্ধ্বে ধারণ করেন; তাঁর দৃষ্টির সব রশ্মি সম্পূর্ণ সরল, ইহারা আর নিম্ন কুটিলতার দ্বারা ব্যাহত হয় না; যাঁর কাছ থেকে জ্ঞানের প্রভাসমূহের, ভাস্বর গোযূথের জন্ম হয়েছিল তিনি এখন তাদের দেন এই উচ্চ ও পরম জন্ম; তিনি তাদের পরিণত করেন দিব্য জ্ঞানে ও অমর চেতনায় (ঋক্ ১১-১২)।

আবার ইহা তাঁর নব ও শেষ জন্ম। যিনি পৃথিবীজাত বিষয়সমূহ থেকে শক্তির পুত্র রূপে জন্মেছিলেন, যিনি জন্মেছিলেন জলরাশির সন্তান-রূপে, তাঁর এখন নানা রূপে জন্ম হয় আনন্দের দেবীর নিকট, যিনি সম্পূর্ণ সুখময়ী তাঁর নিকট অর্থাৎ দিব্য চিন্ময় আনন্দের নিকট, অকূল অনন্তের মাঝে। দেবগণ অর্থাৎ মানবের অন্তঃস্থ দিব্যশক্তিসমূহ মনকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে সেখানে তাঁর কাছে উপনীত হয়, তাঁর চতুর্দিকে একত্র হয় এবং এই নব, শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ জন্মে তাঁকে প্রবৃত্ত করে জগতের মহৎ কর্মে। ঐ বৃহৎ চেতনার বহিঃচ্ছটা তারা এই দিব্যশক্তিতে সংলগ্ন থাকে ইহার উজ্জ্বল বিদ্যুৎরূপে এবং যিনি অতিচেতনের মধ্যে, অকূল বৃহতের মধ্যে, তার স্বীয় ধামের মধ্যে অবস্থিত তাঁর কাছ থেকে তারা মানবের জন্য নিয়ে আসে অমৃতত্ব।

তাহ'লে সপ্ত নদীর, জলরাশির, পঞ্চলোকের, অগ্নির জন্ম ও উত্তরণের যেসব প্রতীক্ বেদে ব্যবহৃত হ'য়েছে তাদের আবরণের পশ্চাতে ইহাই সেসবের গভীর, সুসংলগ্ন ও দীপ্ত অর্থ; আবার অগ্নির উত্তরণের অর্থ হ'ল মানবের নিজের ও তার মধ্যে সে যেসব দেবতার মূর্তি গঠন করে তাদেরও ঊর্ধ্বযাত্রা সত্তার মহান্ পর্বতের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ("সানোঃ সানুম্")। একবার যদি আমরা "গো" প্রতীকের ও "সোম" প্রতীকের প্রকৃত অর্থ ধরতে পারি এবং দেবতাদের মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পাই তাহ'লে এই পদ্ধতির প্রয়োগে এই সব প্রাচীন সুক্তের

আপাতপ্রতীয়মান অসঙ্গতি ও অবোধ্যতা ও কণ্টকবিদ্ধিত বিভ্রান্তিকর অর্থ মুহূর্তের মধ্যে তিরোহিত হয়; আর সহজেই, বিনা আয়াসেই, স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয় প্রাচীন রহস্যবাদীদের গভীর ও সুদীপ্ত শিক্ষা, বেদের রহস্য।

দ্বাদশ অধ্যায়

ঊষার গোযূথ

বেদের সপ্ত নদীকে, জলরাশিকে, "আপঃ"কে বেদের প্রতীকার্থক ভাষায় সাধারণতঃ বলা হয় সপ্ত মাতা, সপ্ত পালিকা গাভী, "সপ্ত ধেনবঃ"। গূঢ়ভাবে "আপঃ" কথাটির দুইটি তাৎপর্য আছে, কারণ 'অপ্' ধাতুটির অর্থ প্রথমে যে শুধু চলা ছিল তা নয় (আর খুব সম্ভব তা থেকেই জলরাশির অর্থ হ'য়েছে), ইহার অর্থ ছিল হওয়া অথবা জন্ম দেওয়া যেমন "অপত্য" পদের অর্থ সন্তান এবং দক্ষিণভারতীয় "অপ্পা"র অর্থ জনক। সপ্ত জলরাশি হ'ল সত্তার জলরাশি, তারাই মাতা যা থেকে অস্তিত্বের সকল রূপের উৎপত্তি হ'য়েছে। কিন্তু আমরা আরো একটি কথা দেখতে পাই, "সপ্ত গাবঃ" সপ্ত গাভী বা সপ্ত আলোক; অন্য একটি বিশেষণ পাওয়া যায়—"সপ্তগু"—যার সপ্ত রশ্মি আছে। বেদের সূক্তগুলিতে "গু" ("গুঃ") এবং "গৌ" ("গাবঃ")—ইহাদের সর্বদাই দুইটি অর্থ থাকে—গাভী ও রশ্মি। প্রাচীন ভারতীয় ভাবনাধারায় সত্তা ও চেতনা পরস্পরের বিভিন্ন দিক মাত্র, আর যে অদিতি অর্থাৎ অনন্ত অস্তিত্ব থেকে দেবতাদের জন্ম হয়েছে এবং যাকে বর্ণনা করা হয়েছে এমন মাতা বলে যার সাতটি নাম ও সাতটি আসন ("ধামানি") তাঁকেও ভাবা হয় অনন্ত চেতনা বলে, গাভী বলে, সেই আদি জ্যোতি বলে যা ব্যক্ত হয় সাতটি রশ্মিতে, "সপ্ত গাবঃ"। সুতরাং অস্তিত্বের সপ্তবিধ তত্ত্বকে একদিক থেকে চিত্রিত করা হ'য়েছে সমুদ্রজাত নদীরূপে, "সপ্ত ধেনবঃ" এবং অন্য দিক থেকে সর্ব-স্রষ্টা পিতা, সূর্য সবিতার রশ্মিরূপে, "সপ্ত গাবঃ"।

বৈদিক প্রতীক্‌গুলির মধ্যে "গাভী"র চিত্রটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বাহ্যানুষ্ঠানরত যাজ্ঞিকের নিকট "গৌ" কথাটির অর্থ শুধু পশু গরু, অন্য কিছু নয়, যেমন ইহার সঙ্গীস্বরূপ পদ অশ্বের অর্থ শুধু পশু ঘোড়া, অন্য কিছু নয়, আবার যেমন 'ঘৃতে'র অর্থ শুধু জল বা ঘি, 'বীর' কথাটির অর্থ শুধু পুত্র বা অনুচর বা ভৃত্য। যখন ঋষি উষার নিকট প্রার্থনা করেন, "গোমদ্ বীরবদ্ ধেহি রত্নম্ উষো অশ্বাবৎ", তখন এই স্তুতিতে যাজ্ঞিক ব্যাখ্যাকার দেখেন যে ইহাতে প্রার্থনা করা হ'য়েছে শুধু "এমন রমণীয়

ধন যার সঙ্গে গরু, পরিজন (বা পুত্র) ও ঘোড়া যুক্ত থাকে।" কিন্তু যদি অপরপক্ষে এই পদগুলি প্রতীক্ হয় তাহ'লে ইহার অর্থ হবে, "আমাদের মধ্যে এমন এক আনন্দের অবস্থা সুদৃঢ় কর যা আলোকে, জয়দাত্রী শক্তিতেও প্রাণবত্তার তেজে পূর্ণ"। সুতরাং বৈদিক সূক্তে ব্যবহৃত "গৌ" কথাটির তাৎপর্য সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজনীয়। যদি প্রমাণিত হয় যে ইহা প্রতীকার্থক্ তাহ'লে অন্য যে পদগুলি যেমন "অশ্ব" (ঘোড়া) "বীর" (মানুষ বা বীর) "অপত্য" বা "প্রজা" (সন্তান) "হিরণ্য" (সোনা), "বাজ" (প্রাচুর্য অথবা সায়ণের মতে খাদ্য) "গৌ" পদের সহিত অবিরতই ব্যবহার করা হয় সেগুলিরও অনুরূপ প্রতীকার্থক্ তাৎপর্য থাকতে বাধ্য।

বেদে গাভীর চিত্রটি সর্বদাই উষা ও সূর্যের সহিত পাওয়া যায়; শুনী সরমা ও অঙ্গিরা ঋষিদের সাহায্যে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির দ্বারা পণিদের গুহা থেকে হারানো গোধন উদ্ধারের উপাখ্যানের মধ্যেও এই চিত্রটি রয়েছে। উষার ভাবনা ও অঙ্গিরাদের উপাখ্যান হ'ল বৈদিক ধর্মের মর্মকথা এবং একরকম বলা যেতে পারে যে ইহারা বেদের তাৎপর্যের রহস্যের চাবি-কাঠি। সুতরাং অনুসন্ধানের একটি সুদৃঢ় ভিত্তি পাবার জন্য এই দুটির পরীক্ষা আবশ্যক।

বেদের উষা-সূক্তগুলিকে নিতান্তই ভাসাভাসাভাবে পরীক্ষা করা হ'লেও ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে উষার গো ও সূর্যের গো আলোকের প্রতীক্, ইহাদের অন্য অর্থ সম্ভব নয়। এইসব সূক্তে সায়ণ নিজেই বাধ্য হ'য়ে ইহার অর্থ কখন করেছেন গরু আবার কখন রশ্মি; ইহাতে যে সঙ্গতি থাকে না তাতে তিনি উদাসীন; কখন তিনি এমনও বলেন যে "গৌ"র অর্থ জল, যেমন তিনি "ঋতম্" পদটির অর্থ সত্য হ'লেও ইহাকে কখন কখন জল বলে ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ ইহাও স্পষ্ট যে "গৌ" পদটির দুইটি অর্থ লওয়া চাই, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য আলোক, আর গরু হ'ল ইহার বাহ্য চিত্র ও রূপক।

কতকগুলি শ্লোকে "গো"র অর্থ যে রশ্মি তাতে কোন সন্দেহই নেই। যেমন প্রথম মণ্ডলে মধুচ্ছন্দার ৭ম সূক্তের (১-৭) তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে, "দূরদৃষ্টির জন্য ইন্দ্র সূর্যকে স্বর্গে উঠিয়েছেন: তিনি তাঁকে পাহাড়ের সর্বত্র পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সব রশ্মির দ্বারা", "বি গোভির্ অদ্রিম্

ঐরয়ৎ"।[১] কিন্তু সেইসাথে সূর্যের রশ্মি হ'ল সূর্যের যূথ; ইহার অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় হোমারের "অডেসী" (Odyssey) কাব্যের "হার্মেসে"র (Hermes) প্রতি স্তুতিতে যেখানে বলা হ'য়েছে যে "হেলিওসে"র (Helios) যে গোযূথকে হার্মেস তার ভাই এপোলোর (Apollo) কাছ থেকে আহরণ করেছিল তাদের ওডেসিয়াসের (Odysseus) সঙ্গীরা নিধন করেছে। ইহারাই সেই গোদল শত্রু বল, পণিরা যাদের লুকিয়ে রেখেছিল। যখন মধুচ্ছন্দা ইন্দ্রকে বলেন, "তুমি বলের গরুরাখার বিবর উন্মুক্ত করেছিলে" সেখানে তাঁর অর্থ এই যে বল হ'ল এমন শত্রু যে জ্যোতি লুকিয়ে রাখে, তাকে আটক রাখে এবং এই প্রচ্ছন্ন জ্যোতিকেই ইন্দ্র ফিরিয়ে দেন যজ্ঞদাতার নিকট। বৈদিক সূক্তে হারানো বা অপহৃত গোদলের পুনরুদ্ধারের কথা সর্বদাই বলা হ'য়েছে আর পণিদের ও অঙ্গিরাদের উপাখ্যানটি পরীক্ষা করা হ'লে ঐ উপাখ্যানের অর্থ সুস্পষ্ট হবে।

একবার এই অর্থ প্রতিষ্ঠিত হ'লে, বেদে যে "গো"র জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তাকে পশু গরু অর্থে ব্যাখ্যা করার যুক্তির জোর থাকে না; কারণ যে হারানো গরুগুলির পুনরুদ্ধারের জন্য ঋষিরা ইন্দ্রকে আবাহন করেন সেগুলি যদি দ্রাবিড়বাসীদের দ্বারা অপহৃত পশু গরু না হয়, বরং তারা সূর্যের, জ্যোতির যূথ হয় তাহ'লে একথা বিবেচনা করা ন্যায়সঙ্গত হ'বে যে যেখানে শুধু "গো"র জন্য প্রার্থনা করা হ'য়েছে অথচ কোন শত্রুর দ্বারা বাধাদানের কথা নেই সেখানেও "গো" পদটি রূপক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ১-৪,-১, ২ শ্লোকে উল্লিখিত যে ইন্দ্র সিদ্ধরূপ গড়ে তোলেন এবং যিনি গোদোহনের কাজে পটু দোহক তাঁর সোমরসের উল্লাস বস্তুতঃ "গো দাতা" "গোদা ইদ্ রেবতঃ মদঃ"। এই কথাটির যদি অর্থ করা যায় যে ইন্দ্র একজন অতি ধনী দেবতা এবং যখন তিনি পানমত্ত হন তখন তিনি গরু দান করায় অত্যন্ত মুক্তহস্ত, তাহ'লে সে অর্থ চরম উদ্ভট ও অযৌক্তিক হবে। ইহা স্পষ্ট যে প্রথম শ্লোকের গোদোহন যেমন একটি রূপক, দ্বিতীয় শ্লোকের গোদানও তেমন একটি রূপক। আর যদি আমরা বেদের অন্যান্য শ্লোক থেকে দেখি যে গো জ্যোতির প্রতীক্ তাহ'লে এখানেও

১ আবার এই অনুবাদ করা সম্ভব,—"তিনি বজ্রকে তার সব আলোসমেত চারিদিকে পাঠিয়ে দিলেন", কিন্তু এই অর্থটি ভাল ও সুসংলগ্ন হয় না, কিন্তু এই অর্থ করলেও "গোভিঃ" কথাটির অর্থ "রশ্মিসমূহ" হবেই, গরু হবে না।

এই অর্থই হবে যে ইন্দ্র সোম-উল্লাসে পূর্ণ হ'লে তিনি আমাদের নিশ্চয়ই জ্যোতি দেবেন।

উষা-সূক্তগুলিতেও গো যে আলোর প্রতীক্ তা স্পষ্ট। উষাকে সর্বদাই বর্ণনা করা হয় "গোমতী" বলে, ইহার অর্থ যে জ্যোতির্ময়ী বা দীপ্তিময়ী তা স্পষ্ট, কারণ যদি আক্ষরিক অর্থ ক'রে বলা হয় যে উষা গরুতে ভরা তা অর্থহীন হবে; উষা যে শুধু "গোমতী" তা নয়, উষা "গোমতী অশ্বাবতী"; তাঁর সহিত সর্বদাই গো ও অশ্ব থাকে। তিনি সমগ্র জগতের জন্য আলো সৃষ্টি করেন এবং যেমন গরুর খোঁয়াড় উন্মুক্ত করা হয় তেমন তিনি অন্ধকার উন্মুক্ত করেন; এখানে 'গো' যে আলোর প্রতীক্ সে সম্বন্ধে কোন ভুলের অবকাশ নেই (১-৯২-৪)। আমরা আরো দেখি যে এই সূক্তে (ঋক্ ১৬) অশ্বীদের বলা হয় যে তাঁরা যেন তাদের রথ চালিয়ে নিম্নে এমন পথের উপর চলেন যা উজ্জ্বল ও স্বর্ণবর্ণ, "গোমদ্ হিরণ্যবদ্"। উপরন্তু উষা সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁর রথকে টেনে নিয়ে যায় কখন কখন অরুণ বর্ণ গাভীরা, কখন কখন আবার অরুণবর্ণ অশ্বরা। "তিনি যুক্ত করেন অরুণবর্ণ গাভীদের যূথ," "যুংক্তে গাবম্ অরুণাম্ অনীকম্" (১-১২৪-১১); এখানে এই চিত্রটির অর্থ যে "অরুণবর্ণ কিরণরাজি" তা সুস্পষ্ট। উষার আর এক বর্ণনা হ'ল গাভীদের বা রশ্মিসমূহের মাতা; "গবাং জনিত্রী অকৃত প্র কেতুম্" (১-১২৪-৫) অর্থাৎ "গাভীগণের (রশ্মিসমূহের) মাতা দৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন"। আবার অন্যত্র তাঁর ক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে ইহা "দৃষ্টি" অথবা "এমন বোধ যা এখন উদিত হ'য়েছে যেখানে কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না।" ইহা স্পষ্ট যে গাভীরা হ'ল জ্যোতির ভাস্বর যূথ। তাঁকে স্তুতি করে বলা হয় "ভাস্বর যূথের নেত্রী", "নেত্রী গবাম্" (৭-৭৬-৬); আর একটি শ্লোক আছে যাতে এই দুটি ভাবনাকে এক করে অর্থটি সুস্পষ্ট করা হ'য়েছে, "যূথের মাতা, দিনের নেত্রী" "গবাং মাতা নেত্রী অহ্নাম্" (৭-৭৭-২)। অবশেষে চিত্রের আবরণ সম্পূর্ণ মুক্ত করার জন্যই যেন বেদে বলা হয়েছে যে যূথ হ'ল জ্যোতির রশ্মিসমূহের প্রতীক্ "যাত্রার জন্য মুক্ত-করা গাভীগণের মতো তাঁর সুখময়ী কিরণরাজি দেখা যায়"—"প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ" (৪-৫২-৫)। আবার আর একটি শ্লোক আছে যাতে আমাদের কথা আরো প্রমাণিত হয় (৭-৭৯-২), "তোমার গাভীরা (রশ্মিসমূহ) অন্ধকার দূর

করে এবং জ্যোতি বিস্তার করে", "সং তে গাবস্তম আ বর্তয়ন্তি, জ্যোতি-র্যচ্ছন্তি।"[১]

কিন্তু ভাস্বর যূথ যে শুধু উষাকে টেনে নিয়ে যায় তা নয়, এই সব তাঁর দান যজ্ঞদাতার কাছে; সোম-উল্লাসে ভরা ইন্দ্রের মতো তিনিও জ্যোতি দান করেন। বশিষ্ঠের একটি সূক্তে (৭-৭৫-৩) তাঁর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে যূথদের যেসব দৃঢ় স্থানের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হ'য়েছিল সে সব স্থান যখন দেবতারা ভেঙে ফেলে ঐ যূথদের সব মানুষের মাঝে বিতরণ করেন তখন দেবতাদের এই কাজে তিনিও যোগদান করেন; "সত্যদেব-গণমাঝে সত্যবতী, মহান্ দেবগণমাঝে মহীয়সী তিনি দৃঢ়স্থানগুলি ভেঙে ফেলেন এবং ভাস্বর সব যূথের দান করেন; গাভীরা শব্দ করতে করতে উষার দিকে যায়,"—"রুজদ্ দৃঢ়ানি দদদ্ উস্রিয়াণাম্, প্রতি গাব উষসং বাবশন্ত"। আবার ঠিক পরের শ্লোকেই তাঁকে বলা হ'চ্ছে তিনি যেন যজ্ঞদাতার জন্য দৃঢ় বা প্রতিষ্ঠা করেন "গোমদ্ রত্নম্ অশ্বাবৎ পুরু ভোজঃ", আনন্দের এমন এক অবস্থা যা আলোকে (গোরুতে), অশ্বে (প্রাণিক শক্তিতে) ও বহু উপভোগ্য বিষয়ে পূর্ণ। সুতরাং উষা যেসব যূথ দান করেন সেসব হল জ্যোতির কিরণরাজি যা দেবতারা ও আঙ্গিরস ঋষিরা উদ্ধার ক'রেছেন বল ও পণিদের দৃঢ় স্থান থেকে এবং যে গোধন ও অশ্ব-ধনের জন্য ঋষিরা নিরন্তর প্রার্থনা করেন তা ঐ জ্যোতির সম্পদ বিনা অন্য কিছু হ'তে পারে না; কারণ ইহা মনে করা অসম্ভব যে সূক্তের ৭ম শ্লোকে যে "গোরাজি" উষা দান করেন বলা হয় তা ৮ম শ্লোকের প্রার্থিত "গো-রাজি" হ'তে ভিন্ন; পূর্বের শ্লোকে যে পদটির অর্থ আলোক, পরের শ্লোকে তার অর্থ পশু গরু আর ঋষি পূর্বে যে চিত্রটির কথা বলেছেন পরের মুহূর্তেই তা ভুলে গেছেন—ইহা কখন সম্ভব নয়।

কখন কখন প্রার্থনীয় বিষয় জ্যোতির্ময় আনন্দ নয় বা জ্যোতির্ময় প্রাচুর্য নয়, ইহা আবার জ্যোতির্ময় প্রেরণা বা শক্তি। "হে স্বর্গের দুহিতা, আমাদের জন্য নিয়ে এস জ্যোতির্ময় প্রেরণা সূর্যের রশ্মিসমূহের সহিত" "গোমতীর্ ইষ আ বহ দুহিতর্দিবঃ, সাকং সূর্যস্য রশ্মিভিঃ" (৭-৭৯-৮)।

১ বেদে 'গৌ'র অর্থ যে আলোক তা নিয়ে কোন বিতর্ক নেই, যেমন যেখানে বলা হ'য়েছে বৃত্র নিহত হয় "গবা" আলোকের দ্বারা, সেখানে গাভীর কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হ'ল দুইটি অর্থের প্রয়োগের কথা এবং 'গৌ' যে প্রতীক্ তার কথা।

সায়ণ ইহার অর্থ করেছেন "উজ্জ্বল খাদ্যসমূহ", কিন্তু উষাকে সূর্যের রশ্মির সহিত উজ্জ্বল খাদ্য আনার কথা বলা অর্থহীন। যদি "ইষ্" কথাটির অর্থ খাদ্য হয় তাহ'লে "গোমতীর্ ইষ্" কথাটির অর্থ হবে "গরুর মাংসের খাদ্য", কিন্তু যদিও গোমাংসভক্ষণ প্রাচীন কালে নিষিদ্ধ ছিল না (যেমন ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহে দেখা যায়), তবু সায়ণ এটি গ্রহণ করেন নি কারণ পরবর্তী হিন্দুদের ভাবনায় গোমাংস ভক্ষণ ঘৃণ্য বলে গণ্য করা হ'ত। কিন্তু সায়ণ যে অর্থ করেছেন তা-ও যে ইহার অর্থ নয়, অর্থাৎ গোমাংস ভক্ষণের মতো উজ্জ্বল খাদ্যসমূহের অর্থও যে অসম্ভব তা ঋগ্বেদের অন্য একটি শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়; এই শ্লোকে অশ্বীদের কাছে প্রার্থনা করা হ'য়েছে যে তাঁরা যেন এমন জ্যোতির্ময় প্রেরণা দেন যা আমাদের নিয়ে যাবে অন্ধকারের অপর পারে, "যানঃ পীপরদ্ অশ্বিনা জ্যোতিষ্মতী তমস্ তিরঃ, তাম্ অস্মে রাসাথাম্ ইষম্ (১-৪৬-৬)।

আদর্শস্বরূপ এই সব উদাহরণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে জ্যোতির অর্থে গাভীর রূপক চিত্রটি কত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে আর বেদের যে একটি মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আছে তা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য একটি সন্দেহ আসতে পারে। গো যে জ্যোতির রূপকচিত্র তা অনস্বীকার্য সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করলেও প্রশ্ন হবে যে কেন ইহার অর্থ শুধু দিনের আলো হবে না? আর বলা হ'বে যে বেদের ভাষা থেকে মনে হয় যে ইহাই বেদের অভিপ্রেত অর্থ। তবে এটিকে শুধু একটি চিত্র হিসাবে না নিয়ে কেন ইহার আবার প্রতীকার্থ করা হবে? কেন তাহ'লে বলা হয় যে 'গো' শুধু উষার আলো নয়, উষার আলোর অর্থ আন্তর দীপ্তি। ইহা কেন মনে করা হবে না যে ঋষিরা আন্তরদীপ্তি প্রার্থনা করেন নি, তাঁরা প্রার্থনা করেছিলেন দিনের আলো?

এইরূপ অনেক আপত্তি আছে আর ইহাদের কতকগুলি বেশ জোরালো। যদি আমরা ধরে নিই যে বৈদিক সূক্তগুলি ভারতবর্ষে রচিত হ'য়েছিল আর উষা হ'ল ভারতীয় উষা এবং রাত্রি হ'ল দশ বা বার ঘন্টার স্বল্পকালীন রাত্রি তাহলে সুরুতেই আমাদের একথা মানতে হবে যে বৈদিক ঋষিরা অসভ্য ছিলেন, তাঁরা অন্ধকারের ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে থাকতেন কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে অন্ধকারের মধ্যেই ভূতপ্রেতের বাস এবং রাত্রির পর যে দিন আসে এই প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে তাঁরা অজ্ঞ ছিলেন—কিন্তু তবু দিনরাত্রির পরম্পরা সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর সূক্ত আছে—আর তাঁরা

বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের প্রার্থনা ও যজ্ঞের ফলেই সূর্য আকাশে উঠত এবং উষা বাহির হত ভগিনী রাত্রির আলিঙ্গনমুক্ত হ'য়ে। অথচ আবার তাঁরাই বলেন দেবতাদের কাজ চলে অলঙ্ঘনীয় নিয়মে এবং উষা সর্বদাই অনুসরণ করে শাশ্বত বিধি বা সত্যের পথে। তাহ'লে আমাদের মনে করতে হবে যে যখন তাঁরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলে ওঠেন, "আমরা অন্ধকার পার হ'য়ে অন্য তীরে উপনীত হ'য়েছি", তখন তাঁরা শুধু দৈনিক সূর্যোদয়ের সাথে জেগে ওঠার কথাই অত আগ্রহভরে গান করেছেন। আমাদের একথাও মনে করতে হবে যে বৈদিক ঋষিরা উষাকালে যজ্ঞে উপবেশন করতেন এবং যে আলোক আগেই এসেছে সেই আলোক প্রার্থনা করতেন। আর যদি আমরা এই সব অসম্ভব কথা মেনে নিই, তাহ'লে আমরা এই স্পষ্ট উক্তি পাই যে কেবল নয় বা দশ মাস বসে থাকার পরই আঙ্গিরস ঋষিরা হারানো আলোক ও হারানো সূর্য পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আর পিতৃগণের দ্বারা জ্যোতিপ্রাপ্তির যে কথা তারা নিরন্তর বলেছেন তারই বা কি অর্থ হ'বে—"আমাদের পিতারা গূঢ় জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁদের মননের সত্যের দ্বারা তাঁরা উষার জন্ম দিলেন", "গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অন্ববিন্দন্, সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্" (৭-৭৬-৪)। যদি কোন সাহিত্যের কোন কবিতাগুচ্ছের মধ্যে আমরা এমন একটি শ্লোক পাই তাহ'লে আমরা তখনই ইহার একটি মনস্তাত্ত্বিক বা আধ্যাত্মিক অর্থ করব; বেদের বেলায় ভিন্নভাবে ব্যাখ্যার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

কিন্তু যদি আমরা বৈদিক সূক্তগুলির প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা করি, অন্য কোন ব্যাখ্যা না করি, তাহ'লে স্পষ্টতঃই বৈদিক উষা ও রাত্রি ভারতবর্ষের উষা ও রাত্রি হ'তে পারে না; শুধু মেরুপ্রদেশেই এইসব প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে ঋষিদের এই মনোভাব এবং আঙ্গিরসগণের সম্বন্ধে এই সব উক্তি আদৌ বোধগম্য হয়। কিন্তু যদিও ইহা খুবই সম্ভব মেরুপ্রদেশে অবস্থানের স্মৃতির কথা বেদের বাহ্য অর্থের মধ্যে বিদ্যমান তবু এই যে তথ্য যে মেরুপ্রদেশেই আর্যদের আদি বাস ছিল তাতে প্রাকৃতিক ঘটনার চিত্রসমূহের পিছনে এক আন্তর অর্থের অস্তিত্ব অপ্রমাণিত হয় না, আর উষা-সূক্তগুলির আরো সরল ও সুসংলগ্ন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা কমে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা অশ্বিদ্বয়ের উদ্দেশে—প্রষ্কণ্ব কাণ্বের একটি সূক্তে পাই (১-৪৬) যাতে সেই জ্যোতির্ময় প্রেরণার কথা বলা হ'য়েছে যা আমাদের নিয়ে যায় অন্ধকারের অপর পারে। এই সূক্তটির সহিত উষা ও

রাত্রি সম্বন্ধে বৈদিক ভাবনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহার মধ্যে অনেকগুলি নির্দিষ্ট বৈদিক চিত্র পাওয়া যায়, যেমন সত্যের পথ, নদী-উত্তরণ, সূর্যোদয়, উষা ও অশ্বিদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্ক, সোমরসের রহস্যময় ফল ও মহাসামুদ্রিক সার।

"দেখ, ঐ উষা যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নেই আকাশে প্রকাশিত হ'চ্ছে আনন্দে পূর্ণ হ'য়ে; হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের বৃহত্ত্ব আমি প্রতিষ্ঠা করি, তোমরা যাদের মাতা হ'ল মহাসমুদ্র, যারা সিদ্ধকর্মী যারা মন পার হ'য়ে উঠে যাও আনন্দসমূহের মধ্যে, দিব্য তোমরা, মননের দ্বারা ঐ ধাতুর সন্ধান পাও। ...হে সমুদ্রযাত্রার দিশারীদ্বয়, যারা বাণীকে মানসিকভাবাপন্ন কর, ইহা তোমাদের সকল চিন্তনের নাশক,—তোমরা সোমপান কর তীব্রভাবে; হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আমাদের সেই প্রেরণা দাও যা জ্যোতির্ময় ও আমাদের নিয়ে যায় অন্ধকারের অপর পারে। মনের সব চিন্তা ছাড়িয়ে অপর পারে যাবার জন্য তুমি আমাদের সাথে তোমার পোতে ভ্রমণ কর। হে অশ্বিদ্বয়, তোমাদের রথ যুক্ত কর—তোমাদের সেই রথ যা নদী-উত্তরণের কাজে স্বর্গে হ'য়ে ওঠে বিশাল দণ্ডযুক্ত পোত। ধী-র দ্বারা আনন্দের শক্তিসমূহকে সংযুক্ত করা হ'য়েছে। স্বর্গে আনন্দের সোমশক্তি-রাজিই জলরাশির স্থানে ঐ ধাতু। কিন্তু নিজেদের প্রচ্ছন্ন রাখবার জন্য তোমরা যে আবরণ তৈরী করেছ তা কোথায় তোমরা ফেলে দেবে? জ্যোতির উৎপত্তি হ'য়েছে সোমানন্দের জন্য—যে সূর্য অন্ধকারময় ছিল তা তার জিহ্বা প্রসারিত করেছে হিরণ্যের দিকে। যে সত্যের পথ দিয়ে আমরা অপর পারে যাব তার আবির্ভাব হ'য়েছে; স্বর্গের মধ্য দিয়ে সেই বিশাল পথ দেখা যায়। যখন অশ্বীরা সোম-উল্লাসে তৃপ্তিলাভ করেন তখন সাধক তার সত্তায় বৃদ্ধি পায় অশ্বিদ্বয়ের অভিব্যক্তির পর আরো অভিব্যক্তির দিকে। তোমরা যারা বাস কর (বা ঝলমল কর) সর্বজ্যোতির্ময় সূর্যে, এস তোমরা, সোমপানের দ্বারা, বাণীর দ্বারা আমাদের মানবত্বের মাঝে আনন্দের স্রষ্টারূপে। যখন তোমরা সকল জগৎ ব্যেপে অবস্থান কর এবং রাত্রিগুলির মধ্য থেকে সত্যসমূহ বাহির কর তখন তোমাদের মহিমা অনুযায়ী উষা আসে আমাদের কাছে। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা দুজনে পান কর, যেসব প্রসরণের সমগ্রতা অক্ষত থাকে তাদের দ্বারা তোমরা উভয়ে আমাদের কাছে শান্তি বিস্তার কর।"

সূক্তটির সরল ও স্বাভাবিক অর্থ ইহাই আর যদি আমরা বৈদিক

শিক্ষার প্রধান সব ভাবনা ও চিত্র মনে রাখি, তাহ'লে এই সূক্তের তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়। স্পষ্টতঃই রাত্রি হ'ল আন্তর অন্ধকারের চিত্র; উষার আগমনের দ্বারা রাত্রিগুলির মধ্য থেকে সত্যসমূহ জয় করা হয়। ইহাই সেই সূর্যের উদয় যা অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল—দেবগণ ও আঙ্গিরস ঋষিগণের দ্বারা হারানো সূর্যের পুনরুদ্ধারের পরিচিত চিত্র—সত্যের সূর্য আর এখন ইহা তার অগ্নিময় জিহ্বা প্রসারিত করে স্বর্ণময় জ্যোতির দিকে —"হিরণ্যে"র জন্য; হিরণ্য অর্থাৎ স্বর্ণ হ'ল পরাজ্যোতির প্রতীক্, সত্যের স্বর্ণ, আর বৈদিক ঋষিরা দেবতাদের নিকট যা প্রার্থনা করেন তা এই ধন, স্বর্ণমুদ্রা নয়। আন্তর অন্ধকার থেকে দীপ্তির মধ্যে এই মহাপরিবর্তন অশ্বীরা সাধন করেন; তাঁরা হ'লেন মন ও প্রাণিক শক্তিসমূহের আনন্দময় ঊর্ধ্বগামী কার্যের অধিপতি; তাঁরা তা সাধন করেন মন ও দেহের মধ্যে আনন্দের অমৃতময় আনন্দ বর্ষণ ক'রে এবং সেখানে তা পান ক'রে। তাঁরা প্রকাশশীল বাক্‌কে মানসিকভাবাপন্ন করেন, আমাদের নিয়ে যান এই অন্ধকারের উজানে শুদ্ধ মনের স্বর্গে আর সেখানে মন্ত্রের দ্বারা তাঁরা আনন্দের শক্তিসমূহকে কর্মে প্রবৃত্ত করেন। কিন্তু এমনকি এই স্বর্গীয় জলরাশিও তাঁরা পার হয়ে যান, কারণ সোমের শক্তির সাহায্যে তাদের সকল মানসিক চেতনা লোপ পায় এবং তাঁরা এই আবরণও ফেলে দেন; তাঁরা মনের অতীতে চলে যান আর এই শেষ প্রাপ্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে যেন ইহা নদী-উত্তরণ, শুদ্ধমনের স্বর্গের মধ্য দিয়ে গমন, সত্যের পথ দিয়ে অপর দিকে যাত্রা। যতক্ষণ না আমরা এই সর্বোচ্চ পরমে, "পরমা পরাবৎ"-এ উপনীত হই ততক্ষণ এই মহতী মানবযাত্রা থেকে আমাদের বিশ্রাম নেই।

আমরা দেখব যে শুধু এই সূক্তে নয়, সর্বত্রই উষা আসেন সাথে সত্য নিয়ে, তিনি নিজেই সত্যের বহিঃছটা। তিনি দিব্য উষা আর এই ভৌতিক উষা হ'ল জড়জগতে শুধু তাঁর ছায়া ও প্রতীক্।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উষা এবং সত্য

উষাকে বারবার বর্ণনা করা হয়েছে গাভীদের মাতা বলে। তাহ'লে বেদে গাভী যদি ভৌতিক আলোক বা আধ্যাত্মিক দীপ্তির প্রতীক্ হয় তা-হ'লে ঐ বর্ণনাটির অর্থ, হয় এই হবে যে উষা দিবালোকের ভৌতিক কিরণ-সমূহের মাতা অথবা উৎস, আর না হয় এই অর্থ হ'বে যে তিনি সৃষ্টি করেন পরমদিবসের প্রভাসমূহ, আন্তর দীপ্তির শোভা ও স্বচ্ছতা। কিন্তু বেদে আমরা দেখি যে দেবতাদের মাতা অদিতিকে গাভী বলা হ'য়েছে আবার সাধারণ মাতাও বলা হ'য়েছে; তিনি পরমা জ্যোতি এবং সকল প্রভার উদ্ভব হয় তাঁর থেকেই। মনস্তাত্ত্বিকভাবে, অদিতি পরম বা অনন্ত চেতনা, দেবতাদের মাতা আর ইহার বিপরীত হল দনু বা দিতি[১], বিভক্ত চেতনা, সেই বৃত্র ও অন্যান্য দানবদের মাতা যারা দেবতাদের শত্রু ও মানুষের অগ্রগতির বিরোধী। সাধারণভাবে বিশ্বে চেতনার সকল রূপেরই, স্থূল থেকে উর্ধ্বের সব চেতনার উৎস তিনি; সপ্ত গাভী, "সপ্ত গাবঃ", তাঁরই বিভিন্ন রূপ আর বলা হয় যে মাতার সপ্ত নাম, সপ্ত ধাম আছে। গাভীদের মাতা হিসাবে উষা শুধু হ'তে পারে এই পরমা জ্যোতির, এই পরম চেতনার, অদিতির একটি রূপ বা শক্তি। বস্তুতঃ আমরা দেখি যে ১-১১৩-১৯ম শ্লোকে তাঁকে সেই ভাবেই বর্ণনা করে বলা হ'য়েছে যে তিনি "মাতা দেবানাম্ অদিতের্ অনীকম্" "দেবতাদের মাতা, অদিতির রূপ (বা শক্তি)"।

কিন্তু পরতর বা অবিভক্ত চেতনার দীপ্তিদায়িনী উষা সর্বদাই সত্যের উষা; যদি উষা ঐ দীপ্তিদায়িনী উষা হয় তাহ'লে আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব যে ঋগ্বেদের শ্লোকগুলিতে তার উদয়ের সাথে প্রায়ই সত্যের, 'ঋতম্'-এর ভাবনাও যুক্ত থাকে। কারণ প্রথমেই উষার বর্ণনায় বলা হ'য়েছে যে ইহা সত্যের পথ অনুসরণ করে সিদ্ধভাবে, "ঋতস্য পন্থাম্ অন্বেতি সাধু" (১-১২৪-৩)। এখানে "ঋতম্"-এর যাজ্ঞিক বা প্রাকৃতিক

১ অদিতি যে দিতির নঞর্থকরূপে নিষ্পন্ন হ'য়েছে তা ঠিক নয়, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতু থেকে তাদের উৎপত্তি—অদ্ ও দি।

কোন অর্থ খাটে না ; কারণ উষা সর্বদাই যজ্ঞের পথ অনুসরণ করে অথবা জলের পথ অনুসরণ করে বলার কোন অর্থ নেই। অবশ্য স্পষ্ট তাৎপর্যটি এড়াবার জন্য আমরা বলতে পারি যে "পন্থা ঋতস্য" কথাটির অর্থ সূর্যের পথ। কিন্তু বেদে বরং বলা হয় যে সূর্যই উষার পথ অনুসরণ করে আর প্রাকৃতিক উষা যে দেখে তার কাছে ইহাই স্বাভাবিক চিত্র বলে মনে হবে। উপরন্তু যদিই বা এই হয় যে অন্যান্য শ্লোকে এ কথাটির অর্থ যে সত্যের পথ তা স্পষ্ট নয়, তবুও মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য এসে পড়বেই; কারণ তাহ'লে অর্থ হ'বে যে দীপ্তির উষা অনুসরণ করে সত্যের অর্থাৎ সত্যাধিপতি সূর্য সবিতার পথ।

আমরা দেখি যে ১-১২৪-৩ শ্লোকে ঠিক এই ভাবনাটিকেই আবার বলা হ'য়েছে আর তাতে মনস্তাত্ত্বিক অর্থটিকে আরো স্পষ্ট ও পূর্ণ করে দেখান হ'য়েছে; "ঋতস্য পন্থাম্ অন্বেতি সাধু, প্রজানতীব ন দিশো মিনাতি", তিনি সত্যের পথ ধরে চলেন এবং জ্ঞানবতীর মতো কোন দিক সীমিত করেন না। বলা যেতে পারে যে "দিশঃ" পদটির দুইটি অর্থ আছে, কিন্তু এখানে এই দুই অর্থ করার কোন প্রয়োজন নেই। উষা সূর্যের পথ ধরে চলেন এবং তাঁর এই জ্ঞান বা দৃষ্টি আছে বলে তিনি যে আনন্ত্যের, "বৃহৎ"-এর দীপ্তি তাকে সীমিত করেন না। ইহাই যে শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ তার সুস্পষ্ট, অভ্রান্ত ও তর্কাতীত প্রমাণ পাই পঞ্চম মণ্ডলের একটি ঋকে (৫-৮০-১); এখানে উষাকে বলা হ'য়েছে "দ্যুতদ্যামানাবু বৃহতীম্ ঋতেন ঋতাবরীব্ স্বর্ আবহন্তীম্" "(তিনি) দীপ্ত গমনের, সত্যে বৃহৎ সত্যে পরমা (বা পূর্ণা) আর সাথে স্বর্ আনেন।" আমরা বৃহতের ভাবনা পাই, সত্যের ভাবনা পাই, স্বর্ লোকের সৌর আলোকের ভাবনা পাই আর একথা নিশ্চিত যে শুধু কোন প্রাকৃতিক উষার সহিত এই সব ভাবনা এইরূপ নিবিড়ভাবে পুনঃপুনঃ যুক্ত থাকে না। এইসাথে আমরা ৭-৭৫-১ শ্লোকের এই অংশটিও তুলনা করতে পারি,—"ব্যুষা আবো দিবিজা ঋতেন, আবিষ্কৃণ্বানা মহিমানম্ আগাৎ"; দ্যুলোকজাতা উষা বিষয়সমূহ উন্মুক্ত করেন সত্যের দ্বারা, তিনি আগমন করেন মহিমা ব্যক্ত ক'রে। এখানেও আমরা পাচ্ছি যে উষা সত্যের শক্তির দ্বারা সকল বিষয় প্রকাশিত করেন আর এই ফলকে বর্ণনা করা হ'য়েছে এক বৃহত্ত্বের অভিব্যক্তি হিসাবে।

শেষ পর্যন্ত আমরা সেই ভাবনাটিকেই অন্য বর্ণনায় পাই তবে তাতে

সত্যের জন্য স্পষ্ট 'সত্য' বলা হ'য়েছে, যে "ঋতম্" পদটির দুটি অর্থ করা যায় তার মতো এটির দুটি অর্থ নেই; "সত্যা সত্যেভির্ মহতী মহদ্ভির্ দেবী দেবেভিঃ (৭-৭৫-৭), সত্যদেবগণের সহিত উষা তাঁর সত্তায় সত্যময়ী, মহান্ দেবগণের সহিত তিনিও মহতী। উষার এই সত্যের কথা বামদেব জোর দিয়ে বলেছেন তাঁর একটি সূক্তে—(৪-৫১);—কারণ সেখানে তিনি উষা সম্বন্ধে শুধু যে বলেছেন যে "তাঁরা সত্যের দ্বারা যুক্ত অশ্বগুলির সাহায্যে সকল ভুবন সদ্য পরিভ্রমণ করেন" (ঋতযুগ্ভির্ অশ্বৈঃ) (তু ৬-৬৫-২) তা নয়, তিনি আরো বলেছেন যে তাঁরা "ভদ্রা ঋতজাতসত্যাঃ" "সুখময়ী ও সত্য কারণ তাঁরা সত্য থেকে জাত"; তিনি আরো বলেছেন যে তাঁরা "এমন সব দেবী যাঁরা জেগে ওঠেন সত্যের আসন থেকে" (৪-৫১-৮)।

"ভদ্রা" ও "ঋত"—এই দুটির মধ্যে এই নিবিড় সংযোগের কথায় আমাদের মনে পড়ে অগ্নির প্রতি মধুচ্ছন্দার সূক্তে ঐসব ভাবনার ঐরূপ সংযোগের কথা। বেদের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আমরা প্রায়শঃই এই প্রাচীন ভাবনাটি পাই যে সত্য আনন্দের পথ। সুতরাং উষার সহিত অর্থাৎ সত্য দীপ্তির অভ্যুদয়ের সহিত সুখ ও আনন্দও আসতে বাধ্য। উষা আনন্দ আনেন,—এই ভাবনাটি আমরা সর্বদাই বেদে পাই আর বসিষ্ঠ তা স্পষ্ট ক'রে বলেছেন ৭-৮১-৩ শ্লোকে, "যা বহসি পুরু স্পার্হং রত্নং ন দাশুষে ময়ঃ" "যে তুমি যজ্ঞদাতার কাছে বহন করে আন বহুল ও রমণীয় উল্লাসরূপী আনন্দ।"

"সূনৃতা" একটি সাধারণ বৈদিক পদ। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যা করেন "প্রিয় ও সত্য বচন" বলে; কিন্তু মনে হয় যে প্রায়ই ইহার অর্থ "সুখময় সত্যগুলি", আর এই অর্থটি আরো ব্যাপক। উষাকে কখন কখন বলা হয়েছে "ঋতাবরী" সত্যে পূর্ণা, আবার কখন কখন "সূনৃতাবরী"। তিনি আসেন সত্য ও সুখময় শব্দ বলতে বলতে, "সূনৃতা ঈরয়ন্তী"। যেমন তাঁকে বলা হয়েছে ভাস্বর যূথের নেত্রী এবং দিনের নেত্রী, তেমন তাঁকে বলা হ'য়েছে সুখময় সত্যসমূহের ভাস্বতী নেত্রী, "ভাস্বতী নেত্রী সূনৃতানাম্" (১-৯২-৭)। বৈদিক ঋষিদের মনে আলোক, রশ্মি বা গাভী এবং সত্যের ভাবনাগুলির মধ্যে এই নিবিড় সংযোগের কথাটি আরো অভ্রান্তভাবে বলা হ'য়েছে ১-৯২-১৪ ঋকে, "গোমতি অশ্বাবতি বিভাবরি...সূনৃতাবতি" ভাস্বর যূথসমেত, অশ্বসমেত যে উষা বিস্তীর্ণআলোকময়ী ও সুখময় সত্যে পূর্ণা"।

১-৪৮-২ শ্লোকে অনুরূপভাবে তবে আরো স্পষ্ট করে এই বিশেষণগুলির সমবায়ের তাৎপর্য দেখান হ'য়েছে, "গোমতীর্ অশ্বাবতীর্ বিশ্বসুবিদঃ" "উষারা যাদের সাথে আছে রশ্মিসমূহ (যূথগণ), দ্রুতগতি (অশ্বগণ), এবং যারা সকল বিষয়ে সঠিক জ্ঞানবতী"।

বৈদিক উষার মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র সম্বন্ধে ঋগ্বেদে আমরা যে শুধু এই নিদর্শনগুলিই পাই তাই নয়। উষাকে সর্বদাই বর্ণনা করা হ'য়েছে এই বলে যে তিনি দৃষ্টি, বোধ ও সত্যগমনে প্রবুদ্ধ করেন। গোতম রাহুগণ বলেন, "দেবী সকল ভুবনের সম্মুখে এসে তাদের নিরীক্ষণ করেন, দিব্যদৃষ্টির চক্ষু দীপ্ত হয় অতীব ব্যাপ্তির সহিত; সকল জীবনকে গতিবৃত্তির জন্য প্রবুদ্ধ ক'রে তিনি সকল মননকারীর জন্য বাণীর সন্ধান পান" "বিশ্বস্য বাচম্ অবিদন্ মনায়োঃ (১-৯২-৯)। এখানে যে উষার কথা আমরা পাই তা প্রাণ ও মনকে মুক্ত ক'রে নিয়ে যায় পূর্ণতম ব্যাপ্তিতে; আর যদি আমরা ঋষির এই সব কথার শুধু এই অর্থ করি যে ইহা শুধু প্রাকৃতিক উষার আগমনে পার্থিব জীবনের পুনরায় জাগ্রত হবার চিত্র তাহ'লে ঐ কথাগুলির সমগ্র গুরুত্ব অবহেলা করা হবে। যদিও এখানে উষার দ্বারা আনা দৃষ্টি বোঝাতে ব্যবহৃত "চক্ষুঃ" পদটির অর্থ শুধু স্থূল দৃষ্টি হওয়া সম্ভব, তাহ'লেও অন্যান্য শ্লোকে "কেতুঃ" পদটি ব্যবহার করা হ'য়েছে যার অর্থ বোধ, মানসিক চেতনায় বোধযুক্ত দৃষ্টি, জ্ঞানের একটি শক্তি। উষা "প্রচেতাঃ", তিনি এমন যাঁর এই বোধময় জ্ঞান আছে। রশ্মিসমূহের মাতা তিনি সৃষ্টি করেছেন মনের এই বোধময়ী দৃষ্টি; "গবাম্ জনিত্রী অকৃত প্র কেতুম্" (১-১২৪-৫)। তিনি স্বয়ং ঐ দৃষ্টি,—"যেখানে পূর্বে কিছু ছিল না সেই অসতের মাঝে এখন বোধময়ী দৃষ্টি মুক্ত হ'য়েছে তার বিশাল উষায়", "বিনূনম্ উচ্ছাদ্ অসতি প্র কেতুঃ" (১-১২৪-১১)। এই বোধময়ী শক্তির দ্বারা তিনি সুখময়ী সত্যসম্পন্না, "চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি" (৪-৫২-৪)।

আরো বলা হয় যে এই বোধ, এই দৃষ্টি হ'ল অমৃতত্বের, "অমৃতস্য কেতুঃ" (৩-৬১-৩); ইহার অর্থ এই যে, পরতর বা অমর চেতনার উপাদান যে সত্য ও আনন্দ তার আলোক ইহা। বেদে রাত্রি হ'ল আমাদের তামস চেতনার প্রতীক্ যে চেতনা অজ্ঞানতায় পূর্ণ এবং সংকল্প ও ক্রিয়ার স্খলনে ভরা এবং সেজন্য সকল অশুভ, পাপ ও কষ্টভোগে পূর্ণ। আলোক

হ'ল সেই প্রদীপ্ত পরতর চেতনার আগমন যা নিয়ে যায় সত্যে ও সুখে। আমরা সর্বদাই "দুরিতম্" ও "সুবিতম্" এই দুটি পদের একটিকে অন্যটির বিপরীতার্থক হিসাবে পাই। "দুরিতম্" কথাটির আক্ষরিক অর্থ স্খলন বা ভ্রান্ত গমন আর রূপক হিসাবে ইহার অর্থ যা কিছু অন্যায় ও অশুভ, সকল পাপ ও প্রমাদ, বিপদ; "সুবিতম্" পদটির আক্ষরিক অর্থ যথার্থ বা শুভ যাত্রা এবং ইহা প্রকাশ করে যা কিছু শুভ ও সুখময় বিশেষতঃ ইহার অর্থ সেই আনন্দ যা পাওয়া যায় যথার্থ পথ অনুসরণ ক'রে। দেবী সম্বন্ধে বসিষ্ঠ বলেন, (৭-৭৮-২), "দিব্য উষা আসেন জ্যোতির দ্বারা সকল অন্ধকার ও অশুভ পিছনে সরিয়ে দিয়ে" "বিশ্বা তমাংসি দুরিতা"; আর অনেকগুলি শ্লোকে বলা হ'য়েছে যে দেবী মানুষদের প্রবুদ্ধ করেন, প্রচোদিত করেন অথবা নিয়ে যান সত্য যাত্রায়, সুখে, "সুবিতায়"।

সুতরাং তিনি যে শুধু সুখময় সত্যসমূহের নেত্রী তা নয়, তিনি আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ও আনন্দের নেত্রী, তিনি সেই আনন্দ আনেন যা মানুষ পায় অথবা তার কাছে উপস্থাপিত করা হয় সত্যের দ্বারা, "এষা নেত্রী রাধসঃ সূনৃতানাম্" (৭-৭৬-৭)। এই যে ধনের জন্য ঋষিরা প্রার্থনা করেন তা পার্থিব ধনের রূপকে বর্ণনা করা হ'য়েছে; ইহা "গোমদ্ অশ্বাবদ্ বীরবদ্" অথবা ইহা "গোমদ্ অশ্বাবদ্ রথবচ্চ রাধঃ"। "গো", গাভী, "অশ্ব", ঘোড়া, "প্রজা" বা "অপত্য", সন্তান, "নৃ" বা "বীর", মানুষ বা বীরপুরুষ, "হিরণ্য", সোনা, "রথ", রথ, "শ্রবস্", খাদ্য বা যশ—এই সবই যাজ্ঞিক ব্যাখ্যা মতে বৈদিক ঋষিদের প্রার্থিত বিষয়। মনে হয় ইহার চেয়ে অন্য কিছু বাস্তব, পার্থিব বা জড়ীয় হ'তে পারে না; প্রবল ভোগকামী, পৃথিবীর সম্পদে আগ্রহী বীর্যবান্ অসভ্যেরা ঠিক এই সব কাম্য বিষয়ই তো তাদের আদিম দেবতাদের নিকট চাইবে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে "হিরণ্য" পার্থিব স্বর্ণ অপেক্ষা অন্য একটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা দেখেছি যে "গাভী"দের সর্বদাই উষার সহিত পাওয়া যায় জ্যোতির রূপক হিসাবে, আর আমরা দেখেছি এই জ্যোতি মানসিক দৃষ্টি এবং আনন্দদায়ী সত্যের সহিত সংযুক্ত। আর "অশ্ব", "ঘোড়া" সর্বদাই এইসব মনস্তাত্ত্বিক অর্থের স্থূল চিত্রসমূহের মধ্যে "গাভী"র প্রতীকার্থক্ মূর্তির সহিত সংযুক্ত: উষা "গোমতী অশ্বাবতী"। বসিষ্ঠের একটি শ্লোকে (৭-৭৭-৩) বৈদিক অশ্বের এই প্রতীকার্থটি সতেজে ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হ'য়েছে—

"দেবানাং চক্ষুঃ সুভগা বহন্তী
শ্বেতং নয়ন্তী সুদৃশীকম্ অশ্বং;
উষা অদর্শি রশ্মিভির্ব্যক্তা
চিত্রামঘা বিশ্বম্ অনু প্রভূতা।"

"যে উষা সুখময়ী, দেবগণের দিব্যদৃষ্টি আনেন, সুদৃষ্টিযুক্ত শ্বেত অশ্ব চালনা করেন তাঁকে দেখা যাচ্ছে রশ্মিসমূহের দ্বারা তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্ত, তাঁর বিচিত্র ধনে তিনি পূর্ণা এবং সকল বিষয়ের মধ্যে তিনি তাঁর জন্ম প্রকাশ করেন।" ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে শ্বেত অশ্ব (যে কথাটি অগ্নি-দেব "কবিক্রতু", সংকল্প-দ্রষ্টা, সব কাজে দিব্য সংকল্পের সুষ্ঠু-দর্শী বীর্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়---৫-১-৪) সম্পূর্ণ প্রতীকার্থক্[১] এবং যে "বিচিত্র ধন" তিনি তাঁর সাথে আনেন তা-ও একটি রূপক, ইহা যে পার্থিব ধন নয় তা নিশ্চিত।

উষাকে বলা হয় "গোমতী অশ্বাবতী বিরবতী"; যেহেতু এখানে "গোমতী" ও "অশ্বাবতী" প্রতীকার্থক্, ইহার অর্থ "গাভীপূর্ণা ও অশ্বযুক্তা" নয়, ইহার অর্থ জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর এবং শক্তির দ্রুতগতিসম্পন্ন, সেহেতু "বীরবতী" কথাটির অর্থ "লোকজন সমেত" অথবা বীর, অনুচর বা পুত্র সমেত হ'তে পারে না, বরং ইহার তাৎপর্য এই যে তিনি বিজয় শক্তিসমূহের দ্বারা সমন্বিত অথবা ইহার অনুরূপ কোন প্রতীকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইহা সুস্পষ্ট হ'য়েছে ১-১১৩-১৮ শ্লোকে, "যা গোমতীর্ উষসঃ সর্ববীরাঃ...তা অশ্বদা অশ্নবৎ সোমসুত্বা।" ইহার এই অর্থ নয় যে উষা-সমূহের গরু ও সকল লোকজন বা সকল অনুচর আছে, তাদের কোন ব্যক্তি সোম নিবেদন করে ও অশ্বদাতারূপে তা উপভোগ করে। উষা হ'ল আন্তর উষা যা মানবের কাছে নিয়ে আসে তার বিশালতম সত্তা, শক্তি, চেতনা, আনন্দের সকল বিচিত্র পূর্ণতাসমূহ; ইহা তার দীপ্তিসমূহে উজ্জ্বল, ইহার সহিত আছে সম্ভবপর সকল শক্তি ও বীর্য, ইহা মানবকে দেয় প্রাণ-বত্তার পূর্ণ শক্তি যাতে সে উপভোগ করতে পারে বৃহত্তর অস্তিত্বের অনন্ত আনন্দ।

১ অশ্বের প্রতীকার্থ এই সবে সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট: (১) যজ্ঞের অশ্বের উদ্দেশে দীর্ঘতমার অনেক সূক্তে, (২) দধিক্রবন্ অশ্বের উদ্দেশে বহু ঋষিদের সূক্তগুলিতে, (৩) বৃহদারণ্যক্ উপনিষদের আদিতে যেখানে "উষা অশ্বের শির" এই কথাটি একটি অত্যন্ত বিস্তৃত চিত্রে প্রথমেই বিদ্যমান।

"গোমদ্ অশ্বাবদ্ বীরবদ্ রাধঃ" কথাগুলিকে আর ভৌতিক অর্থে নেওয়া চলে না; বেদের ভাষা থেকেই বোঝা যায় যে ইহাদের সম্পূর্ণ এক অন্য সত্য আছে। সুতরাং দেবদত্ত ধনের অন্যান্য বিষয়গুলিকেও সেইভাবে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে নেওয়া উচিত; সন্তান, সোনা, রথ—এ সবই প্রতীকার্থক্; "শ্রাবস্" যশ বা খাদ্য নয়, বরং ইহার এক মনস্তাত্ত্বিক অর্থ আছে, ইহার অর্থ সেই পরতর জ্ঞান যা ইন্দ্রিয়সমূহে বা বুদ্ধিশক্তিতে আসে না, যা আসে সত্যের দিব্য শ্রবণে ও দিব্য দৃষ্টিতে; "রাধাঃ দীর্ঘ-শ্রুত্তমম্" (৭-৮১-৫), রয়িং শ্রবসস্যুম্ (৭-৭৫-২) কথাগুলির অর্থ হ'ল সত্তার সেই সমৃদ্ধ অবস্থা, সেই আধ্যাত্মিকভাবাপন্ন প্রচুর আনন্দ যা জ্ঞানা-ভিমুখী ("শ্রবস্যু") এবং যার এক সুদূর-প্রসারিত শ্রবণশক্তি আছে অনন্তের প্রদেশ ("দিষঃ") থেকে আমাদের কাছে আসা বাক্-এর সব স্পন্দনের জন্য। এইভাবে আমরা দেখি যে উষার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি আমাদিগকে মুক্ত করে বেদের সেই জড়ীয়, যাজ্ঞিক অজ্ঞানময় ব্যাখ্যা থেকে যা আমাদের নিয়ে ফেলে চরম বিশৃঙ্খলা ও অন্ধকারের রাত্রির মধ্যে একটি গর্ত থেকে অন্য গর্তের ভিতর; ইহা আমাদের কাছে বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করে এবং প্রবেশ করায় বৈদিক জ্ঞানের মর্মলোকে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গো ও আঙ্গিরস উপাখ্যান

বেদের অর্থ সন্ধান করতে আমরা 'গো'র যে চিত্রটি চাবিকাঠি রূপে ব্যবহার করছি সেইটি আমরা আরো পরীক্ষা করব আঙ্গিরস ঋষিদের সম্বন্ধে বৈদিক উপাখ্যানে বা রূপক কাহিনীতে। বৈদিক কাহিনীদের মধ্যেই ইহাই মোটের উপর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাখ্যান।

বৈদিক সূক্তগুলি অন্য যাই কিছু হ'ক না কেন ইহারা বরাবরই কতকগুলি "আর্য" দেবতাদের নিকট, মানবের বন্ধু ও সাহায্যকারীদের নিকট স্তুতি এবং যে উদ্দেশ্যে এই স্তুতিগায়করা, অথবা তাঁরা যেমন নিজেদের বলেন দ্রষ্টারা ("কবি, ঋষি, বিপ্র") ঐসব স্তুতি করেন সেগুলি পরম কাম্য ("বর, বার") বলে গণ্য করা হয়। এই কাম্য বিষয়গুলিকে, দেবতাদের দেওয়া এই বরগুলিকে সংক্ষেপে বলা হয় "রয়ি, রাধঃ"; স্থূলভাবে ইহাদের অর্থ হ'তে পারে ধন বা শ্রীবৃদ্ধি আর মনস্তাত্ত্বিকভাবে ইহাদের অর্থ এমন আনন্দ বা উপভোগ যার উপাদান হ'ল আধ্যাত্মিক সম্পদের কতকগুলি রূপের প্রাচুর্য। যুক্ত সাধনায় তার অংশ হিসাবে মানব দেয় যজ্ঞকর্ম, বাক্, সোমরস এবং ঘৃত। যজ্ঞের মধ্যে দেবতারা জন্ম নেন, বাক্, সোমরস ও ঘৃতের দ্বারা তাঁরা বৃদ্ধিলাভ করেন এবং ঐ বীর্যের মধ্যে, সোমরসের উল্লাস ও মত্ততার মধ্যে তাঁরা যজ্ঞদাতার উদ্দেশ্য সাধন করেন। এইভাবে যে ধন পাওয়া যায় তার প্রধান বিষয় হ'ল গো এবং অশ্ব; কিন্তু অন্য সব বিষয়ও আছে, "হিরণ্য" (সোনা), "বীর" (লোকজন বা বীরপুরুষ), "রথ", "প্রজা" বা "অপত্য" (সন্তান)। যজ্ঞসাধনের উপকরণগুলি যেমন অগ্নি, সোম, ঘৃত দেবতারা দেন এবং তাঁরা যজ্ঞে উপস্থিত হন ইহার পুরোহিত, পাবক, ধারক, যুদ্ধের বীরপুরুষ হিসাবে—কারণ এমন সব আছে যারা যজ্ঞ ও বাক্ ঘৃণা করে, যজ্ঞদাতাকে আক্রমণ করে, তাকে বিদীর্ণ করে অথবা তার কাছ থেকে তার কাম্য ধন আটক রাখে। সমৃদ্ধির যেসব অবস্থা অত আগ্রহভরে কামনা করা হয় তা হ'ল উষা ও সূর্যের উদয়, স্বর্গের ও সপ্ত নদীর বারিবর্ষণ—তা সে ভৌতিক বা রহস্যময় হ'ক—যাদের বেদে বলা হয় স্বর্গের পরাক্রমশালী পুরুষ। কিন্তু

এমনকি এই সমৃদ্ধিও, গাভী, অশ্ব, স্বর্ণ, লোকজন, রথ, সন্তানসন্ততি প্রভৃতির পূর্ণতাও শেষ কাম্য নয়; এসবই হ'ল উপায় যার সাধ্য হল অন্যসব জগতের উম্ঘাটন, স্বর্লোকজয়, সৌর আকাশে উত্তরণ সত্যের পথ দিয়ে যে জ্যোতি ও স্বর্গীয় আনন্দে মর্ত্যজন অমৃতত্বে উপনীত হয় তার প্রাপ্তি।

ইহাই যে বেদের মূল বিষয় তাতে সন্দেহ নেই। অতি প্রাচীন কাল থেকে ইহার যে যাজ্ঞিক ও কাল্পনিক অর্থ করা হ'য়েছে তা সুবিদিত, ইহাকে বিশেষ ক'রে বলার প্রয়োজন নেই; সংক্ষেপে এই অর্থ হ'ল যে মানুষের প্রধান কর্তব্য হ'ল এখানে ও ইহার পর স্বর্গে ধনভোগ করার জন্য যজ্ঞীয় পূজাসাধন। আবার এই সম্বন্ধে আধুনিকমতও আমরা জানি; এই মতের কথা হ'ল বেদ হ'ল সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উষা, বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি, আকাশ, নদী প্রভৃতিকে মানুষ মনে ক'রে তাদের ও প্রকৃতির অন্যান্য দেবতাদের পূজা করা, যজ্ঞের দ্বারা এইসব দেবতাদের প্রীতিসাধন করা এবং এই জীবনে ধন লাভ ও রক্ষা করা বিশেষতঃ মানুষ ও দ্রাবিড়বাসী শত্রুদের কাছ থেকে এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন দৈত্যদানব ও মানুষী লুণ্ঠনকারী-দের সহিত যুদ্ধ করা আর মৃত্যুর পর মানুষের দ্বারা দেবতাদের স্বর্গ প্রাপ্তি। আমরা এখন দেখছি যে অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে এইসব ভাবনা যতই যুক্তিসম্মত হ'ক না কেন, বৈদিক যুগের দ্রষ্টাদের কাছে, সুদীপ্ত মনের কাছে ("কবি", "বিপ্র") এইসব কথা বেদের আন্তর অর্থ ছিল না। তাদের কাছে জড় বস্তু ছিল অজড়ীয় বস্তুর প্রতীক্—গোযূথ ছিল দিব্য উষার প্রভা বা কিরণরাজি, অশ্ব এবং রথ হল শক্তি ও গতি-বৃত্তির প্রতীক্, স্বর্ণ হ'ল আলোক, দিব্য সূর্যের ভাস্বর ধন—সত্য আলো, "ঋতং জ্যোতিঃ"; যজ্ঞের দ্বারা প্রাপ্ত ধন ও যজ্ঞ—এই উভয়েরই দ্বারাই বোঝাত এক মহত্তর উদ্দেশ্যের জন্য, অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য মানুষের সাধনা ও তার উপায়। বৈদিক ঋষি আস্পৃহা করতেন মানবের সত্তার সমৃদ্ধি ও প্রসার, তার জীবনযজ্ঞে দেবতাদের জন্ম ও রূপ পরিগ্রহ, যে বীর্য, সত্য, জ্যোতি ও আনন্দের শক্তি তাঁরা তাদের বৃদ্ধি যতদিন না তার সত্তার প্রসা-রিত ও সদা-উন্মীলীয়মান জগৎসমূহের মধ্য দিয়ে মানবের অন্তঃপুরুষ উর্ধ্বে ওঠে, দেখে যে তার আহ্বানে দিব্যদ্বারসমূহ ("দেবীর্ দ্বারাঃ") উন্মুক্ত হয়েছে এবং সে প্রবেশ করে স্বর্গ ও পৃথিবীর অতীত এক দিব্য

অস্তিত্বের পরম আনন্দের মধ্যে। এই উত্তরণই আঙ্গিরস ঋষিদের রূপক-উপাখ্যান।

সকল দেবতাই গোজয়ী, অশ্বজয়ী এবং দিব্যধনজয়ী কিন্তু বিশেষ করে মহান্ দেব ইন্দ্রই এই সংগ্রামে বীর ও যোদ্ধা এবং মানবের জন্য জয় করেন জ্যোতি ও শক্তি। সেজন্য ইন্দ্রকে সর্বদাই অভিহিত করা হয় গোযূথের অধিপতি, "গোপতি" ব'লে; এমনকি তাঁকে গো ও অশ্বরূপেও চিত্রিত করা হয়; তিনিই সুদোহক যাঁকে ঋষিরা দোহন করতে চান, আর তিনি যা দেন তা বিভিন্ন সুরূপ ও চরম মনন; তিনি বৃষভ, যূথের বৃষ; তাঁর গোধন ও অশ্বধনই মানব কামনা করে। এমনকি ৬-২৮-৫ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "হে জনগণ, এই যেসব গাভী তারা ইন্দ্র; আমি ইন্দ্রকেই চাই আমার হৃদয় দিয়ে, আমার মন দিয়ে।" গো ও ইন্দ্রের এই একাত্মীকরণ গুরুত্বপূর্ণ এবং যখন আমরা ঐ দেবতার উদ্দেশে মধুচ্ছন্দার সূক্তগুলি আলোচনা করব তখন এই কথাটি আবার বিবেচনা করতে হবে।

কিন্তু সাধারণতঃ ঋষিরা এই ধনসংগ্রহের বিষয়টিকে চিত্রিত করেন কতকগুলি শক্তির, দস্যুর বিরুদ্ধে বিজয়সাধনরূপে; কখন কখন বর্ণনা করা হয় যে এই দস্যুরা কাম্য ধন অধিকার করে রেখেছে আর তাদের কাছ থেকে তা জোর ক'রে নিয়ে আসতে হবে; আবার কখন বলা হয় যে দস্যুরা আর্যদের কাছ থেকে ধন অপহরণ করে নিয়ে গেছে আর আর্যর কাজ হ'ল তখন দেবতাদের সাহায্যে সেই অপহৃত ধনের সন্ধান ক'রে তা পুনরুদ্ধার করা। যে দস্যুরা এই গোদল আটক রাখে বা অপহরণ করে তাদের বলা হয় পণি; মনে হয় 'পণি' কথাটির পূর্বে অর্থ ছিল,— যে কিছু কাজ করে না ব্যবসায়ী বা বণিক; এই অর্থটির সহিত কখন কখন মিশ্রিত হ'য়েছে ইহার "কৃপণ" অর্থটিও। তাদের প্রধান হ'ল বল, এমন একটি দানব যার অর্থ সম্ভবতঃ বেষ্টক বা অবরোধক যেমন বৃত্রের অর্থ বিরোধী, বাধাদায়ক অথবা আবদ্ধকারী আবরক। অনেক পণ্ডিতেরই অভিপ্রায় যে বেদের মধ্যে যতদূর সম্ভব আদিম ইতিহাসের খোঁজ পাওয়া; সেইভাবে ইহা বলা সহজ যে পণিরা হ'ল দ্রাবিড়বাসী আর বল তাদের প্রধান বা দেবতা। কিন্তু মাত্র কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শ্লোকে এই অর্থ চলতে পারে, কিন্তু অনেক সূক্তেই ঋষিদের প্রকৃত কথাগুলির সহিত এই অর্থের কোন সঙ্গতি থাকে না, তাদের চিত্র ও মূর্তিগুলি হ'য়ে পড়ে কতকগুলি জমকালো অর্থহীন স্তূপ। এই অসঙ্গতির কথা আমরা পূর্বেই দেখেছি;

আর যখন আমরা হারানো গরুর কাহিনীটি আরো মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করব তখন এই অসঙ্গতি আরো সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

বল বাস করে পর্বতের মধ্যে একটি গুহায়, একটি গর্তে ("বিল"); ইন্দ্র এবং আঙ্গিরস ঋষিদের কাজ হ'ল সেখানে তার পশ্চাদ্ধাবন করে জোর করে তাকে তার ধন দিয়ে দিতে: কারণ সে হ'ল গাভীদের বল, "বলস্য গোমতঃ" (১-১১-৫)। পণিদের সম্বন্ধেও বলা হয় যে সে অপহৃত গো-যূথকে লুকিয়ে রাখে পর্বতের গুহায়; এই গুহাকে বলা হয় তাদের লুকিয়ে রাখার কারাগার, অথবা বলা হয় গরুর খোঁয়াড় "ব্রজ", আবার কখন কখন ইহার জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা "গব্যম্ উর্বম্" ব্যবহার করা হয়; এই কথাটির আক্ষরিক অর্থ হ'ল গোসম্বন্ধীয় ব্যাপ্তি অথবা "গো"-র অন্য অর্থে "দীপ্তিময়ী ব্যাপ্তি", ভাস্বর গোযূথের প্রভূতধন। এই হারানো ধন উদ্ধার করার জন্য যজ্ঞসাধন প্রয়োজনীয়। আঙ্গিরসদের অথবা বৃহস্পতি ও আঙ্গিরসদের প্রকৃত বাণী, "মন্ত্র"; স্বর্গশুনী সরমার কাজ হ'ল পণিদের গুহায় গাভীগুলির সন্ধান পাওয়া। সোমরসে বলীয়ান্ ইন্দ্রের এবং তাঁর সাথী আঙ্গিরসদের, ঋষিদের কর্তব্য হ'ল পথ অনুসরণ করে গুহায় প্রবেশ করা অথবা পাহাড়ের দৃঢ় স্থানগুলি সজোরে ভেঙে ফেলে পণিদের পরাস্ত করে মুক্ত যূথদলকে ঊর্ধ্বে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যদি আমরা এই কাল্পনিক উপাখ্যান বা কাহিনীর অর্থ নির্ধারণ করতে চাই তাহ'লে প্রথমেই ইহার কতকগুলি লক্ষণের দিকে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য, ইহাদের উপেক্ষা করা উচিত হবে না। প্রথমতঃ এই উপাখ্যানটির চিত্রগুলি যতই নির্দিষ্ট হ'ক না কেন ইহা বেদে এখনো একটি শুধু কাল্পনিক জনশ্রুতি নয়, বরং ইহাকে এমন যথেচ্ছভাবে এবং পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয় যে পবিত্র জনশ্রুতির পিছনে চিত্রটির তাৎপর্য ফুটে ওঠে। প্রায়শঃই ইহার কাহিনীর দিকটি বাদ দিয়ে গায়কের ব্যক্তিগত প্রয়োজন বা আস্পৃহা সম্বন্ধেই ইহা প্রযুক্ত হয়। কারণ ইহা এমন একটি কর্ম যা ইন্দ্র সর্বদাই করতে সক্ষম; যদিও তিনি আঙ্গিরসদের সাহায্যে চিরকালের জন্য ঐভাবে করেছেন, তাহ'লেও এমনকি বর্তমানেও তিনি ঐরূপ কর্ম করেন, তিনি সর্বদাই গো-অন্বেষণকারী, "গবেষণা" এবং অপহৃত ধনের উদ্ধারকর্তা।

কখন কখন আমরা শুধু হারানো গাভীদের কথা এবং ইন্দ্রের দ্বারা তাদের পুনরুদ্ধারের কথা পাই, সরমার বা আঙ্গিরসদের অথবা পণিদের

কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ইহাও আছে যে সর্বদা ইন্দ্রই যূথ পুনরুদ্ধার করেন না। দৃষ্টান্তরূপ, অগ্নির উদ্দেশে পঞ্চম মণ্ডলে আত্রেয়দের দ্বিতীয় সূক্তে গায়ক হারানো গাভীর চিত্রটি নিজের বেলাতেই প্রয়োগ করেছেন আর তা এমন ভাষায় যাতে ইহার প্রতীকার্থ ফুটে ওঠে। পৃথ্বীমাতা অগ্নিকে বহুদিন তাঁর গর্ভে নিরুদ্ধ করে রেখেছেন, তিনি তার পিতা দ্যৌর নিকট ইহাকে দিতে অনিচ্ছুক, তিনি তাকে নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন যতদিন তিনি একটি সীমিতরূপে সংকুচিত ("পেষী") রয়েছেন, কিন্তু অগ্নি জন্ম-গ্রহণ করে যখন তার মাতা বৃহৎ ও মহৎ হ'য়েছেন ("মহিষী")। অগ্নির জন্মের সাথে ভাস্বর যূথের প্রকাশ বা দৃষ্টি সংযুক্ত রয়েছে। "দূরে এক ক্ষেত্রে আমি একজনকে দেখলাম যিনি তাঁর আয়ুধ শাণিত করছেন ও হিরণ্যদন্ত ও উজ্জ্বলশুদ্ধবর্ণ; আমি তাকে অমৃত (অমৃতময় সার, সোম) দিই বিভিন্ন অংশে, তারা আমার কি করতে পারে যাদের ইন্দ্র নেই, বাক্ও নেই? ক্ষেত্রের মধ্যে আমি দেখলাম যেন এক সুখী গোযূথ নিরন্তর বিচরণ করছে, তারা বহু এবং দীপ্তিময়; তাদের তারা ধরল না, কারণ সে জন্মেছে; এমন কি বৃদ্ধারাও (গাভীরা) আবার তরুণী হ'য়ে ওঠে।" কিন্তু এই যে দস্যুরা যাদের ইন্দ্র নেই, বাক্ নেই তারা যদি এখন ভাস্বর গোযূথ অধিকার করতে অশক্ত, কিন্তু এই উজ্জ্বল ও ভীতিপ্রদ দেবতার জন্মের পূর্বে তারা এরূপ ছিল না। "কারা তারা যারা আমার বীর্যকে ("মর্যকম্") আমার লোকজনকে, যোদ্ধাদের ("বীর") বিচ্ছিন্ন করেছে গাভীদের কাছ থেকে? কারণ তাদের (আমার লোকজনদের) কোন যোদ্ধা ছিল না, ছিল না কোন গো-রক্ষক। যারা তাদের আমার কাছ থেকে নিয়েছে, তারা যেন তাদের মুক্ত করে দেয়। তিনি জ্ঞানময়, তিনি আমাদের কাছে গোযূথকে চালিয়ে নিয়ে আসছেন।"

আমরা যদি প্রশ্ন করি, এই সব ভাস্বর গোযূথ কি, কি এইসব গাভী যারা বৃদ্ধা এবং আবার তরুণী হয়, তাহ'লে তা অন্যায় হবে না। একথা নিশ্চিত যে এই সব পশুর যূথ নয়, এই যে ক্ষেত্র যেখানে হিরণ্যদন্ত যোদ্ধা দেবতার ও ভাস্বর গোযূথের অপূর্ব দৃষ্টি পাওয়া যায় তা যমুনা বা ঝিলাম নদীর তীরস্থ কোন পার্থিব ক্ষেত্র নয়। এসব হয় প্রাকৃতিক উষার, নয় দিব্য উষার পুঞ্জ, কিন্তু যেসব কথায় বর্ণনা করা হয়েছে তাতে ইহাদের প্রাকৃতিক উষা বলা চলে না। ইহা নিশ্চিত যে এই রহস্যময় দৃষ্টি দিব্য দীপ্তির রূপক। ইহারা এমন সব রশ্মি যাদের অন্ধকারের শক্তিসমূহ

অপহরণ করেছিল এবং এখন দিব্যভাবে পুনরুদ্ধার করা হ'য়েছে তবে ভৌতিক অগ্নির দেবতার দ্বারা নয়, তা উদ্ধার হ'য়েছে সেই প্রজ্জ্বলিত শক্তির দ্বারা যা জড়ীয় অস্তিত্বের ক্ষুদ্রতার মধ্যে লুকানো ছিল আর এখন মুক্ত হ'য়েছে সুদীপ্ত মানসিক ক্রিয়ার শুদ্ধতার মধ্যে।

তাহ'লে ইন্দ্রই একমাত্র দেবতা নয় যিনি অন্ধকারময় গুহা ভেঙে ফেলে হারানো রশ্মিসমূহ ফিরিয়ে দিতে পারেন। বিভিন্ন সূক্তে অন্যান্য দেবতাদেরও এই জয়ের গৌরব দেওয়া হ'য়েছে। তাঁদের একজন হ'লেন উষা, দিব্য উষা, গোযূথের মাতা। "সত্যদেবগণের সহিত সত্যবতী, মহান্ দেবগণের সহিত মহতী, যজ্ঞীয় দেবগণের সহিত যজ্ঞীয় দেবতা তিনি দৃঢ়স্থানগুলি ভেঙে ফেলেন, ভাস্বর গো-যূথের কিছু দান করেন তিনি; গাভীরা শব্দ করতে করতে এগিয়ে যায় উষার দিকে" (৭-৭৫-৭)। এইরূপ আর এক দেবতা হ'লেন অগ্নি; যেমন আমরা আগেই দেখেছি কখন কখন তিনি একাই যুদ্ধ করেন; আবার কখন তিনি ইন্দ্রের সহিত একযোগে যুদ্ধ করেন, "হে ইন্দ্র, হে অগ্নি, তোমরা দুজনে গাভীদের জন্য যুদ্ধ করেছিলে" (৬-৬০-২); কখন আবার সোমও সাথে থাকে, "হে অগ্নি ও সোম, তোমরা যখন পণিদের কাছ থেকে গাভীদের জোর করে এনেছিলে তখন তোমাদের বীরত্বপূর্ণ বীর্য সচেতন হ'য়েছিল" (১-৯৩-৪)। আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে এই জয়লাভে সোম ইন্দ্রের সহচর; "শক্তিজাত এই দেব সখা ইন্দ্রের সহিত পণিদের প্রতিহত করেছিলেন" এবং দস্যুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেরও দেবতাদের সকল বীরত্বপূর্ণ কার্য করেছিলেন (৬-৪৪-২২)। ৬-৬২-১১ শ্লোকে অশ্বিদ্বয়কেও এই কার্যের জন্য প্রশংসা করা হ'য়েছে, "তোমরা দুজনে গাভীতে পূর্ণ দৃঢ় খোঁয়াড়ের দ্বার খুলে ফেল"; আবার ১-১১২-১৮ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "হে আঙ্গিরস (অশ্বিদ্বয়কে কখন কখন একটি নামেই যুক্তভাবে অভিহিত করা হয়), তোমরা দুজনে মনের দ্বারা আনন্দ পাও এবং প্রথমে প্রবেশ কর গাভীদের স্রোত উন্মুক্ত করার কাজে"; এখানে স্পষ্টতঃই অর্থ হ'ল জ্যোতির মুক্ত, বহিঃপ্রবহমাণ স্রোত বা সাগর।

এই জয়ের নায়ক হিসাবে বৃহস্পতির কথা আরো ঘনঘন বলা হ'য়েছে। "পরম ব্যোমে মহাজ্যোতি থেকে প্রথম জন্মগ্রহণ ক'রে বৃহস্পতি যিনি সপ্তানন, বহুধাজাত ও সপ্তরশ্মিযুক্ত সকল অন্ধকার দূর করলেন; "স্তুভ" ও ঋকের অধিকারী সঙ্গীদের নিয়ে তিনি বলকে বিচূর্ণ করলেন

তাঁর রবের দ্বারা। বৃহস্পতি উচ্চৈঃস্বরে সেই ভাস্বর গোযূথকে উপরের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন যারা নিবেদনকে ত্বরান্বিত করে এবং তারা উত্তরে শব্দ করেছিল" (৪-৫০-৪, ৫)। আবার ৬-৭৩-১ ও ৩ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "বৃহস্পতি যিনি অদ্রিভেদক, প্রথমজাত, আঙ্গিরস...প্রভূত ধন ("বসূনি") জয় করেছিলেন এই দেবতা জয় করেছিলেন গরুতে পূর্ণ বৃহৎ বৃহৎ ব্রজ (খোঁয়াড়)। বৃহস্পতির মতো ঋক্-উদ্‌গাতা মরুতদেরও এই দিব্য কার্যে যুক্ত করা হয় যদিও কম প্রত্যক্ষভাবে। "হে মরুৎগণ, তোমরা যাকে পোষণ কর তিনি খোঁয়াড় ভেঙে ফেলবেন" (৬-৬৬-৮), আর অন্যত্র আমরা মরুৎদের গাভীদের কথা শুনি (১-৩৮-২)। যে পূষা বর্ধক, সূর্যদেবের এক রূপ তাঁকেও আবাহন করা হয় অপহৃত গোযূথের পশ্চাদ্‌ধাবন ও পুনরুদ্ধারের জন্য (৬-৫৪-৫, ৬, ১০)। "পূষা যেন আমাদের গোরাজির অনুসরণ করেন, তিনি যেন আমাদের যুদ্ধ অশ্বদের রক্ষা করেন।...হে পূষন্ আমাদের গোরাজির পশ্চাদ্‌ধাবন কর। যা নষ্ট হ'য়েছিল তা যেন তিনি আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনেন।" এমনকি সরস্বতীও পণিহন্ত্রী হন। আর মধুচ্ছন্দার সূক্তে (১-১১-৫) আমরা এই চমকপ্রদ চিত্র পাই, "হে বজ্রাধিপতি, তুমি বলের অধিকৃত গাভীদের বিবর উন্মুক্ত করেছিলে; নির্ভয়ে দেবতারা তোমার মধ্যে প্রবেশ করলেন দ্রুতবেগে (অথবা তাদের শক্তি প্রয়োগ ক'রে)"।

এই সব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কি কোন নির্দিষ্ট অর্থ আছে আর এগুলিকে একত্র করলে কি কোন একটি সুসংলগ্ন ভাবনা পাওয়া যাবে, না ঋষিরা তাদের হারানো গরুর জন্য অন্বেষণ ও যুদ্ধের কাজে ইচ্ছামতো এখন এই দেবতার, অন্য সময়ে অন্য দেবতার সাহায্য প্রার্থনা করেন? যদি আমরা বেদের বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথকভাবে নিয়ে নিজেদের বিভ্রান্ত না করে বেদের ভাবনাগুলিকে সমগ্রভাবে নিতে সম্মত হই তাহ'লে আমরা এমন একটি উত্তর পাব যা সরল ও পর্যাপ্ত। হারানো গো-যূথের এই বিষয়টি কতকগুলি প্রতীক্ ও চিত্রের সমগ্র রীতির একটি অংশ মাত্র। তাদের পুনরুদ্ধার করা হয় যজ্ঞের দ্বারা আর জ্বলন্ত দেবতা অগ্নি হ'ল যজ্ঞের শিখা, শক্তি ও পুরোহিত; পুনরুদ্ধার হয় বাক্-এর দ্বারা, বৃহস্পতি হ'লেন বাক্-এর পিতা, মরুৎগণ ইহার গায়কবৃন্দ অথবা ব্রহ্মগণ, "ব্রহ্মাণো মরুতঃ", আর সরস্বতী ইহার আন্তর প্রেরণা; এই উদ্ধারের কাজ করেন মদিরা আর সোম হ'ল মদিরার দেবতা আর অশ্বীরা ইহাকে অন্বেষণ করে,

লাভ করে, দান করে ও পান করে। গোযূথ হল জ্যোতির পুঞ্জ আর জ্যোতি আসে উষার দ্বারা এবং সূর্যের দ্বারা যার এক রূপ হ'ল পুষা। এই সব দেবতার প্রধান হ'লেন ইন্দ্র, আলোর অধিপতি, স্বর্ নামক জ্যোতির্ময় স্বর্গের রাজা—আমরা বলি তিনি জ্যোতির্ময় বা দিব্য মন, তাঁর মধ্যেই সকল দেবতা প্রবেশ করেন এবং প্রচ্ছন্ন আলোক অনাবৃত করার কাজে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে বিভিন্ন দেবতাকে একই জয়ের গৌরব দেওয়া হ'য়েছে এবং মধুচ্ছন্দা যে বলেছেন বলের বিরুদ্ধে আঘাত হানার জন্য সকল দেবতা ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করেন তা সম্পূর্ণ ন্যায়সম্মত। খেয়ালখুসিমতো বা বিভ্রান্ত এলোমেলো ভাবনার জন্য কিছু করা হয়নি। সুসংলগ্নতা ও ঐক্য বিষয়ে বেদ নিখুঁৎ ও অপরূপ।

উপরন্তু জ্যোতির জয় বৈদিকযজ্ঞের মহৎ কর্মের একটি অংশ মাত্র। ইহার দ্বারা দেবগণের সেই সকল বরই ("বিশ্বা বারা") জয় করতে হয় যা অমৃতত্ব জয়ের জন্য প্রয়োজনীয়, আর গূঢ় দীপ্তিসমূহের আবির্ভাব শুধু এইরকম একটি বর। জ্যোতি বা গোর মতো, শক্তি বা অশ্বও প্রয়োজনীয়। শুধু যে বলের কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার কৃপণ মুষ্টি থেকে আলোক জয় করে আনতে হবে তা নয়, বৃত্রকেও নিধন ক'রে জলরাশি মুক্ত করা প্রয়োজনীয়। গোযূথের আবির্ভাবের অর্থ উষা ও সূর্যের আবির্ভাব; আবার যজ্ঞ, অগ্নি ও মদিরা বিনা ইহা অসম্পূর্ণ। এই সব বিষয়ই একই কর্মের বিভিন্ন অংশ, তবে কখন কখন ইহাদের পৃথকভাবে বলা হ'য়েছে, কখন কখন কতকগুলির কথা একসাথে বলা হ'য়েছে, আবার কখন সবগুলিকে একত্র ক'রে বলা হ'য়েছে যেন একটিমাত্র ক্রিয়া, এক মহান্ সমগ্র জয় হিসাবে। এই সব লাভ করার অর্থ বৃহৎ সত্যের প্রকাশ এবং স্বর্-বিজয়; স্বর্‌কে অর্থাৎ জ্যোতির্ময় জগৎকে প্রায়ই বলা হয় বিস্তৃত অপর লোক, "উরুম্ উ লোকম্" অথবা শুধু "উ লোকম্"। ঋগ্বেদের বিভিন্ন অংশে এইসব প্রতীকের পৃথক উক্তির কথা বুঝতে হ'লে প্রথমে আমাদের এই ঐক্য উপলব্ধি করা চাই। "যে ৬-৭৩ সূক্তের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাতে তিনটি শ্লোকের একটি সংক্ষিপ্ত সূক্তে এই সব প্রতীক্‌গুলিকে একত্র তাদের ঐক্যে বলা হ'য়েছে; একরকম বলা যেতে পারে যে ইহা যেন বেদের একটি স্মৃতিসহায়ক শ্লোক যাতে ইহার অর্থ ও প্রতীক্‌তন্ত্রের ঐক্যটি মনে রাখার সুবিধা হয়।" যিনি অদ্রিভেদক, প্রথমজাত, সত্যবান্ সেই বৃহস্পতি, আঙ্গিরস, আহুতিদাতা, দুই জগতের ব্যাপ্তিকারী, (সূর্যের)

উত্তাপ ও আলোকের অধিবাসী, আমাদের পিতা, বৃষভের মতো উচ্চৈঃস্বরে গর্জন করেন রোদসীর প্রতি। যে বৃহস্পতি সমুদ্রযাত্রী মানবের জন্য ঐ অন্য লোক নির্মাণ করেন দেবতাদের আবাহনে, তিনি বৃত্রশক্তিদের নিধন ক'রে সকল পুরী বিদীর্ণ করেন যুদ্ধে সকল শত্রুকে পরাজিত ক'রে ও অমিত্রদের অভিভূত করে। তার জন্য বৃহস্পতি জয় করেন বিবিধ ধন, এই দেব জয় করেন গো-পূর্ণ মহৎ ব্রজসমূহ, তাঁর উদ্দেশ্য অভেদ্য স্বর্লোক জয়; বৃহস্পতি শত্রুকে নিধন করেন দীপ্তির স্তুতির দ্বারা ("অর্কৈঃ")।" এই বহুধা প্রতীক্তন্ত্রের ঐক্য আমরা অচিরেই দেখতে পাই।

অন্য একটি অংশে যার ভাষা আরো রহস্যময় উষার এবং সূর্যালোকের পুনরুদ্ধারের বা নবজন্মের ভাবনা বলা হ'য়েছে যদিও ইহাদের কথা বৃহস্পতির উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত সূক্তে প্রকাশ্যভাবে বলা হয়নি। এটি আছে সোমের স্তুতিতে যার প্রথম কথাগুলি আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে (৬-৪৪-২২); এই দেব শক্তির দ্বারা জাত হ'য়ে ইন্দ্রের সহযোগে পণিকে প্রতিহত করলেন; তিনিই তাঁর অশুভ পিতার (বিভক্ত সত্তার) কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন যুদ্ধের সব আয়ুধ এবং জ্ঞানের সকল রূপ ("মায়াঃ"), তিনিই উষাদের মহিমময়ী করলেন তাঁদের অধিপতিতে, তিনিই সূর্যের মধ্যে অন্তর্জ্যোতি সৃষ্টি করলেন, তিনিই স্বর্গে ইহার উজ্জ্বল অঞ্চলসমূহে (অমৃতত্বের) ত্রিতত্ত্ব লাভ করলেন এবং ত্রিখণ্ডিত জগতে পেলেন নিগূহিত অমৃতত্ব (ইহাই অগ্নির উদ্দেশে আত্রেয়সূক্তে উল্লিখিত পৃথক পৃথক অংশে অমৃত দান, ইহাই তিনটি স্তরে "ত্রিষু সানুষু", দেহ, প্রাণ ও মনে ত্রিবিধ সোম নিবেদন); তিনিই প্রশস্তভাবে দ্যৌ ও পৃথিবীকে ধারণ করলেন, তিনিই সপ্ত রশ্মি দিয়ে রথ নির্মাণ করেছিলেন; তিনিই ধারণ করেছিলেন গোরাজির মধ্যে পক্ উৎপন্ন দ্রব্য ('মধু'র বা 'ঘৃতে'র), এমনকি দশ গতিবৃত্তির উৎস" (৬-৪৪-২২, ২৩, ২৪)। আমার কাছে আশ্চর্য লাগে যে অত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন আগ্রহী পণ্ডিতরা এই সব সূক্ত পাঠ করে এটা উপলব্ধি করতে পারেন নি যে এই সব প্রতীক্বাদী ও রহস্যবাদীদের পবিত্র গীতি, ইহারা প্রকৃতি পূজারী অসভ্যের অথবা সুসভ্য ও বৈদান্তিক দ্রাবিড়বাসীদের সহিত যুদ্ধরত অশিষ্ট আর্য আক্রমণকারীদের কবিতা নয়।

এখন আমরা আর কতকগুলি অংশ দ্রুত আলোচনা করব যাতে এই সব প্রতীকের কথা আরো বিক্ষিপ্তভাবে বলা হ'য়েছে। প্রথমতঃ, আমরা এই গুহা-ব্রজের চিত্রে, অদ্রিতে ও অন্যত্র দেখি যে গো ও অশ্বের

কথা একত্র রয়েছে। আমরা দেখেছি যে পূষাকে ডাকা হ'চ্ছে গাভীদের অন্বেষণ করতে ও অশ্বদের রক্ষা করতে। আশ্চর্য যে আর্যদের ধনসম্পদের এই দুটি বিষয় সর্বদাই রয়েছে লুণ্ঠনকারীদের কবলে! কিন্তু দেখা যাক্। "হে শূর (ইন্দ্র), সোমের উল্লাসে তুমি পুরীর মতো ভেঙে ফেলেছিলে গো ও অশ্বের ব্রজ" (৮-৩২-৫)। "আমাদের জন্য মুক্ত কর সহস্র সহস্র গো ও অশ্ব" (৮-৩৪-১৪)। "হে ইন্দ্র, যা তুমি ধারণ কর, গো ও অশ্ব ও অব্যয় উপভোগ তা তুমি দৃঢ় কর যজমানে, পণিতে নয়; যে সুপ্ত থাকে, ব্রতসাধন করে না, দেবগণের অন্বেষণ করে না সে ধ্বংস হ'ক নিজের সংবেগের দ্বারা; তারপর (আমাদের মধ্যে) দৃঢ় কর সেই ধন যা বৃদ্ধি পেতে বাধ্য" (৮-৯৭-২, ৩)। আর একটি সূক্তে বলা হয়েছে যে পণিরা গোধন ও অশ্বধন আটক রাখে। সর্বদাই তারা এমন সব শক্তি যারা এই কাম্য ধন পায় কিন্তু তা ব্যবহার করে না, তারা বরং ভালবাসে ঘুমিয়ে থাকতে, দিব্য কর্ম ("ব্রত") সাধন না করতে, আর এই সব শক্তিকে হয় ধ্বংস না হয় জয় করতে হবে তবে যদি সেই ধন যজমানের অধিকারভুক্ত হয় দৃঢ়ভাবে। এবং সর্বদাই গো এবং অশ্ব এমন এক লুকানো ও আবদ্ধ ধনের প্রতীক্ যাকে অনাবৃত ও মুক্ত করা চাই কোন দিব্যশক্তির দ্বারা।

আবার ভাস্বর গোযূথ জয়ের সহিত সর্বদা থাকে উষা ও সূর্যের জয় বা জন্ম বা দীপ্তির কথা কিন্তু এই বিষয়টির তাৎপর্য আমরা অপর এক অধ্যায়ে বিবেচনা করব। আবার গোযূথ, উষা ও সূর্যের সহিত জড়িত থাকে জলরাশি; কারণ জলরাশির মুক্তির সহিত বৃত্রহনন এবং গোযূথের মুক্তির সহিত বলের পরাজয়—এই দুইটি কাহিনী একত্র জড়িত, ইহারা বিচ্ছিন্ন নয়। এমন কি কিছু অংশে যেমন ১-৩২-৪ শ্লোকে, বলা হ'য়েছে যে বৃত্র হনন হ'ল সূর্য, উষা ও দ্যৌর জন্মের ঠিক পূর্বেকার ঘটনা আর অন্য অংশে বলা হয় যে জলরাশির প্রবাহের পূর্বে অদ্রি উন্মুক্ত হয়। এই সাধারণ সংযোগের জন্য আমরা নিম্নের অংশটির উল্লেখ করতে পারি (৭-৯০-৪), "উষারা প্রকট হ'ল তাদের দীপ্তিতে সুষ্ঠু হ'য়ে ও অক্ষত থেকে; এই বিশাল জ্যোতি তাঁরা (আঙ্গিরসরা) পেয়েছিলেন ধ্যান করে; যারা কামনা করে তারা গাভীদের ব্যাপ্তি উন্মুক্ত করল এবং তাদের জন্য জলরাশি প্রবাহিত হ'ল স্বর্গ থেকে;" ১-৭২-৮ শ্লোকে, "সত্য মন্ত্রের দ্বারা স্বর্গের সপ্ত বীর (সপ্ত নদী) সত্য জেনেছিলেন এবং জেনেছিলেন আনন্দের দুয়ার সমূহ। সরমা সন্ধান পেয়েছিল গাভীদের দৃঢ় ব্যাপ্তি আর

তার দ্বারা মানুষ উপভোগ করে", ১-১০০-১৮ শ্লোকে ইন্দ্র ও মরুৎদের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে, "তিনি তাঁর জ্যোতির্ময় সখাদের সাথে জয় করেছিলেন ক্ষেত্র, জয় করেছিলেন সূর্য, জয় করেছিলেন জলরাশি;" ৫-১৪-৪ শ্লোকে অগ্নি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে, "অগ্নি জাত হ'য়ে দীপ্ত ও প্রকাশিত হ'লেন দস্যুদের হনন ক'রে, জ্যোতির দ্বারা অন্ধকার নাশ ক'রে; তিনি পেলেন গো, জলরাশি ও স্বর্;" ৬-৬০-২ শ্লোকে, ইন্দ্র ও অগ্নি সম্বন্ধে আছে, "তোমরা উভয়ে যুদ্ধ করেছিলে গো, জলরাশি, স্বর্ ও উষাদের জন্য যাদের হরণ করা হ'য়েছিল জোর করে। হে ইন্দ্র, হে অগ্নি তোমরা (আমাদের সহিত) যুক্ত করেছিলে সকল দিক্, স্বর, ভাস্বর উষাসমূহ জলরাশি ও গোরাজি;" ১-৩২-২ শ্লোকে ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে, "হে বীর, তুমি জয় করেছিলে গো, তুমি জয় করেছিলে সোম; তুমি সপ্ত নদীর প্রবাহ মুক্ত করেছিলে।"

শেষ অংশটিতে আমরা দেখি যে ইন্দ্রের সব জয়-করা বিষয়ের মধ্যে গোরাজির সহিত সোমও যুক্ত রয়েছে। সাধারণতঃ সোম হ'ল সেই মত্ততা যার বলে ইন্দ্র গোরাজি জয় করেন; যেমন ৩-৪৩-৭ শ্লোকে, বলা হ'য়েছে সোম, "যার মত্ততায় তুমি গো-ব্রজ উন্মুক্ত করেছিলে;" ২-১৫-৮ শ্লোকে আছে, "অঙ্গিরাদের দ্বারা স্তুত হ'য়ে তিনি বলকে বিদীর্ণ করলেন, পর্বতের দৃঢ় স্থানগুলি পৃথক করে নিক্ষিপ্ত করলেন, কৃত্রিম অববোধসমূহ বিচ্ছিন্ন করলেন; ইন্দ্র এই সব করেছিলেন সোমের মত্ততায়।" কখন কখন আবার বিপরীত পদ্ধতির কথাও বলা হ'য়েছে; জ্যোতিই সোমরসের আনন্দ আনে অথবা তারা একত্র আসে, যেমন ১-৬২-৫ শ্লোকে পাই, "অঙ্গিরাদের দ্বারা স্তুত হ'য়ে, হে কর্মসাধক, তুমি উষাদের উন্মুক্ত করেছিলে সূর্যের সহিত (বা দ্বারা) এবং সোমকে গোরাজির সহিত (বা দ্বারা)"।

সোমের মত অগ্নিও যজ্ঞের এক অপরিহার্য অঙ্গ এবং সেজন্য আমরা দেখি যে ঐসবের সহিত অগ্নিরও উল্লেখ আছে, যেমন ৭-৯৯-৪ শ্লোকে: "যজ্ঞের জন্য (তার লক্ষ্য হিসাবে) তোমরা তৈরী করেছিলে ঐ বিশাল অপর লোক আর সৃষ্টি করেছিলে সূর্যকে, উষাকে ও অগ্নিকে," আর সেই কথাই আমরা পাই ৩-৩১-১৫ শ্লোকে যাতে যুক্ত হ'য়েছে যাত্রার পথের কথা, আর ৭-৪৪-৩ শ্লোকে সেই কথা, তবে তাতে গোর কথাও আছে।

এই সব উদাহরণ থেকে দেখা যাবে যে বেদের বিভিন্ন প্রতীক্ ও উপাখ্যানগুলি পরস্পরের সহিত কত নিবিড়ভাবে জড়িত; সুতরাং যদি আমরা

আঙ্গিরস ও পণিদের উপাখ্যানটিকে একটি বিচ্ছিন্ন গল্পকথা মনে ক'রে ইচ্ছামতো ইহার অর্থ করি, বেদের সাধারণ ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে ইহার উল্লেখের কথা মনোযোগ দিয়ে না দেখি, যে রূপকচিত্রের ভাষায় উপাখ্যান-টির বর্ণনা দেওয়া হয় তার উপর বেদের সাধারণ ভাবনা যে আলোকপাত করে তাতে উদাসীন থাকি, তাহ'লে ব্যাখ্যার প্রকৃত পথ আমরা পাব না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

হারানো সূর্য ও হারানো গোরাজি

ঋগ্বেদের সূক্তগুলিতে সূর্য ও উষার জয় বা পুনরুদ্ধারের কথাটি প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। কখন কখন ইহাকে বলা হয় সূর্যের সন্ধান, কখন কখন বলা হয় স্বর্-এর, সূর্যলোকের সন্ধান বা জয়। বস্তুতঃ সায়ণ 'স্বর্' পদটিকে সূর্যের সমার্থক করেছেন; কিন্তু বহু শ্লোক থেকেই ইহা সুস্পষ্ট যে স্বর্ হ'ল সাধারণ স্বর্গ ও পৃথিবীর উপরে এক পরম জগৎ বা পরম স্বর্গের নাম। কখন কখন অবশ্য ইহা সূর্য এবং তার দীপ্তির দ্বারা গঠিত জগৎ---এই উভয়ের বিশিষ্ট সৌর আলোকের অর্থে ব্যবহার করা হয়। আমরা দেখেছি যে, যে জলরাশি পরম স্বর্গ থেকে নেমে আসে অথবা ইন্দ্র এবং তাঁর সাহায্যপ্রাপ্ত মর্ত্যজন তা জয় করেন বা ভোগ করেন তাকে "স্বর্বতীঃ অপ্‌ঃ" ব'লে বর্ণনা করা হ'য়েছে। সায়ণ "আপঃ" কথাটির অর্থ করেছেন ভৌতিক জলরাশি এবং সেজন্য তাঁকে বাধ্য হ'য়ে "স্বর্বতী"র জন্য অন্য অর্থ করতে হ'য়েছে, তিনি বলেন যে ইহার অর্থ "সরণবতীঃ", প্রবহমাণ। কিন্তু স্পষ্টতঃই এই অর্থ কষ্টকল্পিত কথাটি থেকে এই অর্থ আসে না, আর এই অর্থ করাও যায় না। ইন্দ্রের বজ্রকে বলা হয় স্বর্গের প্রস্তর, "স্বর্য্যম্ অশ্মানম্"; অর্থাৎ ইহার আলোক সৌর দীপ্তিসমূহের জগৎ থেকে আসা আলোক। ইন্দ্র স্বয়ং "স্বর্পতি", স্বরের, দীপ্তজগতের অধিপতি।

উপরন্তু আমরা যেমন দেখি যে গোরাজির সন্ধান ও পুনরুদ্ধারের কথাটি সাধারণতঃ ইন্দ্রের কাজ বলে বলা হয় যা তিনি করেন প্রায়ই আঙ্গিরস ঋষিদের সাহায্যে এবং মন্ত্র ও যজ্ঞের, অগ্নি ও সোমের মাধ্যমে, তেমন সূর্যের সন্ধান ও পুনরুদ্ধারের বিষয়টির জন্য উহারাই যে এই কর্মের সাধক তা বলা হয়। তাছাড়া, এই দুইটি কার্যের কথা বরাবর একই সাথে বলা হয়। আমার মনে হয় যে বেদেই যথেষ্ট প্রমাণ আছে যে এই সব বিষয়গুলি সত্যই একটিমাত্র মহৎ কর্ম আর এ দুটি তারই অংশ। গোরাজি হ'ল সূর্য বা উষার প্রচ্ছন্ন রশ্মি; অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধারের ফল হ'ল অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সূর্যের অভ্যুদয় অথবা প্রথমটি দ্বিতীয়টির

চিহ্ন মাত্র; ইহা আবার স্বর্-জয়ের, জ্যোতির পরম লোকের জয়ের অবস্থা যা সর্বদাই আসে যজ্ঞ ও ইহার সব অনুষঙ্গ ও সাহায্যকারী দেবতাদের মাধ্যমে। আমার মনে হয় বেদের ভাষা থেকেই এই সব কথা নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়; কিন্তু আবার ঐ ভাষা থেকেই বোঝা যায় যে এই সূর্য হ'ল দিব্য দীপ্তিকারী শক্তির প্রতীক্, স্বর, দিব্যসত্যের লোক এবং দিব্যসত্যের জয়সাধনই বৈদিক ঋষিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সূক্তের বিষয়। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে প্রমাণগুলি আমি এখন যথাসম্ভব দ্রুত পরীক্ষা করব।

প্রথমতঃ, বৈদিক ঋষিদের মনে স্বর্, ও সূর্য বিভিন্ন ভাবনা কিন্তু ইহারা সর্বদাই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোম ও ইন্দ্রের প্রতি ভরদ্বাজের সূক্তে এই শ্লোক পাই (৬-৭২-১)—"তোমরা সূর্যকে পেয়েছ, তোমরা স্বরকে পেয়েছ, তোমরা সকল অন্ধকার ও সংকীর্ণতা নাশ করেছ", আর ইন্দ্রের প্রতি বামদেবের সূক্তে (৪-১৬-৪) আমরা ইন্দ্র এবং আঙ্গিরসদের মহৎ কর্মের প্রশংসায় পাই, "যখন দীপ্তির স্তুতির দ্বারা ("অর্কৈঃ") স্বর্ পাওয়া গেল ও তা সম্পূর্ণ দেখা গেল, যখন তাঁরা (আঙ্গিরসরা) রাত্রির মধ্য থেকে মহাজ্যোতি দীপ্ত করালেন, তখন তিনি (ইন্দ্র) সকল অন্ধকারের নিশ্চয়তা হ্রাস করলেন (অর্থাৎ তাদের দৃঢ় আয়ত্ত শিথিল করলেন) যাতে মানুষরা দৃষ্টি পেতে পারে।"প্রথম শ্লোকটিতে আমরা দেখি যে স্বর্ ও সূর্য বিভিন্ন এবং স্বর্ শুধু সূর্যের অপর নাম নয়; কিন্তু সেই সাথে স্বর-প্রাপ্তি ও সূর্য-প্রাপ্তিকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বলে দেখান হ'য়েছে এবং বস্তুতঃ ইহারা একই গতিবৃত্তি যার ফল হ'ল সকল অন্ধকার ও সংকীর্ণতার নাশ। সেইরূপ, দ্বিতীয় শ্লোকটিতে স্বর্কে পাওয়ার ও তাকে দৃষ্টিগোচর করানর সহিত বলা হ'য়েছে অন্ধকারের মধ্য থেকে মহাজ্যোতির স্ফুরণ; আর অনুরূপ অংশ থেকে আমরা পাই যে ইহা আঙ্গিরসগণের দ্বারা অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন সূর্যের পুনরুদ্ধারের কথা। আঙ্গিরসগণ সূর্যকে পেয়েছিলেন তাঁদের স্তুতির শক্তির দ্বারা অর্থাৎ সত্য "মন্ত্রে"র দ্বারা; স্বর্কেও আঙ্গিরসগণ পান ও দৃষ্টিগোচর করান স্তুতির দ্বারা, "অর্কৈঃ"। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে স্বর্-এর পদার্থ হ'ল এক মহান্ আলোক আর ঐ আলোক হ'ল সূর্যের আলোক।

আমরা এমন কি মনে করতে পারতাম যে স্বর্ সূর্যের আলোর বা আকাশের একটি প্রতিশব্দ কিন্তু অন্যান্য শ্লোক থেকে ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্বর্ একটি লোকের নাম। ইহার সম্বন্ধে প্রায়ই বলা হয় যে ইহা

"রোদসীর" অতীত, দ্যৌ ও পৃথ্বীর অতীত এক লোক আর অন্যভাবে বলা হয় ইহা এক প্রশস্ত লোক, "উরু লোক" অথবা প্রশস্ত অপর লোক, "উরু উ লোক" অথবা শুধু বলা হয় অপর লোক "উ লোক"। ইহার সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয় যে ইহা এক বিশাল জ্যোতির লোক, এক ব্যাপ্ত অভয়ের লোক যেখানে গোরাজি, সূর্যের রশ্মিসমূহ বিচরণ করে অবাধে আনন্দের সহিত। এইরূপ ৬-৪৭-৮ শ্লোকে, আমরা পাই, "তুমি তোমার জ্ঞানে আমাদের নিয়ে যাও উপরে প্রশস্ত লোকে, এমনকি স্বর্-এ, জ্যোতিতে যা অভয় ও স্বস্তিতে পূর্ণ, "স্বর্ জ্যোতির্ অভয়ং স্বস্তি।" ৩-২-৭ শ্লোকে অগ্নিবৈশ্বানর সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি পৃথ্বী, দ্যৌ ও মহৎ স্বর্ পূর্ণ করেন, "আ রোদসী অপৃণদ্ আ স্বর্ মহৎ"; সেইরূপ আবার বসিষ্ঠ বিষ্ণুর প্রতি একটি সূক্তে (৭-৯৯-৩, ৪) বলেন, "হে বিষ্ণু, তুমি দৃঢ়ভাবে এই পৃথ্বী ও স্বর্গ ধারণ করেছিলে, এবং পৃথিবীকে চারিদিকে ঊর্ধ্বে ধারণ করেছিলে (সূর্যের) রশ্মির দ্বারা। তোমরা দুজনে যজ্ঞের জন্য (অর্থাৎ ইহার ফলস্বরূপ) সৃষ্টি করেছিলে প্রশস্ত অপর লোক, ("উরুম্ উ লোকম্") এবং তার সহিত জন্ম নেয় সূর্য, ঊষা ও অগ্নি"; এখানেও আমরা আবার দেখি যে স্বর্ ও প্রশস্ত লোকের সহিত সূর্য ও ঊষার জন্ম বা আবির্ভাবের কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইহাকে বলা হয় যজ্ঞের ফলশ্রুতি, আমাদের তীর্থ-যাত্রার সমাপ্তি, বৃহৎ আবাস যাতে আমরা উপনীত হই, সেই অপর লোক যা তাঁরাই লাভ করেন যাঁরা যজ্ঞের কাজ করেন সুষ্ঠুভাবে, "সুকৃতাম্ উ লোকম্"। অগ্নি গমন করেন পৃথ্বী ও দ্যৌ-এর দূত হিসাবে এবং তারপর তাঁর সত্তা দিয়ে ব্যাপ্ত করেন এই বিশাল আবাস, "ক্ষয়ং বৃহন্তং পরি ভূষতি" (৩-৩-২)। ইহা আনন্দের লোক, সকল সম্পদের পূর্ণতার লোক এবং ইহার জন্যই বৈদিক ঋষিদের আস্পৃহা: "হে অগ্নি জাতবেদা, যিনি সকল কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন ব'লে তুমি তাঁর জন্য আনন্দের ঐ অপর লোক সংকল্প কর, আর তিনি লাভ করেন সেই আনন্দ যা অশ্ব, পুত্র, বীর, ও গো সকলে পূর্ণ, এবং যা পূর্ণ স্বস্তির অবস্থা" (৫-৪-১১)। আর এই আনন্দ পাওয়া যায় জ্যোতির দ্বারা; সূর্য ও ঊষা ও দিবসসমূহের জন্ম ঘটিয়ে আঙ্গিরসরা তা পান অভীপ্সু মানবজাতির জন্য, "যে ইন্দ্র স্বর্ জয় করেন, দিবসসমূহের জন্ম ঘটান তিনি অভীপ্সুদের দ্বারা ("উশিগ্ভিঃ" —এই পদটি 'নৃ'র মতো মানুষ ও দেবতার অর্থেও প্রয়োগ করা হয় কিন্তু 'নৃ'র মতো বিশেষ করে ইহা আঙ্গিরসদেরই বোঝায়) আক্রান্ত সৈন্যদলকে

জয় করেছেন এবং মানবের জন্য দীপ্ত করেছেন দিবসসমূহের দৃষ্টি ("কেতুম্ অহ্নাম্") এবং জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বৃহৎ আনন্দের জন্য" "অবিন্দজ্ জ্যোতির্ বৃহতে রণায়" (৩-৩৪-৪)।

এই সব অংশগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে ইহাদের এমন এক ব্যাখ্যা সম্ভব যাতে বলা যেতে পারে যে ইহা একপ্রকার আদিম আমেরিকাবাসীদের ভাবনা যাতে মনে করা হয় যে এই আকাশ ও পৃথিবীর উজানে অন্য এক ভৌতিক জগৎ আছে যা সূর্যের রশ্মিসমূহের দ্বারা তৈরী এক বিশাল লোক আর যাতে মানুষ ভয় ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়, তার সকল কামনার তৃপ্তিসাধন হয় আর সে অসংখ্য ঘোড়া, গরু, পুত্র ও অনুচরের অধিকারী হয়। কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে চাই যে ইহা তা নয়, বরং ইহা বিশাল লোক, "বৃহদ্ দ্যৌ" বা স্বর্ যা আমাদের পেতে হবে স্বর্গ ও পৃথিবী ছাড়িয়ে, —আর এই কথাই বারবার বলা হ'য়েছে, যেমন ১-৩৬-৮ শ্লোকে, "মানুষরা বৃত্রকে নিধন করে পৃথিবী ও দ্যৌ ছাড়িয়ে পার হ'য়ে গেছে এবং বিশাল লোককে তাদের বাসস্থান করেছে," "ঘ্নন্তো বৃত্রম্ অতরন্ রোদসী অপ উরু ক্ষয়ায় চক্রিরে"—এই স্বর্গের উর্ধ্বস্থ ব্যাপ্তি, এই সীমাহীন আলোক ইহা এক অতিমানসিক স্বর্গ, অতিমানসিক সত্যের ও অমৃতময় আনন্দের স্বর্গ আর যে আলোক ইহার সার পদার্থ ও উপাদান তা সত্যের আলোক। কিন্তু বর্তমানে এই কথাটিই সুস্পষ্ট করলেই চলবে যে ইহা এমন এক স্বর্গ যা কোন অন্ধকারের দ্বারা আমাদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন, আর তা পেতে হবে ও দৃষ্টিগোচর করাতে হবে আর এই দেখা ও পাওয়া নির্ভর করে উষার জন্মের উপর, সূর্যের উদয়ের উপর, গোপন গুহা থেকে সৌর গোযূথের উৎক্রমণের উপর। এই যত্নে যে পুরুষরা সফল হন তাঁরা "স্বদৃশ্", "স্ববিদ্" অর্থাৎ স্বরের দ্রষ্টা এবং স্বরের প্রাপক বা ইহার জ্ঞাতা; কারণ "বিদ্" ধাতুর অর্থ সন্ধান পাওয়া বা লাভ করাও হয় আবার জানাও হয় এবং একটি দুইটি শ্লোকে, ইহার পরিবর্তে 'জ্ঞা' ধাতু ব্যবহৃত হয় আর এই ধাতুটি অত দ্ব্যর্থবাচক নয় আর বেদে এমন কথাও বলা হয়েছে যে অন্ধকারের মধ্য থেকে আলোককে জানা হ'য়েছে। তাছাড়া, স্বর্ বা প্রশস্ত লোকের প্রকৃতির প্রশ্নটিও বেদব্যাখ্যার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইহারই উপর নির্ভর করে যে বেদ অসভ্যদের স্তুতিগীতি, না প্রাচীন জ্ঞানের গ্রন্থ, প্রকৃত "বেদ"। প্রশস্ত লোকের কথা আছে এমন শতাধিক শ্লোকের আলোচনা করা হ'লেই এই প্রশ্নটির সম্পূর্ণ সম্যক্ উত্তর সম্ভব কিন্তু এরূপ আলোচনা এই সব

অধ্যায়ের পরিধির সম্পূর্ণ বহির্ভূত হবে। তবে আঙ্গিরস সূক্তগুলির আলোচনার সময় এবং ইহার পরেও আমরা এই প্রশ্নটি আবার বিবেচনা করব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে স্বর্ দেখার বা পাওয়ার জন্য একান্তই প্রয়োজনীয় হ'ল সূর্যের ও উষার জন্ম, আর এই কারণেই বেদে এই উপাখ্যানটির বা চিত্রটির উপর এবং সত্য স্তুতির দ্বারা, "সত্য মন্ত্রে"র দ্বারা অন্ধকার থেকে আলোর দীপ্তি, প্রাপ্তি বা জন্মের ভাবনার উপর এত অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই কার্য সাধন করেন ইন্দ্র ও আঙ্গিরস ঋষিগণ এবং অনেক শ্লোকেই ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বলা হ'য়েছে যে ইন্দ্র ও আঙ্গিরসগণ স্বর্ বা সূর্য পেয়েছেন, "অবিদৎ", ইহাকে দীপ্ত বা উজ্জ্বল করেছেন, "অরোচয়ৎ", ইহাকে জন্ম দিয়েছেন, "অজনয়ৎ", (আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে যজ্ঞে দেবতাদের প্রকাশকে বেদে সর্বদাই বর্ণনা করা হ'য়েছে তাদের জন্ম বলে); আর তাঁরা ইহা জয় ও অধিকার করেছেন, "সনৎ"। অবশ্য প্রায়ই শুধু ইন্দ্রের কথাই বলা হয়। তিনিই রাত্রি থেকে আলো তৈরী করেন, এবং সূর্যের জন্ম দেন, "ক্ষপাং বস্তা জনিতা সূর্যস্য" (৩-৪৯-৪), তিনিই সূর্য ও উষার জন্ম দিয়েছেন (২-১২-৭) অথবা আরো পূর্ণভাবে বলা হ'য়েছে যে তিনিই সূর্য, দ্যৌ ও উষাকে একত্র জন্ম দিয়েছেন, (৬-৩০-৫)। তাঁর কিরণ দিয়ে তিনি উষাকে দীপ্ত করেন, তাঁরই কিরণ দিয়ে তিনি সূর্যকে ভাস্বর করে প্রকাশিত করেন, "হর্যন্ উষসম্ অর্চয়ঃ সূর্যং হর্যন্ অরোচয়ঃ" (৩-৪৪-২)। এইসবই তাঁর মহৎ কর্ম, "জজান সূর্যম্ উষসং সুদন্সাঃ (৩-৩২-৮), তিনিই তার ভাস্বর সখাদের সহিত ক্ষেত্র জয় করে অধিকারে আনেন, (ইহাই কি সেই ক্ষেত্র নয় যেখানে অত্রি ভাস্বর গোযূথ দেখেছিলেন) তিনিই জয় করেন সূর্য, জয় করেন জলরাশি, "সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ সনৎ সূর্যং সনদ্ অপঃ সুবজ্রঃ" (১-১০০-১৮) আমরা দেখেছি যে তিনিই আবার দিবসের জন্ম দিয়ে স্বর্ জয় করেন, "স্বর্ষা" এই অংশগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হ'লে আমরা মনে করতে পারি যে সূর্যের জন্মের অর্থ দেবতাদের দ্বারা সূর্যের আদি সৃষ্টি; কিন্তু এই অংশগুলি ও অন্যান্য অংশগুলি একত্র বিবেচনা করলে সে অর্থ খাটে না। এই জন্ম হ'ল উষার সহযোগে তার জন্ম, রাত্রির মধ্য থেকে তার জন্ম। যজ্ঞের দ্বারাই এই জন্ম ঘটে,—"ইন্দ্রঃ সুযজ্ঞা উষসঃ স্বর্ জনৎ" (২-২১-৪), "ইন্দ্র সুষ্ঠুভাবে যজ্ঞসাধন করে উষাদের ও স্বরকে জন্ম দিলেন"; আর তা করা হয় মানুষের সাহায্যে,—"অস্মাকেভির্ নৃভিঃ

সূর্যং সনৎ", আমাদের "মানুষদের" সাহায্যে তিনি সূর্য জয় করেন (১-১০০-৬); আর অনেক সূক্তে ইহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা আঙ্গিরসদের কর্মের ফল এবং ইহার সহিত জড়িত থাকে গোরাজির মুক্তিসাধন অথবা অদ্রিভেদ।

আমরা হয়ত মনে করতে পারতাম যে সূর্যের জন্ম বা প্রাপ্তির অর্থ শুধু এমন এক বর্ণনা যাতে বলা হয়েছে যে প্রতিদিন উষাকালে আকাশ (ইন্দ্র) সূর্যকে ফিরে পায়, কিন্তু উপরে উল্লিখিত বিষয় ও অন্যান্য সব বিষয়ের জন্য আমাদের সে অর্থ করা সম্ভব নয়। যখন তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে তিনি অন্ধ তমসাতেও জ্যোতি লাভ করেন, "সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতির্ বিদৎ (১-১০০-৮), তখন ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইহাতে সেই জ্যোতিরই কথা বলা হ'চ্ছে যা অগ্নি ও সোম পেয়েছিলেন, সেই একই জ্যোতি এই সকল জীবের জন্য, "অবিন্দতং জ্যোতির্ একং বহুভ্যঃ" যখন তাঁরা পণিদের কাছ থেকে গোরাজি হরণ করেছিলেন (১-৯৩-৪), "সেই জাগরণশীল জ্যোতি যাকে ঋতবর্ষকরা জন্ম দিয়েছিলেন, দেবের জন্য দেব" (৮-৮৯-১), সেই গূঢ় জ্যোতি "গূঢ়ম্ জ্যোতিঃ" যা পিতৃগণ, আঙ্গিরসগণ পেয়েছিলেন যখন তাঁরা তাঁদের সত্যমন্ত্রের দ্বারা উষার জন্ম দিয়েছিলেন (৭-৭৬-৪)। ইহার কথাই বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে মনু বৈবস্বত বা কশ্যপের রহস্যময় সূক্তে (৮-২৯-১০) উল্লেখ করা হ'য়েছে, ইহাতে বলা হ'য়েছে, "তাঁদের মধ্যে জনকয়েক ঋক্ গান ক'রে মনের ভাবনায় প্রকাশ করেছিলেন মহান্সাম এবং ইহার দ্বারা তাঁরা সূর্যকে বাধ্য করলেন কিরণ দিতে।" ইহাতে একথা বলা হয়নি যে ঐ কাজ করা হ'য়েছে মানবসৃষ্টির পূর্বে কারণ ৭-৯১-১ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "যে দেবতারা আমাদের নমঃর দ্বারা বৃদ্ধি পান এবং বৃদ্ধ ও অনবদ্য ছিলেন তাঁরা (অন্ধকারের শক্তির দ্বারা) আক্রান্ত হ'য়ে মানবের জন্য সূর্যের দ্বারা উষাকে কিরণ দিতে বাধ্য করলেন।" আঙ্গিরসদের দ্বারা তাঁদের দশমাসের যজ্ঞের মাধ্যমে অন্ধকারে অবস্থিত সূর্যের সন্ধান লাভ ইহাই। এই চিত্র বা উপাখ্যানের উৎপত্তির কারণ যাই হ'ক না কেন ইহা প্রাচীন ও বহু প্রচলিত আর ইহাতে মনে করা হয় যে সূর্য দীর্ঘকাল অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল আর সে সময় মানুষও অন্ধকারের দ্বারা অভিভূত ছিল। ইহার কথা আমরা যে শুধু ভারতের আর্যদের মধ্যে পাই তা নয়, আমেরিকার ময়দের মধ্যেও এই কথা পাই, যাদের সভ্যতা মিসরীয় সংস্কৃতির আরো নিম্নস্তরের এবং

সম্ভবতঃ আরো প্রাচীন কালের; এখানেও সেই একই উপাখ্যান—সূর্য বহুমাস ধরে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন ছিল এবং তাকে পুনরুদ্ধার করা হ'য়েছে জ্ঞানীদের (আঙ্গিরস ঋষিগণের?) স্তুতি ও প্রার্থনার দ্বারা। বেদে জ্যোতির পুনরুদ্ধার প্রথম করা হ'য়েছে আঙ্গিরসদের দ্বারা, যাঁরা সপ্ত বিপ্র, প্রাচীন মানুষী পিতৃগণ আর ইহার পর তা নিরন্তর মানবের অনুভূতিতে সাধিত হ'য়েছে তাঁদের মাধ্যমে।

এই পর্যালোচনা থেকে দেখা যাবে যে ইন্দ্র ও আঙ্গিরসদের দ্বারা যজ্ঞ ও মন্ত্রের সাহায্যে হারানো সূর্যের পুনরুদ্ধারের কাহিনী এবং তাঁদেরই দ্বারা মন্ত্রেরই সাহায্যে হারানো গোরাজির পুনরুদ্ধারের কাহিনী দুইটি বিভিন্ন কাহিনী নয়, ইহারা একই কাহিনী। গো ও উষার মধ্যে সম্পর্কের বিষয় আলোচনাকালে আমরা পূর্বেই বলেছি যে এই দুই উপাখ্যান একই। গোরাজি হ'ল উষার রশ্মিমালা, সূর্যের যূথ, ইহারা পশু গরু নয়। হারানো গো-রাজি হ'ল সূর্যের হারানো রশ্মিসমূহ; তাদের পুনরুদ্ধার হ'ল হারানো সূর্যের পুনরুদ্ধারের অগ্রগামী ঘটনা। এখন স্বয়ং বেদের সুস্পষ্ট উক্তি থেকেই নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করা প্রয়োজন যে এই দুই কাহিনী একই।

কারণ বেদ খোলাখুলিই বলে যে গোরাজি হ'ল জ্যোতি আর যে খোঁয়াড়ে তারা লুক্কায়িত থাকে তা অন্ধকার। আমরা পূর্বেই ১-৯২-৪ শ্লোকের উদ্ধৃতি থেকে দেখিয়েছি যে তাতে গো ও ব্রজের রূপক অর্থ স্পষ্ট প্রকাশ করা হ'য়েছে, "উষা অন্ধকার অপাবৃত করল গরুর খোঁয়াড়ের মতো"; আমরা আরো দেখিয়েছি যে গোর পুনরুদ্ধারের চিত্রের সহিত জ্যোতি-প্রাপ্তির সম্পর্ক নিরন্তর বর্তমান, যেমন ১-৯৩-৪ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "তোমরা দুজনে পণিদের কাছ থেকে গোরাজি হরণ করেছিলে...তোমরা বহুর জন্য সেই এক জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলে", অথবা ২-২৪-৩ শ্লোকেও আছে, "এই সেই কাজ যা করতে হবে দেবতাগণের মধ্যে দেবতমের জন্য; দৃঢ় স্থানগুলি নিম্নে নিক্ষিপ্ত হ'ল, সুরক্ষিত স্থানগুলি দুর্বল করা হ'ল; বৃহস্পতি গাভীদের (রশ্মিসমূহকে) উপরে চালিয়ে নিয়ে গেলেন, স্তুতির দ্বারা ("ব্রহ্মণা") তিনি বলকে বিদীর্ণ করলেন, তিনি তমকে নিগু-হিত করলেন এবং স্বর্‌কে দৃষ্টিগোচর করালেন"; ৫-৩১-৩ শ্লোকেও বলা হ'য়েছে, "সুদোহকদের তিনি বেগে প্রেরণ করলেন প্রচ্ছন্নকারী 'ব্রজে'র মধ্যে; জ্যোতির দ্বারা তিনি উন্মুক্ত করলেন সর্বাবরক তমকে"; কিন্তু যদি কেউ বলে বেদে বাক্যের একটি অংশের সহিত অন্য অংশের কোন

সম্পর্ক নেই, ঋষিরা অর্থ ও যুক্তির কোন ধার ধারতেন না, ইচ্ছামতো গাভী থেকে সূর্যে যাচ্ছেন, অন্ধকার থেকে দ্রাবিড়বাসীদের গুহায় যাচ্ছেন তাহ'লে আমরা উত্তরে এই দুই বিষয়ের সন্দেহাতীত একত্বের নিদর্শন দেখাতে পারি ১-৩৩-১০ শ্লোকে, "বৃষভ ইন্দ্র বজ্রকে তাঁর সহযোগী করলেন" অথবা সম্ভবতঃ "ইহাকে প্রয়োগ করলেন ("যুজম্"), জ্যোতির দ্বারা রশ্মিসমূহ (গোরাজি) দোহন করলেন অন্ধকারের মধ্য থেকে"—আর আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বজ্র হ'ল "স্বর্য অশ্মা" এবং ইহাতে স্বর্-এর জ্যোতি আছে—আবার যে ৫-৫১-২ শ্লোকে পণিদের কথা আছে সেখানেও পাই, "তারা (ঊষারা) শুদ্ধ আলোকে প্রকাশিত হ'য়ে, পবিত্র ক'রে উন্মুক্ত করল ব্রজের দ্বারসমূহ, এমনকি অন্ধকারের দ্বার" "ব্রজস্য তমসো দ্বারা"। এই সব সত্ত্বেও যদি আমরা জোর করে বলি যে গোরাজি ও পণিদের কথা একটি ঐতিহাসিক কাহিনী, তাহ'লে বলতে হবে যে বেদের নিজের প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা বেদের ঐরূপ অর্থ করতে কৃতসংকল্প। তা না হ'লে আমাদের একথা স্বীকার করতেই হয় যে পণিদের গুপ্ত ধন "নিধিং পণীনাং পরমং গুহাহিতম্" (২-২৪-৬) পার্থিব গোযূথের ধন নয়, কিন্তু যেমন পরুচ্ছে পো দৈবোদাসি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন (১-১৩০-৩), "ইহা স্বর্গের ধন যা নিহিত আছে পক্ষিশাবকের মতে গোপন গুহায়, অনন্ত প্রস্তরের মধ্যে, গাভীদের ব্রজের মতো" "অবিন্দদ্ দিবো নিহিতং গুহা নিধিং বের্ন গর্ভং পরিবীতম্ অশ্মনি অনন্তে অন্তর্ অশ্মনি, ব্রজং বজ্রী গবাম্ ইব সিষাসন্"।

যে সব অংশে এই দুই উপাখ্যানের সম্পর্ক বা তাদাত্ম্যতা দেখা যায় তাদের সংখ্যা অনেক; আমি শুধু আদর্শস্থানীয় কটি অংশ উদ্ধৃত করব। একটি সূক্তে (১-৬২), এই উপাখ্যানটির কথা বিস্তৃতভাবে বলা হ'য়েছে, "হে ইন্দ্র, হে বীর্যবান্, তুমি দশগ্বদের (আঙ্গিরসদের) সহিত বলকে বিদীর্ণ করেছিলে রবের দ্বারা; আঙ্গিরসদের দ্বারা স্তুত হ'য়ে তুমি ঊষাদের উন্মোচন করেছিলে সূর্যের সহিত এবং গোরাজির সহিত উন্মোচন করেছিলে সোমকে"। ৬-১৭-৩ শ্লোকে আমরা পাই, "স্তুতি শ্রবণ কর এবং 'গীঃ-র' দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর, সূর্যকে প্রকাশ কর, শত্রুকে নিধন কর, গোরাজি মুক্ত কর, হে ইন্দ্র"। ৭-৯৮-৬ শ্লোকে আছে, "এই যেসব গোধন তুমি তোমার চতুর্দিকে দেখছ সূর্যের চক্ষু দিয়ে তা তোমার, হে ইন্দ্র, তুমিই গোরাজির একমাত্র অধিপতি," "গবাম্ অসি গোপতির্ এক ইন্দ্র", আর যে গোরাজির

অধিপতি ইন্দ্র তা কি প্রকারের, তা দেখানর জন্য আমরা ৩-৩১ সূক্তে সরমা ও গোরাজি সম্বন্ধে এই কথা পাই, "জয়ী (উষারা) তাঁতে সংলগ্ন হ'ল এবং তারা অন্ধকারের মধ্য থেকে এক মহৎ জ্যোতি জানল; অবগত হ'য়ে উষারা তাঁর কাছে উর্ধ্বে গমন করল, ইন্দ্র হ'লেন গোরাজির একমাত্র অধিপতি," "পতির্ গবাম্ অভবদ্ এক ইন্দ্রঃ"; আর এই সূক্তে আরো বলা হ'য়েছে যে কেমন করে মনের দ্বারা, এবং সত্যের সকল পথ আবিষ্কার করে সপ্তবিপ্ররা, আঙ্গিরসরা গাভীদের উর্ধ্বে চালিয়ে নিয়েছিলেন তাদের দৃঢ় অবরোধের মধ্য থেকে এবং কেমন করে সরমা জানতে পেরে অদ্রির গুহায় এল এবং অবিনশ্বর গোযূথের কণ্ঠস্বরের সমক্ষে উপস্থিত হল। ৭-৯০-৪ শ্লোকেও আমরা উষা এবং স্বরের বিশাল সৌর আলোক প্রাপ্তির মধ্যে সম্পর্কের কথা পাই, "উষারা প্রকাশিত হ'ল জ্যোতিতে পূর্ণ হ'য়ে ও অক্ষত থেকে, তাঁরা (আঙ্গিরসরা) ধ্যানমগ্ন হ'য়ে প্রশস্ত জ্যোতি ("উরু জ্যোতিঃ") পেলেন; যাঁরা অভীপ্সু তাঁরা গোরাজির ব্যাপ্তি পেলেন, তাঁদের উপর স্বর্গ থেকে প্রবাহিত হ'ল জলরাশি।"

সেইরূপ আবার ২-১৯-৩ শ্লোকেও আমরা দিবস, সূর্য ও গোরাজির কথা পাই—"তিনি সূর্যের জন্ম দিলেন, গোরাজি লাভ করলেন, রাত্রির মধ্য থেকে দিবসের অভিব্যক্তি সাধন ক'রে।" ৪-১-১৩ শ্লোকে উষা এবং গো যে এক তা বলা হয়েছে, "সেই সুদোহকরা যাদের ব্রজ হল প্রস্তর, যে ভাস্বর জীবরা তাদের আবরক আগারের মধ্যে আছে—এদের তাঁরা চালিয়ে নিয়ে গেলেন উর্ধ্বে, উষা তাদের আহ্বানে উত্তর দিয়ে", যদি না অবশ্য, ইহার অর্থ হয় উপরের শ্লোকে উল্লিখিত আঙ্গিরসদের, "আমাদের মানুষী পিতৃগণের" আহ্বানে উষারা তাদের জন্য গোরাজি উর্ধ্বে চালিয়ে নিয়ে গেলেন। তারপর ৬-১৭-৫ শ্লোকে পাই যে খোঁয়াড় ভেঙে ফেলাই সূর্যের কিরণপ্রকাশের উপায়: "দৃঢ় স্থানগুলি ভেঙে ফেলে তুমি সূর্য ও উষাকে দীপ্ত করালে; যে মহান্ অদ্রি গোসকলকে আবৃত করে রেখেছিল তাকে তুমি নড়িয়েছিলে তার ভিত্তি থেকে"; আর শেষ পর্যন্ত উপাখ্যানরূপে এই দুই চিত্র যে একান্তই এক তা দেখান হ'য়েছে ৩-৩৯-৪, ৫ শ্লোকে, "মর্ত্যগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নিন্দা করতে পারে (অথবা আমি ব্যাখ্যা করতে চাই, এমন কোন মর্ত্য শক্তি নেই যে আবদ্ধ বা বাধা দিতে পারে) এই আমাদের পিতৃগণকে যাঁরা (পণিদের) গোরাজির জন্য যুদ্ধ করেছিলেন; বীর্যের ইন্দ্র, কর্মের ইন্দ্র তাঁদের জন্য মুক্ত করেছিলেন দৃঢ়-

ভাবে বদ্ধ রাখা গো-ব্রজগুলি; যখন এক সখা তার সব সখা নবগ্‌দের সহিত নতজানু হ'য়ে গোসমূহকে অনুসরণ করেছিলেন, যখন দশের অর্থাৎ দশগদের সহিত ইন্দ্র অন্ধকারে অবস্থিত সত্য সূর্যকে (অথবা আমার ব্যাখ্যায়, যে সূর্য সত্য তাকে) পেয়েছিলেন।" এই অংশটি থেকে এই সিদ্ধান্ত অপরিহার্য যে গোরাজি হ'ল পণিদের গোরাজি, আর আঙ্গিরসরা তাদের অনুসরণ ক'রে গুহার মধ্যে প্রবেশ করেন হাত ও জানুর উপর ভর দিয়ে আর গোরাজিকে যাঁরা লাভ করেন তাঁরা ইন্দ্র ও আঙ্গিরসগণ যাদের অন্য অনেক সূক্ত বলা হয় নবগ্ ও দশগ্ আর পর্বতের গুহার মধ্যে পণিদের গোব্রজের মধ্যে প্রবেশ করে যা পাওয়া যায় তা আর্যদের হাত ধন নয়, পরন্তু ইহা "অন্ধকারে অবস্থিত সূর্য"।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত হয় যে বেদের গোরাজি, পণিদের গোরাজি, যে গোসকল হরণ করা হয়, যাদের জন্য যুদ্ধ করা হয়, যাদের অনুসরণ করা হয়, পুনরুদ্ধার করা হয় যেসব গো ঋষিরা কামনা করেন, যাদের জয় করা হয় স্তুতির দ্বারা ও যজ্ঞের দ্বারা, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও দেব-বর্ধক শ্লোক এবং দেবমত্তকারী সোমের দ্বারা, সেগুলি প্রতীকার্থক গো, জ্যোতির গো; বেদের অন্য যে একটি আন্তর অর্থ আছে তাতে "গো", "উস্রা", "উস্রিয়া" পদগুলির অর্থ ভাস্বর বিষয়সমূহ, রশ্মিমালা সূর্যের যূথ, উষার জ্যোতির্ময় রূপাবলী। এই অপরিহার্য সিদ্ধান্তের বলে, বৈদিক ব্যাখ্যার মূল প্রস্তরটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় আর তা অসভ্যদের পূজার স্থূল জড়ব্যাখ্যার বহু উর্ধ্বে আর বেদ প্রকাশিত হয় একটি প্রতীকার্থক্ শাস্ত্র হিসাবে, সূর্য পূজা বা উষা পূজার এক পবিত্র রূপক গাথা হিসাবে, অথবা এক পরতর ও আন্তর জ্যোতির, সত্য সূর্যের, "সত্যাম্ সূর্যম্"-এর উপাসনা হিসাবে যা প্রচ্ছন্ন থাকে আমাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারের মধ্যে যেমন পক্ষিশাবক, দিব্যহংস লুক্কায়িত থাকে এই জড়ীয় অস্তিত্বের অনন্ত প্রস্তরে, "অনন্তে অন্তর্ অশ্মনি" (১-১৩০-৩)।

যদিও এই অধ্যায়ে আমি শুধু সেই প্রমাণগুলির কথাই বলেছি যাতে দেখা যায় যে গোরাজি হ'ল অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন সূর্যের আলো তবু উদ্ধৃত দুএকটি শ্লোক থেকে সত্যের জ্যোতি ও জ্ঞানের সূর্যের সহিত তাদের সম্পর্ক পূর্বেই প্রকাশিত হ'য়ে পড়েছে। আর যখন আমরা পৃথক পৃথক শ্লোকের পরিবর্তে এই আঙ্গিরসদের সূক্তগুলির সমগ্র অংশগুলি পরীক্ষা করব তখন ইঙ্গিতে যা প্রকাশ পেয়েছে তা পরিণত হয় সুস্পষ্ট নিশ্চয়তায়। কিন্তু

প্রথম আমাদের দেখতে হবে এই আঙ্গিরস ঋষিরা কারা এবং এই যে গুহাবাসীরা, অন্ধকারের বন্ধুরা যাদের কাছ থেকে ঋষিরা জ্যোতির্ময় যূথ ও হারানো সূর্য পুনরুদ্ধার করেন, অর্থাৎ রহস্যময় পণিরাই বা কারা।

ষোড়শ অধ্যায়

আঙ্গিরস ঋষিগণ

বেদে আঙ্গিরস নামটি দুইটি আকারে পাওয়া যায়,—অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস, যদিও আঙ্গিরস নামটিই বেশী ব্যবহৃত হয়; আমরা আবার দেখি যে পৈতৃক নাম আঙ্গিরস দেব, বৃহস্পতির বেলায় একাধিক বার প্রয়োগ করা হ'য়েছে। পরবর্তীকালে মনে করা হ'ত যে ভৃগু ও অন্যান্য ঋষিদের মতো আঙ্গিরস আদি ঋষিদের অন্যতম ছিলেন, আর এই সব ঋষিরাই ছিলেন তাঁদের নামে পরিচিত আঙ্গিরস, আত্রেয় ভার্গব প্রভৃতি ঋষিকুলের পূর্বপুরুষ। বেদেও এই সব ঋষিকুলের, আত্রেয়, ভৃগু, কাণ্ব প্রভৃতির উল্লেখ আছে। আত্রেয়দের একটি সূক্তে (৫-১১-৬) বলা হ'য়েছে যে আঙ্গিরস ঋষিরাই পবিত্র অগ্নিকে আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু অন্য একটি সূক্তে (১০-৪৬-৯) বলা হ'য়েছে যে ভৃগুরাই অগ্নির আবিষ্কারক।[১] প্রায়ই সপ্ত আদি আঙ্গিরস ঋষিদের বলা হ'য়েছে মানুষী পিতৃগণ, "পিতরো মনুষ্যাঃ" যাঁরা জ্যোতি আবিষ্কার করেছিলেন, সূর্যকে কিরণ দিতে বাধ্য করেছিলেন এবং উঠেছিলেন সত্যের স্বর্গে। ১০ম মণ্ডলের কতকগুলি সূক্তে পিতৃগণ হিসাবে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে যমের সহিত, যে যম-দেবতার প্রাধান্য শুধু দেখা যায় পরবর্তী সূক্তগুলিতে ; তাঁরা দেবতাদের সহিত আসন গ্রহণ করেন 'বর্হিস্'এর, পবিত্র ঘাসের উপর এবং যজ্ঞে তাঁদের অংশ গ্রহণ করেন।

এই কথাই যদি সব হ'ত তাহ'লে গো প্রাপ্তির বিষয়ে আঙ্গিরস ঋষি-দের কাজের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল ও উপরভাসা হ'ত; তাঁরা হ'তেন পূর্ব-পুরুষ, বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, আর তাঁদের বংশধররা তাঁদের কিছুটা দেবতা বলে গণ্য করতেন এবং মেরু প্রদেশের দীর্ঘ রাত্রির মধ্য থেকে উষা ও সূর্য পুনর্জয় করার বিষয়েই হ'ক আর জ্যোতি ও সত্য জয়ের ব্যাপারেই হ'ক তাঁদের সর্বদাই দেবতাদের সহিত উল্লেখ করা হ'য়েছে। কিন্তু ইহাই সব নয়, বৈদিক উপাখ্যানটির আরো গভীর তাৎপর্য আছে।

১ খুব সম্ভব আঙ্গিরস ঋষিরা হ'লেন অগ্নির শিখা-শক্তি আর ভৃগুরা সূর্যের সৌর শক্তি।

প্রথমতঃ আঙ্গিরসগণ শুধু দেবোপম মানুষী পিতৃগণ ছিলেন না, তাঁদের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তাঁরা স্বর্গীয় ঋষি, দেবতাদের পুত্র, স্বর্গের পুত্র, অসুরের অর্থাৎ শক্তিশালী প্রভুর বীর বা শক্তি, "দিবস্ পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ" (৩-৫৩-৭) আর এই বর্ণনাটি এমন যে তাঁরা সপ্ত সংখ্যক হওয়ায় আমাদের বেশী করে মনে পড়ে যদিও সম্ভবতঃ শুধু আকস্মিক-ভাবে, ইরাণদেশের অনুরূপ উপাখ্যানের অহুর মাজদার সপ্ত দেবদূতের কথা। উপরন্তু, এমন সব শ্লোক আছে যাথেকে মনে হয় যে তাঁরা কেবল-মাত্র প্রতীকার্থক্, আদি অঙ্গিরস অগ্নির বিভিন্ন শক্তি ও পুত্র, প্রতীকার্থক্ জ্যোতি ও শিখার বিভিন্ন শক্তি, আর এমন কি মনে হয় যে তাঁরা মিশে হ'য়ে যান জ্যোতির নব ও দশ রশ্মিসমেত একটি মাত্র সপ্তানন আঙ্গিরস, "নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে" যাঁর উপর ও যাঁর দ্বারা ঊষা প্রকট হন তাঁর সকল হর্ষ ও প্রাচুর্য নিয়ে। আর তবু এই তিনটি রূপই মনে হয় একই আঙ্গিরসদের, তাঁদের বৈশিষ্ট্য ও তাদের কর্মও একই রকমের।

এই ঋষিদের দিব্য ও মানুষী এই দুই চরিত্র সম্বন্ধে দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা সম্ভব। হয়ত তাঁরা আদিতে মানুষী ঋষি ছিলেন, এবং তাঁদের বংশধরগণ তাঁদের দেবতা জ্ঞান করতেন এবং এই দেবত্ব আরোপের ফলে তাঁদের দিব্য পিতৃত্ব ও দিব্য কর্ম দেওয়া হ'য়েছে; আর না হয়, তাঁরা আদিতে অর্ধ-দেবতা ছিলেন, জ্যোতি ও শিখার শক্তি ছিলেন এবং পরে তাঁদের ঋষি-কুলের পিতা ও জ্ঞানের আবিষ্কারক রূপে মানুষ গণ্য করা হ'য়েছে। আদি পৌরাণিক উপাখ্যানে এই দুই প্রণালীর কথা পাওয়া যায়। উদাহরণ-স্বরূপ গ্রীক্ উপাখ্যানে ক্যাস্টর (Castor) এবং পলিডেউসেস্ (Poly-deuces) এবং তাদের ভগিনী হেলেন (Helen) জীয়াসের (Zeus)-এর সন্তান হ'লেও মানুষ ছিলেন এবং শুধু তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের দেবতা বলে গণ্য করা হ'ত, কিন্তু সম্ভবতঃ আদিতেই এই তিনজনই দেবতা ছিলেন—ক্যাস্টর ও পলিডেউসেস্ ছিলেন যমজ, অশ্বারোহী, সমুদ্রের উপর নাবিকদের পরিত্রাতা আর একরকম নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁরা বৈদিক অশ্বীদের সহিত এক, তাঁদের নামেই বোঝা যায় যে ইহারাও অশ্বারোহী ছিলেন, বিস্ময়কর রথের আরোহী ছিলেন, তাঁরাও যমজ, সমুদ্র থেকে ভুজ্যুদের পরিত্রাতা, বৃহৎ জলরাশির উপর দিয়ে পারকর্তা, ঊষার দুই ভাই, আর খুব সম্ভব হেলেন হ'লেন তাদের ভগিনী ঊষা আর এমনকি স্বর্গশুনী সরমার সহিত এক যে দক্ষিণার মতো ঊষার এক

শক্তি, প্রায় তাঁর এক মূর্তি। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আরো অগ্রগতি হয়েছে যার ফলে এই দেবতারা বা অর্ধ-দেবতারা মনস্তাত্ত্বিক কার্যের শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছেন আর যে প্রণালীতে গ্রীক্ ধর্মে এথেনী, (Athene) উষা জ্ঞানের দেবীতে এবং এপোলো (Apollo), সূর্য দিব্য গায়ক ও দ্রষ্টায়, দৈব ও কবিসুলভ প্রেরণার অধিপতিতে পরিণত হ'য়েছেন এখানেও হয়ত সেই প্রণালীতেই উহাদের ঐরূপ শক্তি দেওয়া হ'য়েছে।

বেদে সম্ভবতঃ আর একটি প্রবণতা প্রবল ছিল,—এই প্রাচীন রহস্য-বাদীদের মনে সর্বদা সকল বিষয়েই প্রতীক্-তন্ত্রের ব্যবহার। সকল কিছুকেই, তাদের নিজেদের নাম, রাজাদের ও যজ্ঞদাতাদের নাম, তাদের জীবনের সামান্য বিষয়গুলিকেও পরিণত করা হ'ত তাদের গোপন অর্থের প্রতীকে ও আবরণে। যে "গো" পদটির অর্থ রশ্মি ও গাভী উভয়ই সেই দ্ব্যর্থবাচক পদটিকে যেমন তাঁরা গোর মূর্তিকে অর্থাৎ তাদের কৃষকজীবনের প্রধান সম্পদকে ব্যবহার করতেন দেবতাদের নিকট হ'তে তাঁদের প্রার্থিত আধ্যাত্মিক সম্পদের প্রধান অঙ্গ আন্তর জ্যোতির গুপ্ত অর্থের আবরণ হিসাবে, সেইরূপ আবার তাঁরা নিজেদের নাম "গোতম", "আলোকে পূর্ণতম", "গবিষ্ঠির" (আলোকে স্থির) ব্যবহার করতেন তাঁদের নিজেদের কাম্য আন্তর ভাবনার উদার ও সাধারণ অর্থ প্রচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে। এইভাবেই তাঁরা নিজেদের বা অন্য ঋষিদের সব বাহ্য ও আন্তর অনু-ভূতিকেও ব্যবহার করতেন। যজ্ঞের বেদীতে বলি হিসাবে আবদ্ধ শুনঃশেপের প্রাচীন কাহিনীতে যদি কোন সত্য থাকে, তাহ'লে ইহা নিশ্চিত,—আর আমরাও তা দেখব—যে ঋগ্বেদে এই ঘটনাকে বা কাহিনীকে ব্যবহার করা হ'য়েছে একটি প্রতীক্ হিসাবে যার গোপন অর্থ হ'ল মানুষের অন্তঃ-পুরুষ পাপের ত্রিবিধ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ থাকে আর তা থেকে সে মুক্তি পায় অগ্নি, সূর্য, বরুণের দিব্যশক্তির দ্বারা। সেইরূপ কুৎস, কাণ্, উশনা কব্য প্রভৃতি ঋষিরা কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও জয়ের আদর্শস্বরূপ ও প্রতীক্ হ'য়ে উঠেছেন এবং সেই কারণে দেবতাদের সহিত পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন। তাহ'লে এই রহস্যময় প্রতীক্-তন্ত্রে সপ্ত আঙ্গিরস ঋষিরা তাদের ঐতিহ্যগত বা ঐতিহাসিক মানুষী চরিত্র সম্পূর্ণ না বর্জন করেও যে আধ্যাত্মিক জীবনের দিব্য সামর্থ্য ও জীবন্তশক্তি হ'য়েছেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমরা অবশ্য এই সব জল্পনা কল্পনা ত্যাগ ক'রে বরং পরীক্ষা করব গো এবং অন্ধকারের মধ্য থেকে সূর্য ও

উষার পুনরুদ্ধারের চিত্রে তাঁদের ব্যক্তিত্বের এই তিন উপাদান বা অঙ্গের কি প্রভাব।

প্রথমতঃ আমরা লক্ষ্য করি যে বেদে আঙ্গিরস পদটি উপাধি রূপে প্রায়ই ব্যবহৃত হয় উষা ও গোর চিত্রের সহিত। দ্বিতীয়তঃ ইহা অগ্নির নাম হিসাবেও ব্যবহৃত হয় আবার বলা হয় যে ইন্দ্র আঙ্গিরস হ'য়েছেন এবং বৃহস্পতিকেও বলা হয় অঙ্গিরস্ ও আঙ্গিরস; স্পষ্টতঃই ইহা শুধু এক আলংকারিক বা পৌরাণিক সংজ্ঞা নয়, বরং ইহার এক বিশেষ তাৎপর্য আছে এবং পদটিতে যে মনস্তাত্ত্বিক বা অন্য অর্থ সংযুক্ত আছে তারও উল্লেখ আছে। এমনকি অশ্বীদেরও সমবেতভাবে বলা হয় আঙ্গিরস। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে বেদে আঙ্গিরস কথাটি শুধু যে এক ঋষিকুলের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়েছে তা নয়, ইহার একটি বিশিষ্ট অর্থও আছে যা পদটির পক্ষে স্বাভাবিক। ইহাও সম্ভব যে যখন নাম হিসাবেও ইহা ব্যবহৃত হয় তখন তাতেও নামটির স্বগত অর্থ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়; সম্ভবতঃ বেদে নামগুলি সর্বদা না হ'লেও সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় তাদের তাৎপর্যের উপর কিছু গুরুত্ব দিয়ে আর একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য দেবতাদের, ঋষিদের ও রাজাদের নামের বেলায়। ইন্দ্র পদটি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় নাম হিসাবে, তবু বৈদিক প্রণালীর ঐরূপ তাৎপর্যপূর্ণ আভাস পাই যখন উষাকে বলা হয় "ইন্দ্রতমা অঙ্গিরস্তমা" "শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র", "শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস" আর পণিদের বলা হয় "অনিন্দ্রাঃ" (ইন্দ্রহীন); স্পষ্টতঃই এই সব পদের প্রয়োগের উদ্দেশ্য হ'ল ইন্দ্র এবং অঙ্গিরসের দ্বারা যেসব গুণ, শক্তি বা কর্ম সূচিত হয় তাদের অস্তিত্ব বা অভাবের অর্থ প্রকাশ করা। আমাদের তাহ'লে দেখা চাই এই অর্থ কি হ'তে পারে এবং আঙ্গিরস ঋষিদের স্বভাব বা কর্ম সম্বন্ধে ইহা কি আলোকপাত করে।

এই পদটি অগ্নি নামের সহিত সমজাতীয়; কারণ ইহা যে ধাতু "অঙ্" থেকে নিষ্পন্ন তা অগ্নির ধাতু 'অগ্' এর শুধু এক অনুনাসিক রূপ। মনে হয় এই দুই ধাতুর নিজস্ব অর্থ হ'ল প্রধান বা শক্তিশালী অবস্থা, অনুভব, গতিবৃত্তি, ক্রিয়া, আলোক[১], আর এই যে শেষের অর্থ উজ্জ্বল বা

১ অবস্থা সম্বন্ধে আমরা পাই "অগ্র", প্রথম, শীর্ষ এবং গ্রীক্ "অগন" (agan), অতিরিক্তভাবে; অনুভব অর্থে গ্রীক্ পদ "অগেপ" (agape) প্রেম এবং সম্ভবতঃ সংস্কৃত পদ "অঙ্গনা", স্ত্রীলোক; গতিবৃত্তি ও ক্রিয়াসম্বন্ধে সংস্কৃত, গ্রীক্ ও ল্যাটিনে অনেক পদ আছে।

জ্বলন্ত আলো তা থেকে পাই "অগ্নি", আগুন, "অঙ্গতি" আগুন "অঙ্গার", জ্বলন্ত কয়লা এবং "অঙ্গিরস" পদটিরও অর্থ নিশ্চয় ছিল শিখাময়, প্রভাময়। বেদে এবং ব্রাহ্মণদের ঐতিহ্যে আঙ্গিরসদের উৎপত্তি অগ্নির সহিত ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। ব্রাহ্মণে বলা হয় যে অগ্নি আগুন এবং আঙ্গিরসরা জ্বলন্ত কয়লা, "অঙ্গারাঃ"; কিন্তু স্বয়ং বেদে বরং মনে হয় ইহার অর্থ অগ্নির শিখা বা প্রভা। আঙ্গিরস ঋষিদের উদ্দেশে ১০-৬২ সূক্তে তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা অগ্নির পুত্র এবং স্বর্গের সর্বত্র তাঁরা তাঁর চারিদিকে জন্মগ্রহণ করেন বিভিন্ন রূপে, আর পরের বাক্যাংশেই ইঁহাদের সম্বন্ধে আবার একত্রে একবচনে বলা হ'য়েছে; "নবগ্বো নু দশগ্বো অঙ্গিরস্তমঃ সচা দেবেষু মন্হতে," নবরশ্মিযুক্ত, দশরশ্মিযুক্ত শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস্, এই অঙ্গিরসকুল একত্র দেবতাদের সহিত বা মধ্যে সম্পদপূর্ণ হ'য়ে ওঠেন; ইন্দ্রের সাহায্য লাভ করে তাঁরা গো ও অশ্বের খোঁয়াড়গুলি উন্মুক্ত ক'রে দেন, যজ-মানকে তাঁরা দেন রহস্যময় অষ্ট-কর্ণবিশিষ্ট গাভীদল এবং এইভাবে দেবতাদের মধ্যে সৃষ্টি করেন "শ্রাবস্", দিব্য শ্রবণ বা সত্যের আন্তর-প্রেরণা। ইহা থেকে ভালই বোঝা যায় যে এখানে আঙ্গিরস ঋষিরা দিব্য অগ্নির স্বর্গজাত উজ্জ্বল প্রভাসমূহ, সুতরাং তাঁরা দিব্য শিখায় প্রভা, কোন ভৌতিক আগুনের নয়; তারা জ্যোতির নব রশ্মির দ্বারা এবং দশের দ্বারা সজ্জিত হয়, শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরস হ'য়ে ওঠে, অর্থাৎ দিব্য শিখা, অগ্নির জ্বলন্ত প্রভায় অতীব পূর্ণ হয় এবং সেজন্য সক্ষম হয় আবদ্ধ জ্যোতি ও শক্তিকে মুক্ত করতে এবং অতিমানসিক জ্ঞান সৃষ্টি করতে।

প্রতীক্-তন্ত্রের এই ব্যাখ্যা যদি স্বীকার নাও করা হয়, তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে একটা প্রতীক্ অর্থ আছে। এই আঙ্গিরসগণ মানুষ যজমান নন, তাঁরা স্বর্গজাত অগ্নির পুত্র এবং যদিও তাঁদের কাজ ঠিক মানুষী আঙ্গিরসদেরই, "পিতরো মনুষ্যাঃ" পিতৃগণেরই মতো; তাঁরা বিভিন্ন রূপ নিয়ে জন্ম নেন, "বিরূপাসঃ" এবং এইসবের শুধু এই অর্থ হওয়াই সম্ভব যে তারা অগ্নি-শক্তির নানাবিধ রূপ। এখন প্রশ্ন হ'ল কোন্ অগ্নির, কোন্ যজ্ঞীয় শিখার জ্বলন্ত সাধারণভাবে আগ্নেয় উপাদান, অথবা সেই অপর পবিত্রশিখা যার সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে, "দ্রষ্টা-সংকল্প-সম্পন্ন পুরোহিত" অথবা "যিনি দ্রষ্টার কাজ করেন, সত্য, আন্তরপ্রেরণার বিচিত্র আলোকে সমৃদ্ধ" "অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যস্ চিত্রশ্রবস্তমঃ" (১-১-৫)? ইহারা যদি আগ্নেয় উপাদান হয় তাহ'লে ইহারা যে জ্বলন্ত প্রভার প্রতিভূ-

স্বরূপ তা নিশ্চয়ই সূর্যের প্রভা, অগ্নির আগুন যা সৌর রশ্মিরূপে বিকীর্ণ হয় এবং আকাশরূপ ইন্দ্রের সহযোগে উষা সৃষ্টি করে। আঙ্গিরস উপাখ্যানের বিস্তৃত বিবরণ ও বিষয়সমূহের সহিত সঙ্গতি রাখতে হ'লে আর কোন প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিন্তু আঙ্গিরস ঋষিদের সম্বন্ধে যে আরো বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে যে তাঁরা দ্রষ্টা, স্তুতির গায়ক, সূর্য এবং উষার মতো বৃহস্পতিরও শক্তি তার কোন অর্থ এই ব্যাখ্যায় মেলে না।

বেদে আর একটি অংশ আছে (৬-৬-৩, ৪, ৫) যাতে সুস্পষ্টভাবে এবং অভ্রান্তভাবে বলা হ'য়েছে যে এই দিব্য আঙ্গিরসগণ অগ্নির শিখাময়ী প্রভা। "সর্বত্র ব্যাপ্ত, হে শুদ্ধ দীপ্তিময় অগ্নি, বায়ুর দ্বারা চালিত হ'য়ে, তোমার শুদ্ধ দীপ্তিময় প্রভাসমূহ ("ভামসেঃ") বিন্যাস কর; স্বর্গীয় নবরশ্মিযুক্তদের ("দিব্যা নবগ্বাঃ") সবলে অভিভূত ক'রে বন[১] উপভোগ কর ("বনা বনন্তি" যাতে তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই গুহ্য অর্থ হয়, "ভোগের বিষয়সমূহ উপভোগ ক'রে), তাদের ভেঙে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে। হে শুদ্ধ-জ্যোতিসম্পন্ন, উজ্জ্বল ও শুদ্ধ তারা সকল পৃথিবীকে আঘাত[২] করে (অথবা অভিভূত করে), ইহারা তোমার এমন সব অশ্ব যারা চতুর্দিকে ধাবমান। তখন তোমার ভ্রমণ বিপুল বিস্তৃতভাবে দীপ্তি পায়, তাদের যাত্রা চালিত হয় নানারঙবিশিষ্ট (গো, পৃশ্নি ও মরুৎগণের অন্যান্যদের) উচ্চতর স্তরে। তখন দ্বিবিধভাবে (পৃথিবী ও স্বর্গে?) তোমার জিহ্বা সম্মুখে লাফ দিয়ে চলে গোসমূহের জন্য যুদ্ধরত বৃষ থেকে মুক্ত বিদ্যুতের মতো।" ঋষিরা যে শিখার সহিত সুস্পষ্টভাবে এক তা এড়াতে সায়ণ চেষ্টা করেন, তিনি "নবগ্ব"র অর্থ করে "নবজাত রশ্মি", কিন্তু স্পষ্টতঃই এখানকার "দিব্যা নবগ্বাঃ" এবং ১০-৬২ সূক্তের স্বর্গজাত অগ্নির পুত্রগণ যারাও "নবগ্ব"— এই দুইই এক, বিভিন্ন হওয়া সম্ভব নয়; আর ইহারা যে একই তার জন্য কোন দৃঢ় সমর্থন দরকার হলে, সে সমর্থন পাওয়া যায় এই উক্তিতে যে নবগ্বদের কার্যের দ্বারা গঠিত এই অগ্নির বিন্যাসে তার জিহ্বা গোসমূহের জন্য যুদ্ধরত বৃষের, অর্থাৎ ইন্দ্রের বজ্রের আকার ধারণ করে এবং তা যে সম্মুখে লাফ দিয়ে চলে তা নিশ্চয়ই স্বর্গের অদ্রির মধ্যে অন্ধকারের সব শক্তিকে আঘাত করতে; কারণ এখানে অগ্নি ও নবগ্বদের যাত্রাকে বলা হয় পৃথিবীর উপর বিচরণের পর পর্বতারোহণ ("সানু পৃশ্নেঃ")।

১ সায়ণের মতে, যজ্ঞীয় অগ্নির কাষ্ঠগুলি।

২ সায়ণের মতে, পৃথিবীর কেশ মুণ্ডন কর।

স্পষ্টতঃই আমরা এখানে পাই শিখা ও জ্যোতির এক প্রতীক্-তন্ত্র, দিব্যশিখাসমূহ পৃথিবীকে গ্রাস করে এবং তরপর হ'য়ে ওঠে স্বর্গের বিদ্যুৎ এবং সৌরশক্তিসমূহের প্রভা; কারণ বেদে অগ্নি সূর্যের জ্যোতি, এবং এমন বিদ্যুৎ ও শিখা যা জলরাশির মধ্যে দেখা যায় এবং পৃথিবীর উপর দীপ্তি দেয়। আঙ্গিরস ঋষিরা অগ্নির শক্তি হওয়ায় তাঁরাও এই বহুধা কার্যের অংশীদার। যজ্ঞের দ্বারা যে দিব্যশক্তি প্রজ্বলিত হয় তা-ই আবার ইন্দ্রকে দেয় বিদ্যুতের উপাদান, অস্ত্র, স্বর্গীয় প্রস্তর, "স্বর্য অশ্ম" এবং ইহার দ্বারাই তিনি নাশ করেন অন্ধকারের শক্তিসমূহ এবং জয় করেন গোসমূহ, সৌর দীপ্তিরাজি।

আঙ্গিরসদের পিতা অগ্নি যে শুধু এই সব দিব্য শক্তির উৎস ও প্রভব তা নয়, তাঁকেই আবার বেদে বলা হয় প্রথম অর্থাৎ পরম ও আদি অঙ্গিরস, "প্রথমো অঙ্গিরাঃ"। এই বর্ণনার দ্বারা বৈদিক কবিরা ইহার কি অর্থ বলতে চান? যেসব অংশে এই উপাধিটি উজ্জ্বল ও শিখাময় দেবতা সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হ'য়েছে তার কতকগুলির দিকে দৃষ্টি দিলেই আমরা ইহার অর্থ বুঝতে পারি। প্রথমতঃ, অগ্নির যে আর একটি নির্দিষ্ট উপাধি অর্থাৎ শক্তির বা বীর্যের পুত্র "সহসঃ সূনুঃ উর্জো নপাৎ" তার সহিত ঐ প্রথম উপাধিটি দুইবার উল্লেখ করা হ'য়েছে। যেমন ৮-৬০-২ শ্লোকে তাঁকে আহ্বান করা হ'চ্ছে "হে অঙ্গিরসঃ, শক্তির পুত্র" "সহসঃ সূনো অঙ্গিরঃ"; আবার ৮-৮৪-৪ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "হে অগ্নি অঙ্গিরস, বীর্যের পুত্র" "অগ্নে অঙ্গির উর্জো নপাৎ"। ৫-১১-৬ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "হে অগ্নি, আঙ্গিরসরা তোমায় দেখেছিলেন গোপন স্থানে নিহিত ("গুহা হিতম্") ও বনে বনে ("বনে বনে") শয়ান অথবা যেমন আমরা পূর্বে "বনা বনন্তি" কথাটির গুহ্য অর্থের আভাস দিয়েছি, এখানেও যদি তা-ই করি, তাহলে "বনে বনে"র অর্থ হবে "প্রতি ভোগের বিষয়ে"। এইভাবে মথিত হ'য়ে ("মথ্যমানঃ") তুমি জন্মে হও এক বিশাল শক্তি; তোমাকে, হে অঙ্গিরস, তোমাকে তারা বলে "শক্তির পুত্র" "স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ ত্বাম্ আহুঃ সহসস্ পুত্রম্ অঙ্গিরঃ। এই সব থেকে কোন সন্দেহ থাকে না যে আঙ্গিরস সম্বন্ধে বৈদিক ভাবনায় শক্তি একটি মৌলিক উপাদান আর আমরা দেখেছিও যে ইহা পদটির অর্থের এক অংশও বটে। স্থিতিতে শক্তি, ক্রিয়া, গতিবৃত্তি, আলো, বেদনা—এই সব 'অগ্' ও 'অঙ্' ধাতুর স্বগত গুণ আর এই দুই ধাতু থেকেই অগ্নি ও অঙ্গিরঃ নিষ্পন্ন। শক্তি তো আছেই কিন্তু

এই সব কথায় জ্যোতির অর্থও আছে পবিত্র শিখা, অগ্নি হ'ল জ্যোতির জ্বলন্ত শক্তি; আঙ্গিরসরাও জ্যোতির জ্বলন্ত শক্তিসমূহ।

কিন্তু কোন্ জ্যোতির? ভৌতিক না রূপক জ্যোতির? কিন্তু আমাদের একথা মনে করা ঠিক হ'বে না যে বৈদিক কবিদের বুদ্ধিশক্তি এত অমার্জিত ও বর্বরসুলভ ছিল যে সকল ভাষায় যেমন ভৌতিক আলোককে মানসিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের, আন্তর দীপ্তির রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাঁরা কিন্তু সেই সহজরূপক ব্যবহারে অক্ষম ছিলেন। বেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় "জ্যোতির্ময় বিপ্রের" কথা, "দ্যুমতো বিপ্রাঃ" এবং 'সূরি' (দ্রষ্টা) পদটি ব্যুৎপত্তির দিক থেকে সূর্যের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং নিশ্চয়ই ইহার আদি অর্থ ছিল "জ্যোতির্ময়"। ১-৩১-১ শ্লোকে, এই শিখার দেবতা সম্বন্ধে বলা হয়, "হে অগ্নি, তুমিই প্রথম অঙ্গিরা ঋষি ছিলে, কল্যাণময় সখা ছিলে, দেবগণের মধ্যে এক দেব; তোমার ব্রতের বিধানে জন্ম নিয়েছিলেন মরুৎগণ তাঁদের দীপ্ত বর্শা নিয়ে, দ্রষ্টা তাঁরা কাজ করেন জ্ঞানের দ্বারা।" সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে অঙ্গিরস অগ্নির ভাবনায় জ্ঞান ও ক্রিয়া এই দুই ভাবনা ছিল; জ্যোতির্ময় অগ্নি ও জ্যোতির্ময় মরুৎরা তাঁদের জ্যোতির দ্বারা ছিলেন জ্ঞানের দ্রষ্টা, "ঋষি", "কবি"; আর জ্ঞানের জ্যোতির দ্বারা বীর্যবান্ মরুৎগণ কাজ করেন কারণ তাঁরা জন্ম নিয়েছেন বা অভিব্যক্ত হ'য়েছেন অগ্নির বিশিষ্ট কর্মধারায় ("ব্রত"); কারণ স্বয়ং অগ্নিকেই বর্ণনা করা হ'য়েছে দ্রষ্টা-সংকল্প সম্পন্ন বলে, "কবিক্রতুঃ", ক্রিয়ার সেই শক্তি যা কাজ করে চিদাবিষ্ট বা অতিমানসিক জ্ঞান অনুসারে ("শ্রাবস্") কারণ "কবি" পদটির দ্বারা ঐ জ্ঞানই বোঝায়, বুদ্ধিমত্তা নয়। তাহ'লে এই মহাশক্তি, অঙ্গিরস অগ্নি, "সহো মহৎ", দিব্য শিখাময়ী শক্তি ছাড়া আর কি? আর ইহার যে দুটি গুণ জ্যোতি ও শক্তি তা কাজ করে সুষ্ঠু সুষমার সহিত—ঠিক যেমন মরুৎদের বলা হয় "কবয়ো বিদ্মনা অপসঃ", এমন দ্রষ্টা যাঁরা কাজ করেন জ্ঞানের দ্বারা। আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসার যুক্তি ছিল যে উষা দিব্য উষা, শুধু ভৌতিক উষা নয়, তাঁর গো-রাজি অর্থাৎ উষা ও সূর্যের রশ্মিমালা হ'ল উদীয়মান দিব্য চেতনার দীপ্তিরাজি এবং সুতরাং সূর্য হ'লেন জ্ঞানের অধিপতি হিসাবে উদ্ভাসক, আর স্বর্ অর্থাৎ দ্যৌ ও পৃথ্বীর উজানে সৌরলোক হ'ল দিব্য সত্য ও আনন্দের লোক, এককথায় বেদে জ্যোতি হ'ল জ্ঞানের প্রতীক্, দিব্য সত্যের

দীপ্তির প্রতীক্। এখন আমরা যুক্তির সহিত নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে শিখা যা জ্যোতির শুধু অন্য এক দিক তা দিব্য চেতনার, অতিমানসিক সত্যের শক্তির বৈদিক প্রতীক্।

অন্য একটি অংশে (৬-১১-৩) একটি কথা পাওয়া যায়, "অঙ্গিরসদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্ত দ্রষ্টা" "বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং বিপ্রঃ", এখানে উক্তিটি আদৌ স্পষ্ট নয়। "বেপিষ্ঠো বিপ্রঃ" এই দুটি পদের একত্র সমাবেশকে সায়ণ অগ্রাহ্য করেন অথচ "বেপিষ্ঠ"র অর্থ শ্রেষ্ঠ "বিপ্র", শ্রেষ্ঠ দ্রষ্টা, সর্বাপেক্ষা দীপ্ত; তিনি মনে করেন যে সূক্তের ঋষি ভরদ্বাজ এখানে নিজে-কেই প্রশংসা করছেন দেবতাদের মধ্যে "শ্রেষ্ঠ স্তাবক" বলে; কিন্তু এই অর্থটি সন্দেহজনক। এখানে অগ্নিই "হোতা", পুরোহিত, তিনিই যজ্ঞ করছেন দেবতাদের নিকট, তাঁর নিজেরই মূর্তির নিকট, "তনুং তব স্বাম্" (৬-১১-২), মরুৎগণ, মিত্র, বরুণ, দ্যৌ ও পৃথিবীর নিকট। সূক্তে বলা হয়েছে, "যদিও মনন সমৃদ্ধিতে পূর্ণ তবু ইহা স্তুতিগায়কের জন্য দেবগণ, (দিব্য) জন্মসমূহ কামনা করে যাতে তিনি তাঁদের কাছে যজ্ঞ নিবেদন করতে পারেন, যখন বিপ্র, অঙ্গিরসদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্ত যজ্ঞে উচ্চারণ করেন মাধুর্যের ছন্দ।" ইহা একরকম মনে হয় যে অগ্নি নিজেই বিপ্র, অঙ্গিরসদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দীপ্ত। অপরপক্ষে মনে হয়, এই বর্ণনা বৃহস্পতির পক্ষে আরো উপযুক্ত।

কারণ বৃহস্পতিও একজন অঙ্গিরস এবং এমন একজন যিনি অঙ্গিরস হ'য়েছেন। আমরা দেখেছি যে জ্যোতির্ময় গোযূথ জয়ের কার্যে তিনি আঙ্গি-রস ঋষিদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং এইভাবে যে তিনি জড়িত তা ব্রহ্মণস্পতি হিসাবে, পবিত্র বা চিদাবিষ্ট বাণীর ("ব্রহ্মন্") অধিপতি হিসাবে; কারণ তাঁর রবের দ্বারাই বল চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং গোরাজি তাঁর আহ্বানে কামনা নিয়ে উত্তর দেয় হাম্বারবে। অগ্নির বিভিন্ন শক্তিরূপে এই ঋষিরাও তাঁর মতো "কবিক্রতু"; তাঁরা দিব্যজ্যোতির অধিকারী, ইহার দ্বারা তাঁরা কাজ করেন দিব্যশক্তি দিয়ে; তাঁরা শুধু ঋষি নন, তাঁরা বৈদিক যুদ্ধের বীরও বটে, "দিবস্ পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ" (৩-৫৩-৭), স্বর্গের পুত্র, বীর্যবান্ প্রভুর বীরপুরুষ; যেমন ৬-৭৫-৯ শ্লোকে বলা হয়েছে, তাঁরা "এমন সব পিতা যাঁরা বাস করেন স্বাদুতার মধ্যে (আনন্দের লোকে), যাঁরা ব্যাপ্ত জন্ম প্রতিষ্ঠা করেন, দুর্গম স্থানে বিচরণ করেন,

শক্তিমান, গম্ভীর[১] তাঁদের আছে উজ্জ্বল সেনা, এবং শরের বল, তাঁরা অজেয়, তাঁদের সত্তায় বীর, তাঁরা দলবদ্ধ শত্রুদের পরাভবকারী"; কিন্তু আবার পরের শ্লোকেই বলা হ'য়েছে যে তাঁরা "ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ" অর্থাৎ তাঁদের আছে দিব্য বাণী এবং ইহার সহিত সংলগ্ন চিদাবিষ্ট জ্ঞান।[২] এই দিব্য বাণীই "সত্য মন্ত্র", ইহাই সেই মনন যার সত্যের দ্বারা আঙ্গিরস ঋষিরা উষার জন্ম ঘটান এবং হারানো সূর্যকে আকাশে ওঠান। এই পদটিকে আবার "অর্ক" বলা হয়, ইহার অর্থ স্তুতি ও জ্যোতি উভয়ই এবং কখন কখন সূর্যের বেলায় প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং ইহা দীপ্তির বাণী, যে বাণী সেই সত্য প্রকাশ করে যার অধিপতি হ'লেন সূর্য এবং সত্যের গূঢ় আসন থেকে ইহার আবির্ভাব জড়িত থাকে সূর্যের দ্বারা তার যূথবদ্ধ রশ্মিসমূহের বহির্বর্ষণ; সেজন্য ৭-৩৬-১ শ্লোকে বলা হ'য়েছে, "বাণী সম্মুখে আসুক সত্যের আসন থেকে; রশ্মিমালার দ্বারা সূর্য চারিদিকে মুক্ত করেছেন গোরাজি" "প্র ব্রহ্মৈতু সদনাদ্ ঋতস্য, বি রশ্মিভিঃ সসৃজে সূর্যো গাঃ"। সূর্যেরই মতো ইহারও অধিকার জয় করতে হবে এবং দেবতাদের কাজ হ'ল ঐ অধিকার প্রাপ্তির জন্য, ("অর্কস্য সাতৌ") এবং তার সহিত সূর্যের ("সূর্যস্য সাতৌ") এবং স্বর্-এরও ("স্বর্ষাতৌ") অধিকার প্রাপ্তির জন্য সাহায্য দেওয়া।

সুতরাং অঙ্গিরস যে শুধু অগ্নি-শক্তি তা নয়, ইহা বৃহস্পতি-শক্তিও বটে। বৃহস্পতিকে একাধিকবার আঙ্গিরস বলা হয়েছে, যেমন ৬-৭৩-১ শ্লোকে, "যো অদ্রিভিৎ প্রথমজা ঋতাব বৃহস্পতির্ আঙ্গিরসো হবিষ্মান্", "বৃহস্পতি যিনি অদ্রিভেদক (পণিদের গুহা), প্রথমজাত যিনি সত্য পেয়েছেন, আঙ্গিরস, তিনিই আহুতির"। আর ১০-৪৭-৬ শ্লোকে বৃহস্পতি যে আঙ্গিরস তার আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ বর্ণনা পাই; "প্র সপ্তগুম্ ঋতধীতিং সুমেধাং বৃহস্পতিং মতির্ অচ্ছা জিগাতি" ১০-৪৭-৬ "য আঙ্গিরসো নমসা উপসদ্যঃ" "মনন চলে বৃহস্পতির দিকে যিনি সপ্তরশ্মিযুক্ত, সত্যচিন্তাশীল, সুষ্ঠু বুদ্ধি, যিনি আঙ্গিরস এবং যাঁর কাছে যেতে হবে নমঃর সহিত।" ২-২৩-১৮ শ্লোকেও গোযূথের উদ্ধার ও জলরাশির মুক্তি সম্বন্ধে বৃহস্পতিকে

১ তুঃ ১০-৬২-৫ শ্লোকে আঙ্গিরসদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা আছে যে তাঁরা অগ্নির পুত্র, রূপে বিভিন্ন, কিন্তু সকলেই জ্ঞানে গম্ভীর "গম্ভীরবেপসঃ"।

২ মনে হয় বেদে ব্রাহ্মণের অর্থ ইহাই, ইহা নিশ্চিত যে ইহার অর্থ জাতিতে ব্রাহ্মণ বা পেশায় পুরোহিত নন্; এখানে পিতৃগণ যোদ্ধা আবার জ্ঞানী। চারটি জাতিব কথা ঋগ্বেদে একবার মাত্র বলা হ'য়েছে, সেই গম্ভীর কিন্তু শেষ রচনায়, পুরুষসূক্তে।

সম্বোধন করা হ'য়েছে অঙ্গিরস্ বলে: "তোমার মহিমার জন্য পর্বত বিদীর্ণ হ'য়ে গেল, আর তখন তুমি অঙ্গিরঃ গোসমূহের খোঁয়াড়কে উর্ধ্বে মুক্ত করেছিলে; ইন্দ্রের সহযোগে তুমি, হে বৃহস্পতি তমসার দ্বারা পরিবৃত জলরাশির স্রোতকে সবেগে বাহির করেছিলে।" এই প্রসঙ্গে ইহা লক্ষণীয় যে বৃত্র উপাখ্যানের যে বিষয় জলরাশির মুক্তিসাধন তা কত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আঙ্গিরস ঋষিদের ও পণিদের উপাখ্যানের বিষয় গোসমূহের মুক্তি-সাধনের সহিত আর বৃত্র ও পণিগণ উভয়েই অন্ধকারের শক্তি। গোযূথ হ'ল সত্যের জ্যোতি, যে সত্য হ'ল প্রভাকর সূর্য, "সত্যং তৎ...সূর্যম্;" বৃত্রের আবরণকারী অন্ধকার থেকে মুক্ত জলরাশিকে কখন কখন বলা হয় সত্যের জলধারা, "ঋতস্য ধারা", আবার কখন কখন "স্বর্বতীর্ আপঃ" স্বর্-এর, জ্যোতির্ময় সৌরলোকের জলরাশি।

তাহ'লে আমরা দেখি যে অঙ্গিরস প্রথমতঃ দ্রষ্টা-সংকল্প অগ্নির শক্তি; তিনি সেই দ্রষ্টা যিনি কাজ করেন জ্যোতির দ্বারা, জ্ঞানের দ্বারা; তিনি সেই অগ্নিশক্তির শিখা, সেই মহাশক্তি জগতে যার জন্ম হয় যজ্ঞের পুরোহিত এবং যাত্রার নেতা রূপে, ইহাই সেই বীর্য যাকে বামদেবের কথায় (৪-১-১) মর্ত্যগণের মধ্যে অমর্ত্যরূপে প্রতিষ্ঠা করাই দেবতাদের কাজ, সেই শক্তি যা সেই মহৎ কর্ম ("অরতি") সাধন করে। দ্বিতীয়তঃ তিনি সেই বৃহ-স্পতির শক্তি অথবা তাঁর সেই বৃহস্পতির শক্তি আছে যে বৃহস্পতি সত্য-চিন্তাশীল, এবং সপ্তরশ্মিযুক্ত, যাঁর জ্যোতির সপ্ত রশ্মি তাঁর মননের সত্য ধারণ করে ("ঋতধীতিম্") এবং যাঁর সপ্ত আনন সত্যপ্রকাশিকা বাণী পুনরায় উচ্চারণ করে, সেই দেব যাঁর সম্বন্ধে বলা হয় (৪-৫০-৪, ৫), "বৃহস্পতি পরম ব্যোমে মহাজ্যোতি থেকে প্রথম জন্ম নিয়ে, বহুরূপে জাত হ'য়ে, সপ্তানন ও সপ্তরশ্মিযুক্ত হ'য়ে ("সপ্তাস্যঃ সপ্তরশ্মিঃ") অন্ধকার দূর করেন তাঁর রবের দ্বারা; তিনি তাঁর অনুচরদের দ্বারা ঋক্ ও স্টুভের সহিত (দীপ্তির স্তুতি এবং দেবপ্রতিষ্ঠাকারী ছন্দ) বলকে বিদীর্ণ করে-ছিলেন তাঁর রবের দ্বারা"। বৃহস্পতির এই অনুচর দলের বা বাহিনীর ("সুষ্টুভা ঋকৃতা গণেন") অর্থ যে সেই সব আঙ্গিরস ঋষি যাঁরা সত্য মন্ত্রের দ্বারা এই মহান্ জয়ে সাহায্য করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইন্দ্রকেও বলা হয় যে তিনি অঙ্গিরস হচ্ছেন অথবা অঙ্গিরসগুণসম্পন্ন হ'চ্ছেন। তিনি যেন অঙ্গিরাদের সহিত অঙ্গিরস্তম হন, বৃষদের সহিত বৃষ

হন (বৃষ হ'ল পুংশক্তি, পুরুষ, "নৃ" যা প্রযুক্ত হয় রশ্মিমালা ও জলরাশি সম্বন্ধে যারা গোরাজি, "গাবঃ", "ধেনবঃ"), সখাদের সহিত সখা হন, ঋক্সম্পন্নদের সহিত ঋক্সম্পন্ন হন ("ঋগ্মিভির্ ঋগ্মী"), যাত্রীদের সহিত ("গাতুভিঃ", যে অন্তঃপুরুষরা বৃহৎ ও সত্যের দিকে অগ্রসর হন) জ্যেষ্ঠ হন; আমাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ইন্দ্র যেন মরুৎদের সহিত যুক্ত হন ("মরুত্বান্")"। এখানে (১-১০০-৪) যেসব গুণবাচক পদগুলি দেওয়া হ'য়েছে সেগুলি আঙ্গিরস ঋষিদের পক্ষেই যোগ্য পদ এবং মনে করা হয় যে ইন্দ্র অঙ্গিরসত্বের গুণগুলি বা সম্পর্কগুলি নিজের উপর গ্রহণ করেন। সেইরকম ৩-৩১-৭ শ্লোকে বলা হয় "জ্ঞানে সর্বাপেক্ষা দীপ্ত ("বিপ্রতমঃ" যে কথাটি ৪-১১-৩ শ্লোকের "বেপিষ্ঠো অঙ্গিরসাং বিপ্রঃ"র অনুরূপ), সখা হ'য়ে ("সখীয়ন্", আঙ্গিরসরা মহান্ সংগ্রামে বন্ধু বা সহকর্মী) তিনি যাত্রা করলেন ("অগচ্ছৎ" সেই পথের উপর দিয়ে, তুঃ "গাতুভিঃ" যা সরমা আবিষ্কার করেছিল); সুকর্মসাধকের জন্য অদ্রি তার অন্তঃস্থ বিষয়সমূহ ("গর্ভম্") দ্রুত বাহির করে দিল; যুবাদের সহিত পৌরুষদৃপ্ত ("মর্যো যুবভিঃ", যুবা কথাটির দ্বারা অজর, অক্ষয় শক্তির ভাবনাও আসে) তিনি সম্পদের পরিপূর্ণতা প্রার্থনা করে অধিকার লাভ করলেন ("সসান মখস্যন্"); এইভাবে তিনি স্তুতি গান গেয়ে তৎক্ষণাৎ অঙ্গিরস হ'লেন"। আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে এই যে ইন্দ্র অঙ্গিরসের সকল গুণ লাভ করেন তিনি স্বর্-এর, সূর্য বা সত্যের প্রশস্ত লোকের অধিপতি আর আমাদের কাছে তিনি অবতরণ করেন তাঁর দুটি ভাস্বর অশ্ব নিয়ে "হারী",—যেগুলিকে এক স্থানে বলা হয় "সূর্যস্য কেতু", সূর্যের বোধের বা জ্ঞানদৃষ্টির দুই শক্তি—যাতে তিনি অন্ধকারের পুত্রদের সহিত যুদ্ধ করতে এবং মহাযাত্রায় সাহায্য করতে পারেন। আমরা বেদের আন্তর অর্থ সম্বন্ধে যেসব সিদ্ধান্ত করেছি তা যদি সঠিক হয় তাহ'লে ইন্দ্র নিশ্চয়ই দিব্যমনের সেই শক্তি (ইন্দ্র, বীর্যবান্,[১] শক্তিশালী প্রভু) যা মানবের মধ্যে জাত হয় এবং সেখানে বাক্ ও সোমের দ্বারা তাঁর পূর্ণ দিব্যত্বে বৃদ্ধি পান। জ্যোতির জয় ও বৃদ্ধির সাথে এই বৃদ্ধিও চলতে থাকে যতদিন না ইন্দ্র নিজেকে প্রকট করেন সেই সকল ভাস্বর যূথের অধিপতিরূপে যাদের তিনি দেখেন "সূর্যের চক্ষুর" দ্বারা, জ্ঞানের সকল দীপ্তির অধিপতি, দিব্যমনের দ্বারা।

১ কিংবা আবার হয়ত "ভাস্বর", তুঃ "ইন্দু", চন্দ্র; "ইন" গৌরবময়, সূর্য; "ইন্ধ", জ্বালান।

ইন্দ্র অঙ্গিরস হ'য়ে "মরুত্বান্" হন অর্থাৎ মরুদ্গণের অধিকারী বা সহচর হন, আর এই যে মরুদ্গণ ঝড় ও বিদ্যুতের দীপ্তিশালী ও উগ্র দেবতা, যাঁদের মধ্যে যুক্ত হয় বায়ুর, বাত্যার, শ্বাসপ্রশ্বাসের, প্রাণের অধিপতির প্রচণ্ড শক্তি, কবিক্রতু অগ্নির তেজ তাঁরা সেজন্য এমন দ্রষ্টা যাঁরা কাজ করেন জ্ঞানের দ্বারা, "কবয়ো বিদ্মনা অপসঃ" এবং এমন সব যোধ্যমান শক্তি যাঁরা স্বর্গীয় শ্বাসপ্রশ্বাসের ও স্বর্গীয় বিদ্যুতের বলে উৎপাটন করেন প্রতিষ্ঠিত বিষয়সমূহ, কৃত্রিম সব বাধা "কৃত্রিমাণি রোধাংসি" যাদের মধ্যে অন্ধকারের পুত্রেরা নিজেদের সুরক্ষিত করেছিল আর এই মরুৎরা ইন্দ্রকে সাহায্য করেন বৃত্র ও দস্যুদের পরাস্ত করতে। বেদের আন্তর অর্থে, ইহারা মনে হয় সেই সব প্রাণশক্তি যারা তাদের স্নায়বিক বা প্রাণিক সব শক্তির দ্বারা মননের ক্রিয়াকে সমর্থন করে যখন মর্ত্য চেতনার প্রয়াস হয় পরম সত্য ও আনন্দের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে বা নিজেদের সম্প্রসারণ করতে। যাই হোক, ৬-৪৯-১১ শ্লোকে তাঁদেরও সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা কাজ করেন অঙ্গিরসের সব গুণসহ ("অঙ্গিরস্বৎ"), "হে যুবা, ও কবি ও যজ্ঞের সব শক্তি, মরুদ্গণ, বাণী উচ্চারণ করতে করতে এস তোমরা উচ্চস্থানে (অথবা পৃথিবীর বা পর্বতের কাম্য স্তরে, "অধি সানু পৃশ্নেঃ", ৬-৬-৪ যা মনে হয় "বরস্যাম্" কথাটির অর্থ), তোমরা এমন সব শক্তি যা বৃদ্ধি পায়, অঙ্গিরসের[১] মতো সঠিকভাবে চলে (পথের উপর, "গাতু"), দীপ্ত নয় যা কিছু ("অচিত্রম্", যা ঊষার বিচিত্র জ্যোতি পায়নি, অর্থাৎ আমাদের সাধারণ অন্ধকারের রাত্রি) তাকেও আনন্দ দেয়"। এখানেও আমরা পাই আঙ্গিরস ক্রিয়ার সেই একই বৈশিষ্ট্যগুলি, অগ্নির শাশ্বত যৌবন ও শক্তি ("অগ্নে যবিষ্ঠ"), বাক্-এর অধিকার ও উচ্চারণ, দ্রষ্টৃভাব, যজ্ঞকর্মসাধন, মহান্ পথের উপর সঠিক গতি যা, আমরা দেখব, নিয়ে যায় সত্যের জগতে, বৃহৎ ও জ্যোতির্ময় আনন্দে। এমন কি মরুৎদের সম্বন্ধেও বলা হয় (১০-৭৮-৫) যে তাঁরা যেন "সামস্তুতিসমেত অঙ্গিরসগণ, যাঁরা সকল রূপ গ্রহণ করেন" "বিশ্বরূপা অঙ্গিরসো ন সামভিঃ"।

১ এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সায়ণ এখানে অঙ্গিরসের সম্বন্ধে এই অর্থ করতে প্রয়াস করেছেন যে ইহা চলন্ত রশ্মিমালা (চলা অর্থে অঙ্ ধাতু থেকে) অথবা আঙ্গিরস ঋষিরা। এই মহাপণ্ডিত যদি আরো সাহসী হ'য়ে তার সব ভাবনাকে ন্যায়সম্মত সিদ্ধান্তে আনতেন তাহ'লে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলির বিষয়ে এই আধুনিক মতের আভাস পূর্বেই পেতেন।

এইসব ক্রিয়া ও গতিবৃত্তি সম্ভব হয় উষার আগমনের দ্বারা। উষাকেও বলা হ'য়েছে "অঙ্গিরস্তমা" এবং উপরন্তু "ইন্দ্রতমা"। ইন্দ্রের বিদ্যুতে এবং উষার রশ্মিমালাতেও অগ্নির শক্তি, অঙ্গিরস শক্তি নিজেকে প্রকট করে। এই অঙ্গিরস শক্তির দিকের উপর আলোকপাত করে এমন দুটি অংশ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি হ'ল ৭-৭৯-২, ৩। "উষারা তাদের রশ্মিদের ভাস্বর করে দ্যুলোকের প্রান্তভাগসমূহে, কর্মে প্রবৃত্ত করান হ'য়েছে এমন সব মানুষের মতো তারা যত্নশীল হয়। তোমার আলোকযূথ অন্ধকার অপসারণে প্রবৃত্ত হয়, তারা জ্যোতিকে প্রসারিত করে, যেন সূর্য প্রসারিত করে তার দুই বাহুকে। উষা হ'য়ে উঠেছেন (অথবা প্রকট হ'য়েছেন) ইন্দ্র-শক্তিতে পূর্ণতমা হ'য়ে, তিনি সম্পদে সমৃদ্ধা, এবং সৃষ্টি করেছেন জ্ঞানের সব আন্তরপ্রেরণা আমাদের সুখময় গমনের জন্য (অথবা মঙ্গল ও আনন্দের জন্য), দেবী তিনি, দ্যুলোকদুহিতা, অঙ্গিরসত্বে পূর্ণতমা ("অঙ্গি-রস্তমা") তাঁর ধনরাজি দান করেন সুকর্মসাধকের জন্য।" যে সম্পদে উষা সমৃদ্ধা তা সত্যের জ্যোতি ও শক্তি ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না; ইন্দ্রশক্তিতে, দিব্য দীপ্ত মনের শক্তিতে পূর্ণা তিনি ঐ মনের সেই সব আন্তরপ্রেরণা ("শ্রবাংসি") দেন যা আমাদের নিয়ে যায় আনন্দের দিকে এবং তাঁর অন্তঃস্থ শিখাময়ী ও দীপ্তিময়ী অঙ্গিরসশক্তির দ্বারা তিনি তাঁর ধনরাজি দান ও সজ্জিত করেন তাদের জন্য যারা মহৎ কর্ম করে যথাযথ-ভাবে এবং এইভাবে পথে চলে সঠিকভাবে, "ইত্থা নক্ষন্তো অঙ্গিরস্বৎ"। (৬-৪৯-১১)

দ্বিতীয় অংশটি আছে ৭-৭৫ সূক্তে। "উষা, দ্যুলোকজাতা সত্যের দ্বারা উন্মুক্ত করেছেন (অন্ধকারের আবরণ) এবং তিনি আসেন মহিমা ("মহিমানম্") প্রকট করে, অনিষ্ট ও অন্ধকারের ("দ্রুহস্ তমঃ) এবং অপ্রিয় সকল কিছুর আবরণ তিনি অপসারণ করেছেন; অঙ্গিরসত্বে পূর্ণতমা তিনি (মহাযাত্রার) পথগুলি ব্যক্ত করেন। অয়ি উষা, আমাদের জন্য মহান্ আনন্দের দিকে ("মহে সুবিতায়") যাত্রার নিমিত্ত, প্রসারিত কর (তোমার ধনরাজি) ভোগের বৃহৎ অবস্থার জন্য, হে মানবি ও দেবি, আমাদের মধ্যে, আমরা যারা মর্ত্য তাদের মধ্যে, দৃঢ় কর এমন সম্পদ যা বিচিত্র ও উজ্জ্বল ("চিত্রম্") এবং চিদাবিষ্ট জ্ঞানে পূর্ণ ("স্রাবস্যম্")। এইসব হ'ল ঐ দৃষ্টিগোচর উষার কিরণমালা যা এসেছে বিচিত্র উজ্জ্বল ("চিত্রাঃ") অমৃতময় হ'য়ে; সৃষ্টি ক'রে দিব্য কর্মরাজি তারা নিজেদের

বিকীর্ণ করে অন্তরিক্ষলোকের সেই সব পূর্ণ ক'রে" "জনয়ন্তো দৈব্যানি ব্রতানি, আপৃণন্তো অন্তরিক্ষ ব্যস্থুঃ" (ঋক ১, ২, ৩)। আবার আমরা পাই যে অঙ্গিরসশক্তি জড়িত রয়েছে যাত্রার সহিত, অন্ধকারের অপসারণের দ্বারা ইহার পথসমূহের প্রকাশের সহিত এবং ঊষার কিরণমালার সৃষ্টির সহিত; অশুভ শক্তিরা মানবের যে অনিষ্টসাধন করে ("দ্রুহঃ" অনিষ্ট-সমূহ অথবা যারা অনিষ্ট সাধন করে) সেই সম অনিষ্টের প্রতীক হ'ল পণিরা, অন্ধকার হ'ল তাদের গুহা; যাত্রা হ'ল তা-ই যা জ্যোতি, ও শক্তি ও জ্ঞানের বর্ধিষ্ণু সম্পদের দ্বারা নিয়ে যায় দিব্য সুখ ও অমৃতময় আনন্দের অবস্থায়; ঊষার যে অমৃতময় কিরণমালা মানবের মাঝে দিব্য কর্মরাজি সৃষ্টি করে এবং তা দিয়ে পূর্ণ করে পৃথ্বী ও দ্যৌর মধ্যস্থ অন্তরিক্ষ লোক-সমূহের কর্মরাজি, অর্থাৎ সেই সব প্রাণলোকের ক্রিয়া যা নিয়ন্ত্রিত হয় আমাদের শারীরিক ও শুদ্ধ মানসিক সত্তার সংযোগকারী বায়ুর দ্বারা তারাই সব অঙ্গিরসশক্তি হ'তে পারে। কারণ তারাও দিব্য কর্মরাজি অক্ষত রেখে ("অমর্ধন্তো দৈব্যা ব্রতানি") সত্য লাভ করে ও রক্ষা করে। বস্তুতঃ ইহাই তাদের কাজ—দিব্য ঊষাকে মর্ত্য প্রকৃতির মধ্যে আনা যাতে দৃশ্যমানা দেবী তাঁর ধনরাজি বর্ষণ ক'রে সেখানে থাকতে পারেন একই সাথে দেবী ও মানুষী হ'য়ে "দেবি মর্তেষু মানুষি", মর্ত্যগণের মধ্যে মানুষী দেবী হ'য়ে।

সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তশীর্ষ ধী, স্বর্ ও দশগ্বগণ

তাহ'লে বেদের ভাষা থেকে আঙ্গিরস ঋষিদের দুইটি বিভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হল বেদের বাহ্য আকার; ইহাতে সূর্য, শিখা, উষা, গো, অশ্ব, মদ্য, যজ্ঞের স্তুতি প্রভৃতির প্রাকৃতিক চিত্রগুলি একত্র গাঁথা হয়; অন্যটি এই সব চিত্র থেকে তাদের আন্তর অর্থ বাহির করে। আঙ্গিরসগণ শিখার পুত্র, উষার কিরণমালা, মদ্যদাতা ও মদ্যপায়ী, স্তুতিগায়ক, শাশ্বত যুবা ও বীর যাঁরা অন্ধকারের পুত্রদের কবল থেকে আমাদের জন্য জোর করে নিয়ে আসেন সূর্য, গোযূথ, অশ্বগণ, এবং সকল ধনরাজি। কিন্তু তাঁরাই আবার সত্যদ্রষ্টা, সত্যের বাণীর সন্ধানী প্রাপক ও প্রবক্তা এবং সত্যের শক্তির দ্বারা তাঁরা আমাদের জন্য জয় করেন জ্যোতি ও অমৃতত্বের প্রশস্ত লোক যাকে বেদে বলা হয় বৃহৎ, সত্য ও ঋত এবং যে শিখার সন্তান তারা তাদের আপন ধাম। প্রাকৃতিক চিত্রগুলি এবং এই মনস্তাত্ত্বিক আভাসগুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত এবং একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করা যায় না। সুতরাং সাধারণ জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হই যে, যে শিখার আপন ধাম হল ঋত ও সত্য তা নিজেই ঋত ও সত্যের শিখা, যে জ্যোতি সত্যের দ্বারা এবং সত্য মননের শক্তির দ্বারা জয় করা হয় তা শুধু ভৌতিক আলোক নয়, যে গোরাজিকে সরমা দেখতে পায় সত্যের পথে তারা শুধু পশুর যূথ নয়, অশ্বগুলি শুধু আক্রমণকারী আর্যজাতির দ্বারা জয়-করা দ্রাবিড়বাসীদের সম্পদ নয়, এমনকি প্রাকৃতিক উষার, ইহার আলোক এবং দ্রুতগামী রশ্মিমালার কথাও শুধু চিত্র নয়, আর পণিরা ও বৃত্র যে অন্ধকারকে আটক রাখে তা শুধু ভারতের বা মেরুপ্রদেশের অন্ধকার নয়। এমনকি আমরা সাহস করে একটি যুক্তিসঙ্গত প্রকল্পও প্রতিষ্ঠা করেছি যা দিয়ে এই সব চিত্রের প্রকৃত অর্থ উদ্ধার করা যায় এবং আমরা আবিষ্কার করতে পারি এই সব ভাস্বর দেবতাদের এবং এই সব দিব্য জ্যোতির্ময় বিপ্রদের প্রকৃত দেবত্ব।

আঙ্গিরস ঋষিরা একই সাথে দিব্য ও মানুষী দ্রষ্টা। এই বিপ্রদের পক্ষে এই দ্বৈত প্রকৃতি বেদে কোন অসামান্য লক্ষণ বা বিশেষ কিছু নয়।

বৈদিক দেবগণেরও দুইটি ক্রিয়া আছে; দিব্য এবং নিজেদের মধ্যে পূর্ব-থেকেই অবস্থিত, আবার মর্ত্যলোকে যখন তাঁরা মহৎ উত্তরণের অভিমুখে বৃদ্ধি পান তখন তাঁদের কর্মে তাঁরা মানুষ। এই কথাটি চমৎকার ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে উষার প্রতি সম্বোধনে—"মর্ত্যগণের মধ্যে হে মানুষী দেবী" "দেবি মর্তেষু মানুষি" (৭-৭৫-২)। কিন্তু আঙ্গিরস ঋষিদের চিত্রে এই দ্বৈত প্রকৃতি আরো জটিল হ'য়ে উঠেছে কারণ জনশ্রুতি হ'ল যে তাঁরা মানুষী পিতৃগণ, জ্যোতি, পন্থা ও লক্ষ্যের আবিষ্কারক। আমাদের দেখতে হবে বৈদিক ধর্মমত ও বৈদিক প্রতীক্‌-তন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যার উপর এই জটিলতার প্রভাব কি।

সাধারণতঃ বলা হয় যে আঙ্গিরস ঋষিরা সংখ্যায় সাতজন: তাঁরা "সপ্ত বিপ্রাঃ", সপ্ত ঋষি, যাঁদের কথা আমরা পেয়েছি পুরাণের[১] মধ্যে এবং ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে যাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে সপ্তর্ষিমণ্ডলে। কিন্তু তাঁদের আবার নবগ্ব ও দশগ্বও বলা হ'য়েছে আর যদিও ৬-২২-২ শ্লোকে বলা হ'য়েছে যে পূর্ব পিতৃগণ, সপ্ত ঋষিগণ নবগ্ব ছিলেন, "পূর্বে পিতরো নবগ্বাঃ সপ্ত বিপ্রাসঃ", তবু আবার ৩-৩৯-৫ শ্লোকে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলা হ'য়েছে—নবগ্ব ও দশগ্ব—; শেষোক্তদের সংখ্যা দশ আর পূর্বোক্তদের সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে বলা না হলেও মনে হয় নয়। "সখা হ যত্র সখিভির্‌ নবগ্বৈর্‌, অভিজ্ঞা শতভির্‌ গা অনুগমন্‌; সত্যং তদিন্দ্রো দশভির্‌ দশগ্বৈঃ সূর্যং বিবেদ তমসি ক্ষিয়ন্তম্‌", "যেখানে একজন সখা তাঁর সখাবৃন্দ নবগ্বদের সহিত গোরাজিকে অনুসরণ ক'রে, ইন্দ্র দশসংখ্যক দশগ্বদের সহিত ঐ সত্য পেয়েছিলেন, এমন কি অন্ধকারে অবস্থিত সূর্যকে"। অপরপক্ষে ৪-৫১-৪ শ্লোকে আমরা আঙ্গিরস সম্বন্ধে একটি যৌথ বর্ণনা পাই যে তাঁরা সপ্তানন বা সপ্তবদন বিশিষ্ট, নবরশ্মিযুক্ত, দশরশ্মিযুক্ত, "নবগ্বে অঙ্গিরে দশগ্বে সপ্তাস্যে"। ১০-১০৮-৮ শ্লোকে আমরা নবগ্ব আঙ্গিরসদের সহিত আর এক ঋষি "অয়াস্যের" উল্লেখ পাই। ১০-৬৭-১ শ্লোকে এই অয়াস্য সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি আমাদের পিতা যিনি সত্যজাত বৃহৎ সপ্তশীর্ষ ধী পেয়েছিলেন এবং ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি গেয়েছিলেন। নবগ্বরা যদি সাত বা নয় জন হন, তাহ'লে অয়াস্য হবেন অষ্টম বা দশম ঋষি।

১ পুরাণে যেসব নাম দেওয়া হ'য়েছে সেইগুলিই যে বৈদিক জনশ্রুতিতে দেওয়া হ'ত তার কোন কারণ নেই।

জনশ্রুতিতে দুই শ্রেণীর আঙ্গিরস ঋষিদের পৃথক অস্তিত্বের কথা বলা হয়, এক শ্রেণীর হ'ল নবগ্বরা যাঁরা নয় মাস ধরে যজ্ঞসাধনা করেছিলেন এবং অন্য শ্রেণী দশগ্বরা যাদের যজ্ঞকাল দশমাসব্যাপী ছিল। এই ব্যাখ্যা অনুসারে আমাদের কর্তব্য নবগ্ব ও দশগ্বদের "নবগোযুক্ত" ও "দশগোযুক্ত" অর্থ করা, প্রতি গো হ'ল যজ্ঞীয় বৎসরের এক মাসের ত্রিশটি উষার সমাহার। কিন্তু ঋগ্বেদে অন্ততঃ একটি শ্লোক আছে যা বাহ্যভাবে এই পরম্পরাগত ব্যাখ্যার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কারণ ৫-৪৫ সূক্তের সপ্তম শ্লোকে এবং আবার একাদশ শ্লোকে বলা হ'য়েছে যে নবগ্বরাই, যজ্ঞ করেছিলেন বা স্তোত্র গেয়েছিলেন দশমাস ধরে, দশগ্বরা নয়। এই সপ্তম শ্লোকটি এই, "অনূনোদ্ অত্র হস্তয়তো অদ্রির্ আর্চন যেন দশ মাসো নবগ্বাঃ; ঋতম্ যতী সরমা গা অবিন্দদ্ বিশ্বানি সত্যা অঙ্গিরাশ্চকার", "এইখানে হস্ত দ্বারা চালিত হ'য়ে প্রস্তর চীৎকার করেছিল (বা নড়েছিল), যার দ্বারা নবগ্বরা দশমাস ধরে স্তোত্র গেয়েছিলেন; সত্যপথযাত্রী সরমা গোরাজির সন্ধান পেয়েছিলেন; সকল বিষয়কেই অঙ্গিরস্ সত্য করেছিলেন"। আর ১১শ শ্লোকে এই কথাটি পুনর্বার বলা হ'য়েছে;" ধিয়ং বো অপ্সু দধিষে স্বর্ষাম্ যয়াতরন্ দশ মাসো নবগ্বাঃ; অয়া ধিয়া স্যাম দেবগোপাঃ, অয়া ধিয়া তুতুর্যাম অতি অনহঃ," "জলরাশির (অর্থাৎ সপ্ত নদীর) মধ্যে আমি তোমার জন্য ধারণ করি ধী যা স্বর্গের[১] অধিকার জয় করে (ইহাই আবার সেই সপ্তশীর্ষ ধী যা সত্য থেকে জাত হ'য়েছিল এবং অয়াস্য পেয়েছিলেন), যার দ্বারা নবগ্বরা দশমাস অতিবাহিত করেছিলেন; এই ধীর দ্বারা আমরা যেন দেবতাদের পাই পরিত্রাতা রূপে, এই ধীর দ্বারা আমরা যে অশুভ পার হ'য়ে যেতে পারি।" এই উক্তিটি স্পষ্ট। অবশ্য সায়ণ ক্ষীণ চেষ্টা করে বলেন যে ৫-৪৫-৭ শ্লোকের "দশ মাসঃ" দশমাস যেন ইহা একটি উপাধি বিশেষ আর ইহার অর্থ দশমাসব্যাপী সাধকরা অর্থাৎ দশগ্বরা; কিন্তু তিনি এই অসম্ভব ব্যাখ্যা করেন শুধু এক বিকল্প হিসাবে এবং একাদশ ঋকে এই ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করেন।

১ সায়ণ ইহার অর্থ করেন, "আমি স্তুতি আবৃত্তি করি জলের জন্য" অর্থাৎ বৃষ্টি পাবার জন্য, কিন্তু এখানে সপ্তমীর বহুবচন প্রয়োগ করা হ'য়েছে আর 'দধিষে'র অর্থ "আমি রাখি বা ধারণ করি" অথবা মনস্তাত্ত্বিক অর্থে, "চিন্তা করি" বা "মননে ধারণ করি, ধ্যান করি"। 'ধী'র মতো ধিষণার অর্থ মনন; সুতরাং "ধিয়ং দধিষে"র অর্থ হবে "আমি চিন্তা করি বা মনন ধ্যান কবি।"

তাহ'লে কি আমাদের এই মনে করতে হবে যে এই সূক্তের কবি জনশ্রুতি ভুলে গেছলেন এবং দশগ্ব ও নবগ্বদের মধ্যে তাঁদের একটা বিভ্রান্তি হ'য়েছিল? এরূপ মনে করা অসঙ্গত হবে। এই সমস্যার উদয় হয় এই কারণে যে আমরা মনে করি যে বৈদিক ঋষিরা দুই বিভিন্ন শ্রেণীর আঙ্গিরস ঋষিদের কথা ভাবতেন; বরং মনে হয় ইহারা অঙ্গিরসত্বের দুইটি বিভিন্ন শক্তি এবং সেক্ষেত্রে নবগ্বরা যজ্ঞকালকে নয়মাসের পরিবর্তে দশমাসে প্রসারিত ক'রে নিজেরাই দশগ্ব হতে পারতেন। সূক্তের "দশ মাসো অত-রন্" কথাটিতে মনে হয় পূর্ণ দশমাস ধরে যজ্ঞসাধনে কোন অসুবিধা ছিল। মনে হয় এই সময়টিতেই অন্ধকারের শক্তিদের যজ্ঞ ব্যাহত করার ক্ষমতা ছিল; কারণ বলা হয়েছে যে, যে ধী স্বর্, সৌরলোক জয় করে তা দৃঢ় করা হ'লেই ঋষিরা দশ মাস কাল অতিবাহিত করতে সমর্থ হন, কিন্তু এই ধী একবার পাওয়া হ'লে তাঁরা দেবতাদের রক্ষাকারী আশ্রয় সম্বন্ধে নিশ্চিত হন এবং অশুভের আঘাত, পণিদের ও বৃত্রদের অনিষ্টসমূহ পার হ'য়ে যান। এই স্বর্-জয়ী ধী নিশ্চয়ই সেই সপ্তশীর্ষ ধী যা সত্য থেকে জাত হ'য়েছিল এবং যাকে পেয়েছিলেন নবগ্বদের সখা অয়াস্য; কারণ বলা হয় যে ইহার দ্বারা অয়াস্য বিশ্বজনীন হ'য়ে, সকল জগতের মধ্যে সকল জন্ম নিজের মধ্যে নিয়ে এক চতুর্থ লোক বা চতুর্বিধ লোক সৃষ্টি করেছিলেন আর এই চতুর্থ লোক নিশ্চয়ই তিনটি নিম্ন লোকের, "দ্যৌ", "অন্তরিক্ষ" ও "পৃথ্বী"র উর্ধ্বে অতিমানসিক লোক হবে, সেই প্রশস্তলোক যা ঘোর পুত্র কাণ্বর কথায় মানুষ পায় বা সৃষ্টি করে বৃত্রকে নিধন করার পর দুই "রোদসী" উত্তরণ ক'রে। সুতরাং এই চতুর্থ লোকই নিশ্চয়ই স্বর্। অয়াস্যের সপ্তশীর্ষ ধী তাঁকে "বিশ্বজন্য" হতে সমর্থ করে; ইহার অর্থ সম্ভবতঃ এই যে তিনি সকল জগৎ বা অন্তঃপুরুষের সকল জন্ম দখল বা অধিকার করেন আর না হয় তিনি সকল জাত সত্তার সহিত নিজেকে একাত্ম করে বিশ্বজনীন হন। তিনি আরো সমর্থ হন একটি চতুর্থ লোক ("স্বর্") ব্যক্ত করতে বা সৃষ্টি করতে, "তুরীয়ং স্বিজ্ জনয়দ্ বিশ্বজন্যঃ (১০-৬৭-১); এবং জলরাশির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যে ধী নবগ্ব ঋষিদের দশমাস অতিবাহিত করতে সমর্থ করে তা আবার "স্বর্ষা", অর্থাৎ তা স্বর্‌কে অধিকারভুক্ত করে। স্পষ্টতঃই জলরাশি হ'ল সপ্ত নদী আর ইহাও স্পষ্ট যে দুইটি মননই এক। তাহ'লে কি আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত হবে না যে নবগ্বদের সহিত অয়াস্য যুক্ত হ'লেই নয়জন

নবগ্ব দশজন হন এবং এইজন্যই তাঁর সপ্তশীর্ষ স্বর্-জয়ী ধী আবিষ্কারের দ্বারা তাঁরা তাদের নয়মাসের যজ্ঞকে দশমাসে প্রসারিত করতে সমর্থ হন? এইভাবেই তাঁরা দশগ্ব হ'য়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি যে, সোমের যে মত্ততার দ্বারা ইন্দ্র স্বরের অথবা স্বর্-পুরুষের ("স্বর্ণর") বীর্য ব্যক্ত বা বর্ধিত করেন তাকে বলা হ'য়েছে দশরশ্মিযুক্ত এবং দীপ্তিকারী, "দশগ্বং বেপয়ন্তম্"। (৮-১২-২)

আমরা পূর্বেই যে ৩-৩৯-৫ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছি তাতে এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ দৃঢ় হয়। কারণ সেখানে আমরা পাই যে নবগ্বদের সাহায্যে ইন্দ্র হারানো গোরাজির সন্ধানে চলেন কিন্তু দশগ্বদের সাহায্যেই তিনি এই সন্ধান-কার্যকে সফল করতে এবং সেই সত্যকে, "সত্যং তৎ"কে, অর্থাৎ অন্ধকারে অবস্থিত সূর্যকে লাভ করতে সমর্থ হন। অন্যকথায় ইহার অর্থ এই যে যখন নয়মাসের যজ্ঞ দশমাসে প্রসারিত হয়, যখন নবগ্বরা দশম ঋষি অয়াস্যের সপ্তশীর্ষ ধীর দ্বারা দশগ্ব হ'য়ে ওঠেন তখনই সূর্য পাওয়া যায় এবং স্বর্-এর যে জ্যোতির্ময় লোকের মধ্যে আমরা সত্য বা এক বিশ্বদেব অধিকার করি তা দেখা যায় ও জয় করা হয়। এই স্বর্-জয়ই আঙ্গিরস ঋষিদের দ্বারা সাধিত যজ্ঞ ও মহৎ কর্মের লক্ষ্য।

কিন্তু এই 'মাস' কথাটির সাংকেতিক অর্থ কি? কারণ ইহা এখন স্পষ্ট হ'য়েছে যে ইহা এক সংকেত, এক রূপক; বৎসর প্রতীকার্থক্, মাসও প্রতীকার্থক্[১]। বৎসরের আবর্তনেই হারানো সূর্যের ও হারানো গোরাজির পুনরুদ্ধারসাধন হয় কারণ ১০-৬২-২ শ্লোকে আমরা এই স্পষ্ট উক্তি পাই, "ঋতেনাভিন্দন্ পরিবৎসরে বলম্" "সত্যের দ্বারা, বৎসরের আবর্তনে তাঁরা বলকে ভেদ করেছিলেন", অথবা সায়ণের কথায় "শতবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞের দ্বারা"। এই অংশটিতে মেরুপ্রদেশের তথ্য বহুপরিমাণে সমর্থিত হয়, কারণ ইহাতে বলা হয় সূর্যের বার্ষিক আগমনের কথা, আহ্নিক আগমনের কথা নয়। কিন্তু বাহ্য আকারের সহিত আমাদের সংস্রব নেই, আর ঐ তথ্যের সত্যতাতে আমাদের নিজেদের ব্যাখ্যার কিছু তারতম্য হয় না; কারণ ইহাও সম্ভব যে মেরুপ্রদেশের দীর্ঘ রাত্রির অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, বাৎসরিক সূর্যোদয় ও নিরন্তর উষার উদয়কেই রহস্যবাদীরা আধ্যাত্মিক রাত্রি ও ইহার দুরূহ দীপ্তির সংকেত করেছিলেন। কিন্তু

১ ইহা দ্রষ্টব্য যে পুরাণে যুগ, মুহূর্ত, মাস প্রভৃতি সবই প্রতীকার্থক্ আর বলা হয় যে মানবের দেহ হ'ল বৎসর।

কালের, মাসের ও বৎসরের এই ভাবনাকে যে প্রতীক্‌রূপে ব্যবহার করা হ'য়েছে তা বেদের অন্য অংশ থেকে মনে হয় স্পষ্ট হ'য়েছে, বিশেষতঃ বৃহস্পতির উদ্দেশে গৃৎসমদের ২-২৪।

এই সূক্তে বলা হ'য়েছে যে বৃহস্পতি গোরাজিকে উপরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, দিব্য বাণীর দ্বারা "ব্রহ্মণা" বলকে বিদীর্ণ করছেন, অন্ধকারকে নিগুহিত করছেন এবং স্বর্‌কে প্রকাশিত করছেন (ঋক্ ৩)। ইহার প্রথম ফল হ'ল, যে কূপের মুখ প্রস্তরময় এবং যার ধারা মধুময়, "মধু", সোমমাধুর্যে ভরা ("অশ্মাস্যম্ অবতং মধুধারম্") তাকে জোর ক'রে উন্মুক্ত করা (ঋক্ ৪)। প্রস্তর দিয়ে আবৃত এই কূপ পরম আনন্দময় ত্রিধামের আনন্দ বা পরম নিশ্রেয়স্, অর্থাৎ সৎ, চিৎ-তপস্ ও আনন্দ এই পরম ত্রিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরাণে কথিত সত্য, তপ ও জন লোকের আনন্দ; তাদের ভিত্তি হ'ল বেদের স্বর্ এবং উপনিষদ ও পুরাণসমূহের মহঃ, সত্যের লোক।[১] এই চারটির সমাহারে চতুর্বিধ চতুর্থ লোক গঠিত হয় আর বেদে ইহাদের বলা হয় চারিটি পরম ও গোপন আসন, "চারি ঊর্ধ্বস্থিতা নদীর" উৎস। কখন কখন এই উপরের লোককে দুইটি লোকে বিভক্ত করা হয়—একটি হ'ল ভিত্তিস্বরূপ স্বর্ এবং অন্যটি শিখর স্বরূপ ময়ঃ বা দিব্য আনন্দ আর এইভাবে উত্তরণকারী পুরুষের জন্য পঞ্চ লোক বা জন্ম রয়েছে। অন্য তিনটি নদী হ'ল সত্তার তিনটি অবর শক্তি এবং ইহারাই তিনটি নিম্ন লোকের তত্ত্ব পূরণ করে।

যাঁরা স্বর্ দেখতে সমর্থ হন তাঁরা সকলেই এই মধুময় গোপন কূপ পান করেন এবং তাঁরা বহুধারায় একত্র বর্ষণ করেন ইহার মাধুর্যের তরঙ্গ-ময় উৎস, "তম্ এব বিশ্বে পপিরে স্বর্দৃশো বহু সাকং সিসিচুর্ উৎসম্ উদ্রিণাম্ (২-২৪-৪)। এই যে বহু ধারাগুলি একত্র বর্ষিত হয় ইহারাই সেই সপ্ত নদী যা ইন্দ্র পর্বত বেয়ে নিম্নে বর্ষণ করেন বৃত্র হননের পর। ইহারাই সত্যের নদী বা ধারা, "ঋতস্য ধারাঃ"; এবং আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইহারাই চিন্ময় সত্তার সেই সপ্ত তত্ত্বের প্রতীক্ যেগুলি তাদের দিব্য পূর্ণতা পায় পরম সত্য ও আনন্দের মধ্যে। এইজন্যই সপ্তশীর্ষ

১ উপনিষদ ও পুরাণগুলিতে স্বর্ ও দ্যৌ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সুতরাং সত্যলোকের জন্য একটি চতুর্থ নাম বাহির করতে হ'ল এবং ইহাই মহঃ যা তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথায় ঋষি মহাচামস্য আবিষ্কার করেছিলেন চতুর্থ ব্যাহৃতি হিসাবে; অন্য তিনটি ব্যাহৃতি হ'ল স্বর্, ভুবঃ ও ভূঃ অর্থাৎ বেদের দ্যৌ, অন্তরিক্ষ ও পৃথ্বী।

ধীকে অর্থাৎ সপ্তশীর্ষ বা শক্তি সমেত দিব্য অস্তিত্বের জ্ঞানকে, বৃহস্পতির সপ্তরশ্মিযুক্ত জ্ঞানকে, "সপ্তগুম্" জলরাশির মধ্যে, সপ্ত নদীর মধ্যে মননে দৃঢ় বা ধারণ করতে হবে, অর্থাৎ দিব্য চেতনার সপ্তরূপগুলিকে ধারণ করতে হবে দিব্যসত্তার সপ্ত রূপে বা গতিবৃত্তিতে; "ধিয়ং বো অপ্সু দধিষে স্বর্ষাম্", স্বর্-জয়ী ধীকে আমি ধারণ করি জলরাশির মধ্যে।

স্বর্-দ্রষ্টাগণের "স্বর্দৃশঃ" নেত্রে স্বর্‌কে দৃশ্যমান করার, তাঁদের মধুময় কূপ পান করার এবং দিব্য জলরাশির বহিঃবর্ষণের অর্থ যে মানবের কাছে নূতন জগতের, অথবা অস্তিত্বের নূতন অবস্থার প্রকাশ তা সুস্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে পরের শ্লোকে (২-২৪-৫), "সনা তা কা চিদ্ ভুবনা ভবীত্বা মদ্ভিঃ শরদ্ভিঃ দুরো বরন্তো বঃ; অযতন্তা চরতো অন্যদ্ অন্যদ্ ইদ্, যা চকার বয়ুনা ব্রহ্মণস্পতিঃ", "এইসব কিছু সনাতন লোক (অস্তিত্বের অবস্থা) যারা আবির্ভূত হ'য়েছে, তাদের দ্বারগুলি তোমাদের কাছে রুদ্ধ[১] (বা উন্মুক্ত) করা হয় মাস ও বৎসরগুলির দ্বারা; বিনা চেষ্টায় এক (লোক) অন্যটির মধ্যে চলে যায় আর এইগুলিকেই ব্রহ্মণস্পতি জ্ঞানে ব্যক্ত করেছেন"; "বয়ুনা"র অর্থ জ্ঞান এবং দুটি রূপ হ'ল ব্রহ্মণস্পতির দ্বারা সৃষ্ট দিব্যভাবাপন্ন পৃথিবী ও স্বর্গ। ইহারাই সেই চার সনাতন লোক যা প্রচ্ছন্ন থাকে সত্তার "গুহা"য়, গূঢ়, অব্যক্ত অতিচেতন অংশগুলিতে; যদিও এগুলি নিজেরা সনাতনভাবে বর্তমান অস্তিত্বের অবস্থা ("সনা ভুবনা") তবু আমাদের পক্ষে ইহারা অস্তিত্বহীন এবং ভবিষ্যতের গর্ভে; আমাদের জন্য সত্তায় তাদের প্রকাশিত করতে হবে, "ভবীত্বা", এখনো তাদের সৃষ্টি করা চাই। সেজন্য বেদে কখন কখন বলা হয় যে স্বর্‌কে এখানে দৃশ্যমান করা হয়েছে, ("ব্যচক্ষয়ৎ স্বঃ"—২-২৪-৩) অথবা আবিষ্কার করে অধিকার করা হয়েছে, "অবিদৎ, অসনৎ", আবার কখন বলা হ'য়েছে যে ইহা সৃষ্ট বা নির্মিত হয়েছে ("ভূ", "কৃ")। ঋষি বলেন, এই সব গূঢ় সনাতন লোক আমাদের কাছে রুদ্ধ হ'য়েছে কালের গতির দ্বারা, মাস ও বৎসরগুলির দ্বারা; সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তাদের আবিষ্কার করতে হবে,

১ সায়ণ বলেন যে এখানে "বরন্ত"র অর্থ "উন্মুক্ত", ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব, কিন্তু সাধারণতঃ 'বৃ'র অর্থ রুদ্ধ করা, বদ্ধ করা, আবৃত করা, বিশেষতঃ যখন তা প্রয়োগ করা হয় পর্বতের দ্বারগুলির বেলায় যেখান থেকে নদীসমূহ ও গোরাজি প্রবাহিত হয়; বৃত্র সেই যে দ্বার রুদ্ধ করে। "বি বৃ" ও অপ বৃ" এ দুয়ের অর্থ মুক্ত করা। তা সত্ত্বেও যদি এখানে পদটির অর্থ হয় "উন্মুক্ত করা", তাহ'লে আমাদের ব্যাখ্যাই আরো জোরালো হবে।

প্রকাশিত করতে হবে, জয় করতে হবে, আমাদের মধ্যে সৃষ্ট করতে হবে কালের গতির দ্বারা অথচ এক অর্থে কালের গতির বিরুদ্ধে। আমার মনে হয় এক আন্তর বা মনস্তাত্ত্বিক কালের মধ্যে এই যে বিকাশ তারই প্রতীক্ হ'ল যজ্ঞীয় বৎসর এবং দশমাস যা অতিবাহিত করার পরই অন্তঃপুরুষের প্রকাশিকা স্তুতি ("ব্রহ্ম") সমর্থ হয় সপ্তশীর্ষ স্বর্গ-জয়ী ধীকে আবিষ্কার করতে আর ইহাই অবশেষে আমাদের নিয়ে যায় বৃত্র ও পণিদের অনিষ্টসমূহের অতীতে।

নদী এবং লোকসমূহের সংযুযোগের কথা আমরা সুস্পষ্টভাবে পাই ১-৬২-৪ শ্লোকে যেখানে ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি অদ্রি ভেদ করেছিলেন নবগ্বদের সাহায্যে এবং বলকে বিদীর্ণ করেছিলেন দশগ্বদের সাহায্যে। আঙ্গিরস ঋষিদের স্তুতিতে, ইন্দ্র অন্ধকার অপাবৃত করেন উষা ও সূর্য ও গোরাজির দ্বারা, তিনি পার্থিব অদ্রির উচ্চ সানুকে প্রসারিত করেন ব্যাপ্তিতে এবং ধারণ করেন স্বর্গের পরতর লোক। কারণ চেতনার পরতর লোকসমূহের উন্মুক্ত করার ফল হ'ল শারীরিক চেতনার ব্যাপ্তির বৃদ্ধি-সাধন এবং মানসিক চেতনার উচ্চতার উন্নয়ন! ঋষি নোধা বলেন, "বস্তুতঃ ইহাই তাঁর প্রবলতম কর্ম, ইহাই সাধকের চারুতম সাধন", "দস্মস্য চারুতমম্ অস্তি দংসঃ", "মধুস্রাবিণী উর্ধ্বস্থিতা চারি নদী কুটিল-তার দুই লোককে পোষণ করে" "উপহ্বরে যদ্ উপরা অপিন্বন্ মধ্বর্ণসো নদ্যশ্চতস্রঃ (১-৬২-৬)। ইহাই আবার সেই মধুস্রাবী কূপ যা তার বহু স্রোতধারা একত্র নিম্নে বর্ষণ করে; দিব্য সত্তার, দিব্য চিন্ময় শক্তির, দিব্য আনন্দের, দিব্য সত্যের, চারটি উচ্চতর নদী পোষণ করছে মন ও দেহের দুই লোককে যাদের মধ্যে তারা অবতরণ করে তাদের মাধুর্যের বন্যা নিয়ে। এই দুই লোক, "রোদসী" সাধারণতঃ কুটিলতার অর্থাৎ মিথ্যার জগৎ আর "ঋতম্" বা সত্য হ'ল ঋজু জগৎ আর "অনৃতম্" বা মিথ্যা কুটিল জগৎ কারণ তারা অদিব্য শক্তিসমূহের, বৃত্র ও পণিদের, অন্ধকার ও বিভাজনের পুত্রদের অনিষ্টসমূহের আয়ত্তাধীন। তারা এখন হ'য়ে ওঠে সত্যের বিভিন্ন রূপ, জ্ঞান, "বয়ুনা", বাহ্য কর্মের সহিত এই জ্ঞানের সামঞ্জস্য থাকে এবং ইহাই স্পষ্টতঃ গৃৎসমদের "চরতো অন্যাদ্ অন্যাদ্" এবং "যা চকার বয়ুনা ব্রহ্মণস্পতিঃ"। ঋষি তারপর বলে চলেন অয়াস্যের কর্মের ফলের কথা আর তা হ'ল পৃথ্বী ও দ্যৌ-এর সত্য, সনাতন ও সম্মিলিত রূপ প্রকাশ করা। "তাদের দ্বিবিধ (দিব্য ও মানুষী)

প্রকারের মধ্যে অয়াস্য তাঁর স্তুতি বলে অপাবৃত করেছিলেন দুই সনাতন লোক এবং একই নীড়ের মধ্যে; সুষ্ঠুভাবে কর্ম সম্পাদন করে তিনি পৃথ্বী ও দ্যৌকে ধারণ করলেন পরম ব্যোমে (প্রকাশিত অতিচেতনের, "পরমং গুহ্যম্") যেমন ভোক্তার দুই স্ত্রী থাকে (১-৬২-৭)। আধ্যাত্মিক সত্তার শাশ্বত আনন্দের মধ্যে উত্তোলিত দিব্যভাবাপন্ন মানসিক ও শারীরিক অস্তিত্বের এই যে অন্তঃপুরুষের উপভোগ ইহার কথা আরো স্পষ্টভাবে ও সুন্দর করে চিত্রিত করা সম্ভব নয়।

এই সব ভাবনা এবং অনেকগুলি কথা গৃৎসমদের সূক্তেরই মতো একই। রাত্রি এবং উষা, অন্ধকারময় শারীরিক ও সুদীপ্ত মানসিক চেতনা সম্বন্ধে নোধা বলেন পৃথ্বী ও দ্যৌ-এর চারিধারে নবজাত ("পুনর্ভবা") তারা পরস্পরের মধ্যে চলাচল করে তাদের আপন আপন নিজস্ব গতিবৃত্তি নিয়ে, "স্বেভির্ এবৈর্...চরতো অন্যান্যা" (১-৬২-৮)[১] আর তা হয় তাদের যে পুত্র এইভাবে তাদের উর্ধ্বে ধারণ করে তার মহৎ কর্মের দ্বারা সাধিত চিরন্তন বন্ধুতার মধ্যে, "সনেমি সখ্যম্ স্বপস্যমানঃ, সূনুর্ দাধার শবসা সুদংসাঃ" (১-৬২-৯)। যেমন নোধার সূক্তে বলা হ'য়েছে তেমন গৃৎসমদের সূক্তেও বলা হ'য়েছে যে আঙ্গিরসরা সত্য লাভ করেন ও অনৃত বাহির করে দিয়ে স্বর্-এ গমন করেন—সেই সত্যে যা থেকে তারা প্রথমে এসেছিলেন এবং যা সকল দিব্য পুরুষের "স্বীয় ধাম"। "যাঁরা লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেন এবং পণিদের সেই ধন লাভ করেন যে পরম ধন নিহিত থাকে গূঢ় গুহার মধ্যে, তাঁরা জ্ঞানলাভ করেন এবং অনৃত দেখে আবার উঠে যায় সেখানে যেখান থেকে তাঁরা এসেছিলেন এবং সেই লোকের মধ্যে প্রবেশ করেন। ঋতবান্ হ'য়ে, অনৃতসমূহ লক্ষ্য করে তাঁরা, দ্রষ্টারা আবার আরোহণ করেন মহান পন্থার মধ্যে", "মহস্ পথঃ" (২-২৪-৬, ৭),—ইহা সেই সত্যের পথ, অথবা মহৎ ও প্রশস্ত রাজ্য, উপনিষদের মহঃ।

আমরা এখন এই বৈদিক চিত্রগুলির গ্রন্থি মোচন করতে সুরু করি। বৃহস্পতি হ'লেন সপ্তরশ্মিযুক্ত ধীমান্, "সপ্তগুঃ", "সপ্তরশ্মিঃ", তিনিই সপ্তানন,

১ তু গৃৎসমদের "অয়তন্ত চরতো অন্যদ্ অন্যদ্" যার অর্থ "স্বেভির্ এবৈর্" মতো একই, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমার মনে হয় এই অংশটি ও অন্য বহু অংশ থেকে এই কথাই স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত হয় যে "অন্যদ্ অন্যদ্"—এই দুটি সর্বদাই পৃথ্বী ও দ্যৌ, শারীরিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত মানুষী চেতনা এবং অতিশারীরিক চেতনার, স্বর্গের উপর প্রতিষ্ঠিত দিব্য চেতনা।

সপ্তবদন অঙ্গিরস যিনি জন্মেছেন নানা রূপে, "সপ্তাস্যঃ তুবিজাতঃ", নবরশ্মি-যুক্ত, দশরশ্মিযুক্ত। সপ্ত বদন হ'ল সেই সপ্ত আঙ্গিরসরা যাঁরা সেই দিব্য বাণী ("ব্রহ্ম") পুনর্বার উচ্চারণ করেন আর এই বাণী আসে সত্যের আসন, স্বর্ থেকে এবং ইহার অধিপতি তিনি ("ব্রহ্মণস্পতিঃ")। প্রত্যেকটি আবার বৃহস্পতির সপ্ত রশ্মির এক একটির অনুরূপ; সুতরাং তাঁরা সপ্ত দ্রষ্টা, "সপ্ত বিপ্রাঃ" "সপ্ত ঋষয়ঃ" যাঁরা সকলে জ্ঞানের এই সপ্ত রশ্মির ব্যক্তিরূপ। এই রশ্মিগুলি আবার সূর্যের সপ্ত উজ্জ্বল অশ্ব, "সপ্ত হরিতঃ", এবং ইহাদের পূর্ণ মিলনেই গঠিত হয় অয়াস্যের সপ্তশীর্ষ ধী যার দ্বারা হারানো সূর্য পুনরুদ্ধার করা হয়। ঐ ধী আবার প্রতিষ্ঠিত হয় সপ্ত নদীতে, দিব্য ও মানুষী সত্তার সপ্ত তত্ত্বে যেগুলি একত্রে সুষ্ঠু আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভিত্তিস্বরূপ। আমাদের সত্তার এই যে সব সপ্ত নদীকে বৃত্র আটক রাখে তাদের এবং বলের দ্বারা নিরুদ্ধ এই যে সপ্ত রশ্মি তাদের জয় করা, সত্যের অবাধ অবতরণের দ্বারা সকল অনৃত থেকে মুক্ত আমাদের পূর্ণ দিব্য চেতনার অধিকার---ইহাদের দ্বারাই আমরা পাই স্বর্লোকের দৃঢ় অধিকার ও আমাদের সব দিব্য উপাদানের অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা অন্ধকার, অনৃত ও মৃত্যুর ঊর্ধ্বে দেবত্বের মধ্যে উত্তোলিত আমাদের মানসিক ও শারীরিক সত্তার উপভোগ। এই জয়লাভ সাধিত হয় ঊর্ধ্বমুখী যাত্রার দ্বাদশ কালের মধ্যে যাদের প্রতীক্ হল যজ্ঞীয় বৎসরের দ্বাদশ মাসের আবর্তন আর কালগুলি হ'ল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সত্যের ক্রমানুয়ী উষাসমূহের অনুরূপ যতক্ষণ না দশম উষার আগমনে জয়লাভ হয়। নব ও দশ রশ্মির সঠিক তাৎপর্য কি হ'তে পারে---ইহা এমন একটি দুরূহ প্রশ্ন যা আমরা এখনো সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে সমর্থ নই; কিন্তু যে আলোক আমরা পেয়েছি তা ঋগ্বেদের সকল প্রধান চিত্রগুলিকে বোধগম্য করার পক্ষে যথেষ্ট।

মানবের জীবন একটি যজ্ঞ, যাত্রা, সংগ্রাম---এই চিত্রের উপরই বেদের প্রতীক্-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন রহস্যবাদীদের বিষয় ছিল মানবের আধ্যাত্মিক জীবন কিন্তু ইহাকে নিজেদের কাছে মূর্তিমন্ত করা এবং অনুপযুক্তদের কাছ থেকে ইহার গুহ্য কথা আবৃত রাখা---এই উভয় উদ্দেশ্যের জন্যই তাঁরা তা প্রকাশ করতেন তাঁদের সময়ের বাহ্য জীবনপ্রণালী থেকে নেওয়া কবিত্বময় চিন্তাবলীতে। সেই জীবনধারা প্রধানতঃ বেশীর ভাগ লোকেদের জন্য পশুপালন ও কৃষিকার্যের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তবে ইহাদের সঙ্গে

মাঝে মাঝে রাজাদের অধীনে বিভিন্ন বংশের যুদ্ধবিগ্রহ ও দেশান্তরগমনও ঘটত এবং এই সব কাজে যজ্ঞের দ্বারা দেবপূজা সর্বাপেক্ষা গম্ভীর ও মহিমময় উপাদান, বাকী সব কিছুর গ্রন্থি। কারণ যজ্ঞের দ্বারা পাওয়া যেত বৃষ্টি যাতে ভূমি উর্বরা হ'ত, গো ও অশ্বের যূথ যা শান্তি ও যুদ্ধের সময় তাদের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, পাওয়া যেত স্বর্ণসম্পদ, ভূমি ("ক্ষেত্র"), অনুচর ও যোদ্ধার দল যাসব থাকার অর্থ মহিমা ও আধিপত্য, যুদ্ধে জয়, জলে ও স্থলে যাত্রায় নিরাপত্তা কারণ সে সময় ভাল পথঘাট না থাকায় এই সব অল্পসংহত উপজাতীয় জীবনের পক্ষে যাতায়াত অত্যন্ত দুরূহ ও বিপজ্জনক ছিল। রহস্যবাদী কবিরা তাঁদের চারিদিকে ঐ বাহ্য জীবনধারার যেসব প্রধান বিষয়গুলি দেখতেন সেইগুলিকেই নিয়ে তাঁরা তাদের পরিণত করেছিলেন আন্তর জীবনের তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রাবলীতে। মানবের জীবনকে চিত্রিত করা হ'ত যেন ইহা দেবতাদের নিকট এক যজ্ঞ, এমন এক যাত্রা যাকে কখন কখন রূপকভাবে বলা হ'ত বিপজ্জনক জলরাশির উত্তরণ, কখন আবার সত্তা-পর্বতের এক সানু থেকে অন্য সানুতে আরোহণ এবং তৃতীয়তঃ ইহাকে চিত্রিত করা হ'ত বিরুদ্ধ জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রূপে। কিন্তু এই চিত্রগুলিকে পৃথক রাখা হ'ত না। যজ্ঞও এক যাত্রা; বস্তুতঃ যজ্ঞকেই বলা হ'ত এক পরিভ্রমণ রূপে, দিব্য লক্ষ্যের দিকে যাত্রা রূপে; এবং এই যাত্রা ও যজ্ঞ উভয়কেই নিরন্তর বলা হ'য়েছে অন্ধকারময় শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিশেষ।

আঙ্গিরসদের উপাখ্যানে বৈদিক চিত্রাবলীর এই তিন মূল লক্ষণগুলিকে যুক্ত করা হ'য়েছে। আঙ্গিরসরা আলোর তীর্থযাত্রী। তাঁদের বিশিষ্ট কার্য বর্ণনা করার জন্য "নক্ষন্তঃ" বা "অভিনক্ষন্তঃ" পদটি সর্বদাই ব্যবহৃত হ'য়েছে। তাঁরা সেই তীর্থযাত্রী যাঁরা চলেন লক্ষ্যের দিকে, এবং পরমস্থানে উপনীত হন, "অভিনক্ষন্তো অভি যে তম্ আনশুর্ নিধিং পরমম্"—তাঁরা যাঁরা পরম ধনের দিকে যাত্রা ক'রে তা লাভ করেন (২-২৪-৬)। তাঁদের কর্মকে আবাহন করা হয় যাতে মানবের জীবনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ইহার লক্ষ্যের দিকে, "সহস্রসাবে প্র তিরন্ত আয়ুঃ (৩-৫৩-৭); কিন্তু যদিও এই যাত্রা প্রধানতঃ এক প্রকার অন্বেষণ, প্রচ্ছন্ন আলোর অন্বেষণ, তবু ইহা আবার অন্ধকারের শক্তিসমূহের বিরোধিতার জন্য এক অভিযান ও সংগ্রাম হ'য়ে ওঠে। এখানে আঙ্গিরসরা ঐ সংগ্রামের বীর-পুরুষ ও যোদ্ধা, "গোষু যোদ্ধাঃ" "গোরাজির বা কিরণমালার জন্য যোদ্ধা"।

ইন্দ্র তাঁদের সহিত এগিয়ে চলেন যেন সরণির উপর পথিকদের সহিত "সরণ্যু ভিঃ", সখাদের সহিত "সখিভিঃ", দ্রষ্টা ও পবিত্রমন্ত্রের গায়কদের সহিত "ঋগ্মিভিঃ" ও "কবিভিঃ" কিন্তু আবার সংগ্রামের যোদ্ধাদের সহিত "সত্বভিঃ"। বারবার তাঁদের "ন্" বা "বীর" বলে অভিহিত করা হয় যেমন যখন বলা হয় যে ইন্দ্র জ্যোতির্ময় যূথ জয় করেন, "অস্মাকেভিঃ নৃভিঃ" "আমাদের লোকজনের দ্বারা"। তাঁদের দ্বারা বলীয়ান্ হয়ে তিনি যাত্রায় জয়লাভ করেন এবং লক্ষ্যে উপনীত হন, "নক্ষদ্ দাভং ততুরিম্"। এই যাত্রা বা অভিযান চলে স্বর্গশুনী সরমার দ্বারা আবিষ্কৃত পথ ধরে যে পথ হ'ল সত্যের পথ "ঋতস্য পন্থাঃ", মহান্ পথ "মহস্ পথঃ" যা নিয়ে যায় পরম সত্যের রাজ্যসমূহে। ইহা আবার যজ্ঞীয় যাত্রা; কারণ ইহার পর্যায়গুলি নবগ্বদের যজ্ঞের কালের অনুরূপ এবং তা সাধন করা হয় সোমমদিরা ও পবিত্র বাক-এর শক্তির দ্বারা।

বেদে সর্বত্রই যেসব সাংকেতিক কথা পাওয়া যায় তাদের অন্যতম হল শক্তি, জয় ও প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সোমমদিরা পান। ইন্দ্র এবং অশ্বিদ্বয় শ্রেষ্ঠ সোমপায়ী কিন্তু সকল দেবতাই এই অমৃতত্বদায়ী পানের অংশভাক্। আঙ্গিরসরাও জয়লাভ করেন সোমশক্তিতে। সরমা পণিদের ভয় দেখায় এই বলে যে অয়াস্য এবং নবগ্ব আঙ্গিরসরা আসছেন তাঁদের সোম-উল্লাসের প্রচণ্ড তীব্রতায়, "এহ গমন্ ঋষয়ঃ সোমশিতা অয়াস্যো অঙ্গিরসো নবগ্বাঃ" (১০-১০৮-৮)। এই মহতী শক্তিবলেই মানুষরা সত্যের পথ অনুসরণ করতে সমর্থ হয়। "সোমের সেই উল্লাস আমরা কামনা করি যার দ্বারা তুমি, হে ইন্দ্র স্বর্-এর শক্তিকে (অথবা স্বর্-পুরুষকে, স্বর্ণরম্) উন্নত করেছিলে, সেই দশরশ্মিযুক্ত উল্লাস আর জ্ঞানের আলো তৈরী ক'রে অথবা সমগ্র সত্তাকে ইহার শক্তি দিয়ে কাঁপিয়ে ("দশগ্বং বেপয়ন্তম্") যে উল্লাসের দ্বারা তুমি সিন্ধুকে পোষণ করেছিলে; সেই সোমমত্ততা যা দিয়ে তুমি বৃহৎ জলরাশিকে (সপ্ত নদীকে) সম্মুখে চালনা করেছিলে সমুদ্রের দিকে রথসমূহের ন্যায়—তা-ই আমরা কামনা করি যাতে আমরা চলতে পারি সত্যের পথের উপর" "পন্থাম্ ঋতস্য যাতবে তমীমহে" (৮-১২-২, ৩)। এই সোমশক্তিতেই অদ্রি ভেদ করা হয় এবং অন্ধকারের পুত্রগণ পরাস্ত হয়। এই সোমমদিরাই সেই মাধুর্য যা প্রবাহিত হ'য়ে আসে উপরের গূঢ় লোকের স্রোতসমূহ থেকে, ইহা প্রবাহিত হয় সপ্ত জলরাশির মধ্যে, ইহার দ্বারাই "ঘৃত", রহস্যময় যজ্ঞের ঘি অনুস্যূত;

ইহাই সেই মধুমান্ ঊর্মি যা প্রাণের সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়। এইরূপ চিত্রগুলির একটি অর্থই সম্ভব; ইহাই সকল অস্তিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন সেই দিব্য আনন্দ যা একবার প্রকট হ'লে জীবনের সকল গৌরবময় ক্রিয়াকে ধারণ করে, এবং সেই শক্তি যা অবশেষে মর্ত্যকে অমৃতময় করে, "অমৃতম্", দেবতাদের অমৃত।

কিন্তু আঙ্গিরসরা বিশেষ ক'রে বাক্-এর অধিকারী; তাঁরা যে দ্রষ্টা, ইহাই তাঁদের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট গুণ। তাঁরা হ'লেন "ব্রাহ্মণাসো পিতরঃ সোম্যাসঃ...ঋতবৃধঃ" (৬-৭৫-১০), সেই পিতৃগণ যাঁরা সোমে পূর্ণ এবং বাণীর অধিকারী এবং সেজন্য সত্যবর্ধক। পথের উপর তাঁদের প্রচোদিত করার জন্য ইন্দ্র নিজেই তাঁদের মননের গীতিতে যোগদান করেন এবং তাঁদের অন্তঃপুরুষের বাণীতে পূর্ণতা ও শক্তি দেন, "অঙ্গিরসাম্ উচথা জুজুষ্বান্ ব্রহ্ম তূতোদ্ গাতুম্ ইষণ্যন্" (২-২০-৫)। আঙ্গিরসদের দ্বারা মননের আলো ও শক্তিতে সমৃদ্ধ হ'লেই ইন্দ্র তাঁর বিজয়িনী যাত্রা সমাপন করেন এবং উপনীত হন পর্বতের উপর তাঁর লক্ষ্যস্থলে; "তাঁর মধ্যেই আমাদের আদি পিতারা, সপ্ত বিপ্ররা, নবগ্বরা তাঁদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করেন—তাঁর মধ্যে যিনি তাঁর অভিযাত্রায় বিজয়ী, এবং সর্ব বাধা ভেদ করে (লক্ষ্য-স্থলে) উপনীত হন, পর্বতের উপর দণ্ডায়মান, বচনে অভঙ্গ, তাঁর চিন্তনে সর্বাপেক্ষা সুদীপ্ত ও তেজোময়" "নক্ষদ্ দাভং ততুরিং পর্বতেষ্ঠাম্, অদ্রোঘ-বাচং মতিভিঃ শবিষ্ঠম্ (৬-২২-২)। ঋক্ যা দীপ্তির স্তুতি তা গান ক'রেই তাঁরা আমাদের সত্তার গুহার মধ্যে পান সৌর দীপ্তিসমূহ, "অর্চন্তো[১] গা অবিন্দন্" (১-৬২-২)। স্তুভের দ্বারাই, সপ্ত বিপ্রের স্তুতির সর্বধারক ছন্দের দ্বারাই, নবগ্বদের কম্পমান কণ্ঠস্বরের দ্বারাই ইন্দ্র 'স্বর্'-এর শক্তিতে পূর্ণ হন, "স্বরেণ স্বর্যঃ" এবং দশগ্বদের রবের দ্বারাই তিনি বলকে চূর্ণ করেন (১-৬২-৪)। কারণ এই রব হ'ল পরতর স্বর্গের ধ্বনি, ইন্দ্রের বিদ্যুৎ-ঝলকের বজ্রনাদ এবং পথের উপর আঙ্গিরসদের অগ্রগমন হ'ল আকাশের এই ধ্বনির অগ্রমুখী সঞ্চরণ, "প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত, প্র ক্রন্দনুর্ নভন্যস্য বেতু" (৭-৪২-১); কারণ বলা হ'য়েছে যে, যে বৃহস্পতি অঙ্গিরস সূর্য ও উষা ও গো ও বাক্-এর আলো আবিষ্কার করেন তাঁর স্বরই দ্যৌ-এর বজ্র, "বৃহস্পতির্ উষসং সূর্যং গাম্ অর্কং বিবেদ স্তনয়ন্

১ বেদে "অর্চন্" (ঋক্) পদটির অর্থ দীপ্তি দেওয়া এবং ঋক্ গান গাওয়া; "অর্ক" পদটির অর্থ সূর্য, আলোক এবং বৈদিক সূক্ত।

ইব দ্যৌঃ" (১০-৬৭-৫)। "সত্যমন্ত্রে"র দ্বারাই, সত্যের ছন্দের মধ্যে প্রকাশিত সত্যমননের দ্বারাই গূঢ় জ্যোতি পাওয়া যায় এবং উষার জন্ম হয়, "গূঢ়ং জ্যোতিঃ পিতরো অবিন্দন্, সত্যমন্ত্রা অজনয়ন্ উষাসম্" (৭-৭৬-৪)। কারণ ইঁহারা সত্যবাদী আঙ্গিরসগণ, "ইত্থা বদদ্ভিঃ অঙ্গিরোভিঃ" (৬-১৮-৫), ঋকের এমন অধিপতি যাঁরা তাঁদের মনন সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করেন, "স্বাধীভির্ ঋক্বভিঃ" (৬-৩২-২), তাঁরা স্বর্গের পুত্র, শক্তিশালী প্রভুর বীরবৃন্দ, তাঁরা সত্য বলেন ও ঋজুতা চিন্তা করেন এবং সেজন্য তাঁরা সমর্থ হন দীপ্ত জ্ঞানের আসন ধারণ করতে, যজ্ঞের পরম ধাম মননে আনতে, "ঋতং শংসন্ত ঋজু দীধ্যানা দিবস্পুত্রাসো অসুরস্য বীরাঃ; বিপ্রং পদম্ অঙ্গিরসো দধানা যজ্ঞস্য ধাম প্রথমং মনন্ত" (১০-৬৭-২)।

এইরূপ সব কথার অর্থ যে শুধু কতকগুলি আর্য ঋষি এক দেবতা ও তাঁর কুকুরের দ্বারা চালিত হ'য়ে দ্রাবিড়দেশীয় গুহাবাসীদের কাছ থেকে হারানো গাভীর দল পুনরুদ্ধার করেছেন, অথবা রাত্রির অন্ধকারের পর উষার পুনরাবির্ভাব হয়েছে, তার বেশী কিছু নয় তা অসম্ভব। এই সব চিত্রের একত্র সমাবেশ এবং বাক্, ধী, সত্য, যাত্রা, এবং অনৃতের পরাভব প্রভৃতি ভাবনার উপর নিরন্তর গুরুত্বদান যা আমরা এই সব স্তুতিতে সর্বদাই পাই––এসবের ব্যাখ্যার জন্য মেরুপ্রদেশের উষার বিস্ময়কর ঘটনাও পর্যাপ্ত নয়। আমরা যে ব্যাখ্যা দিচ্ছি, যে ব্যাখ্যাটি বাহির থেকে আনা হয়নি, বরং যা সূক্তগুলিরই ভাষা ও আভাসন থেকে সোজা উদিত হয় শুধু সেই ব্যাখ্যাই এই বিভিন্ন চিন্তাবলীর মধ্যে সংযোগ আনতে এবং এই আপাতপ্রতীয়মান জটিল অসংলগ্নতার মধ্যে একটি সহজ স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্য প্রকাশ করতে সক্ষম। বস্তুতঃ, একবার মূল ভাবনাটি আয়ত্ত করা হ'লে এবং বৈদিক ঋষিদের মানসিক ধারা এবং তাঁদের প্রতীক্-তন্ত্রের তত্ত্ব বুঝতে পারলে, কোন অসংলগ্নতা ও কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। প্রতীক্গুলি সম্বন্ধে একটি নির্দিষ্ট রীতি আছে এবং পরবর্তী কিছু সূক্ত ছাড়া অন্যসবে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সুযোগ নেই। আর ইহারই আলোকে বেদের আন্তর অর্থ সর্বদাই সহজভাবে প্রকাশিত হয়। সব নির্দিষ্ট কবিত্বপূর্ণ চিন্তাবলীর মতো,––যেমন বৈষ্ণবদের পবিত্র কবিতা-সমূহে, বেদেও অবশ্য প্রতীক্গুলির সমবায়ের মধ্যে স্বাধীনতা কিছু সীমিত কিন্তু তাদের পশ্চাতে মননের যে সারকথা তা স্থির ও সুসংলগ্ন, তাতে কোন পরিবর্তন নেই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মানুষী পিতৃগণ

আঙ্গিরস ঋষিদের এই সব বৈশিষ্ট্য থেকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে বৈদিক শাস্ত্রে তাঁরা এক শ্রেণীর অর্ধ দেবতা যাঁরা তাঁদের বাহিরের দিকে জ্যোতি, স্বর এবং অগ্নিশিখার ব্যক্তিকরণ বা বরং ব্যক্তিসত্ত্ব কিন্তু তাঁদের আন্তর দিকে তাঁরা সত্যের এমন সব শক্তি যাঁরা দেবতাদের যুদ্ধে তাঁদের সাহায্যকারী। কিন্তু এমন কি দিব্য দ্রষ্টা রূপে, এমনকি স্বর্গের পুত্র ও প্রভুর বীরপুরুষ হিসাবে এই ঋষিরা আস্পৃহাবান্ মানবজাতির প্রতিনিধি। ইহা সত্য যে আদিতে তাঁরা দেবতার পুত্রগণ, "দেবপুত্রাঃ", অগ্নির সন্তান, বহুধাজাত বৃহস্পতির বিভিন্ন রূপ এবং সত্যলোকে আরোহণের বিষয়ে তাঁদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তাঁরা যেখান থেকে এসেছিলেন সেখানেই আবার তাঁরা ফিরে উঠে যান; কিন্তু এমন কি এই সব বৈশিষ্ট্যেও, তাদের মানবের অন্তঃপুরুষের প্রতিনিধিও বলা যেতে পারে কারণ এই অন্তঃপুরুষ নিজেই ঐ লোক থেকে নেমে এসেছে এবং সেখানেই তাকে আবার উঠে যেতে হবে; কারণ ইহা তার উৎপত্তিতে এক মানসিক পুরুষ অমৃতত্বের পুত্র ("অমৃতস্য পুত্রঃ") স্বর্গে জাত এবং স্বর্গের পুত্র আর ইহা মর্ত্য শুধু তার ধারণ করা দেহে। আর যজ্ঞে আঙ্গিরস ঋষিদের যে কাজ করতে হয় তা মানুষী কাজ,---বাণী আবিষ্কার করা, দেবতাদের নিকট অন্তঃপুরুষের স্তুতি গান করা, প্রশস্তি, পবিত্র খাদ্য ও সোমমদিরার দ্বারা দিব্যশক্তিসমূহকে পোষণ ও বর্ধন করা, তাঁদের সাহায্যে দিব্য উষার জন্ম ঘটান, সর্বত্র দীপ্তিবিকিরণকারী সত্যের জ্যোতির্ময় রূপ জয় করা এবং ইহার গূঢ়, দূরবর্তী ও উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত সত্যে আরোহণ করা।

যজ্ঞের এই কর্মে তাঁদের দেখা যায় দ্বিবিধ রূপে[১]---দিব্য আঙ্গিরসগণ, ঋষয়ো দিব্যাঃ" যাঁরা দেবতাদের মতো কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক শক্তি ও

১ ইহা উল্লেখযোগ্য যে পুরাণগুলিতে পৃথক দুই শ্রেণীর পিতৃগণের কথা বলা হয়েছে ---দিব্যপিতৃগণ, একশ্রেণীর দেবতা এবং মানবীয় পূর্বপুরুষগণ আর এই উভয়কেই পিণ্ড দান করা হয়। স্পষ্টতঃই এই বিষয়ে পুরাণগুলি আদি বৈদিক ঐতিহ্য অনুসরণ করেছে মাত্র।

ক্রিয়ার প্রতীক্ ও অধিষ্ঠাতা এবং মানুষী পিতৃগণ, "পিতরো মনুষ্যাঃ" যাঁদের ঋভুদের মতো বলা হয়েছে এমন সব মানুষ বা অন্ততঃ মানুষী শক্তি যাঁরা কর্মের দ্বারা অমৃতত্ব জয় করেছেন, লক্ষ্যে উপনীত হ'য়েছেন এবং যাঁদের আবাহন করা হয় সেই দিব্য কর্মসাধনে পরবর্তী মর্ত্য জাতিকে সাহায্য করার জন্য। অবশ্য দশমমণ্ডলের পরবর্তী যমসূক্তগুলিতে আঙ্গিরসদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁরা ভৃগুদের ও আর্থবণদের মতো বর্হিষদ্ পিতৃগণ এবং যজ্ঞে তাঁদের নিজস্ব বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন, কিন্তু বেদের বাকী সব অংশেও তাঁদের আরো ক্রম সুস্পষ্ট কিন্তু আরো বৃহৎ ও তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রে আবাহন করা হয়েছে। মহতী মানুষী যাত্রার জন্যই তাঁদের আবাহন করা হয়; কারণ মর্ত্য অবস্থা থেকে অমৃতত্বে, অনৃত থেকে সত্যে মানুষী যাত্রাই এই পূর্বপুরুষগণ সাধন করেছিলেন এবং এইভাবে পথ উন্মুক্ত করেছিলেন তাঁদের বংশধরদের জন্য।

তাঁদের কর্মধারার এই বৈশিষ্ট্য আমরা দেখি ৭-৪২ ও ৭-৫২ সূক্তে। বসিষ্ঠের এই দুই সূক্তের প্রথমটিতে দেবতাদের স্তুতি করা হয় ঠিক এই মহতী যাত্রার জন্যই, "অধ্বর যজ্ঞ",[১] যে যজ্ঞ চলে বা যা এক গমন দেবত্বদের ধামের দিকে, এবং সেই সাথে এক সংগ্রামও। কারণ এইভাবে স্তুতি করা হ'য়েছে, "তোমার পক্ষে সুগম এই পথ, হে অগ্নি, এবং পূর্ব থেকেই তা তোমার জানা। সোমের হবিতে যুক্ত কর তোমার অরুণবর্ণ (বা সক্রিয়ভাবে ধাবমান) অশ্বাগণ যারা বীরকে বহন করে। আসীন আমি, জন্মসমূহকে আমি দিব্য বলি (শ্লোক ২)। কি এই পথ? ইহা সেই পথ যা অবস্থিত দেবতাদের আবাস এবং পার্থিব মর্ত্যত্বের মধ্যে এবং যা বেয়ে দেবতারা "অন্তরিক্ষের" প্রাণিক প্রদেশের মধ্য দিয়ে নিম্নে অবতরণ করেন পার্থিব যজ্ঞে এবং যা বেয়ে যজ্ঞ এবং যজ্ঞের দ্বারা মানুষ উর্ধ্বে ওঠে দেবতাদের আবাসে। অগ্নি যুক্ত করেন তাঁর অশ্বাগণকে, অর্থাৎ তিনি যে

১ সায়ণ "অধ্বর যজ্ঞের" অর্থ করেন অক্ষত যজ্ঞ, কিন্তু "অক্ষত" কখনই যজ্ঞের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয় না। "অধ্বর" হ'ল "যাত্রা করা", "চলা", ইহার সংযোগ "অধ্বন্"-এর সহিত, যার অর্থ পথ বা যাত্রা আর ইহার ব্যুৎপত্তি হ'ল "অধ্" ধাতু থেকে যা নষ্ট হ'য়েছে এবং যার অর্থ চলা, প্রসারিত করা, ব্যাপ্ত হওয়া, সংহত হওয়া, ইত্যাদি। "অধ্বন্" ও "অধ্বর" এই দুইটি পদের মধ্যে আমরা সংযোগ দেখি "অধ্ব"-এ যার অর্থ বাতাস, আকাশ এবং "অধ্বরে" যারও সেই অর্থ। "অধ্বর" বা "অধ্বর যজ্ঞ" যে পথের উপর ভ্রমণ করা, যাত্রা করা, অগ্রসর হওয়া ভাবনার সহিত সংযুক্ত সে সম্বন্ধে বেদে অনেক শ্লোক আছে।

দিব্যশক্তির প্রতিনিধি তার বিচিত্রবর্ণ শক্তিসমূহকে বা শিখাসমূহকে; ইহারা বীরকে বহন করে অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে সংগ্রামী শক্তি যাত্রা সম্পাদন করে তাকে। আর দিব্য জন্মসমূহ হ'ল একই সাথে স্বয়ং দেবতারা এবং মানবের মধ্যে দিব্য জীবনের সেইসব অভিব্যক্তি যা বেদে দেবত্বর অর্থ। ইহাই যে শ্লোকটির অর্থ তা সুস্পষ্ট হয় চতুর্থ ঋক্ থেকে। "যখন আনন্দের মধ্যে অধিবাসী অতিথি জ্ঞানে চিন্ময় হন বীরের সেই দ্বারযুক্ত ধামে যা (আনন্দে) সমৃদ্ধ, যখন অগ্নি সুপ্রীত এবং ধামে সু-প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি কাম্য মঙ্গল দেন যাত্রাকারী জীবকে" অথবা, হয়ত, তার যাত্রার জন্য।

সুতরাং এই সূক্তটি হ'ল পরম মঙ্গল, দিব্য জন্ম, আনন্দের দিকে যাত্রার জন্য অগ্নির উদ্দেশে এক প্রশস্তি। আর ইহার প্রথম শ্লোকটিতে প্রার্থনা করা হ'য়েছে যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব অবস্থার জন্য, যেসব বিষয়কে এখানে বলা হয় তীর্থযাত্রী যজ্ঞের রূপ, "অধ্বরস্য পেশঃ" এবং ইহাদের মধ্যে প্রথম হ'ল আঙ্গিরসদের অগ্রগমন। "অঙ্গিরাগণ, এগিয়ে চলুন, বাক্-এর পুরোহিত তাঁরা, স্বর্গের (অথবা স্বর্গীয় বিষয়ের, মেঘ, বা বিদ্যুতের) ক্রন্দন এগিয়ে যাক, এগিয়ে চলুক ধাত্রী ধেনুগুলি যারা তাদের জলরাশি বিকীর্ণ করে এবং যুক্ত হ'ক দুটি পেষণ-প্রস্তর (তাদের কর্মে)—তীর্থযাত্রীযজ্ঞের রূপ," "প্র ব্রহ্মাণো অঙ্গিরসো নক্ষন্ত, প্র চ ক্রন্দনুর্ নভন্যস্য বেতু; প্র ধেনব উদপ্রুতো নবন্ত, যুজ্যাতাম্ অদ্রী অধ্বরস্য পেশঃ" (৭-৪২-১)। দিব্য বাণী সহ আঙ্গিরসগণ, স্বর্গের ক্রন্দন যা স্বর্-এর, জ্যোতির্ময় স্বর্গের, এবং বাণী থেকে গর্জনকারী বিদ্যুতের ধ্বনি, দিব্যজলরাশি বা সপ্ত নদী যাদের প্রবাহ মুক্ত করা হয় স্বরের অধিপতি ইন্দ্রের বিদ্যুতের দ্বারা এবং দিব্য জলরাশির বহিঃপ্রবাহের সহিত অমৃতত্বকারী সোমের নিষ্কাশনে—এই সবই "অধ্বর যজ্ঞে"র "পেশঃ"। এবং ইহার সাধারণ লক্ষণ হ'ল অগ্রগমন, দিব্য লক্ষ্যের দিকে সকলের অগ্রসর হওয়া,—কারণ এই সবের কথাই জোর দিয়ে বলা হ'য়েছে গতির তিনটি ক্রিয়ার দ্বারা—"নক্ষন্ত", "বেতু" "নবন্ত" এবং প্রতি বাক্যাংশের প্রথমেই আছে 'প্র', জোরালো কথাটি যার অর্থ অগ্রবর্তী এবং যার দ্বারা বাক্যাংশের অর্থ সূচিত হয়।

কিন্তু ৫২তম সূক্তটি আরো তাৎপর্যপূর্ণ এবং ব্যঞ্জনাময়। প্রথম ঋক্‌টি এইরূপ, "হে অনন্তমাতার পুত্রগণ ("আদিত্যাসো"), আমরা যেন অনন্ত সত্তা হ'তে পারি ("অদিতয়ঃ স্যাম"), বসুগণ যেন রক্ষা করেন

দেবত্বে ও মর্ত্যত্বে ("দেবত্রা মর্ত্যত্রা"); লাভ ক'রে আমরা যেন তোমায় লাভ করি, হে মিত্র ও বরুণ, আমরা যেন বিকশিত হ'য়ে তোমরা হ'য়ে উঠি, হে দ্যৌ ও পৃথিবী," "সনেম মিত্রাবরুণা সনন্তঃ, ভবেম দ্যাবাপৃথিবী ভবন্তঃ"। স্পষ্টতঃই ইহাই অর্থ যে আমাদের পেতে হবে, হ'তে হ'বে আনন্ত্য অর্থাৎ অদিতির সন্তান, দেবত্ব, "অদিতয়ঃ", "আদিত্যাসঃ"। আমাদের স্মরণ রাখা চাই যে মিত্র ও বরুণ হ'ল সূর্যসবিতার, অর্থাৎ জ্যোতি ও সত্যের অধিপতির শক্তি। আর তৃতীয় শ্লোকটি এইরূপ, "যে আঙ্গিরসগণ দ্রুত লক্ষ্যে উপনীত হন তাঁরা যেন তাঁদের যাত্রায় গমন করেন দিব্য সবিতার আনন্দের মধ্যে; আর তাকে (আনন্দকে) যেন আমাদের মহান্ পিতা, তিনি যজ্ঞের, এবং সকল দেব একমনা হ'য়ে হৃদয়ে গ্রহণ করেন।" "তুরণ্যবো নক্ষন্ত রত্নং দেবস্য সবিতুর্ ইয়ানাঃ" সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে আঙ্গিরসগণ হ'লেন সেই সৌর দেবতার জ্যোতি ও সত্যের অভিমুখে যাত্রী যা থেকে ভাস্বর গোরাজির জন্ম হয় আর তাঁরা সেসব জোর করে নিয়ে আসেন পণিদের কাছ থেকে; তাঁরা আবার সেই আনন্দের অভিমুখেও যাত্রী যা, আমরা সর্বদাই দেখি, জ্যোতি ও সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার ইহাও স্পষ্ট যে এই যাত্রা হ'ল দেবত্বে, অনন্ত সত্তায় বৃদ্ধি লাভ ("অদিতয়ঃ স্যাম") আর এই কথাই বলা হয়েছে এই সূক্তের হয় শ্লোকে এইভাবে, যে মিত্র বরুণ ও বসুগণ দেবত্বে ও মর্ত্যত্বে আমাদের রক্ষা করেন আমাদের মধ্যে তাঁদের ক্রিয়ার মাধ্যমে শান্তি ও আনন্দের বৃদ্ধির দ্বারা আমরা যেন আসতে পারি।

এই দুইটি সূক্তে আঙ্গিরস ঋষিদের কথা সাধারণভাবে বলা হ'য়েছে; কিন্তু অন্য সবে আমরা এই সুস্পষ্ট উক্তি পাই যে তাঁরা মানুষী পিতৃগণ যাঁরা জ্যোতি আবিষ্কার করেছিলেন এবং ধী ও বাক্ অধিকার করেছিলেন এবং গমন করেছিলেন জ্যোতির্ময় আনন্দের গোপন লোকসমূহে। আমরা যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছি তাদের আলোকে আমরা এখন সেই সব আরো গুরুত্বপূর্ণ, গম্ভীর, সুন্দর ও সুদীপ্ত অংশগুলি আলোচনা করতে পারি যাতে মানুষী পিতৃগণের মহান্ আবিষ্কারের কথার স্তুতি করা হ'য়েছে। বৈদিক রহস্যবাদীরা যে মহতী আশা সর্বদাই তাঁদের সম্মুখে রাখতেন তার কথাই আমরা সেখানে সংক্ষেপে পাব; আমাদের জ্যোতির্ময় পূর্ব-পুরুষগণ তাঁদের পরবর্তী মর্ত্যগণের জন্য আদর্শ হিসাবে যে প্রাচীন, আদি ব্রত স্থাপন করেছিলেন তা ঐ যাত্রা, ঐ জয়। যে সংকীর্ণতাকারী রাত্রি,

"রাত্রি পরিতক্ম্যা" (৫–৩০–১৪), বৃত্রগণ, সম্বরগণ ও বলগণ, অসুর, দৈত্য সর্পরাজের দল অর্থাৎ অবচেতন শক্তিরা নিজেদের মধ্যে জ্যোতি ও শক্তি ধারণ করে, তাদের রেখে দেয় তাদের অন্ধকারের ও ভ্রান্তির সব পুরীর মধ্যে, কিন্তু সেগুলি তারা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম অথচ মানুষকে, মনোময় পুরুষকে দেবে না, তাদের শক্তিসমূহকে জয় করাই এই ব্রত। তাদের অজ্ঞানতা, অশুভ ও সংকীর্ণতাকে শুধু যে আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে তা নয়. তাদের চূর্ণ করে বাধ্য করতে হবে যেন তারা জ্যোতি, ও শুভ ও আনন্দের গোপন ভাণ্ডারকে সমর্পণ করে। এই মৃত্যু থেকে অমৃতত্ব জয় করতে হবে। এই অজ্ঞানতার পিছনে আবদ্ধ আছে এক গূঢ় জ্ঞান ও সত্যের মহাজ্যোতি; এই অশুভের কারাগারে আছে শুভের অনন্ত ভাণ্ডার; যে মৃত্যু সীমা আনে তার মধ্যেই আছে সীমাহীন অমৃতত্ব। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বল হ'ল রশ্মিসমূহের বল, "বলস্য গোমতঃ" (১-১১-৫)। তার দেহ জ্যোতি দিয়ে তৈরী, "গোবপুষো বলস্য" (১০-৬৮-৯), তার বিবর বা গুহা ধনসম্পদে পূর্ণ পুরী; সেই দেহকে চূর্ণ করতে হবে, সেই পুরীকে বিদীর্ণ করতে হবে, সেই ধনসম্পদকে সবলে অধিকার করতে হবে। এই ব্রতই মানবজাতির জন্য স্থাপিত করা হ'য়েছিল এবং পূর্বপুরুষগণ তা জাতির জন্য সাধন করেছিলেন যাতে পথ জানা যেতে পারে, এবং লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় সেই একই উপায়ে এবং জ্যোতির দেবতাদের সেই একই সখ্যতার মাধ্যমে। "দেবগণ, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সেই প্রাচীন সখ্যতা হ'ক যা হ'য়েছিল আঙ্গিরসদের সহিত যাঁরা বাণী বলেছিলেন যথার্থভাবে; যা দৃঢ় ছিল তাকে তোমরা ভূমিসাৎ করেছিলে, তোমরা বলকে নিধন করেছিলে যখন সে তোমাদের বিরুদ্ধে ছুটে এসেছিল, হে কর্মসাধক, এবং তুমিই তার পুরীর সকল দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলে" (৬-১৮-৫)। মানুষের সকল জনশ্রুতির আদিতে এই প্রাচীন স্মৃতি রয়েছে। ইহা ইন্দ্র ও সর্প বৃত্র, ইহা এপোলো (Apollo) ও পাইথন, (Python) ইহা থর (Thor) ও দৈত্যদল, সিগার্ড (Sigurd) ও ফাফনার (Fafner), ইহাই কেল্টিক উপকথার পরস্পরবিরোধী দেবগণ; কিন্তু শুধু বেদের মধ্যেই আমরা এই চিত্রবালীর চাবিকাঠি পাই যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এক প্রাগৈতিহাসিক মানবজাতির আশা বা জ্ঞান।

প্রথম যে সূক্তটি আমরা নেব সেটি মহান্ ঋষি বিশ্বামিত্রের, ইহা ৩-৩৯ সূক্ত; কারণ ইহা আমাদের সোজা নিয়ে যায় বিষয়টির মর্মলোকে।

ইহার প্রারম্ভেই পাই পিতৃগণের ধীর, "পিত্র্যা ধীঃ" বর্ণনা; আত্রেয়রা যে স্বর্-জয়ী ধীর স্তুতি গেয়েছিলেন, নবগ্বদের জন্য অয়াস্য যে সপ্তশীর্ষ ধী আবিষ্কার করেছিলেন, পিতৃগণের এই ধী তাছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না; কারণ এই সূক্তেও ইহার কথা বলা হ'য়েছে পিতৃগণ আঙ্গিরসদের প্রসঙ্গে। "যে মতি হৃদয় থেকে নিজেকে প্রকাশিত করে, স্তোমে গঠিত হয় তা চলে ইহার অধিপতি ইন্দ্রের দিকে" (ঋক্ ১)। আমাদের ব্যাখ্যায় ইন্দ্র হ'ল দীপ্ত মনের শক্তি, জ্যোতি ও ইহার বিদ্যুতের লোকের অধিপতি; বাণী বা মতিদের সর্বদাই চিত্রিত করা হয় গো বা নারীরূপে, ইন্দ্রকে বৃষভ বা পতিরূপে আর বাণীরা তাঁকে কামনা করে আর এমনকি বলা হয় যে তারা তাকে পাবার জন্য ঊর্ধ্বে নিজেদের নিক্ষেপ করে, যেমন ১-৯-৪ শ্লোকে, "গিরঃ প্রতি ত্বাম্ উদ্ অহাসত...বৃষভং পতিম্"। বৈদিক ভাবনায় ও বৈদিক উক্তিতে যে লক্ষ্য কামনা করা হয় তা এই স্বর্-এর দীপ্ত মন আর ইহার এই অর্থ—দীপ্তরাজির যূথ ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় অন্তঃপুরুষ থেকে, অবচেতনার যে গুহার মধ্যে তারা আবদ্ধ ছিল তা থেকে; স্বর্-এর অধিপতি ইন্দ্র হ'লেন বৃষভ, এই সব যূথের প্রভু, "গোপতিঃ"।

ঋষি "ধী"র কথা আরো বলেন। ইহা "সেই ধী যা প্রকাশ করা হ'লে জ্ঞানে জাগ্রত থাকে," পণিদের নিদ্রাতে মগ্ন হয় না, "যা জাগৃবির, বিদথে শস্যমানা", "হে ইন্দ্র যা তোমা থেকে (বা তোমার জন্য) জন্ম নেয়, তার সম্বন্ধে তুমি জ্ঞান লও।" বেদে এই কথাটি সততই বর্তমান। দেবতার, ভগবানের, কাজ হ'ল মানবের মাঝে তাঁর কাছে যা উত্থিত হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, আমাদের মধ্যে জ্ঞানের মধ্যে তাতে জাগ্রত হওয়া ("বিদ্ধি", "চেতথঃ" ইত্যাদি), নচেৎ ইহা মানুষী বিষয়ই হ'য়ে থাকে, ইহা "দেবগণের নিকট যায়" না ("দেবেষু গচ্ছতি")। আর তারপর "ইহা প্রাচীন (বা সনাতন), ইহা স্বর্গজাত; এবং যখন ইহা প্রকাশিত হয় তখন ইহা জ্ঞানে জাগ্রত থাকে; শুভ্র এবং সুখময় বসন পরিধান করে আমাদের মধ্যে ইহাই পিতৃগণের প্রাচীন ধী" "সেয়ম্ অস্মে সনজা পিত্র্যা ধীঃ" (ঋক্ ২)। আর তারপর ঋষি এই ধী সম্বন্ধে বলেন যে ইহা "যমজের মাতা, যিনি এখানে জন্ম দেন যমজদের; জিহ্বার অগ্রে ইহা অবতরণ ও অবস্থান করে। যমজ দেহ দুটি জাত হ'য়ে পরস্পরে সংলগ্ন থাকে, তারা তমোহন্তা এবং জ্বলন্তশক্তির ভিত্তিতে সঞ্চরণ করে" (ঋক্ ৩)। এই দুইটি জ্যোতির্ময় যমজ কারা তা আমি এখন আলোচনা করব না, কারণ তা আমাদের

অব্যবহিত বিষয়ের গণ্ডীর বহির্ভূত হবে, এইমাত্র বলাই যথেষ্ট যে অন্যত্র তাদের সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে আঙ্গিরসদের প্রসঙ্গে এবং পরম জন্মের প্রতিষ্ঠা-কে (সত্যের লোককে) বলা হয়েছে যমজ যাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রকাশের বচন স্থাপন করেন (১-৮৩-৩), আর যে জ্বলন্ত শক্তির ভিত্তিতে তারা সঞ্চরণ করে তা স্পষ্টতঃই তমোনাশক সূর্যের; আর সুতরাং এই ভিত্তিই পরম লোক, সত্যের ভিত্তি, "ঋতস্য বুধ্নঃ" এবং অবশেষে ইহাও স্পষ্ট যে ইহারা সূর্যের সন্তান যম ও যমীর সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন নয় আর এই যম দশম মণ্ডলে আঙ্গিরস ঋষিদের সহিত একসাথে যুক্ত।[১]

পিতৃগণের এই ধী এবং ইহার তমোনাশক যমজসন্তানদের এই ভাবে বর্ণনা করার পর বিশ্বামিত্র বলতে থাকেন ইহার প্রথম গঠনকারী প্রাচীন পিতৃগণের কথা এবং সেই মহান্ জয়ের কথা যার দ্বারা তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন, "সেই সত্য, অন্ধকারে অবস্থিত সূর্যকে।" "মর্ত্যগণের মধ্যে এমন কেউ নেই যে নিন্দা করতে পারে (অথবা আমার বরং যা মনে হয় ইহার অর্থ মর্ত্যত্বের কোন শক্তি নেই যে আবদ্ধ বা বদ্ধ করতে পারে) আমাদের প্রাচীন পিতৃগণকে, তাঁরা যাঁরা গোরাজির জন্য যোদ্ধা ছিলেন। তাদের জন্য মহিমার ইন্দ্র, কর্মসাধনের ইন্দ্র সুরক্ষিত খোঁয়াড়গুলি ঊর্ধ্বে উন্মুক্ত করেছিলেন—সেখানে যেখানে এক সখা তার সখাদের, যোদ্ধাদের, নবগ্বদের সহিত জানুর উপর ভর করে গোরাজিকে অনুসরণ করায়, দশ দশগ্বদের সহিত ইন্দ্র পেয়েছিলেন সেই সত্যকে "সত্যং তদ্", এমনকি অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত সূর্যকে" (ঋক্ ৪, ৫)। জ্যোতির্ময় গোযূথের জয়ের এবং প্রচ্ছন্ন সূর্যের আবিষ্কারের ইহাই সাধারণ চিত্র; কিন্তু পরের শ্লোকেই ইহার সহিত উল্লেখ করা হ'য়েছে অন্য দুটি সংশ্লিষ্ট চিত্র যেগুলি বৈদিক সূক্তে প্রায়ই পাওয়া যায়; এই চিত্রগুলি হ'ল গোচারণের ভূমি বা ক্ষেত্রের এবং গোর মধ্যে পাওয়া মধুর চিত্র। "ইন্দ্র মধু পেয়েছিলেন ভাস্বর একের মধ্যে, পেয়েছিলেন পদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত (ধনকে) গোর গো-

১ দশম মণ্ডলে যম ও যমীর সংলাপের অর্থ আমাদের বুঝতে হবে এই সব তথ্যের আলোকেই; এই সংলাপে ভগিনী তার ভ্রাতার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করে এবং তাকে নিরস্ত থাকতে বলা হয় পরবর্তী সব বংশ পর্যন্ত যার প্রকৃত অর্থ হ'ল কালের প্রতীকার্থক্ সময়; "পরবর্তী" অর্থের জন্য যে পদটি ব্যবহৃত হ'য়েছে তা "উত্তর" তাতে বরং "উচ্চ-তর" অর্থই সূচিত হয়।

চারণভূমিতে"[১] (ঋক্ ৬)। ভাস্বর এক, "উস্রিয়া" (আবার "উস্রা") অন্য একটি পদ যার অর্থ "গো"র মত রশ্মি ও গাভী উভয়ই এবং বেদে ইহা 'গো'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আমরা সর্বদাই শুনতে পাই "ঘৃত" বা ঘির কথা যা গোর মধ্যে সঞ্চিত আছে, বামদেবের কথায় পণিরা সেখানে ইহাকে লুকিয়ে রেখেছে তিন অংশে; কিন্তু কখন কখন ইহা মধুময় ঘৃত, আবার কখন কখন শুধু মধু, "মধুমদ্ ঘৃতম্" (৯-৮৬-৩৭) এবং "মধু"। আমরা দেখেছি যে অন্যান্য সূক্তে গোজাত 'ঘৃত' এবং সোমলতার রস কত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত আর এখন যখন আমরা গোর অর্থ নির্দিষ্ট-ভাবে জানি, তখন এই অদ্ভুত ও অসংলগ্নসংযোগ যথেষ্ট স্পষ্ট ও সরল হ'য়ে ওঠে। "ঘৃত" কথাটির অর্থ আবার ভাস্বর, ইহা ভাস্বর গোর ভাস্বর উৎপন্ন দ্রব্য; ইহা হ'ল মানসিকতার মধ্যে সচেতনজ্ঞানের গঠিত আলো যা সঞ্চিত থাকে দীপ্ত চেতনার মধ্যে এবং মুক্ত হয় গোর মুক্তির দ্বারা: সোম হল আনন্দ, নিঃশ্রেয়স্, পরম আনন্দ, যা সত্তার দীপ্ত অবস্থা থেকে অচ্ছেদ্য; আর বেদের কথায় যেমন আমাদের মধ্যে মানসিকতার তিনটি স্তর আছে, সেইরকম ঘৃতের তিনটি অংশ আছে যেগুলি নির্ভর করে সূর্য, ইন্দ্র ও সোম এই তিন দেবতার উপর; আবার সোমও নিবেদিত হয় তিন অংশে, পর্বতের তিনটি স্তরে, "ত্রিষু সানুষু"। তিনটি দেবতার স্বভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে সোম দিব্য আলোক মুক্ত করে ইন্দ্রিয়গতমানসিকতা থেকে, ইন্দ্র স্ফুরন্ত মানসিকতা থেকে এবং সূর্য শুদ্ধ বিবেচনাশীল মানসিকতা থেকে; গোচারণভূমির সহিত আমাদের পূর্বেই পরিচয় হ'য়েছে; ইহা সেই "ক্ষেত্র" যা ইন্দ্র দস্যুদের কাছ থেকে জয় করেন তাঁর ভাস্বর সখাদের জন্য এবং যার মধ্যে অত্রি দেখেছিলেন যোদ্ধা অগ্নিকে ও দীপ্তিশালী গোরাজিকে, তাদের যাদের বৃদ্ধারাও আবার তরুণী হ'য়ে উঠেছিল। এই "ক্ষেত্র" হ'ল দেবতারা যজ্ঞের দ্বারা মানবের অন্তঃপুরুষকে যে জ্যোতির্ময় ধামে নিয়ে যান তার শুধু অন্য এক চিত্র।

এই সব চিত্রাবলীর প্রকৃত রহস্যময় অর্থ কি তা বোঝাবার জন্য বিশ্বামিত্র তখন বলেন। "দক্ষিণাসমেত তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তে ("দক্ষিণে দক্ষিণাবান্") সেই গুহ্য বস্তু ধারণ করেছিলেন যা নিহিত থাকে গুহার মধ্যে এবং গূঢ় থাকে জলরাশির মধ্যে। সুষ্ঠুভাবে জেনে তিনি যেন জ্যোতিকে

২ "নমে গোঃ" "নম" এসেছে 'নম্' থেকে যার অর্থ চলা, বিচরণ করা, গ্রীক্ পদ "nemo"; নম হ'ল ক্ষেত্র, গোচারণ ভূমি, গ্রীক্ "namos"।

পৃথক করেন অন্ধকার থেকে, "জ্যোতির্ বৃণীত তমসো বিজানন্", "আমরা যেন অশুভের উপস্থিতি থেকে দূরে থাকি" (ঋক্ ৬, ৭)। এই যে দেবী দক্ষিণা যাঁকে কোন কোন শ্লোকে মনে হয় উষার এক রূপ বা বিশেষণ, আবার অন্য কিছু শ্লোকে মনে হয় সেই দেবতা যিনি যজ্ঞে নিবেদিত সব বিষয়কে বিতরণ করেন তাঁর অর্থের সন্ধান আমরা এখানে পাই। উষা হল দিব্য দীপ্তি, দক্ষিণা সেই বিচারকারী জ্ঞান যা উষার সহিত আসে এবং মনের শক্তিকে, ইন্দ্রকে সমর্থ করে যথার্থভাবে জানতে এবং অন্ধকার থেকে আলোককে, অনৃত থেকে সত্যকে, কুটিলতা থেকে ঋজুতাকে পৃথক করতে, "বৃণীত বিজানন্"। ইন্দ্রের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হ'ল জ্ঞানের মধ্যে তাঁর ক্রিয়ার দুই শক্তি; কারণ তাঁর দুই হস্তকে বলা হয় "গভস্তি"; এই পদটির অর্থ সাধারণতঃ সূর্যের এক রশ্মি কিন্তু আবার বাহুর অগ্রভাগ এবং ইহারা তাঁর দুই দৃষ্টিশক্তির অনুরূপ, তাঁর দুই উজ্জ্বল অশ্ব, "হারী" যেগুলিকে বলা হয় সূর্যচক্ষুবিশিষ্ট, "সূরচক্ষসা" এবং সূর্যের দুই দৃষ্টিশক্তি, "সূর্যস্য কেতূ"। দক্ষিণা হ'লেন দক্ষিণ হস্তের শক্তির, "দক্ষিণা"র অধি-ষ্ঠাত্রী এবং সেজন্য আমরা এই দুই পদকে একত্র পাই, "দক্ষিণে দক্ষিণা-বান্"। এই বিচারজ্ঞানই যজ্ঞের যথাযথ ক্রিয়া এবং নৈবেদ্যসমূহের যথাযথ বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইহার জন্যই ইন্দ্র সমর্থ হয় পণিদের যূথময় ধন দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে তার দক্ষিণ হস্তে। অবশেষে বলা হয় যে এই গুহ্য বিষয়ই আমাদের জন্য রাখা হ'য়েছিল গুহার মধ্যে এবং প্রচ্ছন্ন থাকে সত্তার জলরাশির মধ্যে, যে জলরাশির মধ্যে পিতৃগণের ধীকে স্থাপন করতে হবে, "অপ্সু ধিয়ং ধিষে"। এই লুকানো সূর্যকে, আমাদের দিব্য অস্তিত্বের যে গূঢ় জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে তাকে জ্ঞানের দ্বারা পেতে হবে এবং বাহির করে আনতে হবে। এই জ্যোতি যে কোন ভৌতিক জ্যোতি নয় তা দেখান হ'য়েছে "বিজানন্" কথাটির দ্বারা কারণ যথার্থ জ্ঞানের দ্বারাই ইহাকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার সহিত চাই নৈতিক ফল অর্থাৎ যেন আমরা দূরে রাখি অশুভ—("দুরিতাদ্" যার আক্ষরিক অর্থ হ'ল অযথা গমন, স্খলন) যার আয়ত্তের অধীন হ'য়ে আমরা থাকি আমাদের সত্তার রাত্রির মধ্যে যতক্ষণ না সূর্যকে পাওয়া যায়, উদয় হয় দিব্য উষার।

গোযূথ, সূর্য, মধুমদিরা, আঙ্গিরস উপাখ্যানের ঘটনাবলী, এবং পিতৃ-গণের কর্ম—এই সব বিষয়গুলি যদিও যাজ্ঞিক বা প্রাকৃতিক ব্যাখ্যায়

অতীব অসংলগ্ন এবং সূক্তগুলি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বা আর্য-দ্রাবিড়ীয় ব্যাখ্যা অত্যন্ত অসম্ভব, তবু যদি আমরা একবার ঐসব বিষয়ের অর্থের সন্ধানসূত্র পাই, তখন ইহারা সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট ও সংলগ্ন হ'য়ে ওঠে এবং প্রতিটি অন্যের উপর আলোকপাত করে। আমরা তখন প্রতি সূক্তটির অর্থ বুঝি তার সমগ্রতায় এবং অন্য সব সূক্তের সম্পর্কে; বেদে প্রতি বিচ্ছিন্ন পঙ্‌ক্তি, প্রতি শ্লোক, প্রতি বিক্ষিপ্ত উল্লেখ অনিবার্যরূপে একটি সাধারণ সমগ্রতার সামঞ্জস্যে পরিণত হয়। আমরা এখন জানি কেমন করে বলা হয় যে মধু, আনন্দ গোর মধ্যে সঞ্চিত থাকে অর্থাৎ সত্যের ভাস্বর জ্যোতির মধ্যে; জ্যোতির পতি ও উৎস সূর্যের সহিত মধুভরা গোর কি সম্পর্ক; অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত সূর্যের আবিষ্কার কেন আঙ্গিরসদের দ্বারা পণিদের গোযূথ জয়ের বা পুনরুদ্ধারের সহিত জড়িত; কেন ইহাকে সত্যের আবিষ্কার বলা হয়; পদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন এবং গোর ক্ষেত্র বা চারণভূমি কথাগুলিরই বা কি অর্থ। আমরা আরো বুঝতে পারি পণিদের গুহা কি এবং যা বলের বিবরে প্রচ্ছন্ন থাকে তাকে কেন আবার বলা হয় জলরাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন, যে জলরাশিকে ইন্দ্র মুক্ত করেছিলেন বৃত্রের কবল থেকে, যে সপ্ত নদীকে অধিকার করেছিল অয়াস্যের সপ্তশীর্ষ স্বর্গজয়ী ধী; আমরা বুঝি কেন বলা হয় যে গুহার মধ্য থেকে সূর্যের উদ্ধার করা হয় অন্ধকারের মধ্য থেকে জ্যোতিকে পৃথক বা নির্বাচন করা হয় এক সর্ববিচারকারী জ্ঞানের দ্বারা; কে দক্ষিণা ও সরমা এবং ইন্দ্র যে তাঁর দক্ষিণ হস্তে ক্ষুরযুক্ত ধন ধারণ করেন এই উক্তির অর্থ কি তা-ও বোঝা যায়। আর এই সব সিদ্ধান্তে আসতে কথাগুলির কোন কষ্টকল্পিত অর্থ আমাদের বার করতে হয় না; কি একই পদকে সাময়িক সুবিধামত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করতে হয় না কিম্বা একই পঙ্‌ক্তিকে বা পদের সমষ্টি-কে বিভিন্ন সূক্তে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করতে হয় না অথবা অসংলগ্নতাকেই সঠিক ব্যাখ্যার মান হিসাবে স্বীকার করা হয় না; বরং আমাদের এই ব্যাখ্যায় ঋকগুলির পদে ও রূপে আরো বেশী বিশ্বস্ততা থাকে, বেদের সাধারণ ও বিস্তারিত অর্থ আরো সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় নিরন্তর স্বচ্ছতা ও পূর্ণতার সহিত।

সুতরাং যে অর্থ আমরা আবিষ্কার করেছি তা অন্যান্য অংশেও প্রয়োগ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। এই উদ্দেশ্যে আমি বসিষ্ঠের একটি সূক্ত, ৭-৭৬ পরীক্ষা করব যদিও উপরভাসা দৃষ্টিতে তা শুধু মনে হবে প্রাকৃতিক

উষার এক প্রাণোজ্জ্বল বর্ণনা। কিন্তু যখন আমরা ইহা পরীক্ষা করি, তখন এই প্রাথমিক ধারণা চলে যায়; আমরা দেখি সেখানে সততই বর্তমান আছে এক গভীরতর অর্থের ব্যঞ্জনা এবং আমরা যে সন্ধানীসূত্র পেয়েছি তা যে মুহূর্তে প্রয়োগ করি, তখনই প্রকৃত অর্থের সামঞ্জস্য পরিস্ফুট হয়। দেবতারা ও আঙ্গিরসরা যে পরমা উষা সৃষ্টি করেছেন তার জ্যোতির মধ্যে সূর্যের উদয়ের বর্ণনা দিয়েই সূক্তের আরম্ভ। "সবিতা, দেব, বিশ্বানর, উত্তরণ করেছেন সেই জ্যোতির মধ্যে যা অমৃতময় এবং সকল জন্মের, "জ্যোতির্ অমৃতং বিশ্বজন্যম্"; (যজ্ঞের) কর্মের দ্বারা দেবগণের চক্ষু জন্মগ্রহণ করেছে (অথবা দেবগণের সংকল্প-শক্তির দ্বারা দৃষ্টি জন্মলাভ করেছে); উষা ব্যক্ত করেছে বিশ্বভুবন (অথবা যা কিছু জন্মায় সেসব, সকল অস্তিত্ব, "বিশ্বং ভুবনম্")" (ঋক্ ১)। এই অমৃতময় জ্যোতি যার মধ্যে সূর্য উত্তরণ করেছেন তাকে অন্যত্র বলা হয়েছে সত্য জ্যোতি, "ঋতং জ্যোতিঃ", বেদে সত্য এবং অমৃতকে সর্বদাই একত্র উল্লেখ করা হ'য়েছে। যখন অয়াস্য "বিশ্বজন্য", তাঁর সত্তায় বিশ্বজনীন হ'লেন তখন তিনি যে সপ্তশীর্ষ ধী আবিষ্কার করেছিলেন তার দেওয়া জ্ঞানের জ্যোতি ইহা; সেজন্য এই জ্যোতিকেও বলা হয় "বিশ্বজন্য" কারণ ইহা সেই চতুর্থ লোকের, অয়াস্যের "তুরীয়ং স্বিদ্"-এর অন্তর্ভুক্ত যা থেকে বাকী সব কিছু জন্মগ্রহণ করেছে এবং যার সত্যে বাকীসব ব্যক্ত হয় তাদের বৃহৎ সার্বিকতায়, আর মিথ্যা ও কুটিলতার সীমিত সংজ্ঞার মধ্যে নয়। সেজন্য ইহাকে আবার বলা হয় দেবতাদের চক্ষু এবং দিব্য উষা যা সমগ্র অস্তিত্বকে ব্যক্ত করে।

এই দিব্য দৃষ্টির জন্মের ফলে, মানবের পথ তার নিকট ব্যক্ত হয় এবং দেবগণের বা দেবগণের অভিমুখে সেই সব যাত্রাও ("দেবযানাঃ") ব্যক্ত হয় যা নিয়ে যায় দিব্য অস্তিত্বের অনন্ত ব্যাপ্তির মধ্যে। "আমার কাছে দেখা দিয়েছে দেবযানসমূহ, সেই সব যান যা ভঙ্গ করে না, যার গতিবিধি সৃষ্ট হ'য়েছিল বসুদের দ্বারা। উষার চক্ষু সম্মুখে প্রকাশিত হ'য়েছে এবং তিনি আমাদের দিকে এসেছেন আমাদের গৃহের উপর (উপনীত হ'য়ে)" (ঋক্ ২)। যে দেহগুলি অন্তঃপুরুষের আবাসস্থল, বেদে সততই তাদের চিহ্নিত করা হয় গৃহ বলে যেমন ক্ষেত্র বা ধামের অর্থ সেই সব লোক যাতে অন্তঃপুরুষ আরোহণ করে এবং যার মধ্যে তা বিশ্রাম করে। মানবের পথ হ'ল পরমলোকে তার যাত্রার পথ এবং দেবযানসমূহ

যা ভঙ্গ করে না তা হ'ল,—যেমন দেখা যায় পঞ্চম শ্লোকে যেখানে কথাটি আবার বলা হ'য়েছে—দেবতাদের ক্রিয়াবলী, জীবনের দিব্য বিধান যার মধ্যে অন্তঃপুরুষকে বৃদ্ধি পেতে হবে। তারপর আমরা এক অদ্ভুত চিত্র পাই যা মনে হয় মেরুপ্রদেশীয় ব্যাখ্যার সমর্থন করে। "এমন দিন বহু ছিল যা সব সূর্যোদয়ের পূর্বে ছিল (অথবা যা সব প্রাচীন কালে ছিল সূর্যোদয়ের দ্বারা), যার মধ্যে, অয়ি উষা তোমাকে দেখা গিয়েছিল যেন তুমি প্রেমিকের পাশে বিচরণ করছ এবং পুনর্বার আসছ না" (ঋক্ ৩)। যেমন মেরুপ্রদেশে দেখা যায় ইহা নিশ্চয়ই তেমন সেই সব নিরন্তর উষা-সমূহের চিত্র যা রাত্রির দ্বারা ব্যাহত হয় না। এই শ্লোকটির মনস্তাত্ত্বিক অর্থ সুস্পষ্ট।

এই সব উষা কি ছিল? ইহারা সেই সব যা সৃষ্ট হ'য়েছিল পিতৃগণের, প্রাচীন আঙ্গিরসদের ক্রিয়ার দ্বারা। "তাঁরা নিশ্চয়ই (সোমের) আনন্দ পেয়েছিলেন দেবগণের[১] সহিত, তারা সেই পুরাকালের ঋষিরা যাঁরা সত্য লাভ করেছিলেন; পিতৃগণ গূঢ় জ্যোতি পেয়েছিলেন; তাঁরা সত্যমতির অধিকারী হ'য়ে ("সত্যমন্ত্রা", চিদাবিষ্ট বাক্-এ প্রকাশিত সত্য মতি) উষাকে সৃষ্টি করেছিলেন" (ঋক্ ৪)। এবং উষা, পথ, দেবযান পিতৃগণকে কোথায় নিয়ে গেছল? তারা নিয়েছিল সমান ব্যাপ্তিতে, "সমানে ঊর্বে", যাকে অন্যত্র বলা হয়েছে বাধাহীন বৃহৎ, "উরৌ অনিবাধে" আর ইহা স্পষ্টতঃই সেই একই প্রশস্ত সত্তা বা জগৎ যা কাণ্বের কথায় মানুষ সৃষ্টি করে যখন তারা বৃত্র নিধন ক'রে দ্যৌ ও পৃথিবীর অতীতে প্রস্থান করে; ইহাই বৃহৎসত্য ও অদিতির অনন্ত সত্তা। "সমান ব্যাপ্তিতে তারা মিলিত হয় এবং তাদের জ্ঞান যুক্ত করে (অথবা সুষ্ঠুভাবে জানে) এবং একত্র চেষ্টা করে না; দেবগণের ক্রিয়া তারা হ্রাস করে না (বা সীমিত করে না বা আঘাত করে না), তাদের ভঙ্গ না ক'রে তারা (তাদের লক্ষ্যে) পৌছয় বসুদের (সাহায্যের) দ্বারা (ঋক্ ৫)। ইহা স্পষ্ট যে সপ্ত আঙ্গিরসগণ, মানুষী হোন বা দিব্য হোন—জ্ঞানের, ধীর, বা বাক্-এর বিভিন্ন তত্ত্বের প্রতীক্, তাঁরাই সপ্তশীর্ষ ধী, বৃহস্পতির সপ্তাননের বাণী, এবং সমান ব্যাপ্তির মধ্যে এই সব সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সার্বিক জ্ঞানে; যেসব ভ্রম, কুটিলতা, অনৃতের দ্বারা মানুষরা দেবতাদের ক্রিয়া ভঙ্গ করে এবং তাদের

১ "সধমাদঃ" কথাটির পরম্পরাগত অর্থটিই আমি সাময়িকভাবে গ্রহণ করেছি যদিও আমি নিশ্চিত নয় যে ইহাই প্রকৃত অর্থ।

সত্তার, চেতনার, জ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্ব পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে আসে তাদের অপসারিত করা হ'য়েছে দিব্য উষার চক্ষু বা দৃষ্টির দ্বারা।

এই সূক্তের শেষে আছে এই দিব্য ও আনন্দময়ী উষার প্রতি বসিষ্ঠদের আস্পৃহার কথা, যাতে উষাকে বলা হয়েছে যূথের নেত্রী এবং ঋদ্ধির কর্ত্রী এবং আবার সুখ ও সত্যসমূহের নেত্রী ("সূনৃতানাম্")। আদি ঋষিদের, পিতৃগণের মতো তাঁরাও কামনা করেন সেই সিদ্ধি পেতে এবং তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা মানুষী আঙ্গিরস, দিব্য আঙ্গিরস নয়। যাহোক, আঙ্গিরস উপাখ্যানের ও তার সব খুঁটিনাটির অর্থ নির্ধারিত হ'য়েছে, শুধু বাকী আছে পণিরা এবং শুনী সরমা সঠিকভাবে কি তা জানা আর আমরা এখন চতুর্থ মণ্ডলের প্রথম কয়টি সূক্তের অংশগুলি আলোচনা করব যাতে মানুষী পিতৃগণের কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে এবং তাদের কার্যের কথা বর্ণনা করা হ'য়েছে। আঙ্গিরস উপাখ্যানের এই দিকটির পক্ষে বামদেবের এই সূক্তগুলি সর্বাপেক্ষা আলোকদায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ এবং ইহারা নিজেরাও ঋগ্বেদের মধ্যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক অংশ।

উনবিংশ অধ্যায়

পিতৃগণের জয়

দিব্যশিখা, কবিক্রতু, অগ্নির উদ্দেশে মহান্ ঋষি বামদেবের সূক্তগুলি ঋগ্বেদের মধ্যে অন্যতম রহস্যময় উক্তি এবং যদি আমরা ঋষিদের দ্বারা ব্যবহৃত তাৎপর্যপূর্ণ চিত্রাবলীর রীতি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করি তাহ'লে তাদের অর্থ সম্পূর্ণ সরল হয়ে ওঠে কিন্তু অন্যথায় সেসব কথা মনে হবে শুধু কতকগুলি অবোধ্য চিত্রের উজ্জ্বল কুহেলিকা। সূক্তগুলির অর্থের চাবিকাঠি স্বরূপ যে নির্দিষ্ট সাংকেতিক লিপি তা-ই পাঠককে প্রতি মুহূর্তে প্রয়োগ করতে হবে; অন্যথায় কোন দর্শনের ছাত্র যদি দর্শনে সর্বদাই ব্যবহৃত দার্শনিক সংজ্ঞাগুলির অর্থ আয়ত্ত না করেই দর্শন পড়ে সে যেমন কিছুই বুঝবে না, অথবা পাণিনির সব সূত্র অধ্যয়ন করতে গিয়ে যদি কোন পাঠক সেই সব সূত্র সম্বন্ধে ব্যাকরণের সাংকেতিক পদ্ধতি কিছু না জানে তাহ'লে তার কাছে যেমন সবই অবোধ্য হবে, ঠিক তেমন অবস্থায় বেদের পাঠককেও পড়তে হবে। আমরা কিন্তু ইতিপূর্বেই এই সব চিত্রের রীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট আলো পেয়েছি এবং সেজন্য মানুষী পূর্বপুরুষগণের মহতী সিদ্ধি সম্বন্ধে বামদেব যা বলতে চান তা আমরা বুঝতে সক্ষম হব।

এই মহতী সিদ্ধি কি তা সুরুতেই আমাদের মনে সুস্পষ্টভাবে রাখার উদ্দেশ্যে পরাশর শাক্ত্য যে সব স্পষ্ট ও পর্যাপ্ত সূত্রে তা বলেছেন সেগুলি আমরা নিজেদের সম্মুখে রাখতে পারি। "আমাদের পিতৃগণ তাঁদের উক্তির দ্বারা দৃঢ় ও কঠিন স্থানগুলি বিদীর্ণ করেছিলেন, হ্যাঁ আঙ্গিরসগণ তাঁদের রবের দ্বারা অদ্রিকে বিদীর্ণ করেছিলেন; আমাদের মধ্যে তাঁরা তৈরী করলেন বৃহৎ স্বর্গে যাবার পথ; তাঁরা পেলেন দিবা ও স্বর্ এবং দৃষ্টি এবং ভাস্বর গোরাজি", "চক্রুর্ দিবো বৃহতো গাতুম্ অস্মে, অহঃ স্বর্ বিবিদুঃ কেতুম্ উস্রাঃ" (১-৭১-২)। তিনি বলেন যে এই পথ হ'ল সেই পথ যা অমৃতত্বে নিয়ে যায়; "যথার্থ ফলদায়ী সকল বিষয়ে যাঁরা প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা গঠন করেছিলেন অমৃতত্বের অভিমুখে পথ; তাঁদের জন্য পৃথিবী ব্যাপ্ত হ'য়ে থেকেছিল মহত্ত্বের দ্বারা এবং মহৎগণের দ্বারা, মাতা অদিতি তাঁর পুত্রদের সহিত এসেছিলেন (বা নিজেকে ব্যক্ত

করেছিলেন) ধারণের জন্য" (১-৭২-৯)।[১] ইহার অর্থ এই, শারীরিক সত্তা ঊর্ধ্বের অনন্তলোকের মহত্ত্বের দ্বারা এবং যেসব মহান্ দেব সেই সব লোকে রাজত্ব করেন তাঁদের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট হ'য়ে জ্যোতির দিকে উন্মুক্ত হয় এবং তার এই নতুন ব্যাপ্তিতে তাকে ঊর্ধ্বে ধারণ করে অনন্ত চেতনা, মাতা অদিতি এবং তাঁর পুত্রগণ, পরমদেবের দিব্যশক্তিসমূহ। ইহাই বৈদিক অমৃতত্ব।

এই প্রাপ্তি ও প্রসরণের উপায় সম্বন্ধেও পরাশর খুব সংক্ষেপে বলেছেন তাঁর রহস্যার্থক কিন্তু তবু স্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে। "তাঁরা সত্যকে ধারণ করেছিলেন, তাঁরা ইহার ধীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন; তারপর বস্তুতঃ আস্পৃহাবান্ পুরুষরা ("অর্যঃ"), তাঁরা ধীতে তা ধারণ ক'রে তাকে তাঁদের সকল সত্তার মধ্যে বিকীর্ণ করে ভরণ করেছিলেন, "দধান্ ঋতং ধনয়ন্ অস্য ধীতিম্ আদ্ ইদ্ অবর্যা দিধিষ্বো বিভৃত্রাঃ" (১-৭১-৩)। "বিভৃতাঃ" পদটি ব্যঞ্জনাময় আর ইহার অর্থ আমাদের সত্তার সকল তত্ত্বে সত্যের মতিকে ধারণ করা অর্থাৎ সাধারণ বৈদিক চিত্রে ইহার অর্থ সকল সপ্ত জলরাশিতে সপ্তশীর্ষ ধী, "অপ্সু ধিয়ং ধিষে" যে চিত্রটি অন্যত্র প্রায় একই সমান ভাষায় প্রকাশিত করা হ'য়েছে; এই চিত্রটি ইহার অব্যবহিত পরেই দেখান হ'য়েছে,—"কর্মসাধকরা তৃষ্ণাহীন (জলরাশির) অভিমুখে যায় আর ইহারা দিব্যজন্ম বর্ধন করে আনন্দের তৃপ্তির দ্বারা" "অতৃষ্যন্তীর্ অপসো যন্তি অচ্ছা, দেবান্ জন্ম প্রয়সা বর্ধয়ন্তীঃ"। নিঃশ্রেয়সের জন্য অন্তঃপুরুষের ক্ষুধার তৃপ্তির দ্বারা পরিতৃপ্ত সপ্তবিধ সত্য-সত্তার মধ্যে সপ্তবিধ সত্য-চেতনার দ্বারা আমাদের মধ্যে যেসব দিব্যজন্মের বৃদ্ধি হয় তাহাই অমৃতত্বের বৃদ্ধি। ইহাই সেই দিব্যসত্তা, জ্যোতি ও আনন্দের ত্রিত্বের অভিব্যক্তি যাকে বেদান্তবাদীরা পরে সচ্চিদানন্দ বলেছেন।

সত্যের এই সার্বিক বিকিরণ এবং আমাদের মধ্যে সকল দেবতার জন্ম ও ক্রিয়া যার দ্বারা আমাদের বর্তমান সীমিত মর্ত্যত্বের পরিবর্তে এক বিশ্বজনীন ও অমর জীবন নিশ্চিত হয়—এই অর্থটি পরাশর আরো স্পষ্ট করেছেন ১-৬৮ সূক্তে। দিব্য কবিক্রতু অগ্নি সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি স্বর্গে আরোহণ করেন এবং যা কিছু স্থির ও যা কিছু চঞ্চল সেসব

১ আ যে বিশ্বা স্বপত্যানি তস্থুঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্; মহ্না মহদ্ভিঃ পৃথিবী বি তস্থে মাতা পুত্রৈর্ অদিতির্ ধায়সে বেঃ।

থেকে রাত্রির অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন, "যখন তিনি তাঁর সত্তার মহত্ত্বের দ্বারা এই সকল দেবতাকে ব্যেপে এক দেব হ'য়ে ওঠেন। বস্তুতঃ তখন সকলে সংকল্প (বা কর্ম) গ্রহণ করে ও তাতে সংলগ্ন থাকে যখন, হে দেব, তুমি জীবন্ত পুরুষ হ'য়ে জন্ম লও শুষ্কতা থেকে। অর্থাৎ জড়ীয় সত্তা থেকে যাকে বলা হয় মরুভূমি, সত্যের ধারার দ্বারা সিঞ্চিত নয়); তারা সকলে দেবত্ব উপভোগ করে তাদের গতিবিধির দ্বারা সত্য ও অমৃতত্ব লাভ ক'রে, "ভজন্ত বিশ্বে দেবত্বং নাম, ঋতং সপন্তো অমৃতম্ এবৈঃ"। সত্যের প্রবেগ, সত্যের চিন্তন বিশ্বজনীন জীবন হ'য়ে ওঠে (অথবা সকল জীবন ব্যাপ্ত করে) এবং ইহার মধ্যে তাদের সকল ক্রিয়া সার্থক করে" "ঋতস্য প্রেষা ঋতস্য ধীতির্, বিশ্বায়ুর্ বিশ্বে অপাংসি চক্রুঃ" (ঋক্ ১, ২, ৩)।

ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ বেদের যে দুর্ভাগ্যজনক অপব্যাখ্যা আধুনিক মনের উপর আরোপ করেছেন তার দ্বারা অভিভূত হ'য়ে যাতে আমরা মানুষী পূর্বপুরুষগণের অতি-পার্থিব সিদ্ধির মধ্যে পাঞ্জাবের সপ্ত পার্থিব নদীর ভাবনা না আনি সেজন্য আমরা এখানে উল্লেখ করব পরাশর সপ্ত নদী সম্বন্ধে কি বলেছেন তাঁর প্রাঞ্জল ও প্রকাশময় ভঙ্গীতে। "সত্যের ধাত্রী ধেনুগণ ("ধেনবঃ"—এই চিত্রটি নদী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় আর সূর্যের জ্যোতির্ময় গোরাজি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় "গাবঃ" বা "উস্রাঃ") তাকে পুষ্ট করেছিল, তারা হাম্বারব করছিল তাদের স্তনযুগল সুখময় ছিল এবং তারা স্বর্গে উপভোগ করেছিল; পরম (লোক) থেকে বর হিসাবে সত্য চিন্তন লাভ ক'রে নদীগুলি অদ্রির উপর দিয়ে বিস্তৃত ও সমান হ'য়ে প্রবাহিত হ'য়েছিল;" "ঋতস্য হি ধেনবো বাবশানাঃ, স্মদূধ্নীঃ পীপয়ন্ত দ্যুভক্তাঃ; পরাবতঃ সুমতিং ভিক্ষামাণাঃ, বি সিন্ধবঃ সময়া সস্রুর্ অদ্রিম্" (১-৭৩-৬)। আবার ১-৭২-৮ শ্লোকে তিনি তাদের সম্বন্ধে এমন সব পদ প্রয়োগ করেন যা অন্যান্য সূক্তে নদী সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয়; তিনি বলেন, "স্বর্গের সপ্ত বীর পুরুষগণ মননকে যথার্থভাবে স্থাপন ক'রে, সত্যকে জেনে জ্ঞানের মধ্যে সুখের দ্বারগুলি বিচার করে জেনেছিলেন; সরমা খুঁজে পেয়েছিল দুর্গ, জ্যোতির্ময় গোরাজির ব্যাপ্তি; ইহার দ্বারা মানুষী জীব আনন্দ উপভোগ করে", "স্বাধ্যো দিব আ সপ্ত যহ্বীঃ, রায়ো দুরো বি ঋতজ্ঞা অজানন্; বিদদ্ গব্যং সরমা দৃঢ়ম্ উর্বম্, যেনা নু কং মানুষী ভোজতে বিট্"। স্পষ্টতঃই ইহারা পাঞ্জাবের জলরাশি নয়, ইহারা স্বর্গের

নদী, সত্যের ধারাসমূহ[১], সরস্বতীর মতো দেবীবৃন্দ যাঁরা জ্ঞানের মধ্যে সত্যের অধিকারী এবং ইহার দ্বারা মানুষী জীবের কাছে উন্মুক্ত করেন নিঃশ্রেয়সের দ্বারগুলি। আগে যেমন আমি বার বার বলেছি, এখানেও আমরা দেখি যে গোপ্রাপ্তি ও নদীসমূহের বহিঃপ্রবাহের সহিত নিবিড় সম্পর্ক আছে; ইহারা একই কর্মের অংশ, আর সেই কর্ম হ'ল মানুষের দ্বারা সত্য ও অমৃতত্ব লাভ, "ঋতং সপন্তো অমৃতম্ এবৈঃ"।

এখন ইহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে আঙ্গিরসদের সাধন হ'ল সত্য ও অমৃতত্ব জয় করা, আর যে স্বরকে আবার বলা হয় বৃহৎ স্বর্গ, "বৃহৎ দ্যৌঃ" তা সাধারণ স্বর্গ ও পৃথিবীর ঊর্ধ্বে অর্থাৎ সাধারণ মানসিক ও শারীরিক সত্তার ঊর্ধ্বে সত্যের লোক; আর ইহাও স্পষ্ট যে বৃহৎ দ্যৌ-এর পথ, সত্যের যে পথ আঙ্গিরসরা সৃষ্টি করেছেন এবং শুনী সরমা অনুসরণ করেছে তা-ই অমৃতত্ব পাবার পথ, "অমৃতত্বায় গাতুম্" (১-৭৮-৯); আর উষার দৃষ্টি ("কেতু"), আঙ্গিরসদের দ্বারা জয় করা দিবস হ'ল ঋত-চেতনার উপযোগী দৃষ্টি; পণিদের কাছ থেকে জোর করে আনা সূর্যের ও উষার ভাস্বর গোরাজি হ'ল এই ঋতচেতনার দীপ্তিসমূহ যা অয়াস্যের সপ্তশীর্ষ ধীতে পূর্ণ সত্যের মতি, "ঋতস্য ধীতিঃ" গঠনে সাহায্য করে। ইহাও স্পষ্ট যে বেদের রাত্রি হ'ল মর্ত্য জীবের অন্ধকারময় চেতনা যার মধ্যে সত্য অবচেতন থাকে, পর্বতের গুহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, আর রাত্রির এই অন্ধকারের মধ্যে অবস্থিত হারানো সূর্যের উদ্ধারের অর্থ অন্ধকারময় অবচেতন অবস্থার মধ্য থেকে সত্যসূর্যের উদ্ধার, আর পৃথিবীর দিকে সপ্ত নদীর নিম্নপ্রবাহ নিশ্চয়ই দিব্য বা অমর অস্তিত্বের সত্যের মধ্যে রূপায়িত আমাদের সত্তার সপ্তবিধ তত্ত্বের বহিঃস্রোতের ক্রিয়া। ঠিক সেইরকম পণিরাও নিশ্চয়ই সেই সব শক্তি যা অবচেতন অবস্থার মধ্য থেকে সত্যের আবির্ভাব নিবারণ করে এবং যাদের নিরন্তর প্রয়াস হ'ল মানবের কাছ থেকে ইহার সব দীপ্তি অপহরণ করা এবং তাকে আবার রাত্রির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করা এবং বৃত্র নিশ্চয়ই সেই শক্তি যা সত্যের দীপ্ত নদীসমূহের অবাধ গতি ব্যাহত ও নিবারণ করে, ব্যাহত করে আমাদের মধ্যে সেই সত্যের প্রবেগ "ঋতস্য প্রেষা", জ্যোতির্ময় প্রেরণা, "দ্যুমতীম্

১ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১-৩২-৮ শ্লোকে হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস বৃত্র থেকে মুক্ত করা জলরাশিকে বর্ণনা করেছেন যেন তারা মনে আরোহণ করছে, "মনো রুহানাঃ" এবং অন্যত্র তাদের বলা হয় জ্ঞানযুক্ত জলরাশি, "আপো বিচেতসঃ" (১-৮৩-১)।

ইষম্" (৭-৫-৮) যা আমাদের নিয়ে যায় রাত্রির উজানে অমৃতত্বে। আবার বিপরীত পক্ষে অদিতির পুত্রগণ, দেবতারা নিশ্চয়ই অনন্ত চেতনা অদিতি থেকে জাত জ্যোতির্ময় দিব্যশক্তিসমূহ আর আমাদের মানুষী ও মর্ত্য সত্তার মধ্যে তাদের গঠন ও ক্রিয়া দেবত্বের মধ্যে দেবের সত্তার মধ্যে ("দেবত্বম্") অর্থাৎ অমৃতত্বের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধির জন্য' প্রয়োজনীয়। ঋতচিৎ কবিক্রতু অগ্নিই প্রধান দেবতা যিনি আমাদের সমর্থ করেন যজ্ঞ-সাধনে; তিনি ইহাকে নিয়ে যান সত্যের পথে, তিনিই সংগ্রামের যোদ্ধা, কর্মের সাধক এবং নিজের মধ্যে অন্য সকল দেবতাকে গ্রহণ করায় আমাদের মধ্যে তাঁর ঐক্য ও সার্বিকতা অমৃতত্বের ভিত্তি। সত্যের যে লোকে আমরা উপনীত হই তা তাঁর নিজের ধাম ও অন্য দেবগণেরও স্বীয় ধাম এবং মানবের অন্তঃপুরুষেরও অন্তিম ধাম। আর এই অমৃতত্বকে বলা হয় নিঃশ্রেয়স্, অনন্ত আধ্যাত্মিক সম্পদ্ ও প্রাচুর্যের অবস্থা, "রত্ন" "রয়ি", "বাজ", "রাধস্" ইত্যাদি এবং আমাদের দিব্য ধামের প্রবেশের দ্বারগুলি হ'ল আনন্দের দ্বার, "রায়ো দুরঃ" আর এইসব দিব্য দ্বার উদারভাবে উন্মুক্ত হয় তাদের কাছে যারা সত্য বর্ধন করে ("ঋতাবৃধঃ") এবং যেগুলিকে আমাদের জন্য আবিষ্কার করেন সরস্বতী ও তাঁর ভগিনীবৃন্দ, সপ্ত নদী, ও সরমা; ইহাদের দিকেই, বৃহৎসত্যের অনিবাধ ও সমান আনন্ত্যসমূহের মধ্যে প্রশস্ত চারণভূমির ("ক্ষেত্র") দিকেই বৃহস্পতি ও ইন্দ্র ঊর্ধ্বে নিয়ে যান দীপ্তিময় যূথসমূহ।

এই ভাবনাগুলি আমাদের মনে স্পষ্টভাবে দৃঢ় হ'লে আমরা বামদেবের শ্লোকগুলি বুঝতে সমর্থ হব যাতে শুধু প্রতীকার্থক্ ভাষায় বলা হয় মননের সেই সারকথা যা পরাশর বলেছেন আরো স্পষ্টভাবে। কবিক্রতু অগ্নির উদ্দেশেই বামদেবের প্রথম সূক্তগুলি রচিত। এইসব স্তুতিতে তাঁকে বলা হ'য়েছে মানবের যজ্ঞের সখা বা নির্মাতা যিনি তাকে জাগ্রত করেন দৃষ্টিতে, জ্ঞানে, ("কেতু"), স চেতয়ন্ মনুষো যজ্ঞবন্ধুঃ" (৪-১-৯); এই কাজ করে "তিনি বাস করেন সত্তার দ্বারযুক্ত গৃহসমূহে, সাধন ক'রে, তিনি, দেব, এসেছেন মর্ত্যের সাধনের উপায় হবার জন্য" "স ক্ষেতি অস্য দুর্যাসু সাধন্, দেবো মর্তস্য সধনিত্বম্ আপ"। তিনি কি সাধন করেন? পরের শ্লোকেই বলা হ'য়েছে, "এই অগ্নি যেন আমাদের নিয়ে যান তাঁর জ্ঞানে তাঁর সেই আনন্দের দিকে যা দেবগণ উপভোগ করেন, সেই যাকে মনন দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন সকল অমর্ত্য এবং দ্যৌবিপতা, সত্য বর্ষণকারী

পিতা" "স নো অগ্নির্ নয়তু প্রজানন্, অচ্ছা রত্নং দেবভক্তং যদ্ অস্য; ধিয়া যদ্ বিশ্বে অমৃতা অকৃণ্বন্, দ্যৌষ্পিতা জনিতা সত্যম্ উক্ষন্"। ইহাই পরাশরের অমৃতত্বের নিঃশ্রেয়স্ যাকে অমর দেবতার সকল শক্তি সৃষ্টি করেছিল সত্যের মননে এবং ইহার প্রবেগে, আর স্পষ্টতঃই সত্যের বহির্বর্ষণ হ'ল জলরাশির বহির্বর্ষণ আর তা প্রকাশ করা হয়েছে "উক্ষন্" পদটির দ্বারা যা হ'ল পরাশরের কথিত পর্বতের উপর সত্যের সপ্ত নদীর সমান বিকিরণ।

বামদেব তারপর আরো বলেন এই মহান্, প্রথম বা পরম তেজ অগ্নির জন্মের কথা সত্যের মধ্যে, জলরাশির মধ্যে, তার আদি ধামে। "তিনি জন্মেছিলেন, প্রথম, জলরাশির মধ্যে, মহান্ লোকের (স্বর্) ভিত্তিতে, ইহার গর্ভে (অর্থাৎ ইহার আসনে ও জন্মস্থানে, ইহার আদি ধামে); তিনি পদ ও শীর্ষ বিহীন, তাঁর দুই অন্ত গোপন রেখে, নিজেকে তাঁর কাজে প্রবৃত্ত ক'রে বৃষভের আবাসে" (ঋক্ ১১)। বৃষভ হলেন দেব বা পুরুষ, তাঁর আবাস হ'ল সত্যের লোক, আর কবিক্রতু অগ্নি ঋতচেতনার মধ্যে কাজ ক'রে জগৎসমূহ সৃষ্টি করেন; কিন্তু তিনি তাঁর দুই প্রান্তভাগ, তাঁর মস্তক ও পদ প্রচ্ছন্ন করেন; অর্থাৎ তাঁর কাজ চলে অতিচেতন ও অবচেতনের মধ্যে যাদের মধ্যে তাঁর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অবস্থাগুলি প্রচ্ছন্ন থাকে, প্রথমটি থাকে একান্ত জ্যোতির মধ্যে এবং দ্বিতীয়টি একান্ত অন্ধকারের মধ্যে। সেখান থেকে তিনি অগ্রসর হন প্রথম এবং পরম তেজরূপে এবং জন্ম নেন বৃষভের বা প্রভুর কাছে আনন্দের সপ্তশক্তির, সপ্ত প্রিয়ের কর্মের দ্বারা। "তিনি সম্মুখে চললেন দীপ্তজ্ঞানের দ্বারা প্রথম তেজ রূপে, সত্যের আসনে, বৃষভের আবাসে, কাম্য, যুবা, বপুতে পূর্ণ, বিস্তৃতভাবে দীপ্যমান্; সপ্ত প্রিয়জন তাঁকে জন্ম দিয়েছিল প্রভুর কাছে" (ঋক্ ১২)।

তারপর ঋষি বলেন মানুষী পিতৃগণের কর্মসাধনের কথা, "অস্মাকম্ অত্র পিতরো মনুষ্যাঃ, অভি প্র সেদুর্ ঋতং আশুষাণাঃ": "এইখানে আমাদের মানুষী পিতৃগণ সত্যলাভের কামনায় তার দিকে অগ্রসর হ'লেন; আবরণকারী কারাগারের মধ্যে উজ্জ্বল গোরাজি, সুদোহক তারা যাদের খোঁয়াড় ছিল অদ্রির মধ্যে—তাদের তাঁরা ঊর্ধ্বের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন (সত্যের দিকে), উষারা তাদের আহ্বানে উত্তর দিল। তাঁরা পর্বতকে বিদীর্ণ করেছিলেন এবং তাদের উজ্জ্বল করেছিলেন; তাঁদের চারিপাশের অন্য সকলেরা তাঁদের এই (সত্যকে) বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত

করেছিলেন; যূথসমূহের চালক তাঁরা কর্মসাধকের (অগ্নির) উদ্দেশে স্তুতি গেয়েছিলেন, তাঁরা জ্যোতি পেয়েছিলেন, তাঁদের মননে তাঁরা দীপ্ত হয়েছিলেন (অথবা তাঁরা মননের দ্বারা কর্মসাধন করেছিলেন)। যে মন আলোক চায় (গোরাজি, "গব্যতা মনসা") তা নিয়ে তাঁরা জ্যোতির্ময় গোরাজির চতুষ্পার্শ্বস্থ দৃঢ় ও সংহত অদ্রি বিদীর্ণ করেছিলেন; 'আস্পৃহাবান্ পুরুষগণ দিব্য বচনের দ্বারা "বচসা দৈব্যেন" গাভীতে পূর্ণ দৃঢ় খোঁয়াড় উন্মুক্ত করেছিলেন" (ঋক্ ১৩, ১৪, ১৫)। এই সবই আঙ্গিরস উপাখ্যানের সাধারণ চিত্র কিন্তু পরের শ্লোকে বামদেব আরো রহস্যার্থক ভাষা ব্যবহার করেন। "তাঁরা মনে ভাবনা করেছিলেন ধাত্রী গাভীদের প্রথম নাম, তাঁরা পেয়েছিলেন মাতার ত্রি সপ্ত পরম (আসনগুলি); যূথের স্ত্রীরা তা জেনেছিল এবং তারা ইহাকে অনুসরণ করেছিল; অরুণবর্ণ জন ব্যক্ত হ'য়েছিলেন জ্যোতির গোর বিজয়ী প্রাপ্তির (বা প্রভার) দ্বারা।" "তে মন্বত প্রথমং নাম ধেনোস্ ত্রিঃসপ্ত মাতুঃ পরমাণি বিন্দন্; তজ্ জানতীর্ অভ্যনূষত ব্রা, আবির্ভুবদ্ অরুণীর্ যশসা গোঃ"। এখানে মাতা হ'লেন অদিতি, অনন্ত চেতনা যিনি "ধেনু" বা ধাত্রী গাভী আর তাঁর আছে সপ্তবিধ স্রোতের জন্য সপ্ত নদী, তিনিই আবার "গৌ", জ্যোতির গাভী যার সন্তান হ'ল উষারা; অরুণবর্ণ জন হ'ল দিব্য উষা এবং যূথ বা রশ্মিমালা হল দিব্য দীপ্তিসমূহ। ত্রিসপ্ত পরম আসন সহ মাতার প্রথম নাম যাকে উষারা অথবা মানসিক দীপ্তিসমূহ জানে এবং যার দিকে তারা যায় তা নিশ্চয়ই পরমদেবের নাম বা দেবতা যে পরমদেব হলেন অনন্ত সত্তা ও অনন্ত চেতনা ও অনন্ত আনন্দ আর আসনগুলি হ'ল তিনটি দিব্য লোক যেগুলিকে সূক্তে আগে বলা হ'য়েছে অগ্নির তিনটি পরম জন্ম, পুরাণের সত্য, তপঃ ও জন যেগুলি দেবের তিনটি আনন্ত্যের অনুরূপ এবং ইহাদের প্রতিটি তার নিজস্ব প্রণালীতে আমাদের অস্তিত্বের সপ্তবিধ তত্ত্ব সার্থক করে: এইভাবে আমরা পাই অদিতির ত্রিবিধ সপ্ত আসনের শ্রেণী যে অদিতি ব্যক্ত হন তাঁর পূর্ণ গরিমায় সত্যের উষার আবির্ভাবে।[১] সুতরাং আমরা দেখি যে মানুষী পিতৃগণের দ্বারা জ্যোতি ও সত্যের সাধনও পরম ও

১ মেধাতিথি কাণ্ব এই একই ভাবনা প্রকাশ করেছেন (১-২০-৭) নিঃশ্রেয়সের, পরমানন্দের ত্রিবিধ সপ্ত উল্লাস "রত্নানি ত্রিঃ সাপ্তানি" অথবা আরো আক্ষরিকভাবে সাতটি উল্লাসের তিন শ্রেণী যাদের প্রতিটি ঋভুরা প্রকাশ করেন পৃথকভাবে ও সম্পূর্ণরূপে, "একম্ একং সুশস্তিভিঃ"।

দিব্যস্থিতির অমৃতত্বে আরোহণ, অর্থাৎ সর্ব-সৃজনী অনন্ত মাতার প্রথম নামে, এই ক্রমোচ্চ অস্তিত্বের ত্রিবিধ সপ্ত পরম পর্যায়ে, শাশ্বত পর্বতের সর্বোচ্চ স্তরসমূহে ("সানু", "অদ্রি") আরোহণ।

এই অমৃতত্বই সেই পরম আনন্দ যা দেবতারা উপভোগ করেন এবং যার কথা বামদেব পূর্বেই বলেছেন যে ইহা এমন এক বিষয় যা অগ্নিকে সাধন করতে হয় যজ্ঞের দ্বারা, ত্রিবিধ সপ্ত উল্লাসসহ পরম আনন্দ (১-২০-৭)। কারণ তিনি আরো বলেন, "দূর হ'ল অন্ধকার তার ভিত্তিতে কম্পিত হ'য়ে; স্বর্গ উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশিত হল ("রোচত দ্যৌঃ" যার অর্থ স্বর্-এর তিনটি দীপ্তিময় লোকের "দিবো রোচনানি" অভিব্যক্তি); উর্ধ্বে উদিত হল দিব্য উষার জ্যোতি; মর্ত্যগণের মধ্যে ঋজু ও কুটিল বিষয়সমূহ দেখে সূর্য প্রবেশ করলেন (সত্যের) বৃহৎ ক্ষেত্রসমূহে। তারপর তারা প্রবুদ্ধ হ'য়ে একান্তভাবে দেখল (সূর্যের দ্বারা কুটিলতা থেকে ঋজুতার, অনৃত থেকে সত্যের পৃথক করার ফলে); তারপর বস্তুতঃ তারা তাদের মধ্যে ধারণ করল সেই আনন্দ যা স্বর্গে ভোগ করা হয়, "রত্নং ধারয়ন্ত দ্যুভক্তম্"। হে মিত্র, হে বরুণ, সকল দেবতারা আমাদের ধামে অবস্থান করুন, আমাদের মননের জন্য যেন সত্যের আবির্ভাব হয়", "বিশ্বে বিশ্বাসু দুর্যাসু দেবা মিত্র ধিয়ে বরুণ সত্যম্ অস্তু" (ঋক্ ১৭, ১৮)। পরাশর শাক্ত্য অন্যকথায় যা প্রকাশ করেছেন, ইহাও স্পষ্টতঃই সেই একই ভাবনা, মনন ও সত্যের প্রবেগের দ্বারা সমগ্র অস্তিত্বের ব্যাপ্তি এবং সেই মনন ও প্রবেগের মধ্যে সকল দেবতার ক্রিয়া যাতে আমাদের অস্তিত্বের প্রতি অংশে সৃষ্ট হয় আনন্দ ও অমৃতত্ব।

এই সূক্তের শেষ অংশ এইরূপ: "আমি যেন বচন বলতে পারি অগ্নির প্রতি যিনি শুদ্ধভাবে দীপ্তি পান, যিনি নিবেদনের পুরোহিত, যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ আর আমাদের কাছে নিয়ে আসেন সকলকে; তিনি যেন নিষ্কাশন করেন জ্যোতির গাভীদের শুদ্ধ স্তন এবং আনন্দের লতার (সোমের) পবিত্র করা খাদ্য যা বর্ষিত হয় সর্বত্র। তিনি সকল যজ্ঞপতি-দের (দেবতাদের) অনন্ত সত্তা এবং সকল মানুষের অতিথি; অগ্নি নিজের মধ্যে দেবতাদের বর্ধিষ্ণু অভিব্যক্তি গ্রহণ ক'রে সকল জাতবিষয়ের জ্ঞাতা তিনি যেন সুখদাতা হন্" (ঋক্ ১৯, ২০)।

চতুর্থ মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তে আমরা অতি স্পষ্টভাবে ও ব্যঞ্জনাময়রূপে সেই সপ্ত ঋষিদের সমচ্ছন্দ পাই যারা দিব্য আঙ্গিরস ও মানুষী পিতৃগণ।

এই অংশটির প্রথমে আছে চারটি শ্লোক ৪-২-১১, ১৪ যাতে আছে সত্য ও আনন্দের প্রতি মানুষী অন্বেষণের ভাবনা। "জ্ঞাতা তিনি যেন সুষ্ঠুভাবে বিচার করেন বিদ্যা ও অবিদ্যাকে, বিস্তৃত সমানপ্রদেশ সমূহকে এবং কুটিল বিষয়সকলকে যা মর্ত্যগণকে আবদ্ধ রাখে; এবং হে দেব, অপত্যে ফলপ্রসূ আনন্দের জন্য আমাদের উপর প্রচুরভাবে প্রদান কর দিতিকে এবং রক্ষা কর অদিতিকে।" এই একাদশ শ্লোকটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে আমরা বিদ্যা ও অবিদ্যার দ্বন্দ্বের কথা পাই যা বেদান্তে পরিচিত; বিদ্যাকে বলা হ'য়েছে প্রশস্ত সমান প্রদেশসমূহ যাদের কথা বেদে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়; ইহারাই সেই সব বৃহৎ স্তর যেখানে যজ্ঞ সাধকরা উত্তরণ করে এবং সেখানে তারা অগ্নিকে দেখে আসীন ও আত্মানন্দে পূর্ণ (৫-৭-৫); ইহারাই সেই প্রশস্ত সত্তা যা সে নিজের আপন দেহের জন্য তৈরী করে (৫-৪-৬), সমান ব্যাপ্তি, অনিবাধ বৃহৎ। সুতরাং দেবের এই অনন্ত সত্তাতেই আমরা উপনীত হই সত্যের লোকে এবং ইহাতে আছে অদিতি মাতার ত্রিবিধ সপ্ত পরম আসন, অনন্তের মধ্যে অগ্নির তিনটি পরম জন্ম, "অনন্তে অন্তঃ" (৪-১-৭)। অপরপক্ষে অবিদ্যাকে বলা হয় কুটিল বা অসমান স্তরসমূহ[১] যা মর্ত্যগণকে আবদ্ধ রাখে এবং সেজন্য ইহা সীমাবদ্ধ বিভক্ত মর্ত্য অস্তিত্ব। তাছাড়া, পরের অর্ধ-শ্লোকের দিতি হ'ল অবিদ্যা, এবং "দিতিং চ রাস্ব অদিতিম্ উরুস্য", আর বিদ্যা হ'ল অদিতি। দিতিকে দনুও বলা হয় আর ইহার অর্থ বিভাজন আর বাধাদায়ক শক্তিগুলি অর্থাৎ বৃত্রগণ তার সব সন্তান, দনুরা, দানবরা, দৈত্যেরা আর অদিতি হ'ল অনন্ত অস্তিত্ব এবং দেবগণের মাতা। ঋষির কামনা হ'ল সন্তানে ফলপ্রসূ আনন্দ, দিব্য সব কর্মে ও তাদের ফলে আনন্দ এবং তা সাধন করতে হবে আমাদের বিভক্ত মর্ত্য সত্তার মধ্যে যে ধনরাজি আছে কিন্তু যাকে বৃত্ররা ও পণিরা আমাদের কাছ থেকে আটক রেখেছে সেই ধনরাজিকে জয় ক'রে এবং সেসবকে ধারণ ক'রে অনন্ত দিব্যসত্তার মধ্যে। আমাদের মানুষী অস্তিত্বের সাধারণ প্রবণতা থেকে, দনু বা দিতির সন্তানদের নিকট অধীনতা থেকে আমাদের

১ "চিত্তিম্ অচিত্তিং চিনবদ্ বি বিদ্বান্, পৃষ্ঠেব বীতা বৃজিনা চমর্তান্।" 'বৃজনা'র অর্থ কুটিল এবং বেদে এই কথাটি ব্যবহার করা হয় মিথ্যার কুটিলতা বোঝাতে যার বিপরীত হ'ল সত্যের ঋজুতা, কিন্তু স্পষ্টতঃই কবির মনে আছে 'বৃজ্' এর ক্রিয়াবাচক অর্থ, বিভক্ত করা, আবরণ করা এবং এই ক্রিয়াবাচক বিশেষণ অর্থই "মর্তান্" পদটিতে প্রযুক্ত হ'য়েছে।

মধ্যে এই শেষের কাজটিকে রক্ষা করতে হ'বে। ঈশোপনিষদে যে বলা হ'য়েছে বিদ্যা ও অবিদ্যার প্রাপ্তিতেই, একই ব্রহ্মের মধ্যে ঐক্য ও বহুত্ব লাভেই অমৃতত্ব লাভ হয় সেই কথারই সহিত বেদের এই ভাবনা স্পষ্টতঃ এক।

এখন আমরা বলব সপ্ত দিব্য ঋষিদের কথা। "অপরাজিত দ্রষ্টারা কবিকে (দেবকে, অগ্নিকে) ঘোষণা করেছিলেন তাঁকে মানবসত্তার সব গৃহের মধ্যে ধারণ করে; সেখান থেকে (এই শরীরধারী মানব থেকে), হে অগ্নি, তুমি যেন কর্মের দ্বারা ("অর্যঃ") আস্পৃহা ক'রে তোমার অগ্রসরমাণ গতিবিধির দ্বারা তাঁদের দেখ যাঁদের দৃষ্টি তুমি পেয়েছ, সেই বিশ্বাতীত জনদের (দেবের দেবতাদের)", "কবিংশশাশুঃ কবয়ো অদব্ধাঃ, নিধারয়ন্তো দুর্যাসু আয়োঃ; অতস্ ত্বং দৃশ্যান্ অগ্ন এতান্, পড্ভিঃ পশ্যের্ অদ্ভুতান্ অর্য এবৈঃ" (ঋক্ ১২)। আবার, সেই দেবতার দৃষ্টির দিকে যাত্রার কথা। "তুমি, হে অগ্নি, কনিষ্ঠশক্তি, (সেই পথের উপর) তার সুনায়ক যে বাণী গান গায় ও সোম নিবেদন করে এবং যজ্ঞ বিধান করে; দীপ্ত কর্মসাধকের কাছে তুমি নিয়ে এস বৃহৎ রভসযুক্ত আনন্দ তার বৃদ্ধির জন্য, কর্মসাধককে (অথবা মানবকে, "চর্ষণিপ্রাঃ") তৃপ্ত ক'রে। এখন, হে অগ্নি, যাসব আমরা করেছি হস্ত, পদ ও তনু দিয়ে সুধীগণ (আঙ্গিরসগণ) তা দিয়ে যেন তোমার রথ নির্মাণ করেন দুই হস্তের (স্বর্গ ও পৃথিবীর, "ভুরিজোঃ") কর্মের দ্বারা; সত্যলাভের কামনায় তাঁরা ইহার প্রতি তাঁদের পথ নির্মাণ করেছেন (অথবা ইহার কর্তৃত্ব জয় করেছেন", "ঋতং যেমুঃ সুধ্যা আশুষাণাঃ" (ঋক্ ১৩, ১৪)। "এখন মাতা উষার সপ্ত বিপ্রের মতো, (যজ্ঞের) পরম বিধাতারূপে আমরা যেন আমাদের জন্য দেবতাদের জন্ম দিতে পারি; আমরা যেন ধনপূর্ণ অদ্রি বিদীর্ণ ক'রে, শুভ্রতায় উজ্জ্বল হ'য়ে হ'য়ে উঠতে পারি আঙ্গিরসগণ, স্বর্গের পুত্রগণ" (ঋক্ ১৫)। এখানে অতি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে সপ্ত দিব্য ঋষিরা হ'লেন জগৎ-যজ্ঞের পরম বিধাতাসকল এবং মানব যে এই সব সপ্ত ঋষি "হ'য়ে উঠছে" তার ভাবনার কথাও আছে অর্থাৎ তাঁদের সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে এবং তাদের কামনামতো তাতে বৃদ্ধিলাভ করে ঠিক যেমন সে হ'য়ে ওঠে স্বর্গ ও পৃথিবী ও অন্যান্য সব দেবতা অথবা যেমন অন্যভাবে বলা হয় সে নিজের মধ্যে উৎপাদন করে, সৃষ্টি করে বা তৈরী করে ("জন্", "কৃ", "তন্") দিব্য জন্মসমূহ।

ইহার পর দেওয়া হয় মানুষী পিতৃগণের দৃষ্টান্ত এই মহৎ হওয়া ও কর্মের আদি আদর্শরূপে। "এখনও, হে অগ্নি, ঠিক যেমন আমাদের পরম প্রাচীন পিতৃগণ সত্যলাভের কামনায়, বাক্ প্রকাশ ক'রে, শুচিতা ও জ্যোতিতে যাত্রা করেছিলেন ; পৃথিবীকে (জড়ীয় সত্তাকে) বিদীর্ণ ক'রে তাঁরা অপাবৃত করেছিলেন অরুণবর্ণ জনদের, (উষাদের, গাভীদের) ; কর্মে ও জ্যোতিতে সুষ্ঠু হ'য়ে, দেবত্বের, দেবগণের অভিলাষী হ'য়ে, লৌহের মতো জন্মসমূহ নির্মাণ ক'রে (অথবা লৌহের মতো দিব্য জন্মসমূহ নির্মাণ ক'রে), অগ্নিকে শুদ্ধ শিখা ক'রে, ইন্দ্রকে বর্ধন ক'রে তাঁরা পেয়েছিলেন ও উপনীত হ'য়েছিলেন জ্যোতির প্রশস্ততায় (গোরাজির, "গব্যম্ উর্বম্")। যেন ধনরাজির ক্ষেত্রের মধ্যে গোযূথ, উহা ব্যক্ত হ'য়েছিল দৃষ্টির সম্মুখে যা অন্তরে দেবতাদের জন্ম, হে বীর্যশালী পুরুষ ; তাঁরা উভয়েই মর্ত্যগণের বিশাল ভোগ (বা কামনা) সাধন করেছিলেন এবং উচ্চতর সত্তার বৃদ্ধির জন্য আস্পৃহাবান্ জনগণের মতো কর্ম করেছিলেন ;" "আ যূথেব ক্ষুমতি পশ্বো, অখ্যদ্ দেবানাম্ যজ্ জনিম অন্তি উগ্র ; মর্তানাং চিদ্ উর্বশীর্ অকৃপ্রন্ বৃধে চিদ্ অর্য উপরস্য আয়োঃ", (ঋক্ ১৬, ১৭, ১৮)। স্পষ্টতঃই ইহাও তবে অন্যভাবে দিতির ধনরাজি প্রাপ্তি অথচ অদিতিকে রক্ষা করা---এই দুই ভাবনার পুনরুক্তি। "তোমার জন্য আমরা কাজ করেছি, আমরা কাজে সুষ্ঠু হ'য়েছি, প্রোজ্জ্বল উষারা সত্যের মধ্যে তাদের আবাস নিয়েছে (অথবা সত্য দিয়ে নিজেদের ভূষিত করেছে, আর তা হ'য়েছে অগ্নির পূর্ণতায় ও তাঁর বহুবিধ আনন্দের মধ্যে, সকল উজ্জ্বলতাসমেত দেবতার ভাস্বর চক্ষুর মধ্যে" (ঋক্ ১৯)।"

আঙ্গিরসদের কথা আবার বলা হ'য়েছে ৪-৩-১১ শ্লোকে এবং, যেসব কথার শেষে এই শ্লোকটি আছে তা উল্লেখযোগ্য ; কারণ একথা বারবার বলাতে দোষ নেই যে বেদের কোন শ্লোকেরই অর্থ যথার্থভাবে বোধগম্য হয় না যদি না তা বিচার করা হয় ইহার পূর্ববর্তী প্রসঙ্গক্রমে, সূক্তটির ভাবনার মধ্যে ইহার স্থান কোথায় এবং পূর্বে ও পরে কি আছে সেসব জেনে। সূক্তটির প্রথমেই আছে, মানুষদের প্রতি আহ্বান যেন তারা সৃষ্টি করে অগ্নিকে যিনি সত্যের মধ্যে যজ্ঞ করেন, তাঁকে যেন সৃষ্টি করে তাঁর হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির রূপে ("হিরণ্যরূপম্", হিরণ্য, স্বর্ণ সর্বদাই সত্যের সৌর জ্যোতির প্রতীক্, "ঋতং জ্যোতিঃ") আর তা করা চাই অবিদ্যা নিজেকে গঠন করার পূর্বে, "পুরা তনয়িত্নোর্ অচিত্তাৎ" (৪-৩-১)।

এই দেবতাকে আবাহন করা হয় মানবের কাজে এবং তার মধ্যে সত্যে প্রবুদ্ধ হ'তে কারণ তিনি নিজেই "সত্যচেতন যিনি মননকে যথার্থভাবে স্থাপন করেন" "ঋতস্য বোধি ঋতচিৎ স্বাধীঃ" (৪-৩-৪)—কারণ সকল মিথ্যা হ'ল শুধু সত্যের অনিয়মিত স্থাপন। মানবের অন্তঃস্থ সকল দোষ ও পাপ ও ত্রুটি নিবেদন করা চাই বিভিন্ন দেবতাদের নিকট অথবা ভাগবত পুরুষের দিব্যশক্তিসমূহের নিকট যাতে সেসব দূর করা যেতে পারে এবং মানব সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত বলা যেতে পারে যে সে অনন্ত মাতার সম্মুখে নির্দোষ, "অদিতয়ে অনাগসঃ" (১-২৪-১৫), অথবা যেমন অন্যত্র বলা হ'য়েছে অনন্ত অস্তিত্বের পক্ষে নির্দোষ।

তারপর নবম ও দশম শ্লোকে নানারূপে বলা হ'য়েছে যুক্ত মানুষী ও দিব্য অস্তিত্বের, দিতির ও অদিতির ভাবনার কথা, আর অদিতি দিতির ভিত্তি হ'য়ে তাকে যে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেকে দিয়ে তাকে অভিষিক্ত করে তার কথাও। "আমি কামনা করি সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সত্যকে (অর্থাৎ দিব্য সত্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষী সত্যকে) আমি যেন একত্র পাই গোর অপক্ব বিষয়সমূহ এবং তার পক্ব ও মধুময় রস (আবার বিশ্বজনীন চেতনা ও অস্তিত্বের অপূর্ণ মানুষী ফল ও পূর্ণ ও আনন্দময় দিব্য ফল); সে (গো) কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায়, (অন্ধকারময় ও বিভক্ত অস্তিত্ব, দিতি) পুষ্ট হয় ভিত্তির দীপ্তিমান্ জলের দ্বারা, সহচর স্রোতসমূহের জলের দ্বারা ("ভামর্যেণ পয়সা")। সত্যের দ্বারা বৃষভ, পুরুষ অগ্নি ইহার সব স্তরের জলের দ্বারা সিঞ্চিত হ'য়ে বিচরণ করে কম্পমান না হ'য়ে ও ব্যাপ্তি (প্রশস্ত দেশ বা অভিব্যক্তি) প্রতিষ্ঠা ক'রে; বিচিত্র বর্ণের বৃষ দোহন করে শুদ্ধ উজ্জ্বল চুচুক।" উৎস, আসন, ভিত্তিস্বরূপ একের উজ্জ্বল শুভ্র শুদ্ধতা এবং ত্রিভুবনে অভিব্যক্ত জীবনের বিচিত্র বর্ণের রঞ্জন—এদু'য়ের মধ্যে প্রতীকার্থক দ্বন্দ্ব বেদে প্রায়ই পাওয়া যায়। বিচিত্র বর্ণের বৃষ এবং শুদ্ধ উজ্জ্বল গোস্তন অথবা জলরাশির উৎস—এই যে চিত্র তাতে অন্যান্য সব চিত্রের মতোই এই ভাবনা প্রকাশ করে যে মানব জীবনের বহুবিধ সব অভিব্যক্তি সত্য ও আনন্দের জলরাশির দ্বারা পুষ্ট হ'য়ে তার বিভিন্ন ক্রিয়ায় পূত ও শান্ত হয়।

অবশেষে ঋষি ভাস্বর গোরাজি ও জলরাশির সংযোগের কথা বলেন, যে কথা আমরা বারবার পাই। "সত্যের দ্বারা আঙ্গিরসগণ অদ্রিকে ভেদ ক'রে তাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন এবং গোরাজির সহিত সংযুক্ত হ'লেন,

মানুষী পুরুষ তাঁরা আবাস নিলেন উষার মধ্যে, স্বর্ অভিব্যক্ত হ'ল যখন অগ্নি জন্ম নিলেন। হে অগ্নি, সত্যের দ্বারা দিব্য অমৃতময় জলরাশি অবাধে তাদের মধুমান্ স্রোতসহ, সম্মুখে ধাবমান অশ্বের মতো ছুটে চলল শাশ্বত প্রবাহে" (ঋক্ ১১, ১২)। বস্তুতঃ এই চারটি শ্লোকের উদ্দেশ্য হ'ল অমৃতত্বের মহতী সিদ্ধির জন্য ইহার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় সাধনার কথা বলা। এই সব হ'ল মহৎ উপকথার বিভিন্ন প্রতীক, এই উপকথা রহস্য-বাদীদের উপকথা যার মধ্যে তাঁরা অধার্মিকের কাছ থেকে তাঁদের পরম আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন আর দুর্ভাগ্যের কথা যে তা এমনই প্রচ্ছন্ন রইল যে ভাবীবংশধররা তার কথা বুঝতে পারল না। এগুলি যে গূঢ় প্রতীক্, এমন সব চিহ্ন যাদের উদ্দেশ্য হ'ল তাঁদের রক্ষিত সত্যকে প্রকাশ করা শুধু দীক্ষিতের কাছে, বিদ্বানের কাছে, ঋষির কাছে তা বামদেব নিজেই অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরালো ভাষায় বলেছেন এই সূক্ত-টিরই শেষ শ্লোকে; "হে অগ্নি, হে বিধাতা, তুমি বিদ্বান্, তোমাকে আমি এই যে সব কথা বলেছি তা গূঢ় বচন, এমন বচন যা অগ্রে নিয়ে যায়, দ্রষ্টার জ্ঞানের বচন যা তার অর্থ প্রকাশ করে দ্রষ্টার কাছে—আমি এইসব বলেছি আমার বাক্যে ও চিন্তনে দীপ্ত হ'য়ে"—"এতা বিশ্বা বিদুষে তুভ্যং বেধো, নীথানি অগ্নেনিণ্যা বচাংসি; নিবচনা কবয়ে কাব্যানি, অশনসিষং মতিভির্ বিপ্র উক্থৈঃ" (৪–৩–১৬)। ইহারা এমন গূঢ় বচন যারা সত্যই তাদের গূঢ়তা রেখেছে আর তা অজানা রয়েছে পুরোহিত, যাজ্ঞিক, বৈয়াকরণিক, পণ্ডিত, ঐতিহাসিক, উপকথাবিদ্ প্রভৃতির কাছে; তাঁদের কাছে এই সব কথা অন্ধকারময়, বিভ্রান্তিকর, পরম প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ ও তাঁদের জ্ঞানদীপ্ত বংশধরদের কাছে যা ছিল তা নয়।

বিংশ অধ্যায়

স্বর্গশুনী

সত্য সম্বন্ধে এই বৈদিক ভাবনাকে এবং আদি পিতৃগণের দ্বারা উষার কিরণরাজির আবিষ্কারকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে হ'লে আঙ্গিরস উপাখ্যানের আরো যে দুটি অঙ্গ সতত বর্তমান তাদের বিষয়ে আরো কিছু আলোক পাওয়া প্রয়োজনীয়; বৈদিক ব্যাখ্যার যে দুটি সমস্যা অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত অর্থাৎ সরমা কে এবং পণিদের সঠিক কাজ কি তা আমাদের সুনিশ্চিতভাবে জানা চাই। সরমা যে জ্যোতির এবং সম্ভবতঃ উষার কোন শক্তি তা খুব স্পষ্ট; কারণ একবার তা জানা হ'লে, একদিকে ইন্দ্র ও আদি আর্য ঋষিদের সহিত অন্যদিকে গুহার পুত্রগণের সহিত সংগ্রামের কথাটি আদি ভারতীয় ইতিহাসের কোন অদ্ভুত বিকৃতি নয় বলে জানা যাবে, পরন্তু জানা যাবে যে ইহা জ্যোতি ও অন্ধকারের শক্তিসমূহের মধ্যে এক প্রতীকার্থক্ সংগ্রাম আর যে সরমা ভাস্বর গোযূথের সন্ধানে নেত্রী হ'য়ে পথ ও পর্বতের মধ্যে গোপন ভাণ্ডার—এ দুইই আবিষ্কার করে তা নিশ্চয়ই মানবমনের মধ্যে সত্য-উদয়ের অগ্রবর্তিনী কিছু। আর যদি আমরা নিজেদের জিজ্ঞাসা করি সত্যলাভ করে এমন সব শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তি আমাদের সত্তার মধ্যে অজ্ঞাত শক্তিসমূহের অন্ধকারের মধ্য থেকে ইহার ভিতর প্রচ্ছন্ন সত্যকে আবিষ্কার করে তাহ'লে আমরা তখনই ভাবব যে ইহা বোধি। কারণ সরমা সরস্বতী নয়, তিনি আন্তরপ্রেরণা নন, যদিও দুটি নামে সাদৃশ্য বর্তমান। সরস্বতী দেন জ্ঞানের পূর্ণ প্রবাহ, তিনি নিজে মহতী স্রোতস্বতী, "মহো অর্ণঃ" অথবা তা প্রবুদ্ধ করেন এবং সকল ধীকে দীপ্ত করেন প্রচুরভাবে, "বিশ্বা ধিয়ো বিরাজতি"। সরস্বতী সত্যের মহান্ প্রবাহ ও ইহার অধিকারী; সরমা সত্য পথের পথিক ও অন্বেষু, তিনি নিজে সত্যের অধিকারী নয়, বরং যা হারিয়ে গিয়েছিল তিনি তার সন্ধান পান। আবার তিনি দেবী ইলার মতো দিব্য প্রকাশের সম্যক্ বাক্ নন বা মানবের শিক্ষক নন; কারণ যখন তিনি তাঁর অন্বেষণের বিষয়ের সন্ধান পান তখনো তিনি তা অধিকার করেন না, তিনি শুধু ইহার সম্বন্ধে বার্তা দেন ঋষিদের এবং তাঁদের দিব্য সাহায্যকারীদের কাছে আর যে জ্যোতির

সন্ধান পাওয়া গেছে তা পাবার জন্য তাঁদের তখনো যুদ্ধ করতে হয়।

এখন দেখা যাক বেদ নিজে সরমা সম্বন্ধে কি বলে। ১-১০৪ সূক্তে একটি শ্লোক (৫) আছে যাতে তাঁর নাম নেই, আবার সূক্তটি নিজেও আঙ্গিরসদের বা পণিদের সম্বন্ধে নয়, কিন্তু তবু বেদে সরমার কাজ সম্বন্ধে যা বলা হয় এই পঙ্‌ক্তিটিতে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সঠিকভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে:—"যখন এই নেত্রীকে দেখা গেল তখন তিনি জেনে সেই আসনের অভিমুখে গেলেন যা দস্যুদের গৃহের মতো" "প্রতি যৎ স্যা নীথা আশি দস্যোর্, ওকো ন অচ্ছা সদনং জানতী গাৎ"। ইহারাই সরমার দুটি মূল বৈশিষ্ট্য; তাঁর কাছে জ্ঞান আসে অগ্রেই, দৃষ্টির পূর্বেই, সামান্য ইঙ্গিতেই তা উৎসারিত হয় সহজাতভাবে এবং অবশিষ্ট যে সকল সামর্থ্য ও দিব্য শক্তি অণ্বেষণ করে তাদের তিনি পথ দেখান ঐ জ্ঞান দিয়ে। আর তিনি নিয়ে যান সেই আসনে, "সদনম্", নাশকদের গৃহে যা সত্যের আসনের "সদনম্ ঋতস্য" অপর প্রান্তে, গুহার মধ্যে অথবা অন্ধকারের গুহ্য স্থানে, "গুহায়াম্", ঠিক যেমন দেবতাদের আবাস হ'ল জ্যোতির গুহা বা গুহ্যতা। ইহার এই অর্থ যে তিনি এমন এক শক্তি যা অতিচেতন সত্য থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদের মধ্যে, অবচেতনার মধ্যে যে জ্যোতি প্রচ্ছন্ন আছে তাতে আমাদের নিয়ে যান। এই সব বৈশিষ্ট্য যথার্থভাবে বোধি-রই বৈশিষ্ট্য।

বেদের মাত্র কতকগুলি সূক্তেই সরমার নাম উল্লেখ করা হ'য়েছে এবং তা সর্বদাই আঙ্গিরসদের কর্মসাধন বা অস্তিত্বের সর্বোচ্চ লোকজয়ের প্রসঙ্গে। এই সব সূক্তগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হ'ল আত্রেয়দের সূক্ত, ৫-৪৫ যার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি নবগ্ব ও দশগ্ব আঙ্গিরসদের সম্বন্ধে আমাদের পর্যালোচনায়। প্রথম তিনটি শ্লোকে ঐ মহৎ কর্মসাধন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা হ'য়েছে। "বাণীর দ্বারা স্বর্গের অদ্রি বিদীর্ণ ক'রে তিনি তাদের পেলেন; হ্যাঁ, উদীয়মানা ঊষার ভাস্বর বিষয়গুলি চতুর্দিকে বিস্তৃত হ'ল; খোঁয়াড়ের মধ্যে যারা ছিল তাদের তিনি অপাবৃত করলেন, স্বর্ উর্ধ্বে উঠল; এক দেবতা মানুষী দ্বারগুলি উন্মুক্ত করলেন। সূর্য প্রশস্তভাবে পেলেন বীর্য ও শ্রী; গোরাজির মাতা (ঊষা) জেনে ব্যাপ্তি থেকে এলেন; নদীগুলি হ'ল বেগবতী স্রোতধারা, যেসব স্রোতধারা (তাদের খাতকে বিদীর্ণ করেছিল, স্বর্গকে দৃঢ় করা হ'ল সুন্দর আকারের স্তম্ভের মতো। এই বাণীর প্রতি পর্বতের গর্ভস্থ বিষয়গুলি (বাহিরে

এল) মহান্‌দের (নদীগুলির অথবা কম সম্ভবতঃ উষাদের) পরম জন্মের জন্য; অদ্রি পৃথক হ'য়ে বিভক্ত হ'ল, স্বর্গ সুষ্ঠু হ'ল (অথবা নিজেকে সিদ্ধ করল); তারা অবস্থান করল (পৃথিবীর উপর) এবং বিতরণ করল বৃহত্ত্ব।” সূক্তের বাকী অংশ থেকে দেখা যায় এবং বস্তুতঃ যেসব কথা প্রয়োগ করা হ'য়েছে তা থেকে ইহা স্পষ্ট যে ইন্দ্র এবং আঙ্গিরসদের সম্বন্ধেই ঋষি বলছেন; কারণ এইগুলিই আঙ্গিরস উপাখ্যানের সাধারণ সূত্র এবং যেসব কথা উষা, গোরাজি ও সূর্যের উদ্ধারবিষয়ক সূক্তগুলিতে ব্যবহার করা হয় ঠিক সেই সব কথাই ইহাতেও ব্যবহার করা হ'য়েছে। আমরা ইতিপূর্বেই জানি ইহাদের অর্থ কি। অদ্রিস্বরূপ আমাদের যে ত্রিবিধ অস্তিত্ব পূর্বেই গঠিত হ'য়েছে এবং যার শিখর উঠেছে স্বর্গের মধ্যে তাকে ইন্দ্র চূর্ণবিচূর্ণ করেন এবং প্রচ্ছন্ন দীপ্তিসমূহ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়; অতিচেতনের পরতর স্বর্গ, স্বর্ প্রকাশিত হয় ভাস্বর যূথসমূহের উর্ধ্বমুখী নিঃসরণের দ্বারা। সত্যের সূর্য তার জ্যোতির সকল বীর্য ও গরিমা বিকিরণ করে এবং জ্ঞানের দ্বারা অনুস্যূত জ্যোতির্ময় ব্যাপ্তি থেকে আসে আন্তর উষা, “জানাতী গাৎ” এবং এই কথাটি ব্যবহৃত হ'য়েছে ১-১০৪-৫ শ্লোকে তাঁর সম্বন্ধে যিনি দস্যুদের আবাসে নিয়ে যান এবং সরমা সম্বন্ধে ৩-৩১-৬ শ্লোকে—সত্যের যে নদীগুলি ইহার সত্তার ও গতির বহিঃপ্রবাহের প্রতীক্ (“ঋতস্য প্রেষা”) অবতরণ করে বেগবতী স্রোতধারায় এবং তাদের জলরাশির জন্য এখানে খাত নির্মাণ করে; স্বর্গ অর্থাৎ মানসিক সত্তাকে সুষ্ঠু করা হয় এবং দৃঢ় করা হয় সুগঠিত স্তম্ভের মতো যাতে ইহা ধারণ করতে পারে সেই পরতর বা অমৃতময় জীবনের বৃহৎ সত্য যা এখন ব্যক্ত করা হয় আর ঐ সত্যের বৃহত্ত্ব এখানে অধিষ্ঠিত হয় সকল শারীরিক সত্তার মধ্যে। পর্বতের গর্ভস্থ বিষয়সমূহের প্রকাশ, “পর্বতস্য গর্ভঃ”, সপ্তশীর্ষ ধী স্বরূপ যে দীপ্তিরাজি চিদাবিষ্ট বাণীর উত্তরে নির্গত হয় তা নিয়ে যায় সপ্ত মহানদীগুলির পরম জন্মে যেগুলি সক্রিয় গতিবিধিতে প্রবৃত্ত সত্যের ধাতুস্বরূপ “ঋতস্য প্রেষা”।

তারপর “দেবপ্রিয় সুষ্ঠু বচনের উক্তিগুলির দ্বারা” ইন্দ্র ও অগ্নির প্রশস্তির পর—কারণ এই সব উক্তির দ্বারাই মরুৎগণ[১] যজ্ঞসাধন করেন সেই সব দ্রষ্টার মতো যাঁরা তাঁদের দ্রষ্টৃ-জ্ঞানের দ্বারা যজ্ঞের কাজ

১ পরে দেখা যাবে যে ইহারা প্রাণের সেই সব শক্তি যা মনন আনে।

সুসম্পন্ন করেন "উক্তেভির্ হি স্মা ক্ষয়ঃ সুযজ্ঞা...মরুতো যজন্তি," (ঋক্ ৪)—ঋষি মানুষদের মুখ দিয়ে উপদেশ ও পারস্পরিক উৎসাহের কথা বলেন যাতে তারা পিতৃগণের মতো কাজ করতে ও সেই একই দিব্য ফল পেতে পারে। "এখন এস, আজ যেন আমরা মতিতে শুদ্ধ হই, আমরা যেন কষ্টভোগ ও অস্বস্তি নাশ করি, আমরা যেন গ্রহণ করি পরতর মঙ্গল," "এতো নু অদ্য শুধ্যো ভবাম, প্র দুচ্ছুনা মিনবাম আ বরীয়ঃ", "আমরা যেন সর্বদাই আমাদের থেকে দূরে রাখি সকল বিরুদ্ধ বিষয় (সেই সকল বিষয় যা আমাদের আক্রমণ ও বিভক্ত করে, "দ্বেষাংসি"); এস আমরা অগ্রসর হই যজ্ঞের প্রভুর প্রতি। এস, হে সখাবৃন্দ, আমরা যেন সৃজন করি ধী (স্পষ্টতঃই সপ্তশীর্ষ অঙ্গিরস-ধী) যা মাতা (অদিতি বা উষা) এবং যা দূর করে গোর আবদ্ধকারী খোঁয়াড়" (ঋক্ ৫, ৬)। ইহার তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট; এইরূপ সব অংশেই বেদের আন্তর অর্থ অর্ধ-প্রকাশিত হয় প্রতীকের আবরণ থেকে।

তারপর ঋষি সেই মহান্ ও প্রাচীন দৃষ্টান্তের কথা বলেন, অর্থাৎ আঙ্গিরসদের দৃষ্টান্ত ও সরমার কীর্তির কথা আর মানুষদের বলা হয় তা পুনরায় সাধন করতে। "এখানে প্রস্তরকে সঞ্চালিত করা হ'ল যার দ্বারা নবগ্বরা দশমাস ধরে স্তুতিগান করলেন, সত্যের দিকে গিয়ে সরমা গোরাজি দেখতে পেলেন, অঙ্গিরস সকল বিষয় সত্য করলেন। যখন এই বৃহৎ একের উদয়ে (উষা হল অনন্তা অদিতির প্রতীক্, "মাতা দেবানাম্ অদিতের অনীকম্") সকল আঙ্গিরসরা একত্র এলেন গোরাজির সহিত (অথবা বরং দীপ্তিসমূহের দ্বারা যেগুলি গোরাজির বা রশ্মিমালার প্রতীকার্থ); তখন এই সবের (দীপ্তিসমূহের) উৎস হ'ল পরম জগতে; সত্যের পথ দিয়ে সরমা গোরাজির দেখা পেলেন" (ঋক্ ৭, ৮)। এখানে আমরা দেখি যে সত্যের পথ দিয়ে সোজা সত্যের দিকে সরমার গমনের মাধ্যমেই সপ্ত ঋষিরা যাঁরা অয়াস্য ও বৃহস্পতির সপ্তশীর্ষযুক্ত বা সপ্তরশ্মিযুক্ত ধীর প্রতীক্ সকল প্রচ্ছন্ন দীপ্তি লাভ করেন আর বসিষ্ঠ যেমন পূর্বেই বলেছেন, এই সব দীপ্তির শক্তির দ্বারাই তাঁরা একত্র উপনীত হন সমান ব্যাপ্তিতে, "সমানে ঊর্বে", যা থেকে উষা অবতরণ করেছেন জ্ঞানের সহিত ("ঊর্বাদ্ জানতী গাৎ", ঋক্ ২), অথবা এখানে যেমন বলা হ'য়েছে এই মহৎ একের উদয়ে অর্থাৎ অনন্ত চেতনায়। যেমন বসিষ্ঠ বলেছেন, এখানে তাঁরা যুক্ত হ'য়ে জ্ঞানে সম্মত হন এবং একত্র চেষ্টা করেন না, "সঙ্গতাসঃ

সং জানতা ন যতন্তে মিথস্ তে" (৭-৭৬-৫), সপ্তজন এক হন, যেমন অপর এক সূক্তে দেখান হ'য়েছে; তাঁরা হ'য়ে ওঠেন এক সপ্তাস্য অঙ্গিরস যে চিন্ময় সপ্তশীর্ষযুক্ত ধীর অনুরূপ আর এই একক যুক্ত অঙ্গিরসই সকল বিষয় সত্য করেন সরমার আবিষ্কারের ফল হিসাবে (শ্লোক ৭)। এই সুসঙ্গত যুক্ত, সুষ্ঠু দ্রষ্টা-সংকল্প সকল অনৃত ও কুটিলতা সংশোধন করে, এবং সকল মনন, প্রাণ ক্রিয়াকে পরিণত করে সত্যের সংজ্ঞায়। এই সূক্তেও সরমার কাজ ঠিক সেই বোধিরই কাজ যা সোজা সত্যে যায় সত্যের পথ দিয়ে,—সংশয় ও প্রমাদের সব কুটিল পথ দিয়ে নয়—এবং যা সত্যকে মুক্ত করে অন্ধকার ও মিথ্যা প্রতিভাসসমূহের আবরণের মধ্য দিয়ে; তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত দীপ্তিসমূহের মাধ্যমেই দ্রষ্টা-মন পেতে পারে সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ। সূক্তটির বাকী অংশে বলা হ'য়েছে সপ্তাশ্বযুক্ত সূর্যের উদয়ের কথা তার "ক্ষেত্রের" অভিমুখে "যা তার জন্য চারিদিকে বিস্তৃত হয় দীর্ঘযাত্রার শেষে," আর বলা হ'য়েছে দ্রুত শ্যেনের সোমপ্রাপ্তির কথা, ভাস্বর গোরাজির ক্ষেত্রে যুবা দ্রষ্টার গমনের কথা, "জ্যোতির্ময় অর্ণবে" সূর্যের উত্তরণের কথা, "মনস্বীদের দ্বারা চালিত পোতের মতো" ইহাকে উত্তীর্ণ করার কথা, এবং তাদের আহ্বানের উত্তরে মানবের উপর ঐ মহাসাগরের জলের অবতরণের কথা। ঐ জলরাশির মধ্যে অঙ্গিরসের সপ্তবিধ মতি প্রতিষ্ঠিত হয় মানুষী দ্রষ্টার দ্বারা। আমরা যদি মনে রাখি যে সূর্য অতিচেতন বা ঋতচিৎ জ্ঞানের প্রতীক্ আর জ্যোতির্ময় অর্ণব হ'ল মাতা অদিতির ত্রিবিধ সপ্তাসনযুক্ত অতিচেতনের রাজ্যসমূহ, তাহ'লে এই সব প্রতীক্ প্রকাশিত কথাগুলির[১] অর্থ বোঝা দুষ্কর হবে না। আঙ্গি-রসদের দ্বারা সম্পূর্ণ কর্মসাধনের পরেই, সত্যলোকে তাঁদের যুক্ত উত্তরণের পরেই আসে পরম লক্ষ্যের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি, ঠিক যেমন ঐ কর্মসাধন আসে সরমার দ্বারা যূথরাজির আবিষ্কারের পরে।

এই প্রসঙ্গে অন্য যে একটি সূক্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হ'ল বিশ্বামিত্রের তৃতীয় মণ্ডলের একত্রিশতম সূক্ত। "অগ্নি (দিব্যশক্তি) জন্ম নিলেন, ভাস্বর একের (দেবের, রুদ্রের) মহান্ পুত্রদের প্রতি যজ্ঞের জন্য নিবেদনের তাঁর শিখার সহিত কম্পমান তিনি; তাঁদের সন্তান মহৎ, এক বিশাল

১ এই অর্থেই আমরা বেদের যেসব কথা এখন অস্পষ্ট সেসব সহজেই বুঝতে পারি, যেমন ৮-৬৮-৯ শ্লোক, "তোমার সাহায্যে আমাদের সংগ্রামে জয় করতে পারি জল-রাশি ও সূর্যের মধ্যে অবস্থিত মহৎ ধন," "অপ্সু সূর্যে মহৎ ধনম্"।

জন্ম; যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভাস্বর অশ্বগুলির চালকের (ইন্দ্রের, দিব্য মনের) এক মহৎ সঞ্চরণ থাকে। তাঁর সংগ্রামে বিজয়ী (উষাগণ) তাঁতে সংলগ্ন থাকে, অন্ধকারের মধ্য থেকে তারা জ্ঞানের দ্বারা এক মহাজ্যোতি মুক্ত করে; জেনে উষারা তাঁর কাছে উর্ধ্বে ওঠে, ইন্দ্র হ'য়েছেন জ্যোতির্ময় গোরাজির এক অধিপতি। (পণিদের) দৃঢ় স্থানগুলির মধ্যস্থ, গোরাজিকে মনস্বীরা মুক্ত করলেন; মনের দ্বারা সপ্ত বিপ্র তাদের চালিয়ে দিলেন সম্মুখের দিকে (অথবা উর্ধ্বে পরমের দিকে), তারা পেয়েছিলেন সত্যের সমগ্র পথ (লক্ষ্য বা যাত্রার ক্ষেত্র); ঐগুলিকে (সত্যের পরম আসন-গুলিকে) জেনে ইন্দ্র নমঃর দ্বারা তাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন", "বীলেই সতীর্ অভি ধীরা অতৃন্দন্, প্রাচা অহিন্বন্ মনসা সপ্ত বিপ্রাঃ; বিশ্বাম্ অবিন্দন্ পথ্যাম্ ঋতস্য, প্রজানন্ ইৎ তা নমসা বিবেশ" (ঋক্ ৩, ৪, ৫)। ইহা সেই একই মহাজন্ম, মহাজ্যোতি, সত্য-জ্ঞানের মহৎ দিব্য সঞ্চরণ, আর তার সহিত আছে লক্ষ্যপ্রাপ্তি এবং উর্ধ্বস্থ পরম লোকসমূহের মধ্যে দেবতা ও দ্রষ্টাদের প্রবেশ। তারপর বলা হ'য়েছে সরমা এই কাজে যা করেছেন তার কথা।" যখন সরমা অদ্রির চূর্ণ স্থানটি দেখলেন তখন তিনি (সরমা) সেই মহৎ ও পরম লক্ষ্যকে অবিরত করলেন। সুপদযুক্তা তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন অব্যয় জনদের (উষার অবধ্য গোরাজির) সম্মুখে; প্রথমে তিনি গেলেন, জেনে, তাদের রবের দিকে" (ঋক্ ৬)। ইহা আবার সেই বোধি যা অগ্রে নিয়ে যায়; জ্ঞানবতী তিনি তৎক্ষণাৎ ও সকলের অগ্রবর্তী হ'য়ে দ্রুত চলে যান প্রচ্ছন্ন দীপ্তিরাজির রবের অভিমুখে, সেই স্থানের দিকে যেখানে অদ্রি যা দেখতে অত দৃঢ়ভাবে গঠিত ও অভেদ্য ("বীলু, দৃধ") চূর্ণ হ'য়েছে এবং অন্বেষুদের প্রবেশের যোগ্য হ'য়েছে।

সূক্তটির বাকী অংশে আঙ্গিরসগণের ও ইন্দ্রের কর্মসাধনের কথা বলা হ'য়েছে। "বিপ্রতম তিনি গেলেন তাঁদের সখ্যতা ক'রে; অদ্রি তার গর্ভস্থ বিষয়সমূহ বাহিরে পাঠাল সুকর্মসাধকের জন্য; পৌরুষের বীর্যে তিনি যুবাদের (আঙ্গিরসদের) সহিত ধনরাজির প্রাচুর্যের অভিলাষী হ'য়ে অধি-কার লাভ করলেন, তারপর জ্যোতির স্তুতি গেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ অঙ্গিরস হ'লেন। আমাদের সম্মুখে প্রতি বিদ্যমান্ বিষয়ের রূপ ও মান হ'য়ে তিনি সকল জন্ম জানেন ও শুষ্ণকে নিধন করেন"; অর্থাৎ দিব্য মন জগৎস্থ প্রতি বিষয়ের প্রতিরূপ গ্রহণ করে এবং ইহার প্রকৃত দিব্য মূর্তি ও অর্থ প্রকাশ করে এবং যে মিথ্যাশক্তি জ্ঞান ও ক্রিয়াকে বিকৃত করে

তাকে নাশ করে। "গো কামী, স্বর্গাসনের দিকে যাত্রী তিনি, পরম সখা, স্তুতি গান ক'রে তাঁর সখাদের মুক্ত করেন (যথার্থ আত্ম-প্রকাশের) সকল ন্যূনতা থেকে। জ্যোতির (গোরাজির) অভিলাষী মন নিয়ে তাঁরা তাঁদের আসনে প্রবেশ করলেন দীপ্তিকারী সব বচনের দ্বারা, অমৃতত্বের দিকে পথ তৈরী ক'রে ("নি গব্যতা মনসা সেদুর্ অর্কৈঃ কৃণ্বানাসো অমৃতত্বায় গাতুম্"। ইহাই তাঁদের সেই মহৎ আসন, সেই সত্য, যা দিয়ে তাঁরা মাসগুলির (দশগ্বদের দশমাসগুলির) অধিকার পেলেন। দৃষ্টিতে সুসঙ্গত হ'য়ে (অথবা সম্যক্‌ভাবে দেখে) তাঁরা তাঁদের আপন (আবাসে, স্বর্-এ) আনন্দিত হ'লেন, (বিষয়সমূহের) প্রাচীন বীজ থেকে দুগ্ধ দোহন ক'রে। তাঁদের (বাক্-এর) রব সকল স্বর্গ ও পৃথিবীকে তপ্ত করেছিল (অর্থাৎ সৃষ্টি করেছিল জ্বলন্ত শুদ্ধতা, "ঘর্ম," "তপ্তং ঘৃতম্" যা সৌর গোরাজির উৎপন্ন বস্তু); যা জন্ম নিল তার মধ্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করলেন এক দৃঢ় স্থিতি এবং গোরাজির মধ্যে বীরপুরুষগণকে (অর্থাৎ জ্ঞানের আলোকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সংগ্রামী শক্তি)।

"যারা জন্মাল (যজ্ঞের পুত্রগণ) তাদের দ্বারা, নৈবেদ্যের দ্বারা, দীপ্তির স্তুতির দ্বারা বৃত্রহন্তা ইন্দ্র ভাস্বর জীবদের উর্ধ্বের দিকে মুক্ত করলেন; প্রশস্তা ও আনন্দময়ী গো (গো অদিতি, বৃহৎ ও আনন্দময় পরতর চেতনা) তাঁর জন্য মিষ্ট খাদ্য, ঘৃতমিশ্রিত মধু এনে ইহাকে উৎপন্ন করলেন তাঁর দুগ্ধ হিসাবে। এই পিতারও জন্য (স্বর্গের জন্য) তাঁরা নির্মাণ করলেন বৃহৎ ও উজ্জ্বল সদন; সুষ্ঠুকর্মসাধক তাঁরা ইহার সমগ্র দৃষ্টি পেলেন। মাতাপিতাকে (দ্যৌ ও পৃথিবীকে) তাদের আশ্রয়ের দ্বারা বিস্তৃতভাবে উর্ধ্বে ধারণ করে তাঁরা আসীন হ'লেন ঐ উচ্চ লোকে এবং ইহার সকল রভস গ্রহণ করলেন। যখন (সকল অশুভ ও অনৃত) বিদীর্ণ করার জন্য বিশাল ধী তাঁকে তৎক্ষণাৎ ধারণ করে পৃথিবী ও স্বর্গের ব্যাপ্তিতে বর্ধন ক'রে—তখন যে ইন্দ্রের জন্য সমান ও অনবদ্য সব বাণী বর্তমান তাঁর জন্য থাকে সকল দুর্নিবার শক্তি। তিনি দেখেছেন মহৎ বহুবিধ ও আনন্দময় ক্ষেত্র (গোরাজির ব্যাপ্ত ক্ষেত্র, স্বর্); আর তিনি তাঁর সখাদের জন্য একত্র পাঠিয়েছেন সমগ্র সঞ্চরমাণ যূথ। মানুষী পুরুষদের (আঙ্গি-রসদের) দ্বারা ইন্দ্র বাহিরে দীপ্ত হ'য়ে একত্র সৃষ্টি করেছেন সূর্য, উষা, পথ ও অগ্নিকে" (ঋক্ ৭-১৫)।

আর বাকী শ্লোকগুলিতেও সেই একই চিন্তাবলী—তবে মাঝে আছে বৃষ্টির প্রসিদ্ধ চিত্র যার অর্থ অত্যন্ত ভুল বোঝা হ'য়েছে। "প্রাচীন জাতক-কে আমি নবীন করি যাতে আমি জয়লাভ করতে পারি। তুমি আমাদের বহু অদিব্য আঘাতকারীদের অপসরণ কর এবং স্বর্কে প্রতিষ্ঠা কর আমাদের অধিকার প্রাপ্তির জন্য। পাবক বৃষ্টিধারা আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত হয় (জলরাশিরূপে); তাদের অপর পারে যে আনন্দের অবস্থা তাতে তুমি আমাদের উত্তীর্ণ কর। তোমার রথে সংগ্রাম ক'রে তুমি আমাদের রক্ষা কর শত্রু থেকে; সত্বর, সত্বর, তুমি আমাদের গোরাজির জয়ী কর। বৃত্রহন্তা, গোপতি (মানুষদের) দেখিয়েছিলেন গোরাজিকে; তাঁর দীপ্তিমান্ বিধানসমূহ (বা রশ্মিসমূহ) সমেত তিনি প্রবেশ করলেন তাদের মধ্যে যারা কৃষ্ণ (আলোকশূন্য, পণিদের মতো); সত্যের দ্বারা সত্যগুলি (সত্যের গোরাজি) দেখিয়ে তিনি তার নিজের সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছেন," প্র সূনৃতা দিশমান ঋতেন দুরশ্ চ বিশ্বা অবৃণোদ্ অপ স্বাঃ (ঋক্ ১৯-২১); অর্থাৎ আমাদের অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করে ("অন্তঃ কৃষ্ণান্ গাৎ") পণিদের দ্বারা বদ্ধ "মানুষী দ্বারগুলি" ভেঙে ফেলে তিনি উন্মুক্ত করেন তাঁর নিজের লোক, স্বর্-এর দ্বারগুলি।

এইরূপ যে একটি অত্যাশ্চর্য সূক্ত তার অধিকাংশই আমি অনুবাদ করেছি কারণ ইহা বৈদিক কবিতার রহস্যময় ও সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশ করে এবং এইরূপ ক'রে যেসব চিন্তাবলীর মধ্যে সরমার কথা বলা হ'য়েছে তাদের কি প্রকৃতি ইহা তা বিশদভাবে প্রদর্শন করে। ঋগ্বেদে সরমা সম্বন্ধে অন্যান্য যেসব উক্তি আছে তাতে এই ভাবনার অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই। ৪-১৬-৮ শ্লোকে, ইহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, "যখন তুমি পর্বতের মধ্য থেকে জলরাশিকে বিদীর্ণ করেছিলে তখন তোমার সম্মুখে সরমা প্রকাশিত হ'ল; সেইরকম তুমি আমাদের নেতারূপে খোঁয়াড়গুলি ভেঙে, আঙ্গিরসদের দ্বারা স্তুত হ'য়ে আমাদের জন্য জোর করে বাহিরে আন প্রচুর সম্পদ।" ইহাই বোধি যা প্রকাশিত হয় দিব্য মনের সম্মুখে ইহার অগ্রবর্তী হিসাবে আর তখনই উদ্গত হয় জলরাশি, সত্যের প্রবহমান সব সঞ্চরণ, যা সবেগে বাহিরে আসে পর্বতের মধ্য থেকে যার মধ্যে বৃত্র তাদের নিরুদ্ধ করেছিল (শ্লোক ৭); আর এই বোধির সাহায্যেই এই দেবতা আমাদের নেতা হন জ্যোতির

উদ্ধারসাধনে এবং পণিদের দুর্গদ্বারের পশ্চাতে প্রস্তরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রচুর সম্পদ জয়ে।

সরমা সম্বন্ধে আমরা আর একটি উক্তি পাই পরাশর শাক্ত্যর একটি সূক্তে (১-৭২)। বস্তুতঃ পরাশরের অধিকাংশ সূক্তের মতো ইহাতে বৈদিক চিন্তাবলীর অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। পরাশর একজন অত্যন্ত উদ্ভাসক কবি যিনি সর্বদাই ভালবাসেন রহস্যবাদীর আবরণের প্রান্তভাগের চেয়ে বেশী কিছু অপসারণ করতে। এই সূক্তটি সংক্ষিপ্ত এবং আমি ইহার সম্পূর্ণ অনুবাদ করব। "তিনি ভিতরে সৃষ্টি করেছেন বিষয়সমূহের শাশ্বত বিধাতার দ্রষ্টৃ-জ্ঞানগুলি, আর তাঁর হস্তে ধারণ করেছেন বহু শক্তি (দিব্য পুরুষের শক্তিসমূহ, "নর্যা পুরূণি"); অগ্নি সকল অমৃতত্ব একত্র সৃষ্টি ক'রে (দিব্য) ধনরাজির অধিপতি হন। সকল অমরপুরুষ, তাঁরা যাঁরা (অবিদ্যার দ্বারা) সীমাবদ্ধ নন কামনা ক'রে আমাদের মধ্যে তাকে পেলেন যেন ইহা (গো অদিতির) সর্বত্র বিদ্যমান বৎস; পরিশ্রম ক'রে, আসনের দিকে ভ্রমণ ক'রে, ধীকে ধারণ ক'রে তাঁর পরম আসনের মধ্যে উপনীত হ'লেন অগ্নির ভাস্বর (মহিমায়)। হে অগ্নি, যখন তিনটি বৎসরের মধ্য দিয়ে (তিনটি প্রতীকার্থক্ ঋতু বা সময় যেগুলি হয়ত তিনটি মানসিক স্বর্গের মধ্য দিয়ে যাত্রার অনুরূপ) শুদ্ধ তাঁরা তোমাকে, শুদ্ধ জনকে 'ঘৃত' দিয়ে সেবা করলেন তখন তাঁরা ধারণ করলেন যজ্ঞীয় নামসমূহ এবং সুজাত রূপগুলিকে সঞ্চালন করলেন (পরম স্বর্গের দিকে)। বৃহৎ স্বর্গ ও পৃথিবীর জ্ঞান তাঁরা পেয়েছিলেন এবং তাদের ধারণ করলেন সম্মুখের দিকে, তাঁরা যাঁরা রুদ্রের পুত্রগণ, যজ্ঞের অধিপতিগণ মর্ত্য দৃষ্টিতে জাগ্রত হলেন এবং অগ্নিকে দেখতে পেলেন পরম আসনে দণ্ডায়মান। সুষ্ঠুভাবে (অথবা সামঞ্জস্যের মধ্যে) জেনে তাঁরা তাঁর কাছে নতজানু হ'লেন; তাঁরা তাঁদের পত্নীসহ (দেবতাদের স্ত্রীশক্তিসমূহ) নমস্যের কাছে নমস্কার করলেন; নিজেদের পবিত্র ক'রে (অথবা হয়ত স্বর্গ ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম ক'রে) তাঁরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের স্বীয় (নিজেদের যথার্থ বা দিব্য) রূপসমূহ, প্রতি সখা সখার দর্শনে সুরক্ষিত হ'য়ে। তোমার মধ্যে যজ্ঞের দেবতারা দেখতে পেলেন ভিতরে প্রচ্ছন্ন ত্রিবিধ সপ্ত গূঢ় আসনগুলি; সমহৃদয় হ'য়ে তাঁরা সেসব দিয়ে রক্ষা করেন অমৃতত্ব। যে পশুর দল স্থির থাকে ও যা চলে তাদের তুমি রক্ষা কর। হে অগ্নি, জগৎসমূহের মধ্যে সকল অভিব্যক্তির (বা জন্মের) জ্ঞান লাভ ক'রে (অথবা বিভিন্ন

জনগণের সকল জ্ঞান জেনে) তোমার শক্তিরাজিকে নিরন্তর প্রতিষ্ঠা কর জীবনের জন্য। দেবযানের পথগুলি অন্তরে জেনে তুমি হ'য়েছিলে তাদের অতন্দ্র দূত ও হব্যবাহক। স্বর্গের সপ্ত বীর্যবান্ বিষয় (নদীগুলি) মননকে যথার্থভাবে স্থাপন ক'রে, সত্যকে জেনে আনন্দের দ্বারগুলি বিবেচনার সহিত জানল; সরমা দেখতে পেল গোরাজির দৃঢ়স্থান, ব্যাপ্তি যার দ্বারা মানুষ এখন উপভোগ করে (পরম ধনরাজি)। যথার্থ ফলপ্রসূ বিষয়সমূহের উপর যাঁরা প্রবেশ করলেন তাঁরা অমৃতত্বের পথ নির্মাণ করলেন; মহাজনদের দ্বারা এবং মহত্বের দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হ'য়ে অবস্থান করল, মাতা অদিতি তাঁর পুত্রদের সহিত এলেন ঊর্ধ্বে ধারণের জন্য। অমর্ত্যগণ তার মধ্যে স্থাপন করল ভাস্বর মহিমা যখন তাঁরা তৈরী করলেন স্বর্গের দুই চক্ষু (সম্ভবতঃ ইহারা সূর্যের দুই দৃষ্টিশক্তির, ইন্দ্রের দুই অশ্বের সহিত সমান); নদীগুলি যেন মুক্ত হ'য়ে নিম্নে প্রবাহিত হয়; হে অগ্নি, যে সব ভাস্বর বিষয় (গোরাজি) এখানে নিম্নে ছিল তারা জানল।"

ইহাই পরাশরের সূক্ত আর ইহাকে যতদূর সম্ভব আক্ষরিকভাবে অনুবাদ করা হ'য়েছে যদিও তাতে ইংরাজী ভাষা কিছু কুৎসিত হ'য়েছে। প্রথম দৃষ্টিতেই ইহা স্পষ্ট যে ইহা বরাবরই জ্ঞানের, সত্যের ও এমন এক দিব্য শিখার স্তুতি যার সহিত পরম দেবতার কোন পার্থক্য বোঝা যায় না, আবার ইহা অমৃতত্বের স্তুতি এবং দেবগণের, দিব্যশক্তিসমূহের তাঁদের দেবতার নিকট যজ্ঞের দ্বারা তাঁদের পরম নামগুলিতে, তাঁদের যথার্থ রূপসমূহে, পরমদেবতার ত্রিবিধ সপ্ত আসন সমেত পরম অবস্থার দীপ্তিমান মহিমায় উত্তরণের স্তুতি। এই উত্তরণের অর্থ মানবের মাঝে দিব্য শক্তিসমূহের তাদের সাধারণ বিশ্বজনীন আকৃতির মধ্য থেকে ঊর্ধ্বস্থ ভাস্বর সত্যে উত্তরণ ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না আর বস্তুতঃ পরাশর নিজেই বলেছেন যে দেবতাদের এই ক্রিয়ার দ্বারা মর্ত্য মানব জ্ঞানে প্রবুদ্ধ হয় এবং অগ্নিকে দেখে পরম আসনে ও লক্ষ্যস্থলে দণ্ডায়মান; "বিদন্ মর্তো নেমধিতা চিকিত্বান্ অগ্নিং পদে পরমে তস্থিবাংসম্"। এইরূপ এক সূক্তে সরমা কি করছেন যদি না তিনি সত্যের এক শক্তি হন, যদি না তাঁর গোরাজি দীপ্তির দিব্য ঊষার রশ্মিমালা হয়? প্রাচীন যুধ্যমান গোষ্ঠীগুলির গোরাজির সহিত এবং পরস্পরের মধ্যে লুণ্ঠন ও গবাদি-আহরণের জন্য আমাদের আর্য ও দ্রাবিড়দেশীয় পূর্বপুরুষদের রক্তাক্ত সংগ্রামের সহিত অমৃতত্ব ও দেবত্বের এই জ্যোতির্ময় দেবত্বারোপের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে?

অথবা এই সব নদীগুলিই বা কি যারা চিন্তা করে, ও সত্য জানে এবং প্রচ্ছন্ন দ্বারসমূহ আবিষ্কার করে? অথবা আমরা কি তবু বলব যে এই সব পাঞ্জাবের নদী যা অনাবৃষ্টি বা দ্রাবিড়দের দ্বারা অবরুদ্ধ হ'য়েছিল আর সরমা আর্যদের দৌতকর্মের এক উপকথার মূর্তি আর না হয় শুধু প্রাকৃতিক উষা।

দশম মণ্ডলের সমগ্র একটি সূক্তে সরমার এই "দৌত্যকার্যের" কথা বলা হয়েছে, ইহা সরমা ও পণিদের সংলাপ; কিন্তু আমরা পূর্বেই তার সম্বন্ধে যা জেনেছি ইহাতে তার বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেই, আর ইহার প্রধান গুরুত্ব হল যে গুহানিহিত ধনরাজির অধিপতিদের সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা গঠন করতে ইহা আমাদের সাহায্য করে। কিন্তু আমরা এই কথা বলতে পারি যে এই সূক্তে এবং অন্যান্য যেসব সূক্ত আমরা লক্ষ্য করেছি তাদের কোনটিতেই সরমা সম্বন্ধে দিব্য শুনীর মূর্তির কোন আভাস নেই, সম্ভবতঃ বৈদিক চিত্রাবলীর পরবর্তী অংশে সরমাকে শুনী বলে চিত্রিত করা হ'য়েছে। ইহা নিশ্চয়ই দীপ্তিময়ী সুপদযুক্তা দেবী যাঁর দ্বারা পণিরা আকৃষ্ট হয় এবং যাঁকে তারা চায় তাদের ভগিনীরূপে—তাদের গবাদিপশুদের রক্ষা করার জন্য কুকুর হিসাবে নয়, পরন্তু তাদের ধনরাজির অংশীদার হিসাবে। কিন্তু স্বর্গশুনীর এই চিত্রটি অত্যন্ত উপযোগী ও মনোহর এবং উপাখ্যান থেকে ইহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। পূর্ববর্তী একটি সূক্তে (১-৬২) আমরা অবশ্য একটি পুত্রের কথা বলেছি যার জন্য সরমা প্রাচীন ব্যাখ্যানু-যায়ী "খাদ্য পেয়েছিল" আর এই কথাটির জন্য এই গল্প আছে যে হারানো গোরাজি সন্ধান করার কাজে পূর্ব সর্ত হিসাবে সরমা তার তনয়ের জন্য যজ্ঞে খাদ্য দাবী করেছিল। কিন্তু স্পষ্টতঃই এই ব্যাখ্যাটি কল্পনাপ্রসূত, ঋগ্বেদে ইহার কোন উল্লেখ নেই। বেদের কথা এই, "যজ্ঞে" অথবা আরো সম্ভবতঃ ইহার এই অর্থ, "(গোরাজির জন্য) ইন্দ্র ও অঙ্গিরা ঋষিদের অন্বেষণ কার্যে সরমা তনয়ের জন্য একটি প্রতিষ্ঠা আবিষ্কার করেছিলেন," "বিদৎ সরমা তনয়ায় ধাসীম্" (১-৬২-৩); কারণ ইহাই "ধাসীম্" কথাটির সম্ভবপর অর্থ। খুব সম্ভব, এই পুত্র যজ্ঞজাত পুত্র যা বৈদিক চিত্রাবলীতে এক সতত অঙ্গ, ইহা সরমা থেকে জাত কুকুর-বংশ নয়। এরূপ কথা বেদে অন্যত্র আছে, যেমন ১-৯৬-৪ শ্লোকে, "মাতরিশ্বা পুরুবার পুষ্টির্ বিদদ্ গাতুং তনয়ায় স্ববিৎ," "মাতরিশ্বা (প্রাণদেবতা, বায়ু) বহু কাম্য বিষয় (জীবনের উচ্চতর বিষয়সমূহ) বৃদ্ধি ক'রে পুত্রের জন্য পথ

আবিষ্কার করল, আবিষ্কার করল স্বর্‌"; এখানেও বিষয়টি স্পষ্টতঃ একই কিন্তু পুত্রের সহিত কোন কুকুরছানার কোন সম্পর্ক নেই।

দশম মণ্ডলের একটি শেষের সূক্তে যমের দূত দুই সারমেয় কুকুরের কথার উল্লেখ আছে কিন্তু সরমা যে তাদের মাতা তার কোন উল্লেখ এখানে নেই। এটি আছে প্রসিদ্ধ "অন্ত্যেষ্টি" সূক্তে (১০-১৪) এবং ঋগ্বেদে যম ও তার দুই কুকুরের প্রকৃত চরিত্র কি তা লক্ষ্য করার যোগ্য। পরবর্তী ভাবনাসমূহে যম মৃত্যুর দেব এবং তার নিজস্ব বিশেষ লোক আছে; কিন্তু ঋগ্বেদে মনে হয় তিনি আদিতে সূর্যের এক রূপ ছিলেন—এমন কি অনেক পরে ঈশোপনিষদেও আমরা দেখি যে সূর্যকে যম বলে অভিহিত করা হ'য়েছে—আর তারপর তিনি বিস্তৃতভাবে দীপ্তিমান্ সত্যাধিপতির যমজ অন্যতম। তিনি ধর্মের রক্ষক, সত্যের ধর্ম, "সত্যধর্ম" যা এক সর্ত এবং সেজন্য নিজেই অমৃতত্বের রক্ষক। তাঁর জগৎ হ'ল স্বর্‌, অমৃতত্বের লোক, "অমৃতে লোকে অক্ষিতে", যেখানে, যেমন ৯-১১৩-৭ শ্লোকে বলা হয়, অবিনশ্বর জ্যোতি বর্তমান, যেখানে স্বর্‌ প্রতিষ্ঠিত, "যত্র জ্যোতির্‌ অজস্রম্‌, যস্মিন্‌ লোকে স্বর্‌ হিতম্‌"। বস্তুতঃ ১০-১৪ সূক্ত তত মৃত্যুর সূক্ত নয়, যত ইহা প্রাণ ও অমৃতত্বের সূক্ত। যম ও প্রাচীন পিতৃগণ সেই লোকের পথ আবিষ্কার করেছেন যা গোরাজির চারণভূমি এবং যেখান থেকে শত্রু ভাস্বর গোযূথ অপহরণ করতে অক্ষম, "যমো ন গাতুং প্রথমো বিবেদ, নৈষা গব্যূতির্‌ অপভর্তবা উ, যত্র নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেয়ুঃ (ঋক্‌ ২)। স্বর্গারোহী মর্ত্যের অন্তঃপুরুষকে আদেশ করা হয় "শুভ (বা কার্যকরী) পথের উপর চতুরাক্ষ বিচিত্রবর্ণের সারমেয় কুকুর দুটিকে বেগে ছাড়িয়ে যেতে" (ঋক্‌ ১০)। ইহারা ঐ স্বর্গপথের চতুরাক্ষ রক্ষক আর তারা মানবকে রক্ষা করে তাদের দিব্য দৃষ্টির দ্বারা, "যৌ তে শ্বানৌ যম রক্ষিতারৌ চতুরাক্ষৌ পথিরক্ষী নৃচক্ষসৌ" (ঋক্‌ ১১) আর যমকে বলা হয় অন্তঃপুরুষকে তার পথে রক্ষীরূপে দিতে। এই কুকুরগুলি "চতুর্দিকে বিচরণকারী ও সহজে তৃপ্ত হয় না" এবং মানুষের মাঝে তারা বিচরণ করে বিধান-অধিপতির দূত হিসাবে। আর সূক্তটিতে প্রার্থনা করা হয় "এখানে এই অসুখী (লোকে) তারা (কুকুররা) যেন আমাদের ফিরিয়ে দেন আনন্দ যাতে আমরা সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি" (ঋক্‌ ১২)। আমরা এখনো প্রাচীন বৈদিক ভাবনার স্তরে রয়েছি অর্থাৎ জ্যোতি ও আনন্দ ও অমৃতত্বের স্তরে এবং এই সারমেয় কুকুরগুলি সরমার

মূল বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকারী অর্থাৎ তাদের আছে দৃষ্টি, সুদূরব্যাপী সঞ্চরণ, যে পথ দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় সেই পথের উপর ভ্রমণ করার ক্ষমতা। সরমা নিয়ে যান গোরাজির ব্যাপ্তিতে; এই কুকুরগুলি অন্তঃ-পুরুষকে রক্ষা করে সেই অভেদ্য চারণভূমির যাত্রায় যা জ্যোতির্ময় ও অবিনশ্বর গোযূথের "ক্ষেত্র"। সরমা আমাদের নিয়ে যান সত্যে, সূর্য-দৃষ্টিতে যা আনন্দের কি যাবার পথ; এই কুকুরগুলি এই কষ্টভোগের জগতে মানবের কাছে সুখ আনে যাতে সে নিশ্চিত পায় সূর্যের দৃষ্টি। সরমাকে পথের উপর ধাবমানা সুপদযুক্তা দেবীরূপে অথবা স্বর্গীয় শুনী, পথের এই সব সুদূরসঞ্চারী রক্ষীগুলির মাতারূপে যেভাবেই চিত্রিত করা হ'ক না কেন, ভাবনা সেই একই, তিনি সত্যের এক শক্তি যা অন্বেষণ করে ও আবিষ্কার করে, যা অন্তর্দৃষ্টির দিব্যশক্তির দ্বারা প্রচ্ছন্ন জ্যোতি ও নিষিদ্ধ অমৃতত্বের দেখা পায়। কিন্তু শুধু এই অন্বেষণ ও সন্ধানপ্রাপ্তির মধ্যেই তাঁর কার্য সীমিত।

একবিংশ অধ্যায়

অন্ধকারের পুত্রগণ

একবার নয়, বারবার আমরা দেখেছি যে আঙ্গিরসদের ইন্দ্র ও সরমার, পণিদের গুহা এবং উষা, সূর্য ও গোরাজি জয়ের কাহিনীকে আর্য আক্রমণকারী ও দ্রাবিড়জাতীয় গুহাবাসীদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক ও সামরিক সংঘর্ষের বিবরণ বলে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। এই সংঘর্ষ হ'ল জ্যোতি-অন্বেষুগণ ও অন্ধকারের শক্তিসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ; গোরাজি হ'ল সূর্য ও উষার দীপ্তিসমূহ, তারা ভৌতিক অর্থাৎ পশু গরু হ'তে পারে না; আর্যদের জন্য ইন্দ্র যে গোরাজির ব্যাপ্ত অভয় ক্ষেত্র জয় করেন তা স্বর্-এর বিশাল লোক, সৌরদীপ্তির লোক এবং স্বর্গের ত্রিবিধ জ্যোতির্ময় লোক। সুতরাং সমভাবেই মনে করা চাই যে পণিরা অন্ধকারের গুহার শক্তিসমূহ। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে পণিরা দস্যু বা দাস; সর্বদাই তাদের ঐ নামেই অভিহিত করা হয়, তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যে তারা দাস বর্ণের যা আর্যবর্ণের বিপরীত, আর "বর্ণ, রঙ্ কথাটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ও পরবর্তী রচনাবলীতে জাতি বা শ্রেণী অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় না যে ঋগ্বেদেও ইহার সেই একই অর্থ। দস্যুরা হ'ল পবিত্র বাণীর নিন্দাকারী, তারা দেবগণকে কোন দান বা পবিত্র মদ্য দেয় না, তারা তাদের গো ও অশ্বরাজির সম্পদ ও অন্যান্য ধনরাজি নিজেদের জন্যই রাখে, সেগুলিকে ঋষিদের দেয় না; তারা যজ্ঞসাধন করে না। যদি ইচ্ছা করি তাহ'লে আমরা মনে করতে পারি যে ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে একটা সংগ্রাম হ'য়েছিল এবং ঋষিরা এই সব ধর্মমতের মানুষী প্রতিনিধিদের মধ্যে স্থূল সংগ্রামের চিত্রগুলিকে নিয়ে সেসব প্রয়োগ করেছিলেন আধ্যাত্মিক সংঘর্ষের বেলায়, ঠিক যেমন তাঁরা তাদের শারীরিক জীবনের অন্যান্য বিষয়গুলিকে প্রয়োগ করেছিলেন আধ্যাত্মিক যজ্ঞ, আধ্যাত্মিক সম্পদ, আধ্যাত্মিক সংগ্রাম ও যাত্রার প্রতীকরূপে। কিন্তু অন্ততঃ ঋগ্বেদে যে ঋষিরা আধ্যাত্মিক সংঘর্ষ ও সংগ্রামের কথা বলেন, কোন স্থূল সংগ্রাম ও লুণ্ঠনের কথা বলেন না, তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত।

যে পদ্ধতিতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ নিয়ে তাদের একটা বিশেষ

অর্থ দেওয়া হয় যা শুধু সেগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য অথচ যে অন্য বহুসংখ্যক অংশ আছে যাতে ঐ অর্থ স্পষ্টতঃই প্রয়োগের অযোগ্য সেগুলি অগ্রাহ্য করা হয় তাহ'লে ঐ পদ্ধতি হয় অযৌক্তিক নয় সরলতাবর্জিত। পণিরা, তাদের সম্পদ, তাদের সব বৈশিষ্ট্য, দেবতাদের, ঋষিদের ও আর্যদের দ্বারা তাদের জয়সাধন—এইসব সম্বন্ধে বেদে যে সব উক্তি আছে সেসবকে সমগ্রভাবে নেওয়া দরকার এবং এই সব অংশ একত্র নিলে তা থেকে যে সিদ্ধান্ত আসে তা-ই সমভাবে সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করা উচিত। এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হ'লে আমরা দেখতে পাই যে এই সব শ্লোকের অনেক-গুলিতেই পণিদের মানুষ বলে ভাবা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং তারা হয় ভৌতিক, নয় আধ্যাত্মিক অন্ধকারের শক্তিরাজি; বাকী শ্লোকগুলিতে তারা আদৌ ভৌতিক অন্ধকারের শক্তি হ'তে পারে না, পরন্তু তারা হয় দেবকামী ও যজ্ঞসাধকের মানুষী শত্রুদল, আর না হয় আধ্যাত্মিক জ্যোতির শত্রুদল; আবার এমন অন্য অনেক শ্লোক আছে যাতে তারা মানুষী শত্রু বা ভৌতিক আলোকের শত্রু হ'তে পারে না, কিন্তু নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিক জ্যোতি, সত্য ও ধীর শত্রুদল। এই সব তথ্য থেকে এই একটি মাত্রই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তারা সর্বদাই শুধু আধ্যাত্মিক জ্যোতির শত্রু।

এই দস্যুদের সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে প্রধান সন্ধানীসূত্র হিসাবে আমরা ৫-১৪-৪ ঋক্‌টি পরীক্ষা করতে পারি। "অগ্নি জাত হ'য়ে দীপ্তিমান্ হ'লেন, দস্যুদের, অন্ধকারকে জ্যোতির দ্বারা নিধন ক'রে; তিনি দেখতে পেলেন গোরাজি, জলরাশি ও স্বর্," "অগ্নির্জাতো অরোচত, ঘ্নন্ দস্যূন্ জ্যোতিষা তমঃ, অবিন্দদ্ গা অপঃ স্বঃ"। দস্যুরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত— এক শ্রেণী হ'ল পণিরা যারা গোরাজি ও জলরাশি উভয়ই আটক রাখে এবং বিশেষ করে গোরাজি দিতে অস্বীকার করে, আর অন্য শ্রেণীর হ'ল বৃত্ররা যারা জলরাশি ও জ্যোতি আটক রাখে তবে বিশেষ করে বলা হয় যে তারা জলরাশিই আটক রাখে; কিন্তু এই দুই শ্রেণীর সকল দস্যুই স্বর্-এ উত্তরণে বাধা দেয় এবং আর্য ঋষিদের দ্বারা সম্পদ আহরণের কার্যে বিরুদ্ধাচরণ করে। জ্যোতি অস্বীকার করার অর্থ স্বর্-এর দৃষ্টির "স্বদৃশ"-এর বিরুদ্ধা-চরণ এবং সূর্যের দৃষ্টির, জ্ঞানের পরম দৃষ্টির "উপমা কেতুঃ"-র (৫-৩৪-৯) বিরুদ্ধাচরণ; জলরাশি অস্বীকার করার অর্থ স্বর্-এর প্রচুর সঞ্চরণের, "স্বর্বতীর্ অপঃ", সত্যের গতি বা ধারাসমূহের, "ঋতস্য প্রেষা"র "ঋতস্য ধারাঃ"-র বিরুদ্ধাচরণ; সম্পদআহরণে বিরুদ্ধাচরণের অর্থ স্বর্-

এর প্রচুর পদার্থের অস্বীকার, অর্থাৎ "বসু", "ধন" "বাজ", "হিরণ্য"-এর, সূর্যে ও জলরাশিতে যে মহাসম্পদ পাওয়া যায় তার "অপ্‌সু সূর্যে মহদ্‌ ধনম্‌"এর অস্বীকার (৮-৬৮-৯)। তথাপি যেহেতু সমগ্র সংগ্রাম হ'ল জ্যোতি ও অন্ধকারের মধ্যে, সত্য ও অনৃতের, দিব্যমায়া ও অদিব্যমায়ার মধ্যে, সেহেতু এখানে সকল দস্যুকেই সমভাবে অন্ধকারের সহিত এক করা হয়; এবং অগ্নির জন্ম ও দীপ্তির দ্বারাই সেই জ্যোতির সৃষ্টি হয় যার দ্বারা তিনি নিধন করেন দস্যুদল ও অন্ধকার। এখানে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা আদৌ খাটে না, যদিও প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা চলতে পারে যদি আমরা এই শ্লোকটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখি এবং মনে করি যে যজ্ঞীয় অগ্নির প্রজ্জ্বলনই দৈনিক সূর্যোদয়ের কারণ; কিন্তু আমাদের বিচার করা চাই বেদের সমগ্র অংশের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা, শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশের আলোচনার দ্বারা নয়।

আর্যদের এবং পণি বা দস্যুদলের মধ্যে বিরুদ্ধাচরণের কথা পঞ্চম মণ্ডলের অন্য একটি সূক্তে (৩৪) বলা হ'য়েছে, এবং তৃতীয় মণ্ডলের ৩৪তম সূক্তে আমরা "আর্য বর্ণ" কথাটি পাই। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে দস্যুদের এক করা হ'য়েছে অন্ধকারের সহিত; সুতরাং আর্যদের যুক্ত করা চাই জ্যোতির সঙ্গে এবং আমরা সত্যই পাই যে বেদে সূর্যের আলোককে আর্যজ্যোতি বলা হয় যা স্পষ্টতঃ দাস অন্ধকারের বিপরীত। বসিষ্ঠও তিনটি আর্য সম্প্রদায়ের কথা বলেন যাঁরা "জ্যোতিরগ্রাঃ," অর্থাৎ যাঁরা জ্যোতির দ্বারা চালিত হন, যাঁদের সম্মুখে জ্যোতি থাকে (৭-৩৩-৭)। আর্য-দস্যু প্রশ্নটির সম্যক্‌ বিবেচনা সম্ভব কেবল যদি আমরা সকল প্রাসঙ্গিক শ্লোকগুলিকে পরীক্ষা ক'রে এবং যেসব বিষয়ে বিরোধ দেখা যায় তার সম্মুখীন হয়ে একটা সম্পূর্ণ আলোচনা করি, কিন্তু আমার বর্তমান উদ্দেশ্যের জন্য আমি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছি তা-ই যথেষ্ট। আমাদের একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে বেদে আমরা "ঋতং জ্যোতিঃ", "হিরণ্যং জ্যোতিঃ", সত্য আলোক, স্বর্ণময় আলোক কথাগুলি পাই আর এগুলি আমাদের সন্ধানের অতিরিক্ত সূত্র। আমি বলি যে সৌর আলোকের এই যে তিনটি বিশেষণ "আর্য", "ঋত", "হিরণ্য", ইহারা পরস্পরের অর্থ প্রকাশ করে এবং প্রায় সমার্থক। সূর্য সত্যের অধিপতি এবং সেজন্য ইহার আলোক "ঋতং জ্যোতিঃ"; সত্যের এই জ্যোতিরই অধিকারী আর্য—দেবতা বা মর্ত্য—এবং ইহাই তাঁর আর্যত্বের সার; আর হিরন্ময় বিশেষণটি সর্বদাই

সূর্য সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় এবং বেদে স্বর্ণ সম্ভবতঃ সত্যের পদার্থের প্রতীক্, কারণ ইহার পদার্থ হ'ল সেই জ্যোতি যা সূর্যের মধ্যে এবং স্বর-এর জল-রাশির মধ্যে, "অপ্সু সূর্যে" পাওয়া স্বর্ণময় সম্পদ—সেইজন্য আমরা "হিরণ্যং জ্যোতিঃ" কথাটিও পাই। এই হিরন্ময় বা দীপ্তিময় আলোকই সত্যের রঙ্, "বর্ণ"; আবার ইহাই আর্যদের দ্বারা জয়-করা দীপ্তিতে পূর্ণ মননসমূহের রঙ্। উজ্জ্বলবর্ণ গোরাজির রঙ্ "শুক্র" "শ্বেত", জ্যোতির রঙ্; অন্যদিকে দস্যু অন্ধকারের শক্তি হওয়ায় কৃষ্ণবর্ণ। আমি বলি যে সত্যের জ্যোতির উজ্জ্বলতাই, "জ্যোতিঃ আর্যম্" (১০-৪৩-৪) আর্য "বর্ণ", যে আর্যরা "জ্যোতিরগ্রাঃ" তাদের রঙ্; অজ্ঞানতার রাত্রির অন্ধকার হ'ল পণিদের রঙ্, দাস"বর্ণ"। এইরূপে "বর্ণ"র অর্থ হবে প্রায় স্বভাব অথবা ঐ বিশেষ স্বভাবের অন্য সব কিছু, রঙ্ হ'ল স্বভাবের প্রতীক্; আর প্রাচীন আর্য ঋষিদের মধ্যে এই ভাবনাই যে প্রচলিত ধারণা ছিল তা আমার মনে হয় প্রমাণিত হয় এই কারণে যে বিভিন্ন বর্ণগুলিকে ব্যবহার করা হত চারি জাতির পার্থক্য বোঝাতে যেমন সাদা, লাল, হলদে ও কাল।

৫-৩৪ সূক্তের অংশটি এইরূপ: "তিনি (ইন্দ্র) পাঁচ বা দশ দিয়ে আরোহণ করতে চান না; যে সোম দেয় না তাতে তিনি সংলগ্ন থাকেন না যদিও সে বৃদ্ধি ও উন্নতি করতে পারে; তিনি তাকে হয় অভিভূত করেন আর না হয় নিধন করেন তাঁর দুর্দমনীয় গতিতে; দেবকামীকে তিনি তার ভোগের জন্য দেন গোরাজিতে পূর্ণ খোঁয়াড়। যুদ্ধের আঘাতে (শত্রু) বিদারক, দৃঢ় চক্রধারী, যে সোম দেয় না তার প্রতি বীতরাগ কিন্তু সোমদাতার বর্ধক—এমন যে ইন্দ্র তিনি ভীষণ ও সকলকে বশে আনেন; আর্য তিনি, দাসকে আনেন একান্ত অধীনতায়। তিনি আসেন পণির এই ভোগকে দূর ক'রে দিয়ে, তার কাছ থেকে তা কেড়ে নিয়ে এবং দাতাকে তার ভোগের জন্য তিনি সম্পূর্ণভাবে ভাগ করে দেন সেই সম্পদ যা বীরশক্তি-সমূহে সমৃদ্ধ (আক্ষরিকভাবে পরিজনে সমৃদ্ধ, "সূনরং বসু," "বীরাঃ", "নৃ" যে কথাগুলি প্রায়ই সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হয়); যে ব্যক্তি ইন্দ্রের ক্ষমতাকে দ্বেষ করে দুর্গম যাত্রায় তাকে বহুভাবে নিরস্ত করা হয়, ("দুর্গে[১] চন ধ্রিয়তে আ পুরু") ভাস্বর গোরাজির মধ্যে যখন মঘবন্ সেই দুজনকে

১ দেবতাদের নিকট ঋষি সর্বদাই প্রার্থনা করেন শ্রেষ্ঠ আনন্দে যাবার তাদের পথকে সুগম ও কন্টকশূন্য করতে, "সুগ"; "দুর্গ" হ'ল সহজ গমনের বিপরীত, ইহা সেই পথ যা বহুবিধ ("পুরু") বিপদ ও কষ্টভোগ ও বিঘ্নে সমাকীর্ণ।

জানেন যারা সম্পদে ধনবান ও সকল শক্তিতে পূর্ণ তখন তিনি জ্ঞানে সমৃদ্ধ হ'য়ে তৃতীয় একজনকে তাঁর সাহায্যকারী করেন এবং তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে তাঁর যোদ্ধাদের সাহায্যে উর্ধ্বপানে মুক্ত করেন বহুসংখ্যক গোরাজি ("গব্যম্")"। আর সূক্তের শেষ ঋক্‌টিতে বলা হয় যে আর্য (দেবতা বা মানুষ) উপনীত হ'চ্ছেন শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-দৃষ্টিতে, ("উপমাং কেতুম্ অর্যঃ"), জলরাশি সম্মিলিত হ'য়ে তাঁকে পুষ্ট করে এবং তাঁর আবাসকে করে সংগ্রামের এক পরাক্রম-শালী ও উজ্জ্বল শক্তি, "ক্ষত্রম্ অমবৎ ত্বেষম্" (ঋক্ ৫-৯)।

এই সব প্রতীক্ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বেই যা জানি তা থেকে আমরা সূক্তটির আন্তর অর্থ সহজেই ধরতে পারি। ইন্দ্র দিব্য মনঃশক্তি অবিদ্যার শক্তিসমূহের কাছ থেকে তাদের গোপন সম্পদ নেন; এমনকি যখন এই সব শক্তি ধনবান্ ও সমৃদ্ধ তখনও তিনি ইহাদের সহিত বন্ধুত্ব করতে অস্বীকার করেন। প্রদীপ্ত উষার অবরুদ্ধ পশুর দলকে তিনি দেন দেব-কামী যজ্ঞসাধককে। তিনি নিজেই আর্য যিনি অজ্ঞানতার জীবনকে উচ্চ-তর জীবনের সম্পূর্ণ অধীনতায় আনেন যাতে ইহা এই জীবনের কাছে ছেড়ে দিতে পারে ইহার অন্তঃস্থ সকল সম্পদ। শুধু এই সূক্তে নয়, অন্যান্য সূক্তেও দেবগণ বোঝাতে "আর্য" ও "অর্য" পদগুলির প্রয়োগ থেকে মনে হয় যে আর্য ও দস্যুর মধ্যে বিরুদ্ধভাব আদৌ কোন রাষ্ট্রজাতীয় বা উপ-জাতীয় বা শুধু মানুষী পার্থক্য নয় বরং ইহার গভীর তাৎপর্য আছে। ইহা নিশ্চিত যে যোদ্ধারা হ'ল সপ্ত আঙ্গিরস; কারণ তাঁরাই গোরাজির মুক্তিসাধনে ইন্দ্রের সহায়ক, সায়ণ যে "সত্বভিঃ"র ব্যাখ্যা ক'রে ইহাদের মরুৎ বলেন, সেই সব মরুৎ তাঁরা নন। কিন্তু ভাস্বর গোরাজির মধ্যে প্রবেশ ক'রে, ধীর সম্মিলিত দীপ্তিসমূহ অধিকার ক'রে ইন্দ্র সে তিন জনের দেখা পান বা তাদের জানতে পারেন তাঁরা যে কাঁরা তা নির্দিষ্ট করা আরো কঠিন। খুব সম্ভব, ইঁহারা সেই তিনজন যাঁরা আঙ্গিরস-জ্ঞানের সপ্তরশ্মিকে উত্তোলন করেন দশ সংখ্যায় যাতে তাঁরা সফলভাবে দশমাস অতিবাহিত ক'রে সূর্য ও গোরাজিকে মুক্ত করেন; কারণ দুই-জনকে দেখার বা জানার এবং তৃতীয় জনের সাহায্য পাবার পরই ইন্দ্র পণিদের গোরাজি মুক্ত করেন। আবার তাঁদের যুক্ত করা যেতে পারে জ্যোতির দ্বারা চালিত তিন আর্য সম্প্রদায়ের ও স্বর্-এর তিনটি জ্যোতির্ময় লোকের প্রতীক্-তন্ত্রের উপর; কারণ পরমা জ্ঞান-দৃষ্টির, "উপমা কেতুঃ"র প্রাপ্তিই তাঁদের কর্মের শেষ ফল আর এই পরম জ্ঞান হ'ল সেই যা স্বর্-

এর দৃষ্টির অধিকারী এবং ইহার তিনটি জ্যোতির্ময় লোকে অবস্থিত, "রোচনানি", যেমন আমরা পাই ৩-২-১৪ শ্লোকে, "স্বদৃশং কেতুং দিবো রোচনস্থাম্ উষর্বুধম্","সেই জ্ঞান-দৃষ্টি যা স্বর্কে দেখে যা অবস্থান করে দীপ্তিমান্ জগৎসমূহে, যা প্রবুদ্ধ হয় উষায়।"

৩-৩৪ সূক্তে বিশ্বামিত্র "আর্য বর্ণ" কথাটি প্রয়োগ করেন এবং সেই সাথে ইহার মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্যের সন্ধানীসূত্রটিও দেন। এই সূক্তের তিনটি শ্লোক (৮-১০) এইরূপ: "(তাঁরা স্তুতি করেন) পরম বরেণ্যকে, সর্বদা পরাভবকারীকে, সেই শক্তিদাতাকে যিনি স্বর্-এর ও দিব্য জলরাশির অধিকার জয় করেন; যে ইন্দ্র পৃথিবী ও স্বর্গের অধিকার লাভ করেন তাঁর পশ্চাতে মনস্বীরা আনন্দ পান। ইন্দ্র অশ্বসমূহের অধিকার জয় করেন, জয় করেন সূর্য, জয় করেন বহু ভোগের গাভীকে; তিনি হিরন্ময় ভোগ জয় করেন, দস্যুদের নিধন ক'রে তিনি পোষণ (বা রক্ষা) করেন আর্য "বর্ণকে"; ইন্দ্র ওষধি এবং দিবসগুলি, বৃক্ষসমূহ ও অন্তরিক্ষ জয় করেন, তিনি বলকে বিদীর্ণ করেন এবং বাণীসমূহের বক্তাকে সম্মুখের দিকে প্রেরণ করেন; যারা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের কর্মসংকল্পকে ("অভিক্রতূনাম্") প্রয়োগ করে তাঁদের তিনি এইভাবে বশে আনেন"। আর্যর জন্য ইন্দ্রের দ্বারা জয়-করা সকল সম্পদের প্রতীকার্থক্ বিষয়গুলি এখানে আমরা পাই আর ইহার মধ্যে আছে সূর্য, দিবস, পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ, অশ্বগুলি, পৃথিবীজাত বিষয়সমূহ, ওষধি এবং বৃক্ষ ("বনস্পতীন্" যার দুই অর্থ বনের অধিপতি এবং ভোগের অধিপতি); আর আমরা পাই বল ও দস্যুদের বিপরীত আর্য 'বর্ণকে'।

কিন্তু ইহার পূর্বের সূক্তগুলিতে (৪-৬), আমরা ইতিপূর্বেই "বর্ণ" কথাটি পেয়েছি আর্য মননসমূহের, যেসব মনন সত্য ও জ্যোতিতে পূর্ণ তাদের রঙ্ হিসাবে। "স্বর্জয়ী ইন্দ্র দিনগুলিকে জন্ম দিয়ে কামনাসমূহের (আঙ্গিরসদের) দ্বারা (দস্যুদের) এই সব সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ ক'রে জয় করেছিলেন; মানবের জন্য তিনি দিনগুলির জ্ঞান-দৃষ্টি ("কেতুম্ অহ্নাম্") দীপ্ত করালেন, বিশাল ভোগের জন্য তিনি জ্যোতি পেলেন;... তিনি তাঁর আরাধকের জন্য এই মননগুলিকে জ্ঞানে সচেতন করলেন, (দস্যুদের বাধা অতিক্রম ক'রে) তিনি এই সবের (মননদের) এই উজ্জ্বল "বর্ণ"কে সম্মুখে নিয়ে গেলেন, "অচেতয়দ্ ধিয়া ইমা জরিত্রে, প্র ইমং বর্ণম্ অতিরচ্ ছুক্রম্ আসাম্"। তাঁরা মহান্ ইন্দ্রের বহু মহৎ ও সুষ্ঠু কর্ম

আরম্ভ (বা প্রশংসা) করেন; তাঁর ক্ষমতাবলে, তাঁর পরাভবকারী শক্তিতে, তাঁর জ্ঞানের সব কর্মপ্রণালীর দ্বারা ("মায়াভিঃ") তিনি কুটিল দস্যুদের চূর্ণ করেন।

আমরা এখানে পাই বৈদিক কথাটি "কেতুম্ অহ্নাম্", দিবসসমূহের জ্ঞান দৃষ্টি যার অর্থ সত্যের সূর্যের সেই জ্যোতি যা নিয়ে যায় বৃহৎ নিঃশ্রেয়সে; কারণ "দিবসগুলি" উৎপন্ন হয় মানবের জন্য ইন্দ্রের দ্বারা স্বর্-বিজয়ের মাধ্যমে আর আমরা জানি যে এই বিজয় আসে যখন আঙ্গিরসদের সাহায্যে তিনি পণিবাহিনীকে ধ্বংস করেন এবং সূর্য ও ভাস্বর গোরাজির উত্তরণ হয়। দেবতারা যে এই সব করেন তা মানবের জন্য এবং মানবের সব শক্তি হিসাবে, তাঁদের নিজেদের জন্য নয় কারণ তাঁরা পূর্ব থেকেই ঐ সবের অধিকারী;—তার জন্যই "নৃ", দিব্য মানব বা পুরুষ হিসাবে ইন্দ্র ঐ পৌরুষের অনেক শক্তি ধারণ করেন; "নৃবদ্...নর্যা পুরূণি"; তাকেই তিনি প্রবুদ্ধ করেন এই সব মননের জ্ঞানে যাদের প্রতীক্-ভাষায় বলা হয় পণিদের কাছ থেকে মুক্ত-করা ভাস্বর গোযূথ বলে; আর এই সব মননের উজ্জ্বল রঙ্ "শুক্রং বর্ণম্ আসাম্" স্পষ্টতঃই সেই "শুক্র" বা "শ্বেত" আর্য রঙ্ যার কথা বলা হ'য়েছে ৯ম শ্লোকে। এই সব মননের "রঙ্"কে ইন্দ্র সম্মুখদিকে নিয়ে যান বা বৃদ্ধি করেন পণিদের বিরুদ্ধাচরণের উজানে, "প্র বর্ণম্ অতিরচ্ চুক্রম্";আর এইরূপ ক'রে তিনি দস্যুদের নিধন করেন এবং আর্য "বর্ণ" রক্ষা বা পোষণ করেন এবং তা বৃদ্ধি করেন, "হত্বী দস্যূন্ প্র আর্যং বর্ণম্ আবৎ"। উপরন্তু এই দস্যুরা হ'ল কুটিল জন "বৃজিনান্" এবং তারা পরাভূত হয় ইন্দ্রের সব কর্মের বা জ্ঞানের রূপের দ্বারা, তাঁর "মায়া"র দ্বারা যে সবের দ্বারা, যেমন অন্যত্র বলা হ'য়েছে তিনি পরাস্ত করেন দস্যুদের, বৃত্র বা বলের বিরুদ্ধ "মায়া"-সমূহকে। বেদে ঋজু ও কুটিল সর্বদাই সত্য ও মিথ্যার সমার্থক। সুতরাং ইহা স্পষ্ট যে এই সব পণিদস্যু হ'ল মিথ্যা ও অজ্ঞানতার সব কুটিল শক্তি যা তাদের মিথ্যা জ্ঞান, মিথ্যা শক্তি, সংকল্প ও কর্ম প্রয়োগ করে দেবগণ ও আর্যদের সত্যজ্ঞান, সত্যশক্তি সংকল্প ও কর্মসমূহের বিরুদ্ধে। জ্যোতির জয়ের অর্থ হ'ল এই মিথ্যা বা দৈত্যসুলভ জ্ঞানের অন্ধকারের বিরুদ্ধে সত্যের দিব্যজ্ঞানের জয়; ঐ জয় হ'ল সূর্যের উত্তরণ, দিবসসমূহের জন্ম, উষার উদয়, দীপ্তিমান্ রশ্মিসমূহের যূথগুলির মুক্তি এবং তাদের আরোহণ জ্যোতির লোকে।

গোরাজি যে সত্যের মননসমূহ তা যথেষ্ট পরিষ্কারভাবে বলা হ'য়েছে সোমের উদ্দেশে ৯-১১১ সূক্তে। "এই উজ্জ্বল আলোকের দ্বারা তিনি নিজেকে পবিত্র ক'রে সকল বিরোধী শক্তি পার হ'য়ে যান তাঁর স্বয়ং-যুক্ত অশ্বগুলির দ্বারা, যেন সূর্যের স্বয়ং-যুক্ত অশ্বগুলির দ্বারা। যখন তিনি ঋক্‌বক্তাদের সহিত, ঋকের সপ্তাস্য বক্তাদের (আঙ্গিরস শক্তিদের) সহিত (বিস্ময়-সমূহের) সকল রূপ ব্যেপে থাকেন তখন তিনি, পিষ্ট সোমনিঃসৃত স্রোত-ধারা, নিজেকে পবিত্র ক'রে দীপ্ত হন, তিনি জ্যোতির্ময় ও ভাস্বর জন। হে সোম, তুমি পণিদের সেই সম্পদ খুঁজে পাও, মাতৃগণের (পণিদের গোরাজি যাদের ঐভাবে অন্যান্য সব সূক্তে প্রায়ই অভিহিত করা হ'য়েছে) দ্বারা তুমি নিজেকে উজ্জ্বল কর তোমার নিজের ধামে (স্বর্), সত্যের মননসমূহের দ্বারা তোমার ধামে, "সং মাতৃভিঃ মর্জয়সি স্ব আ দমে ঋতস্য ধীতিভির্ দমে"। যেন পরতর লোকের ("পরাবতঃ") সাম (সমান সার্থকতা, "সমানে ঊর্বে", সমান ব্যাপ্তিতে) হ'ল ঐ (স্বর্) যেখানে (সত্যের) মননসমূহ তাদের আনন্দ পায়। ত্রিবিধ লোকের (অথবা ত্রিবিধ মৌলিক প্রকৃতির) ঐসব ভাস্বর জনের দ্বারা তিনি ধারণ করেন (জ্ঞানের) প্রশস্ত অভিব্যক্তি, দীপ্ত হ'য়ে তিনি ধারণ করেন প্রশস্ত অভিব্যক্তি।" আমরা দেখি যে পণিদের এই সব গো যাদের দ্বারা সোম বিশদ ও উজ্জ্বল হন নিজের ধামে, অগ্নির ও অন্যান্য দেবগণের ধামে যাকে আমরা জানি স্বর্-এর বৃহৎ সত্য ব'লে "ঋতং বৃহৎ", এই সব ভাস্বর গো যাদের মধ্যে আছে পরম লোকের ত্রিবিধ প্রকৃতি "ত্রিধাতুভির্ অরুষীভিঃ" এবং যাদের দ্বারা সোম ঐ সত্যের[১] জন্ম বা প্রশস্ত অভিব্যক্তি ধারণ করেন---সেসব গো হ'ল সত্য-উপলব্ধকারী মননসমূহ। তিনটি দীপ্তিমান্ লোকসমেত এই যে স্বর্ যার ব্যাপ্তির মধ্যে "ত্রিধাতুর" সমান সার্থকতা আছে ("ত্রি-ধাতু" কথাটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় সেই পরম ত্রিতত্ত্বের অর্থে যা ত্রয়াত্মক সর্বোত্তম লোক গঠন করে, "তিস্রঃ পরাবতঃ") তাকে অন্যত্র বর্ণনা করা হ'য়েছে ব্যাপ্ত ও অভয় গোচারণভূমি বলে যার মধ্যে গোরাজি স্বচ্ছন্দে

১ "বয়ঃ" তু ৬-২১-২, ৩ যেখানে বলা হ'য়েছে যে, যে ইন্দ্র জ্ঞানবান্, এবং যিনি আমাদের সব বাণীকে ঊর্ধ্বে ধারণ করেন এবং বাণীগুলির দ্বারা যজ্ঞে বৃদ্ধি পান, "ইন্দ্রং যো বিদানো গীর্বাহসং গীর্ভির্য যজ্ঞবৃদ্ধম্", যে অন্ধকার নিজেকে বিস্তৃত করেছে এবং যার মধ্যে কোন জ্ঞান ছিল না তাকে তিনি সূর্যের দ্বারা রূপায়িত করেন তাতে যার আছে জ্ঞানের অভিব্যক্তি, "স ইৎ তমো অবয়ুনং ততন্বৎ সূর্যেণ বয়ুনবচ্ চকার"।

বিচরণ করে এবং তাদের আনন্দ পায় ("রণন্তি") এবং এখানেও ইহা সেই প্রদেশ যেখানে সত্যের মননসমূহ তাদের আনন্দ লাভ করে, "যত্র রণন্তি ধীতয়ঃ"। এবং পরের শ্লোকে বলা হ'য়েছে যে সোমের দিব্য রথ জ্ঞান, পরম দিক পেয়ে অনুসরণ করে ও সম্মুখের দিকে যত্নশীল হয় দৃষ্টি পেয়ে, রশ্মিসমূহের দ্বারা, "পূর্বাম্ অনু প্রদিশং যাতি চেকিতৎ, সং রশ্মি-ভির্ যততে দর্শতো রথো দৈব্যো দর্শতো রথঃ"। স্পষ্টতঃই এই পরম দিক হ'ল দিব্য বা বৃহৎ সত্যের দিক; এই সব রশ্মি স্পষ্টতঃই সত্যের উষার বা সূর্যের রশ্মিসমূহ; ইহারা পণিদের দ্বারা লুক্কায়িত গোরাজি, প্রদীপ্ত মননসমূহ, উজ্জ্বল রঙের "ধিয়ঃ", "ঋতস্য ধীতয়ঃ"।

বেদে যেখানেই পণিদের, গোরাজির আঙ্গিরসদের চিত্র আছে সকল আন্তর সাক্ষ্য সেই সকল ক্ষেত্রেই একই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করে। পণিরা হ'ল সত্যের মননসমূহের অবরোধকারী, জ্ঞানহীন অন্ধকারের অধিবাসী ("তমো অবয়ুনম্") আর এই অন্ধকারকে ইন্দ্র ও আঙ্গিরসগণ দূর করেন বাক্-এর দ্বারা, সূর্যের দ্বারা এবং তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন জ্যোতি যাতে সেখানে ব্যক্ত হ'তে পারে সত্যের ব্যাপ্তি। ইন্দ্র যে পণিদের সহিত যুদ্ধ করেন তা জড়ীয় অস্ত্র দিয়ে নয়, তিনি যুদ্ধ করেন বচনসমূহের দ্বারা, (৬-৩৯-২), "পণীবঁচোভির্ অভি যোধদ্ ইন্দ্রঃ"। যে সূক্তটিতে এই কথাটি আছে সেটি বিনা টীকাতেই অনুবাদ করলে তা থেকেই এই প্রতীক্-তন্ত্রের প্রকৃতি যে কি তা নিঃসন্দেহভাবে জানা যাবে। "হে দেব, এই দিব্য ও উল্লাসভরা দ্রষ্টার (সোমের), যজ্ঞবাহকের, দীপ্তধীসম্পন্ন মধুমান্ বক্তার সেই প্রবেগগুলি আমাদের সহিত যুক্ত কর, বাণীর বক্তার সহিত যুক্ত কর, যেগুলি চালিত হয় জ্যোতির গোরাজির দ্বারা ("ইষো গোঅগ্রাঃ")। অদ্রির চারিদিকে ভাস্বর বিষয়গুলি (গোরাজি, "উস্রাঃ") তিনিই কামনা করে-ছিলেন সত্যযুক্ত হ'য়ে, তাঁর রথকে সত্যের মননসমূহের সহিত যুক্ত করে, "ঋতধীতিভির্ ঋতযুগ্ যুজানঃ"; (তারপর) ইন্দ্র বিদীর্ণ করলেন বলের অক্ষত পর্বত-সানু, বচনসমূহের দ্বারা তিনি পণিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। তিনিই (সোম) চন্দ্রশক্তি (ইন্দু) রূপে অহোরাত্র ও সকল বৎসর ধরে আলোকহীন রাত্রিগুলিকে প্রদীপ্ত করলেন এবং তারা দিবসগুলির দৃষ্টি ধারণ করল; জন্মে শুদ্ধ এমন সব উষা তিনি সৃষ্টি করলেন। তিনিই দীপ্তিমান্ হ'য়ে আলোকহীন বিষয়গুলিকে আলোকে পূর্ণ করলেন; তিনি বহু (উষাকে) দীপ্ত করলেন সত্যের দ্বারা, সত্যের দ্বারা যুক্ত সব অশ্ব

নিয়ে, যে চক্র স্বর্ পায় তা নিয়ে তিনি গেলেন কর্মসাধককে (সম্পদের দ্বারা) তৃপ্ত ক'রে (৬-৩৯-১, ২, ৩, ৪)। মনন, সত্য, বাণী—এই সবের কথাই সর্বদাই উল্লেখ করা হয় পণিদের গোরাজির প্রসঙ্গে; যে ইন্দ্র দিব্য মনঃশক্তি তার বচনের দ্বারাই গো-অবরোধকারীরা পরাভূত হয়; যা অন্ধকার ছিল তা আলোক হ'ল; সত্যের দ্বারা যুক্ত অশ্বগুলির দ্বারা চালিত রথ (জ্ঞানের দ্বারা, "স্ববিদা নাভিনা") সত্তার ও চেতনার ও আনন্দের সেই সব দীপ্তিমান্ বৃহত্ত্ব পায় যা এখন আমাদের দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন। "ব্রহ্মের দ্বারা ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করেন, অন্ধকারকে প্রচ্ছন্ন করেন ও স্বর্-কে দৃষ্টিগোচর করেন" (২-২৪-৩), "উদ্ গা আজদ্ অভিনদ্ ব্রহ্মণা বলম্ অগূহৎ তমো ব্যচক্ষয়ৎ স্বঃ"।

সমগ্র ঋগ্বেদ হ'ল জ্যোতির শক্তিসমূহের এবং সত্যের শক্তি ও দৃষ্টির দ্বারা অনৃতের আক্রমণ থেকে মুক্ত ইহার উৎস ও আসনের মধ্যে ইহার অধিকার লাভে তাদের উত্তরণের জয়-গীতি। "সত্যের দ্বারা গোরাজি (দীপ্ত মননসমূহ) সত্যের মধ্যে প্রবেশ করে; সত্যের দিকে যত্নশীল হ'য়ে সত্যকে সে জয় করে; সত্যের প্রচণ্ড শক্তি অন্বেষণ করে জ্যোতির গোরাজি এবং অগ্রসর হয় (শত্রুকে) ভেদ করে; সত্যের জন্য দুই বিস্তৃত জন (স্বর্গ ও পৃথিবী) বহুল ও গভীর হয়, সত্যের জন্য দুই পরমা মাতা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য দান করে", "ঋতেন গাব ঋতম্ আ বিবেশুঃ; ঋতম্ যেমান ঋতম্ ইদ্ বনোতি, ঋতস্য শুষ্মস্ তুরয়া উ গব্যুঃ; ঋতায় পৃথ্বী বহুলে গভীরে, ঋতায় ধেনূ পরমে দুহাতে" (৪-২৩-৯, ১০)।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দস্যুদের উপর বিজয়

দস্যুরা হ'ল আর্য দেবতাদের ও আর্য ঋষিদের—উভয়েরই বিরোধী। দেবতাদের জন্ম হয় বিষয়সমূহের পরম সত্যের মধ্যে অদিতি থেকে আর দস্যুদের বা দানবদের জন্ম অধঃস্থ অন্ধকারের মধ্যে দিতি থেকে; তারা জ্যোতির অধিপতি ও রাত্রির অধিপতি এবং পরস্পরের সম্মুখীন হ'য়ে অবস্থান করে পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ, দেহ, মন ও সংযোগকারী প্রাণ-বায়ুর উপর দিয়ে। ১০-১০৮ সূক্তে, সরমা অবতরণ করেন পরম রাজ্য থেকে, "পরাকাৎ"; তাঁকে "রসা"র জলরাশি উত্তীর্ণ হ'তে হয়, তিনি রাত্রির দেখা পান আর তিনি রাত্রিকে পার হ'য়ে যাবেন এই ভয়ে রাত্রি তাঁর বশীভূত হয়, "অতিষ্কদো ভিয়সা"; তিনি উপনীত হন দস্যুদের আবাসে, "দস্যোর্ ওকো ন সদনম্", যাকে তারা নিজেরাই বর্ণনা করে "রেকু পদম্ অলকম্", বিষয়সমূহের সীমা ছাড়িয়ে মিথ্যার লোক। পরম লোকও বিষয়সমূহের সীমা ছাড়িয়ে যায় তবে তার অতিরিক্ত হ'য়ে বা উর্ধ্বে গিয়ে; ইহা "রেকু পদম্" কিন্তু "সত্যম্", ইহা "অলকম্" নয়, ইহা সত্যের লোক, মিথ্যার লোক নয়। শেষেরটি হ'ল জ্ঞানহীন অন্ধকার, "তমো এবয়ুনং ততন্বৎ"; যখন ইন্দ্রের বৃহত্ত্ব দ্যৌ, পৃথ্বী ও অন্তরিক্ষ অতিক্রম করে ("রিরিচে") তখন তিনি আর্যদের জন্য সৃষ্টি করেন জ্ঞান ও সত্যের বিপরীতলোক, "বয়ুনবৎ" যা এই তিনটি রাজ্য অতিক্রম করে এবং সেজন্য "রেকু পদম্"। এই অন্ধকার, বিষয়সমূহের রূপায়িত অস্তিত্বের মধ্যে রাত্রি ও নিশ্চেতনের নিম্নলোক, যাকে পৃথিবীর জঠর থেকে স্বর্গের পৃষ্ঠ পর্যন্ত উত্থিত পর্বতের চিত্রে অঙ্কিত করা হ'য়েছে তাকে বর্ণনা করা হ'য়েছে পর্বতের পাদদেশে গোপন গুহা, অন্ধকারের গুহা রূপে।

কিন্তু গুহা পণিদের শুধু আবাস, তাদের কর্মক্ষেত্র হ'ল পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরিক্ষ। তারা নিশ্চেতনার পুত্র কিন্তু তাদের কর্মে তারা নিজেরা ঠিক নিশ্চেতন নয়; আপাতজ্ঞানের বিভিন্নরূপ "মায়াঃ" তাদের আছে কিন্তু ইহারা অজ্ঞানতার সব রূপ, তাদের সত্য প্রচ্ছন্ন আছে নিশ্চেতনের অন্ধকারের মধ্যে এবং তাদের উপরিভাগ বা সম্মুখভাগ হ'ল মিথ্যা,

ইহা সত্য নয়। কারণ জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি তা এসেছে অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অন্ধকার থেকে, সেই গভীর ও অতল বন্যা থেকে যা সকল বিষয়কে আবৃত করে রেখেছিল, নিশ্চেতন মহাসাগর থেকে, "অপ্রকেতং সলিলম্" (১০-১২৯-৩); সেই অনস্তিত্বের মাঝে ঋষিরা হৃদয়স্থ কামনার এবং মনের মননের দ্বারা সেই বিষয় দেখতে পেলেন যা সত্য অস্তিত্ব নির্মাণ করে। বিষয়সমূহের সত্যের এই অনস্তিত্ব, "অসৎ" হ'ল তাদের প্রথম আকার যা নিশ্চেতন মহাসমুদ্র থেকে বহির্গত হয় আর ইহার মহান্ অন্ধকারই বৈদিক রাত্রি, "রাত্রিং জগতো নিবেশনীম্ (১-৩৫-১) যার অন্ধকারময় বক্ষের মধ্যে আছে জগৎ এবং ইহার সকল অপ্রকাশিত যোগ্যতাসমূহ। আমাদের এই ত্রিবিধ জগতের উপর রাত্রির রাজ্য বিস্তৃত এবং তার মধ্য থেকে স্বর্গে, মানসিক সত্তায় জন্ম নেয় উষা; অন্ধকারের মধ্যে যে সূর্য প্রচ্ছন্ন ও তমসাবৃত হ'য়ে অবস্থান করছিল তাকে উষা মুক্ত করে অন্ধকার থেকে এবং অসতের মাঝে, রাত্রির মধ্যে সৃষ্টি করে পরম দিবসের দৃষ্টি, "অসতি প্র কেতুঃ" (১-১২৪-১১)। সুতরাং এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে জ্যোতির অধিপতিদের ও অবিদ্যার অধিপতিদের সংগ্রাম চলে তার নিরন্তর সব পরিবর্তনের মধ্যে।

"পণি" কথাটির অর্থ ব্যবসায়ী, বণিক্, ইহার উৎপত্তি 'পণ্' থেকে (আবার "পন্"[১] থেকেও, তুঃ তামিল "পন্", গ্রীসীয় 'ponos' পরিশ্রম) আর আমরা হয়ত মনে করতে পারি যে পণিরা হ'ল সেই সব শক্তি যা জীবনের সেই সব সাধারণ অনালোকিত ইন্দ্রিয়-ক্রিয়াসমূহের উপর কর্তৃত্ব করে যাদের অব্যবহিত মূল রয়েছে অন্ধকারময় অবচেতন শারীরিক সত্তার মধ্যে, দিব্য মনে নয়। মানবের সমগ্র সংগ্রাম হ'ল ইহাকে সরিয়ে ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা মন ও প্রাণের দীপ্ত কর্মপ্রণালী যা উপর থেকে আসে মানসিক অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে। যে এইভাবে আস্পৃহা করে, পরিশ্রম করে, যুদ্ধ করে, যাত্রা করে, সত্তার পর্বত আরোহণ করে সেই আর্য ("আর্য", "অর্য", "অরি" যার বিভিন্ন অর্থ হ'ল পরিশ্রম করা, যুদ্ধ করা, আরোহণ করা বা উর্ধ্বে ওঠা, ভ্রমণ করা, যজ্ঞ প্রস্তুত করা); কারণ আর্যর কাজ

১ বেদে "পন্"-এর অর্থ সায়ণ করেন---প্রশংসা করা কিন্তু এক জায়গায় তিনি স্বীকার করেন যে ইহার অর্থ "ব্যবহার"। আমার মনে হয় যে অধিকাংশ স্থলেই ইহার অর্থ কর্ম। কর্ম অর্থে "পণ্" থেকে, আমরা পাই কর্মেন্দ্রিয়সমূহের পূর্বেকার নামগুলি, "পাণি", হাত, পা বা খুর, লাতিন " penis ", তুঃ পায়ু।

হ'ল যজ্ঞ যা একই সাথে সংগ্রাম, ও উত্তরণ ও যাত্রা, অন্ধকারের শক্তি-সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, পৃথিবী ও স্বর্গ ছাড়িয়ে পর্বতের উচ্চতম শিখর-সমূহে স্বর্-এর মধ্যে উত্তরণ, নদীসমূহের ও মহাসাগরের অপর পারে বিষয়সমূহের দূরতম আনন্ত্যের মধ্যে যাত্রা। কর্মের প্রতি সংকল্প আর্যর আছে, সে কর্মের সাধক ("কারু", "কিরি" ইত্যাদি, যে দেবতারা তার কর্মে তাদের শক্তি প্রয়োগ করেন তাঁরা "সুক্রতু", যজ্ঞের জন্য শক্তিতে সুষ্ঠু; দস্যু বা পণি এই উভয়েরই বিপরীত, সে "অক্রতু"। আর্য যজ্ঞ-সাধক, "যজমান", "যজ্যু"; যে দেবতারা তার যজ্ঞ গ্রহণ করেন, উর্ধ্বে ধারণ করেন, তার প্রেরণা দেন তিনি "যজতা", "যজত্র", যজ্ঞের বিভিন্ন শক্তি; দস্যু ইহাদের উভয়েরই বিপরীত, সে "অযজ্যু"। যজ্ঞের মধ্যে আর্য পান দিব্য বাণী, "গীঃ", "মন্ত্র", "ব্রহ্ম", "উক্থ", তিনি "ব্রহ্মা" বা বাণীর গায়ক; দেবতারা বাণীতে আনন্দ পান ও তা উর্ধ্বে ধারণ করেন, "গীর্বাহসঃ" "গির্বণসঃ", দস্যুরা বাক্-এর নিন্দক ও নাশক, "ব্রহ্মদ্বিষঃ", তারা বচন নষ্ট করে, "মৃধ্রবচসঃ"। দিব্যশ্বাসের কোন শক্তি তাদের নাই, দিব্য বাণী বলার কোন মুখও নাই, তারা "অনাসঃ"; বাণী ও ইহার অন্তঃস্থ সত্য চিন্তা করার ও মানসিকভাবাপন্ন করার কোন শক্তি তাদের নেই, তারা "অমন্যমানাঃ": কিন্তু আর্যরা বাণীর চিন্তক, "মন্যমানাঃ", মনন, মনন-মানস ও দ্রষ্টৃ-জ্ঞানের ধারক, "ধীর", "মনীষী", "কবি"; দেবগণও দিব্যমননের পরম চিন্তক, "প্রথমো মনোতা ধিয়ঃ," "কবয়ঃ"। আর্যরা দেবতাদের অভিলাষী, "দেবয়ুঃ" "উশিজঃ"; তাঁরা নিজেদের মধ্যে নিজেদের আপন সত্তা ও দেবতাদের বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন বাণীর দ্বারা, মননের দ্বারা; দস্যুরা দেবনিন্দক, "দেবদ্বিষঃ", দেবত্বের বাধাদায়ক, "দেবনিদঃ", তারা কোন বৃদ্ধি কামনা করে না, "অবৃধঃ"। দেবতারা আর্যদের সম্পদ দেন প্রচুরভাবে, আর্যরা তাদের সম্পদ দেন দেবগণকে; দস্যু তার সম্পদ আর্যর কাছ থেকে নিরুদ্ধ করে রাখে যতক্ষণ না ইহা তার কাছ থেকে জোর করে লওয়া হয়, যে অমৃতময় সোমমদিরার উল্লাস দেবতারা মানবের মাঝে কামনা করেন তা সে দেবতাদের জন্য নিষ্কাশন করে না; যদিও সে "রেবান্, যদিও তার গুহা গো, অশ্ব ও ধনরাজিতে পরিপূর্ণ, "গোভির্ অশ্বেভির্", "বসুভির্ ন্যৃষ্টঃ" (১০-১০৮-৭), তবু সে "অরাধস্" কারণ তার সম্পদ মানবকে বা নিজেকে কোন সমৃদ্ধি বা আনন্দ দেয় না,—পণি হ'ল অস্তিত্বের কৃপণ। এবং আর্য ও দস্যুর মধ্যে সংগ্রামে

তার নিরন্তর প্রয়াস হ'ল লুণ্ঠন ও ধ্বংস করা, আর্যদের ভাস্বর গোরাজি হরণ করা এবং তাদের আবার লুকিয়ে রাখা গুহার অন্ধকারের মধ্যে। "খাদককে, পণিকে হনন কর; কারণ সে বৃক (বিদীর্ণকারী, "বৃকঃ")" (৬-৫১-১৪)।

ইহা স্পষ্ট যে এই সব বর্ণনা সহজেই সেই সব মানুষী শত্রুদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় যারা আর্যর ধর্মমত ও দেবতাদের প্রতি দ্বেষপরায়ণ, কিন্তু আমরা দেখব যে এইরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অসম্ভব কারণ যে ১-৩৩ সূক্তে এই সব পার্থক্যের কথা স্পষ্টভাবে বলা হ'য়েছে, এবং দস্যুদের সহিত ইন্দ্র ও তাঁর মানবমিত্রদের যুদ্ধের কথা অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে, তাতে এই সব দস্যু, পণি বা বৃত্র কোনমতেই মানুষ যোদ্ধা, উপজাতি বা তস্কর হওয়া সম্ভব নয়। হিরণ্যস্তুপ আঙ্গিরসের এই সূক্তের প্রথম দশটি শ্লোকে স্পষ্টতঃই গোরাজির জন্য সংগ্রামের কথা এবং সেজন্য পণিদের কথার উল্লেখ আছে। "এস, গোরাজির অন্বেষণে আমরা ইন্দ্রের কাছে যাই; কারণ তিনিই আমাদের মধ্যে মতি বর্ধন করেন; অজেয় তিনি, তাঁর সব সুখ সম্পূর্ণ, তিনি আমাদের জন্য মুক্ত করেন (অন্ধকার থেকে পৃথক করেন) ভাস্বর গোরাজির পরম জ্ঞান-দৃষ্টি, "গবাং কেতং পরম্ আবর্জতে নঃ"। পাখী যেমন উড়ে যায় তার প্রিয় নীড়ে, আমিও তেমন যাই অদম্য ধনদাতার কাছে, ইন্দ্রকে নমস্কার করি জ্যোতির সব পরম বাণী দিয়ে, তাঁকে যাঁর কাছে তাঁর স্তুতিকারকগণ তাদের যাত্রায় আবাহন করে। তিনি আসেন তাঁর সকল সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে এবং তাঁর সব তূণীর দৃঢ়ভাবে বেঁধেছেন; তিনি যোদ্ধা (আর্য) যিনি সকল গোকামীদের কাছেই গোরাজি নিয়ে আসেন। (আমাদের বাণীর দ্বারা) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হে ইন্দ্র তুমি তোমার জন্য তোমার প্রচুর আনন্দ ধ'রে রেখ না, আমাদের মধ্যে তুমি পণি হয়ো না, "চোক্ষূয়মাণঃ ভূরি বামং মা পণির্ ভূর্ অস্মদ্ অধি প্রবৃদ্ধ"। শেষের কথাগুলি মনোযোগের যোগ্য এবং প্রচলিত ব্যাখ্যায় ইহার যে অর্থ করা হয় "আমাদের প্রতি কৃপণ হ'য়ো না" তাতে ইহার প্রকৃত গুরুত্ব থাকে না। কিন্তু পণিরা যে সম্পদ আটক ক'রে নিজেদের জন্য তা রেখে দেয়, দেবতা বা মানব কাহাকেও তা দেয় না—সে কথাটি ঐ ব্যাখ্যায় অগ্রাহ্য করা হয়। স্পষ্টতঃই কথাগুলির অর্থ এই, "তোমার আনন্দের প্রচুর সম্পদ পেয়ে, তুমি সেই পণি হ'য়ো না যে তার সব সম্পত্তি শুধু তার নিজের জন্য রাখে এবং মানবের কাছ থেকে

আটক রাখে; পণিরা যেমন তাদের অবচেতন গোপন ভাণ্ডারের মধ্যে রেখে দেয়, তুমি তেমন তোমার অতিচেতন গুহ্যতার মধ্যে আমাদের কাছ থেকে আনন্দ আটক রেখ না।"

তারপর সূক্তটিতে পৃথিবী ও স্বর্গ অধিকারের জন্য দস্যু পণির সহিত ইন্দ্রের সংগ্রামের কথা বলা হ'য়েছে। "হে ইন্দ্র, ধনী দস্যুকে তুমি তোমার অস্ত্র দিয়ে নিধন কর, তোমার অধীন তোমার সকল শক্তি দিয়ে একাকী বিচরণ ক'রে; তোমার ধনুর উপরিস্থ তারা (শররূপী শক্তিসমূহ) সকল দিকে বিচিত্রভাবে ছুটে চলল এবং যারা সম্পত্তি রেখে দেয় ও যজ্ঞ করে না তারা মৃত্যুর কবলে পড়ল। তাদের মস্তক তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল,—তারা যারা যজ্ঞ করে না অথচ যজ্ঞকারীদের সহিত যুদ্ধ করে, যখন, হে ভাস্বর অশ্বসমূহের অধিপতি, হে স্বর্গের মধ্যে বলবান্ অবস্থানকারী, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবী থেকে নিক্ষিপ্ত করেছিলে তাদের যারা তোমার কর্মপ্রণালীর বিধান মানে না ("অব্রতান্")। তার যুদ্ধ করেছিল অনবদ্যের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে; নবগ্বরা তাকে প্রবৃত্ত করাল তাঁর যাত্রায়; বৃষের সহিত যুদ্ধকারী বলদদের মতো তারা নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল, তারা জানতে পারল ইন্দ্রের কি কাজ, এবং তাঁর কাছ থেকে তারা পালিয়ে গেল নিম্নভূমি বেয়ে। হে ইন্দ্র, যারা হেসেছিল ও কেঁদেছিল অন্তরিক্ষের অপর পারে ("রজসঃ পারে" অর্থাৎ স্বর্গের সীমানায়) তাদের সহিত তুমি যুদ্ধ ক'রেছিলে; উচ্চতা থেকে স্বর্গের মধ্য থেকে তুমি দস্যুকে দগ্ধ করেছিলে, যে তোমার স্তুতি গায় এবং তোমায় সোম দেয় তার প্রকাশকে তুমি পোষণ করেছিলে। পৃথিবীর চারিদিকে চক্রাকারে, তারা দীপ্ত হ'য়েছিল হিরন্ময় মণির (সূর্যের এক চিত্র) আলোকে; তাদের দ্রুত ধাবন সত্ত্বেও তারা ইন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারল না কারণ তিনি সূর্যের দ্বারা চারিদিকে চর নিযুক্ত করেছিলেন। যখন তুমি তোমার বৃহত্ত্ব দিয়ে পৃথিবী ও স্বর্গকে চতুর্দিকে অধিকার করেছিলে; হে ইন্দ্র, বাণীবক্তাদের দ্বারা ("ব্রহ্মভিঃ") তুমি দস্যুকে নিক্ষিপ্ত করেছিলে, যারা চিন্তা করে তাদের দ্বারা যারা (সত্য) চিন্তা করে না তাদের আক্রমণ ক'রে "অমন্যমানান্ অভি মন্যমানৈঃ"। তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রান্তে উপনীত হ'ল না; বৃষভ ইন্দ্র, বজ্রকে তাঁর সহায়ক করেছিলেন, জ্যোতির দ্বারা তিনি অন্ধকারের মধ্য থেকে ভাস্বর গোরাজি দোহন করলেন।"

এই যে যুদ্ধ তা পৃথিবীতে হয় না, তা হয় অন্তরিক্ষের অপর পারে, স্বর্গ থেকে দস্যুদের বিতাড়িত করা হয় বজ্রের শিখার দ্বারা, তারা পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এবং স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয় থেকেই নিক্ষিপ্ত হয়; কি স্বর্গে কি পৃথিবীতে কোথাও তাদের স্থান হয় না কারণ এ সবই এখন ইন্দ্রর মহত্ত্বের দ্বারা পূর্ণ; আবার তারা তাঁর বিদ্যুতের কাছ থেকেও নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পারে না কারণ সূর্য তার সব রশ্মি নিয়ে তাঁকে যেসব চর দেন তাদের তিনি সকল দিকে নিযুক্ত করেন আর ঐসব রশ্মির ঔজ্জ্বল্যে পণিদের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহা আর্য ও দ্রাবিড়দেশীয় জাতিদের মধ্যে কোন পার্থিব সংগ্রামের বর্ণনা হ'তে পারে না; বিদ্যুৎও কোন ভৌতিক বিদ্যুৎ হ'তে পারে না কারণ রাত্রির শক্তিসমূহের ধ্বংসের সহিত অথবা অন্ধকারের মধ্য থেকে উষার গোরাজির দোহনের সহিত তার কোন সম্পর্ক নেই। তাহ'লে ইহা স্পষ্ট যে এই সব অযজ্ঞকারী, যারা বাণীকে ঘৃণা করে এবং এমনকি তা চিন্তা করতেও অক্ষম তারা আর্য ধর্মমতের মানুষ শত্রু নয়। তারা সেই সব শক্তি যারা মানবের মাঝেই স্বর্গ ও পৃথিবীর অধিকারের জন্য চেষ্টা করে; তারা দৈত্য, তারা দ্রাবিড়বাসী নয়।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে তারা চেষ্টা করে কিন্তু "পৃথিবী ও স্বর্গের প্রান্তে" উপনীত হ'তে পারে না; আমাদের ধারণায় এই সব শক্তি মন্ত্র বা যজ্ঞ বিনাই পৃথিবী ও স্বর্গের উজানে সেই পরতর লোকে যেতে চায় যা জয় করা যায় শুধু মন্ত্র ও যজ্ঞের দ্বারা। তারা চায় সত্যকে অধিকার করতে তাকে অবিদ্যার বিধানের অধীনে এনে; কিন্তু তারা পৃথিবী বা স্বর্গের প্রান্তে উপনীত হ'তে অক্ষম হয়; শুধু ইন্দ্র ও দেবতাদেরই শক্তি আছে ঐভাবে মন, প্রাণ ও দেহের নিয়ম ছাড়িয়ে যেতে এই সব তিনটিকে তাদের মহত্ত্বের দ্বারা পূর্ণ করার পর! মনে হয় সরমা (১০-১০৮-৬) পণিদের এই দুরাশার কথারই আভাস দেন। "তোমাদের বচনগুলি যেন লাভে ব্যর্থ হয়, তোমাদের শরীর যেন অশুভ ও অমঙ্গলজনক হয়; যাত্রার পথ তোমাদের পক্ষে অগম্য হ'ক; বৃহস্পতি যেন দুইলোকের (দিব্য ও মানুষী লোকের) সুখ তোমাদের না দেন।" বস্তুতঃ পণিরা উদ্ধতভাবে বলে যে তারা ইন্দ্রের সহিত মিত্রতা চায় কেবল যদি তিনি তাদের গুহায় থাকেন এবং গোরাজির রক্ষক হন, কিন্তু সরমা উত্তরে বলে যে ইন্দ্র সকলকে দমন করেন, তাঁকে কেউ দমন ও উৎপীড়ন করতে অক্ষম। তারা আবার সরমার সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে চায় যদি তিনি তাদের সহিত বাস করেন এবং যে

সুদূর লোক থেকে তিনি দেবতাদের সাহায্যে সকল বাধা অতিক্রম করে এসেছেন সেখানে আর ফিরে না যান, "প্রবাধিতা সহসা দৈব্যেন"। সরমা উত্তর দেন, "ভ্রাতৃত্ব ও ভগ্নীত্ব আমি কিছু জানি না—জানেন ইন্দ্র এবং দারুণ আঙ্গিরসগণ; গোকামী তাঁরা আমাকে রক্ষা করেছেন, তাই আমি এসেছি; হে পণির দল, এখান থেকে পালিয়ে অন্য আরো ভাল জায়গায় যাও। হে পণির দল, দূরে পালাও এখান থেকে আরো ভাল জায়গায়, যে গোরাজিকে তুমি আটক রেখেছ তারা সত্যের দ্বারা উর্ধ্বপানে চলুক—সেই সব লুকানো গো যাদের বৃহস্পতি পেয়েছেন এবং সোম এবং প্রেষণী প্রস্তরগুলি ও জ্ঞানোজ্জ্বল সকল ঋষিরা অধিকার করেছেন।"

পণিরা নিজেরা স্বেচ্ছায় তাদের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছে—এই ভাবনাও আমরা ৬-৫৩ সূক্তে পাই; এই সূক্তটি সূর্যের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তাতে সূর্যকে সম্বোধন করা হ'য়েছে বর্ধক পূষন্ ব'লে। "হে পূষন্ হে পথের অধিপতি, আমরা তোমাকে রথের মতো যুক্ত করি প্রাচুর্য জয়ের জন্য, 'ধী'র জন্য।...হে দীপ্তিমান্ পূষন্, দানের জন্য প্রেরণা দাও পণিকে, এমনকি তাকেও যে দেয় না; এমনকি পণিদেরও মন তুমি মৃদু কর। যেসব পথ প্রাচুর্য জয়ে নিয়ে যায় তাদের তুমি পৃথক করে দেখিয়ে দাও, আক্রমণকারীদের নিধন কর, আমাদের মননসমূহ যেন সুষ্ঠু করা হয়। হে ঋষি, পণির হৃদয়কে তুমি আঘাত কর তোমার অঙ্কুশ দিয়ে; এইভাবে তুমি তাকে আমাদের বশীভূত কর।...যে অঙ্কুশ তুমি বহন কর তা বাণীকে উত্থিত করতে বাধ্য করে, হে ভাস্বর ঋষি, সেই দিয়ে তুমি সকলের হৃদয়ের উপর তোমার রেখা লেখ, (এইভাবে তাদের তুমি আমাদের বশে আন)। তোমার রশ্মি তোমার যে অঙ্কুশের অগ্রভাগ সেই অঙ্কুশ পশুরদলকে সুষ্ঠু করে (মননদৃষ্টির, "পশুসাধণীম্", তুঃ ৪র্থ শ্লোকের সাধন্তাং ধিয়ঃ), তার আনন্দ আমরা কামনা করি। আমাদের জন্য সৃজন কর গোজয়ী, অশ্বজয়ী, ধনপ্রাচুর্যজয়ী ধী।"

পণিদের এই প্রতীক্ সম্বন্ধে যদি আমাদের ব্যাখ্যা সঠিক হয় তাহ'লে কথাটির সাধারণ অর্থ রেখেও এই ভাবনাগুলি যথেষ্ট বোধগম্য কিন্তু সায়ণ ইহার সাধারণ অর্থ না নিয়ে ইহার অর্থ করেন শুধু এক কৃপণ, লোভী মানুষ যাকে ক্ষুধার্ত কবি মৃদু ও দানশীল করার জন্য সূর্যদেবকে কাতরভাবে প্রার্থনা করছেন। বৈদিক ভাবনা ছিল যে অবচেতন অন্ধকার এবং অজ্ঞানতার সাধারণ জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল দিব্যজীবনের অন্তর্গত

সব কিছু এবং এই সব গোপন ধনরাজিকে উদ্ধার করা দরকার, তবে তার জন্য প্রথম আবশ্যক হ'ল অজ্ঞানতার দুর্দমনীয় শক্তিগুলিকে ধ্বংস করা এবং তারপর অবর জীবনকে পরতর জীবনের অধীনস্থ ক'রে তাকে অধিকার করা। আমরা দেখেছি যে ইন্দ্র সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে যে তিনি দস্যুকে হয় নিধন, নয় জয় করেন এবং সেই ধন দিয়ে দেন আর্যকে। সেইজন্যই সরমা পণিদের সহিত মিত্রতা করে শান্তিস্থাপনে অস্বীকৃত হন, কিন্তু তিনি তাদের উপদেশ দেন আবদ্ধ গোরাজির সমর্পণ ও উত্তরণের দ্বারা দেবগণেরও আর্যদের নিকট নতি স্বীকারতে এবং অন্ধকার থেকে আরো উত্তম স্থানে প্রস্থান করতে, "আ বরীয়ঃ" (১০-১০৮-৯, ১০)। জ্যোতির্ময় দ্রষ্টা, সত্যাধিপতি পূষার যে অঙ্কুশ বদ্ধ হৃদয় মুক্ত করে এবং পবিত্র বাণীকে উত্থিত করে তার গভীর তলদেশ থেকে, তার প্রচণ্ড শক্তির দ্বারাই, যে অঙ্কুশের অগ্রভাগ দীপ্ত এবং যা ভাস্বর গোরাজিকে সৃষ্টু করে এবং দীপ্ত মননসমূহ সাধন করে তার দ্বারাই পণির পরিবর্তন সাধিত হয়; তখন তার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়েরও মধ্যস্থ সত্য-দেব তা-ই কামনা করেন যা আর্য কামনা করেন। সুতরাং জ্যোতি ও সত্যের এই মর্মভেদী কর্মের দ্বারা সাধারণ অজ্ঞানময় ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার শক্তিগুলি আর্যর বশীভূত হয়।

কিন্তু সাধারণতঃ তারা তার শত্রু, বশ্যতা ও সেবা অর্থে "দাস" নয় ("দস্", কর্ম থেকে "দাস" ভৃত্য), কিন্তু ধ্বংস ও ক্ষতি অর্থে ("দাস", "দস্যু", শত্রু, লুণ্ঠনকারী, যা এসেছে বিভক্ত করার, আঘাত করার, ক্ষতি করার অর্থবাচক 'দস্' থেকে)। পণি দস্যু যে জ্যোতির গোরাজি, দ্রুততার অশ্বদল এবং দিব্য প্রাচুর্যের ধনরাজি ছিনিয়ে নেয়, সে নেকড়ে বাঘ, খাদক, "অত্রি", "বৃক"; সে বাধাদানকারী, "নিদ্" এবং বাণীর নাশক। সে শত্রু, তস্কর, মিথ্যা বা অশুভ চিন্তক যে তার দস্যুতা ও বাধার দ্বারা পথ দুর্গম করে; "আমাদের কাছ থেকে একান্ত দূরে নিক্ষেপ কর শত্রুকে, তস্করকে, সেই কুটিল ব্যক্তিকে যে মননকে মিথ্যাভাবে স্থাপন করে; হে অস্তিত্বের অধিপতি("সৎপতি"), আমাদের পথ সুগম কর। পণিকে নিধন কর কারণ সে খাদক বৃক" (৬-৫১-১৩, ১৪)। আক্রমণে তার উত্থান দেবগণের দ্বারা দমন করা চাই। "এই দেব (সোম) জন্ম নিয়ে এবং ইন্দ্রকে তাঁর সহায়ক পেয়ে পণিকে শক্তির দ্বারা নিরস্ত করেছিলেন" (৬-৪৪-২২), এবং জয় করেছিলেন স্বর্ ও সূর্য ও সকল ধন। পণিদের হয় বধ নয় পরাভূত করা চাই যাতে তাদের ধনসম্পদ তাদের কাছ থেকে

জোর করে নিয়ে নিযুক্ত করা যায় পরতর জীবনের জন্য। "তুমি যে পণিকে ছিন্ন করেছিলে তার অবিরত ব্যূহসমূহে, তোমারই এই সব প্রবল দান, হে সরস্বতি। হে সরস্বতি, দেবগণের বাধাদায়কদের চূর্ণ কর" (৬–৬১–১, ৩)। "হে অগ্নি ও সোম, তখন তোমাদের বীর্য জাগ্রত হ'য়েছিল যখন তুমি পণির কাছ থেকে গোরাজিকে জোর করে নিয়েছিলে এবং বহুর জন্য একমাত্র জ্যোতি পেয়েছিলে" (১-৯৩-৪)।

যখন উষাগমে দেবতারা যজ্ঞের জন্য জেগে ওঠেন তখন যজ্ঞের সকল উন্নতিতে বাধাদানের জন্য পণিরাও যেন কিছুতেই জেগে না ওঠে। "অয়ি উষা, প্রাচুর্যের রাণী, যারা আমাদের (দেবতাদের) পূর্ণ করে তাদের জাগ্রত কর, কিন্তু পণিরা যেন ঘুমিয়ে থাকে, না জেগে। হে প্রাচুর্যের রাণী, যারা প্রাচুর্যের অধিপতি তাদের জন্য তুমি শোভাময়ী হ'য়ে প্রকট হও, তোমার স্তবকারীর কাছে শোভাময়ী হয়ে প্রকট হও, হে উষা যে তুমি সত্য। নবীনা তিনি আমাদের সম্মুখে দীপ্ত হ'চ্ছেন, তিনি সৃজন করেছেন তাঁর অরুণবর্ণ গোরাজির বাহিনী; অসতের মাঝে দৃষ্টি ব্যাপ্ত হ'য়ে প্রকট হ'য়েছে" (১-১২৪-১০, ১১)। অথবা আবার ৪-৫১-১, ২, ৩ শ্লোক-গুলিতে বলা হ'য়েছে, "দেখ, আমাদের সম্মুখে ঐ জ্ঞানপূর্ণ পরম জ্যোতি উদিত হ'য়েছে অন্ধকারের মধ্য থেকে; চতুর্দিকে দীপ্তিময়ী দ্যুলোক-দুহিতাগণ, উষারা মানবের জন্য পথ সৃজন করেছেন। উষারা আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন যজ্ঞের মধ্যে স্তম্ভের মতো; পবিত্র ও পাবক হ'য়ে উদীয়মানা তাঁরা খোঁয়াড়ের, অন্ধকারের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। আজ প্রকট হ'য়ে উষারা ভোক্তাদের জ্ঞানে প্রবুদ্ধ করেছেন প্রচুর সুখদানের জন্য; ভিতরে যেখানে আলোর কোন খেলা নেই সেখানে পণিরা না জেগে ঘুমিয়ে থাকুক অন্ধকারের অভ্যন্তরে"। এই অধস্তন অন্ধকারের মধ্যে তাদের নীচে নিক্ষিপ্ত করতে হবে পরতর লোকসমূহ থেকে এবং সেসময় ঐ রাত্রির মধ্যে তাদের দ্বারা আবদ্ধ উষাদের তুলতে হবে পরতম লোকসমূহে। "যে পণিরা কুটিলতার গ্রন্থি তৈরী করে, যাদের কর্মে সংকল্প নেই, যারা বচনের নাশক, শ্রদ্ধাহীন, বৃদ্ধি পায় না, যারা যজ্ঞ করে না—তাদের অগ্নি বিতাড়িত করেছেন দূরে, আরো দূরে; পরম তিনি, যারা যজ্ঞ করবে না তাদের তিনি নিম্নতম করেছেন। এবং যারা (গাভীরা, উষারা) অধস্তন অন্ধকারের মধ্যে উৎফুল্ল ছিল তাদের তিনি তাঁর শক্তির দ্বারা উচ্চতম লোকে সঞ্চালিত করেছেন।...তিনি তাঁর আঘাতের দ্বারা সীমাকারক

প্রাচীরগুলি ভেঙে ফেলেছেন, তিনি উষাদের আর্যর অধিকারভুক্ত করেছেন, "অর্যপত্নীর্ উষসশ্ চকার"। যখন নদীরা ও উষারা বৃত্র বা বলের অধিকারে থাকে তখন তাদের বলা হয় "দাসপত্নীঃ"; দেবতাদের কর্মের দ্বারা তারা হ'য়ে ওঠে "অর্যপত্নীঃ", হ'য়ে ওঠে আর্যর সহায়ক।

অজ্ঞানতার অধিপতিদের হয় বধ করতে হবে, নয় সত্য ও ইহার অন্বেষুদের অধীন করতে হবে; কিন্তু তাদের সম্পদ মানবীয় পরিপূর্ণতার পক্ষে অপরিহার্য; ইহা যেন ইন্দ্রের অবস্থান করা "পণিদের সর্বাপেক্ষা সম্পদ্-পূর্ণ মস্তকের উপর", "পণীনাং বরিষ্ঠে মূর্ধন্ অস্থাৎ"; তিনি নিজেই হ'য়ে ওঠেন জ্যোতির গাভী এবং দ্রুততার অশ্ব এবং প্রচুরভাবে দান করেন সদা-বর্ধমান সহস্রবিধ সম্পদ। আমরা পূর্বেই জেনেছি যে পণিদের ঐ দীপ্তিমান্ সম্পদের পূর্ণতা এবং স্বর্গাভিমুখে ইহার উত্তরণই পথ ও অমৃতত্বের জন্ম। "অঙ্গিরা ঋষিরা (সত্যের) পরম প্রকাশ ধারণ করেছিলেন, ---তাঁরা যাঁরা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন কর্মের সুষ্ঠু সাধনের দ্বারা; পণি ও তার গো ও অশ্বসমূহের সমগ্র ভোগ তাঁরা লাভ করেছিলেন। অর্থবা প্রথম পথ গঠন করেছিলেন, তারপর সূর্য জন্ম নিলেন বিধানের রক্ষক ও আনন্দময় জনরূপে "ততঃ সূর্যো ব্রতপা বেন আজনি"। উশনা কাব্য গাভীদের ঊর্ধ্বে চালনা করলেন। তাঁদের সহিত আমরা যেন যজ্ঞের দ্বারা জয় করতে পারি অমৃতত্ব যা বিধানের অধিপতির সন্তানরূপে জন্ম নেয়", "যমস্য জাতম্ অমৃতম্ যজামহে" (১-৮৩-৪, ৫)। অঙ্গিরা ঋষি দ্রষ্টৃ-সংকল্পের প্রতীক্, অথর্বা হ'লেন পথের উপর যাত্রার ঋষি, উশনা কাব্য দ্রষ্টৃ-জ্ঞান থেকে জাত স্বর্গাভিমুখী কামনার ঋষি। আঙ্গিরসরা জয় করেন অবর জীবন ও ইহার কুটিলতার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সত্যের দীপ্তি ও শক্তি-সমূহের সম্পদ ;অথর্বা তাদের বীর্যে গঠন করেন পথ এবং তারপর জন্ম নেন জ্যোতির অধিপতি সূর্য দিব্য বিধান ও যম-শক্তির রক্ষকরূপে; উশনা আমাদের মননের যূথবদ্ধ দীপ্তিরাজিকে সত্যের পথ বেয়ে ঊর্ধ্বে চালিয়ে নিয়ে যান সেই আনন্দে যা সূর্য অধিকার করেন; এইভাবে সত্যের বিধান থেকে জন্ম নেয় অমৃতত্ব যার প্রতি আর্যের অন্তঃপুরুষ আস্পৃহা করে যজ্ঞের দ্বারা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

সিদ্ধান্তসমূহের সংক্ষেপ

ঋগ্বেদের আঙ্গিরস উপাখ্যানটি আমরা এখন সকল সম্ভবপর দিক থেকে ও ইহার সকল প্রধান প্রতীকগুলিতে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করেছি এবং তাথেকে যেসব সিদ্ধান্তে আমরা এসেছি সেসবকে দৃঢ়ভাবে সংক্ষিপ্ত করতে সক্ষম। যেমন আমি পূর্বেই বলেছি, আঙ্গিরস উপাখ্যান এবং বৃত্র কাহিনী—এই দুটিই বেদের প্রধান রূপক গল্প; তাদের কথা সর্বত্রই বারবার বলা হ'য়েছে; প্রতীকার্থক্ চিত্রাবলীর দুইটি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত সূত্র হিসাবে তারা সূক্তগুলির মধ্যে বর্তমান এবং তাদের চারিদিকেই বৈদিক প্রতীক্-তন্ত্রের বাকী সব কিছু রচিত হয়েছে। ইহারা যে তার কেন্দ্রীয় ভাবনা তা নয়, তবে এই প্রাচীন সৌধের দুই প্রধান স্তম্ভ। ইহাদের অর্থ নির্ধারিত করা হ'লেই সমগ্র ঋক্-সংহিতার অর্থ নির্ধারিত হয়। যদি বৃত্র ও জলরাশি মেঘ, ও বৃষ্টি ও পাঞ্জাবের সপ্তনদীর প্রবাহের প্রতীক্ হয়, আর যদি আঙ্গিরসরা ভৌতিক উষার আনয়নকারী হন, তাহলে বেদ সেই সব প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতীকতন্ত্র যেগুলিকে দেবতা ও ঋষি ও অনিষ্ট-কারী দস্যুর মূর্তিতে ব্যক্তিত্ব দেওয়া হ'য়েছে। যদি বৃত্র এবং বল দ্রাবিড় দেবতা হন এবং পণিরা ও বৃত্রেরা মানুষী শত্রু হয় তাহ'লে বেদ হ'ল প্রকৃতি-পূজারী অসভ্যদের দ্বারা দ্রাবিড় ভারতবর্ষ আক্রমণের একটি কবিত্ব-ময় ও উপাখ্যানমূলক বিবরণ। কিন্তু যদি অপরপক্ষে ইহা জ্যোতি ও অন্ধকারের, সত্য ও অনৃতের, বিদ্যা ও অবিদ্যার, মৃত্যু ও অমৃতত্বের আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের মধ্যে সংগ্রামের প্রতীক্-তন্ত্র হয় তাহ'লে তাহাই সমগ্র বেদের প্রকৃত অর্থ।

আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে আঙ্গিরস ঋষিরা উষার আনয়ন-কারী, অন্ধকারের মধ্য থেকে সূর্যের উদ্ধারকর্তা কিন্তু এই উষা, সূর্য, অন্ধকার আধ্যাত্মিকতাৎপর্যপূর্ণ চিত্র। বেদের কেন্দ্রীয় ভাবনা হ'ল অবিদ্যার অন্ধকারের মধ্য থেকে সত্যের জয়সাধন এবং সত্যের জয়ের দ্বারা অমৃ-তত্বেরও জয়সাধন। কারণ বৈদিক "ঋতম্" একটি আধ্যাত্মিক ও মন-স্তাত্ত্বিক ভাবনা। ইহা সেই সত্য সত্তা, সত্য চেতনা, অস্তিত্বের সত্য আনন্দ

যা অবস্থিত এই দেহের পৃথিবীর, প্রাণিক শক্তির অন্তরিক্ষের, মনের এই সাধারণ আকাশ বা স্বর্গের অতীতে। এইসব লোক আমাদের পার হ'য়ে যেতে হবে যদি আমরা উপনীত হ'তে চাই সেই অতিচেতন সত্যের পরতর লোকে যা দেবতাদের আপন ধাম ও অমৃতত্বের প্রতিষ্ঠা। ইহাই স্বর্লোক যেখানে যাবার জন্য আঙ্গিরসরা পথ আবিষ্কার করেছেন তাঁদের ভাবী পুরুষদের জন্য।

আঙ্গিরসগণ একই সাথে সেই সব দিব্য ঋষি যাঁরা দেবতাদের ও তাঁদের পার্থিব প্রতিনিধিদের বিশ্বজনীন ও মানুষী কর্মপ্রণালীতে সাহায্য করেন, সেই প্রাচীন পিতৃগণ যাঁরা প্রথম সেই প্রজ্ঞা লাভ করেছিলেন যার সম্বন্ধেই বৈদিক সূক্তগুলি গীতি ও স্মৃতি এবং যা বারবার অনুভূত করা হয়। সপ্ত দিব্য আঙ্গিরসগণ অগ্নির পুত্র বা শক্তি, কবিক্রতুর বিভিন্ন শক্তি, দিব্যজ্ঞানে অনুস্যূত দিব্যশক্তির সেই শিখা যা প্রজ্জ্বলিত করা হয় জয়ের জন্য। পার্থিব অস্তিত্বের জাত বিষয়সমূহের মধ্যে গূঢ় এই শিখাকে ভৃগুরা পেয়েছেন কিন্তু আঙ্গিরসরা তা প্রজ্জ্বলিত করেন যজ্ঞের বেদীতে এবং সেই যজ্ঞ সাধন করে চলেন যজ্ঞীয় বৎসরের বিভিন্ন কালের মধ্য দিয়ে আর এই যজ্ঞীয় বৎসর হল সেই দিব্য সাধনার বিভিন্ন কাল যার দ্বারা সত্যের সূর্য উদ্ধার করা হয় অন্ধকারের মধ্য থেকে। যাঁরা এই বৎসরের নয় মাস ধরে যজ্ঞ করেন তাঁরা নবগ্, নয়টি গোর বা নয়টি রশ্মির ঋষি যাঁরা সূর্যের গোযূথের জন্য অন্বেষণে এবং পণিদের সহিত সংগ্রামের জন্য ইন্দ্রের অভিযানে প্রবৃত্ত হন। যাঁরা দশমাস ধরে যজ্ঞ করেন তাঁরা দশগ্, দশরশ্মিযুক্ত ঋষি যাঁরা ইন্দ্রের সহিত পণিদের গুহায় প্রবেশ ক'রে হারানো পশুর দল উদ্ধার করেন।

যজ্ঞের অর্থ হ'ল মানব তার সত্তার মধ্যে যা ধারণ করে তা দান করা পরতর বা দিব্য প্রকৃতির নিকট এবং ইহার ফলস্বরূপ তার মনুষ্যত্ব আরো সমৃদ্ধ হয় দেবতাদের প্রচুর প্রসাদবর্ষণের দ্বারা। এইভাবে যে সম্পদ লাভ হয় তা-ই আধ্যাত্মিক ধন, উন্নতি, আনন্দের অবস্থা যা নিজেই যাত্রার জন্য এক শক্তি ও সংগ্রামের জন্য এক তেজ। কারণ যজ্ঞ হ'ল এক যাত্রা, এক অগ্রগতি; অগ্নির দ্বারা চালিত হ'য়ে যজ্ঞ নিজেই দিব্য পথ বেয়ে উর্ধ্বে চলে দেবতাদের কাছে এবং এই যাত্রার সামান্যরূপ হ'ল অঙ্গিরা পিতৃগণের দ্বারা দিব্য স্বর্লোকে উত্তরণ। তাদের এই যজ্ঞযাত্রা এক সংগ্রামও বটে কারণ ইহাতে বাধা দেয় পণিরা, বৃত্রেরা এবং অশুভ ও

অনৃতের অন্যান্য শক্তিসমূহ এবং এই সংগ্রামের এক প্রধান ঘটনা হ'ল পণিদের সাহিত ইন্দ্র ও অঙ্গিরা ঋষিদের সংঘর্ষ।

যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ হ'ল দিব্যশিখার প্রজ্জ্বলন, ঘৃত ও সোমমদিরার নিবেদন এবং পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ। স্তুতি এবং নিবেদনের দ্বারা দেবগণ বৃদ্ধি পান; বলা হয় যে তাঁরা মানবের মাঝে জাত, সৃষ্ট বা অভিব্যক্ত হন এবং এখানে তাদের বৃদ্ধি ও নিবেদনের দ্বারা তাঁরা পৃথিবী ও স্বর্গকেও বর্ধন করেন অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক অস্তিত্বকে বর্ধন করেন তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতায় এবং এই সবকে ছাড়িয়ে তাঁরা আবার সৃষ্টি করেন উচ্চতর জগৎ বা লোকসমূহ। এই উচ্চতর অস্তিত্বই দিব্য, অনন্ত অস্তিত্ব যার প্রতীক্ হ'ল ভাস্বর গো, অনন্ত মাতা, অদিতি; নিম্নতর অস্তিত্ব তাঁর তামসরূপ দিতির অধীন। যজ্ঞের উদ্দেশ্য হ'ল পরতর বা দিব্য সত্তা জয় করা এবং ইহার সহিত অবর বা মানুষী অস্তিত্বকে অধিকার করা এবং ইহাকে দিব্য সত্তার বিধান ও সত্যের অধীন করা। যজ্ঞের "ঘৃত" হল ভাস্বর গোর উৎপন্ন দ্রব্য; ইহা হ'ল মানবীয় মানসিকতার মধ্যে সৌর আলোকের শুদ্ধতা বা ঔজ্জ্বল্য। সোম হ'ল অস্তিত্বের অমৃতময় আনন্দ যা গূঢ় আছে জলরাশি ও লতার মধ্যে এবং নিষ্কাশিত করা হয় দেবতাদের ও মানবদের পানের জন্য। মন্ত্র হ'ল সত্যের মনন-দীপ্তি প্রকাশিকা চিদাবিষ্ট বাণী যা অন্তঃপুরুষ থেকে উত্থিত হ'য়ে, হৃদয়ের মধ্যে গঠিত হ'য়ে মনের দ্বারা রূপায়িত হয়। "ঘৃতের" দ্বারা বৃদ্ধি পেয়ে অগ্নি, সোমের দীপ্তিময় বীর্য ও আনন্দে পরাক্রান্ত ইন্দ্র আঙ্গিরসদের সাহায্য করেন সূর্যের যূথসমূহ উদ্ধার করতে।

বৃহস্পতি সৃজনশীলা বাক্-এর অধিপতি। যদি অগ্নি পরম অঙ্গিরা হন, সেই শিখা হন যা থেকে আঙ্গিরসরা জাত হন, তাহ'লে বৃহস্পতিই একমাত্র অঙ্গিরা যাঁর সাতটি মুখ, দীপ্তিকারী মননের সপ্ত রশ্মি এবং ইহার প্রকাশিকা সপ্তবাণী আর এই ঋষিরা হ'লেন উচ্চারণের বিভিন্ন শক্তি। সত্যের এই সম্পূর্ণ সপ্তশীর্ষ মননই মানবের জন্য যজ্ঞের যা উদ্দেশ্য সেই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক সম্পদ জয় ক'রে তার জন্য জয় করে চতুর্থ বা দিব্য লোক। এইজন্যই অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, সোম—এসবকেই বর্ণনা করা হয় সূর্যের যূথসমূহের জয়ীরূপে এবং যে দস্যুরা সেসবকে মানবের কাছ থেকে প্রচ্ছন্ন ও আটক রাখে তাদের নাশক বলে। সরস্বতী যিনি বাক্-এর এক স্রোতধারা অথবা সত্যের অনুপ্রেরণা তিনিও দস্যু-হন্ত্রী

এবং ভাস্বর যূথসমূহের বিজয়িনী; আর তাদের আবিষ্কার করেন, ইন্দ্রের অগ্র-দূতী সরমা যিনি এক সৌর বা উষার দেবী এবং মনে হয় সত্যের বোধি-ময় শক্তির প্রতীক্। উষা একইসাথে নিজেই মহান্ জয়ের এক কর্মী এবং তাঁর পূর্ণ উদয়ে এই জয়ের জ্যোতির্ময় ফল।

উষা দিব্য উষা কারণ তাঁর আগমনের দ্বারা যে সূর্য উদিত হন তা অতিচেতন সত্যের সূর্য। যে দিবা তিনি আনেন তা হ'ল সত্য জ্ঞানের মধ্যে সত্য জীবনের দিবা, যে রাত্রি তিনি দূর করেন তা হ'ল অজ্ঞানতার রাত্রি যার বক্ষের মধ্যে তবু উষা প্রচ্ছন্ন আছে। উষা স্বয়ং সত্য, "সূনৃতা" এবং সত্যসমূহের মাতা। দিব্য উষার এই সত্যগুলিকে বলা হয় তাঁর গোরাজি, তাঁর ভাস্বর যূথসমূহ; আর তাদের সহিত সত্যের যেসব শক্তি থাকে এবং প্রাণকে অধিকার করে তারা তাঁর অশ্বদল। এই গো ও অশ্বের প্রতীকের চারিদিকেই বৈদিক প্রতীক্-তন্ত্রের অধিকাংশ জড়িত রয়েছে; কারণ দেবতাদের কাছ থেকে মানব যে ধনরাজি প্রার্থনা করে ইহারাই তাদের প্রধান বিষয়। উষার গোরাজিকে অন্ধকারের অধিপতি দৈত্যরা অপহরণ ক'রে লুকিয়ে রেখেছে তাদের গোপন অবচেতনের অধস্তন গুহার মধ্যে। ইহারাই জ্ঞানের দীপ্তিরাজি, সত্যের মননসমূহ, "গাবো মতয়ঃ" আর ইহাদের মুক্ত করতে হবে তাদের কারাগারের মধ্য থেকে। তাদের মুক্তির অর্থ দিব্য উষার শক্তিসমূহের উৎসবন।

ইহাই আবার অন্ধকারে অবস্থিত সূর্যের পুনরুদ্ধার; কারণ সূর্য, "সেই সত্য" সেই বস্তুই যা ইন্দ্র এবং আঙ্গিরসরা পেয়েছিলেন পণিদের গুহার মধ্যে। ঐ গুহা বিদীর্ণ করা হ'লে দিব্য উষার যূথসমূহ যা সব সত্যের সূর্যের রশ্মিমালা সত্তার পর্বত আরোহণ করে এবং সূর্য স্বয়ং দিব্য অস্তিত্বের জ্যোতির্ময় উর্ধ্বস্থ সমুদ্রে আরোহণ করে আর এই সমুদ্রের উপর দিয়ে তাকে নিয়ে যান মনীষীরা জলরাশির উপর পোতের ন্যায়,—যতক্ষণ না ইহা উপনীত হয় তার অপর পারে।

যে পণিরা পশুরদল লুকিয়ে রাখে, যারা অধস্তন গুহার অধিপতি তারা এমন একশ্রেণীর দস্যু যাদের বৈদিক প্রতীক্-তন্ত্রে দেখান হ'য়েছে আর্যদেবতাদের ও আর্য ঋষি ও কর্মীদের বিরোধী ব'লে। সে-ই আর্য যে যজ্ঞের কাজ করে, দীপ্তির পবিত্র বাণী পায়, দেবতাদের কামনা করে এবং তাঁদের বর্ধন করে এবং নিজেও তাঁদের দ্বারা বর্ধিত হয় সত্য অস্তি-ত্বের বৃহত্ত্বের মধ্যে; সে জ্যোতির যোদ্ধা ও সত্যের পথিক। দস্যু হ'ল

অদিব্য পুরুষ যে কোন যজ্ঞ করে না, এমন সম্পদ্ সঞ্চয় করে যা সে যথার্থভাবে ব্যবহার করতে অক্ষম কারণ সে বাণী বলতে অশক্ত অথবা অতিচেতন সত্যকে মানসিকভাবাপন্ন করতে অসমর্থ; সে বাক্, দেবতাদের ও যজ্ঞ ঘৃণা করে এবং নিজের কিছুই পরতর অস্তিত্বসমূহে দেয় না, কিন্তু ধন অপহরণ ক'রে সে তা আর্যর কাছ থেকে আটক রাখে। সে তস্কর, শত্রু, বৃক, খাদক, বিভাজক, বাধাদায়ক ও আবদ্ধকারী। দস্যুরা হ'ল অন্ধকার ও অজ্ঞানতার বিভিন্ন শক্তি যারা সত্য ও অমৃতত্বের অন্বেষুকে বাধা দেয়। দেবতারা হ'লেন জ্যোতির শক্তিসমূহ, অনন্তের সন্তান, এক পরমদেবের বিভিন্ন রূপ ও ব্যক্তিসত্ত্ব যাঁরা তাঁদের সাহায্য দিয়ে এবং মানবের মাঝে তাঁদের বৃদ্ধি ও মানুষী ক্রিয়াধারার দ্বারা তাকে উত্তোলন করেন সত্যে ও অমৃতত্বে।

এইভাবে অঙ্গিরা উপাখ্যানের ব্যাখ্যাই বেদের সমগ্র রহস্যের চাবিকাঠি আমাদের দেয়। কারণ যদি যেসব গো ও অশ্ব আর্যরা হারিয়েছিলেন এবং দেবতারা পুনরুদ্ধার করেছিলেন, যেসব গো ও অশ্বের প্রভু ও দাতা হ'লেন ইন্দ্র এবং বস্তুতঃ ইন্দ্র স্বয়ং গো ও অশ্ব তাহ'লে সেসব স্থূল ভৌতিক গো ও অশ্ব নয়, আর যদি যজ্ঞের দ্বারা প্রার্থিত সম্পদের এই সব বিষয় আধ্যাত্মিক ধনরাজির প্রতীক্ হয়, তাহ'লে ইহাদের সহিত অন্য যেসব বিষয় সর্বদাই প্রার্থনা করা হয় যেমন পুত্র, জনগণ, স্বর্ণ, বিত্ত ইত্যাদি সেইগুলিও নিশ্চয়ই ঐরূপ আধ্যাত্মিক ধনরাজির প্রতীক্ হবে। যে গাভী থেকে "ঘৃত" উৎপন্ন হয় যদি সেই গাভী স্থূল পশু গাভী না হয়, পরন্তু তা হয় দীপ্তিময়ী মাতা, তাহ'লে যে "ঘৃত" জলরাশির মধ্যে পাওয়া যায় এবং যার সম্বন্ধে বলা হয় যে পণিরা তাকে ত্রিবিধভাবে গোপন করে রেখেছে গাভীর মধ্যে তা কোন স্থূল ভৌতিক নিবেদন নয়; ঠিক সেই কথাই প্রযোজ্য সোমের মধুমদিরার বেলায় যার সম্বন্ধেও বলা হয় যে ইহা নদীগুলির মধ্যে অবস্থান করে এবং সমুদ্র থেকে মধুময় ঊর্মি রূপে ওঠে এবং ঊর্ধ্বে প্রবাহিত হয় দেবগণের নিকট। আর সেক্ষেত্রে যজ্ঞের অন্যান্য নিবেদনও প্রতীকার্থক্ হ'তে বাধ্য; বাহ্য যজ্ঞ আন্তর দানের প্রতীক্ ছাড়া অন্য কিছু হ'তে পারে না। আর যদি অঙ্গিরা ঋষিরাও অংশতঃ প্রতীকার্থক্ হন কিংবা দেবতাদের মতো যজ্ঞের অর্ধ-দিব্য কর্মী ও সহায়ক হন তাহ'লে ভৃগুরা, অথর্বারা, উশনা, কুৎস এবং অপর যাঁরা তাঁদের সহিত তাঁদের কর্মে যুক্ত থাকেন তাঁরাও ঐরূপ হবেন। যদি আঙ্গিরস উপাখ্যান এবং

দস্যুদের সহিত সংগ্রামের কাহিনী রূপক গল্প হয় তাহ'লে ঋগ্বেদে দৈত্যদের বিরুদ্ধে দেবগণ ঋষিদের যে সাহায্য দেন সেই সবের উপাখ্যানমূলক কাহিনীও তদ্রূপ হবে; কারণ এইগুলিকেও বৈদিক কবিরা ঐরূপ কথায় বর্ণনা করেন এবং সর্বদাই আঙ্গিরস উপাখ্যানের সহিত সমভাবে গণ্য করেন।

সেইরূপ এই যেসব দস্যু দান ও যজ্ঞ অস্বীকার করে এবং বাক্-কে ও দেবতাদের ঘৃণা করে এবং সর্বদাই আর্যদের সহিত সংগ্রামে রত থাকে যদি তারা অর্থাৎ বৃত্রগণ, পণির দল ও অন্যান্যেরা মানুষী শত্রু না হয় বরং অন্ধকারের, অনৃতের ও অশুভের সব শক্তি হয় তাহ'লে আর্যদের সব যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজা, রাষ্ট্রজাতির সমগ্র ভাবনাই আধ্যাত্মিক প্রতীক্ ও নীতিকথার রূপ ধারণ করতে সুরু করে। ইহারা সম্পূর্ণভাবে সেইরূপ, না শুধু আংশিকভাবে সেইরূপ---এ বিষয়টির মীমাংসা আরো বিস্তারিত পরীক্ষা ব্যতীত সম্ভব নয়, কিন্তু এইরূপ বিস্তারিত আলোচনা আমাদের বর্তমান উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই দেখা যে বৈদিক সূক্তগুলি প্রাচীন ভারতীয় রহস্যবাদীদের প্রতীকার্থক্ সাধনতত্ত্ব এবং তাদের অর্থ আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক---এই যে ভাবনার কথা আমরা প্রথমে বলেছি তার জন্য কোন আপাতগ্রাহ্য যুক্তি আছে কিনা। এরূপ এক আপাতযুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি; কারণ এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নিষ্ঠার সহিত বেদাধ্যয়নে অগ্রসর হওয়ার এবং ইহাকে এক প্রতীকার্থক্ গীতিকবিতা বলে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার যথেষ্ট কারণ আমরা পেয়েছি।

তবু, আমাদের কথা সম্পূর্ণ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আঙ্গিরসগণ ও জ্যোতির উপাখ্যানের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত অনুরূপ বৃত্র ও জলরাশির উপাখ্যানটি পরীক্ষা করা শ্রেয়ঃ। প্রথমতঃ বৃত্রহন্তা ইন্দ্র অগ্নির সহিত বৈদিক দেবগণের মধ্যে দুই প্রধান দেবতার অন্যতম এবং যদি তাঁর চরিত্র ও ক্রিয়াবলী যথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহ'লে আর্যদেবতাদের সাধারণ চরিত্র কি তা দৃঢ়ভাবে নির্ধারিত করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ তাঁর সহচর ও পবিত্রমন্ত্রের গায়ক মরুৎরা বৈদিক পূজা সম্বন্ধে প্রাকৃতিক ব্যাখ্যার পক্ষে এক প্রবল যুক্তিস্বরূপ; তাঁরা যে ঝড়ের দেবতা তাতে সন্দেহ নেই এবং তাঁদের চেয়ে বড় অন্য কোন বৈদিক দেবতারই, অগ্নির, বা অশ্বিদ্বয়ের বা বরুণ ও মিত্রের, অথবা ত্বষ্টৃ ও দেবীগণের ও এমন কি সূর্যের বা উষারও এরূপ সুস্পষ্ট ভৌতিক চরিত্র নেই। তাহ'লে যদি দেখান যায় এই ঝড়ের

দেবতাদেরও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ ও প্রতীক্-তন্ত্র আছে তাহ'লে বৈদিক ধর্ম ও অনুষ্ঠানের গভীরতর অর্থ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আর অবশেষে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা ক'রে যদি দেখা যায় যে বৃত্র এবং তার সঙ্গী শুষ্ণ, নমুচি ও অপর সব দৈত্য আধ্যাত্মিক অর্থে দস্যু এবং যে স্বর্গীয় জলরাশি সে আটক রাখে তার অর্থ আরো সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করা হয় তা'হলে ঋষিকুল, দেবগণ ও দৈত্যদলের সম্বন্ধে গল্পগুলিকে একটি নিশ্চিত সূত্র থেকে রূপককাহিনী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে এবং বৈদিক লোকসমূহের প্রতীক্-তন্ত্রকে আরো সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করা যুক্তি-সম্মত হয়।

বর্তমানে আমাদের পক্ষে ইহার বেশী কিছু করার চেষ্টা সম্ভব নয়; কারণ সূক্তগুলির মধ্যে বৈদিক প্রতীক্তন্ত্র প্রতিপদে এত জটিল, এবং বিচার করার দৃষ্টিভঙ্গি এত বহুসংখ্যক এবং ইহার বিভিন্ন আনুষঙ্গিক উক্তিগুলিতে ও গুরুত্বের তারতম্যে এত বেশী অস্পষ্টতা ও কষ্ট দেখা দেয় যে তাদের ব্যাখ্যা একরূপ অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে; এবং সর্বোপরি সুদীর্ঘকাল ধরে ইহার অর্থ ভুলে যাওয়া ও ভুল বোঝার ফলে কোন সুচারু ব্যাখ্যা একটিমাত্র গ্রন্থে সম্ভব নয়। বর্তমানে আমরা পারি শুধু ইহার প্রধান সূত্রগুলি সন্ধান ক'রে যতদূর সম্ভব একটি দৃঢ় ও সঠিক ভিত্তি স্থাপন করতে।